আহকামুল কুরআন

ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম
আবূ বকর আহমাদ বিন আলী যাস্‌সাস (র)

১

অনুবাদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আহ্‌কামুল কুরআন

(কুরআনের বিধান)

১ম খণ্ড

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্‌মাদ ইবনে
আলী আর-রাযী আল-যাস্‌সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা -১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২

আহ্‌কামুল কুরআন (১ম খণ্ড)

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্‌মাদ ইবনে আলী
আর-রাযী আল-যাস্‌সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯১

২য় প্রকাশ
(খায়রুন প্রকাশনী প্রথম)
সফর ঃ ১৪২০
জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৪০৬
মে ঃ ২০০১

প্রকাশক ঃ
বেগম খায়রুন নেসা
খায়রুন প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয় ঃ ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

কম্পোজ ঃ
ওয়ালী উল্যাহ ভূঁঞা
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০/ই এ/১, মধুবাগ, নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ মোস্তাফা নাসিরুল হক

মুদ্রণ ঃ আফতাব আর্ট প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা

প্রসঙ্গ কথা

আল্লামা আবূ বকর আল-যাস্‌সাস রচিত 'আহ্‌কামুল কুরআন' তাফসীর সাহিত্যে একটি অসামান্য অবদান। প্রায় বারো শো বছর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থখানি তাফসীর জগতে এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা আল-যাস্‌সাস ছিলেন সেকালে হানাফী মাযহাবের অবিসম্বাদিত ইমাম। তাই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকাহ অনুসারে সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এক অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদের দৈনন্দিন জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। এ কারণে তাফসীর সাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থখানি এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ইসলামী পণ্ডিত ও আলেম সমাজেও এটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক তাফসীরখানির ভাষা অত্যন্ত সুপ্রাচীন–ক্লাসিকধর্মী; এর বাক-রীতিও বেশ জটিল। আধুনিক কোন ভাষায় এর অনুবাদ করার কাজও অত্যন্ত দুরুহ। তবু গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বাংলায় এর ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। জীবনের শেষভাগে নানান কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পুরো গ্রন্থটির ভাষান্তর সুসম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রাণপনে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাই গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের ভাষান্তর সম্পন্ন হবার পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সুসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

তবে মরহুম মওলানার ইন্তেকালের পর অনুবাদ কর্মের উদ্যোক্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর অনূদিত অংশটিকে দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা যথারীতি সমাদৃতও হয়। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এদিকে গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে পাঠক মহল থেকে মওলানা মরহুমের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত খায়রুন প্রকাশনীর কাছে ক্রমাগত দাবি আসতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খায়রুন প্রকাশনী আজ গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণের এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মওলানা মরহুমের সৃষ্টি ও অবদানকে ধরে রাখার এবং এর বাকী অংশ অনুবাদ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়ায় খায়রুন প্রকাশনী নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতা ও ব্যবহারের সুবিধার দিকে বিবেচনা করে দুটি খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটির অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ পারিপাট্য যথাসম্ভব উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, গ্রন্থটির এই সংস্করণও বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদক উভয়কে এই মহতী উত্তম কর্মের প্রতিফল দান করুন।

বিনয়বনত

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

ঢাকা ঃ ১৬ মে, ২০০১

অনুবাদকের কথা

আবূ বকর আহ্মাদ আল-যাস্সাস রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আহ্কামুল কুরআন'-এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করলাম। ৩৭০ হিজরী সনের পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

যে সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেই সময়ের আরবী ভাষা আজকের তুলনায় প্রায় এগারো-বারো শ' বছর পূর্বের। এর মধ্যে আরবী ভাষাসহ অন্যান্য আধুনিক সকল ভাষারই বিশ্লেষণ রীতি ও বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সেই সময়কার ভাষায় রচিত গ্রন্থের একালে অনুবাদ অনেকখানি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেকালের বর্ণনাভঙ্গী ও বিশ্লেষণরীতি অনেকটা প্যাঁচানো। তা থেকে মর্মোদ্ধার করে অনুবাদ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবু পূর্ণ সচেতনতা সহকারে গ্রন্থকারের বক্তব্য যথাযথভাবে ভাষান্তরিত করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

'আহকামুল কুরআন'-এর বাংলা অর্থ 'কুরআনের বিধান বা হুকুম'। কুরআনের আদেশ নিষেধমূলক আয়াতসমূহের ফিক্হী দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। কিন্তু ফিক্হী কিতাবের বিন্যাস এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এ গ্রন্থ যেহেতু কুরআনের আয়াতভিত্তিক ফিকহী আলোচনা, তাই এ গ্রন্থে কুরআনের পরম্পরাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে 'আবূ বকর বলেছেন' এ কথাটির উল্লেখ বারবার হয়েছে। মনে হচ্ছে, মূল গ্রন্থকার আবূ বকর আল-যাস্সাস মুখে বলেছেন, অপর কেউ তা লিখেছেন তাঁরই কথা, তাঁরই নামে।

বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম। এতে মানুষের পালনের জন্যেই জীবন-প্রসঙ্গের আইন বিধান দেয়া হয়েছে। ফলে ফিকাহ বা ব্যবহারশাস্ত্রের মৌল বিধান হচ্ছে এ গ্রন্থ।

এ থেকে মুসলিম জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন—এ আশা পোষণ করছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ অনুবাদের উদ্যোক্তা এবং প্রকাশক। এজন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

এপ্রিল ১৯৮৭ ইং (মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণই ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা ১৩২৫ সনের ৮ ফাল্গুন, (ইংজেী ১৯১৮ সালের ২ মার্চ) সোমবার বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই একজন দক্ষ সংগঠকরূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', নারী', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'পরিবার ও

পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোন জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান' (দুই খণ্ড) ও 'ইসলামের হালাল-হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবূ বকর আল-যাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহ্‌কামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনের অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশি দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'ইতিহাস দর্শন' নামক দুটি গ্রন্থ এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সনে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সনে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত

প্রথম ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সনে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সনে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩১৯ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজী ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আহ্‌মাদ ইবনে আলী আবূ বকর আর-রাযী আল-যাস্‌সাস তাঁর জীবনকালে হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবূ সহল আজ্‌-জুজাজ ও আবুল হাসান আল-কারাখী। তাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন আবূ সাঈদ আল-বারদয়ী থেকে, তিনি মূসা ইবনে নুসাইর আর-রাযী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ থেকে। আহ্‌মাদ আবূ বকর আর-রাযী নিজে বাগদাদে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর বিদেশ যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হয়। তাক্‌ওয়া পরহেজগারীতে তিনি ইমাম আল-কারখীর পন্থার অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হন, হাদীসের শিক্ষাও তিনি তাঁর নিকটই লাভ করেন।

ইমাম আল-যাস্‌সাস বেশ কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে আহ্‌কামুল কুরআন, মুখতাসার আল-কারখীর শরাহ, মুখতাসার তাহাভীর শরাহ, জামে মুহাম্মাদ-এর শরাহ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলনীতি (উসূল) পর্যায়েও তাঁর একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি 'শরহে আল-আসমাউল হুসনা' ও 'আদাবুল কাযা' এ দুইটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। তিনি বাগদাদে ৩০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল-জামে বলেছেন, তিনি 'জিপসাম' (Gypsum–নরম খনিজ পদার্থ)-এর কারিগর ছিলেন বলেই 'আল-যাস্‌সার' নামে খ্যাত। সাময়ানীও এই কথার উল্লেখ করেছেন। 'তাবকাতুল কারী' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, আহ্‌মাদ ইবনে আলী আবূ বকর আর-রাযী বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। তিনি আল-যাস্‌সাস অভিধায় পরিচিত। এটা তাঁর জন্যে উপাধি বা উপনাম বিশেষ। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে 'আর-রাযী' অভিধায় অভিহিত করেছেন, আর কেউ কেউ 'আল-যাস্‌সাস' বলে। মূলত একই ব্যক্তিত্ব। যদিও কোন কোন লোক এ দুই অভিধায় অভিহিত দুইজন ব্যক্তি মনে করেছেন নিতান্তই ভুলবশত। 'আল-কামুস' গ্রন্থকার তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

আহ্‌মাদ আবূ বকর বাগদাদেই বসবাস করেছেন। এই নগরীর ফিকাহ শিক্ষার্থিগণ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হানাফী মতের প্রাধান্য তাঁর নিকটই পরিণত হয়। খতীব বাগদাদী বলেছেন, তাঁর জীবনকাল অবধি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের অনুসারীদের তিনি-ই ছিলেন ইমাম। তিনি তাকওয়া-পরহেজগারীতে বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁকে বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। পরে আরও একবার এই প্রস্তাব দেয়া হয়; কিন্তু সেবারেও তিনি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন নি।

তিনি আবূ সহল ও আবুল হাসান আল-কারখীর নিকট ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৩২৫ হিজরীতে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করেন। পরে আহওয়াজ চলে যান এবং পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। পরে তাঁর শিক্ষক ও শায়খ আবুল হাসান আল-কারখীর মত ও পরামর্শক্রমে নিশাপুরের শাসকের সঙ্গে নিশাপুর চলে যান। তিনি নিশাপুর-এ থাকাকালে আল-কারখী ইন্তিকাল করেন। তাই ৩৪৪ হিজরীতে তিনি আবার বাগদাদে চলে আসেন।

বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর নিকট ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-জুরজানী কুদুরীর শায়খ এবং আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-জাফরানী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল বাকী ইবনে কানে-এর নিকট থেকে। কুরআনের আহকাম-বিধি-বিধান পর্যায়েও তাঁর নিকট থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। খতীব বাগদাদীর মতে তিনি ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এই জীবনী লেখকের বক্তব্য হল, একাধিক ব্যক্তিই এরূপ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আজ-জুরকানী তাঁর 'শরহিল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের সপ্তম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৩১৫ হিজরীতে। তিনি এ-ও লিখেছেন যে, আবূ বকর আর-রাযী ইমাম, হাদীসের হাফেজ এবং নিশাপুরস্থ হানাফী ইমামগণের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আবূ হাতিম ও উসমান

আদ-দারেমীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন আবূ আলী ও আবূ আহ্মদ আল-হাকেম। ইবনে উক্দা বলেছেন, আবূ বকর আরা-রাযী হাদীসের হাফেয ছিলেন। তিনি ৩১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

'কাশফুয-যুনূন' গ্রন্থকার 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ গ্রন্থটি আল-যাস্সাস আর-রাযী অভিধায় পরিচিত মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদের রচিত। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩৭০ হিজরীতে। 'উসূলে ফিকাহর উল্লেখ পর্যায়েও এ মৃত্যুসনেরই উল্লেখ করেছেন। আদাবুল কাযীর শরাহ লেখকদের সঙ্গেও এ মৃত্যুসনই লিখেছেন। 'জামে সগীর' গ্রন্থের শরাহ লেখকদের প্রসঙ্গে ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আল-জাস্সাস-এর মৃত্যুসন ৩৭০ লিখেছেন। 'আল-জাম' আল কবীর গ্রন্থে শরাহ প্রসঙ্গেও তাই লিখেছেন। মুখতাসার আল-কারখীর শরাহ গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পর্যায়েও আবূ বকর আল-যাস্সাস-এর মৃত্যু সন ৩৭০ হিজরী লিখেছেন।

মৃত্যু সন পর্যায়ে এই মতপার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে নামের পার্থক্যও লক্ষণীয়। কোথাও আহমাদ ইবনে আলী, কোথাও মুহাম্মাদ ইবনে আলী এবং কোথাও মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনী লেখকের মতে প্রথমোক্ত কথাই সত্য ও যথার্থ।[১]

---

১. কোন মাযহাবের তাকলীদকারী, যারা মূলতই ইজতিহাদ করতে অক্ষম, কিন্তু দুইটি সম্ভাবনাময় মোটামুটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। মূল নীতিসমূহ করায়ত্ত থাকার দরুন ইমাম আবূ বকরকে অনেকে সেই পর্যায়ের মনীষী গণ্য করেছেন। কিন্তু অনেকে এরূপ উক্তিকে তাঁর প্রতি জুলুম রূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, এতে তাঁর মর্যাদাহানী হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত কথাসমূহ যাচাই করলেই সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং তিনি মুজতাহিদ ফিল মাযহাব প্রমাণিত হবেন।

সূচীপত্র

আহ্‌কামুল কুরআন

প্রথম খণ্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী (র) বলেছেন, এই গ্রন্থের পূর্বে আমি একটি ভূমিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেছি।[১] তাতে যেসব কথা লিখিত হয়েছে, তা অবশ্যই স্মরণীয়। তাতে তওহীদের মৌল নীতি, কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার উপায়-পন্থা, তার দলীলসমূহ প্রকাশকরণ, তার শব্দ থেকে পাওয়া হুকুম বা নির্দেশ-নিষেধ এবং আরবদের বাক্যের রূপ পরিবর্তন, আভিধানিক নাম ও শরীয়াত পর্যায়ে বাক্যসমূহ বুঝবার জন্যে যা যা প্রয়োজন, তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কেননা এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহ্র এককত্ব প্রমাণ, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্যমুক্ততা এবং মিথ্যা অপবাদকারীরা যেসব জুলুম সম্পর্কিত কথাবার্তা বলেছে, তা থেকে তাঁকে পবিত্র প্রমাণ করা।

সেই ভূমিকা-গ্রন্থের পর এক্ষণে সরাসরি কুরআনের বিধান পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে শরীয়াতের প্রত্যেকটি হুকুম সংক্রান্ত দলীলসমূহও পেশ করা হবে। এ কাজে আমি আল্লাহ্র নিকট তওফীক প্রার্থনা করছি, যা আমাকে আল্লাহ্র নৈকট্য দান করবে, আমাকে তাঁর নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা তিনিই তো আমার অভিভাবক, একমাত্র তিনিই তা করতে সক্ষম।

بسم الله الرحمن الرحيم পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ বিষয়ে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলতে হবে। প্রথম কথা 'বিসমিল্লাহ্'র পূর্বে উহ্য শব্দের সর্বনাম সম্পর্কে। অর্থাৎ এর পূর্বে 'আমি শুরু করছি' বা 'শুরু কর' কথাটি উহ্য রয়েছে। এর কর্তা কে তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়, 'বিসমিল্লাহ্.....' বাক্যটি যা শুরুতেই রয়েছে, তা কি কুরআনের অংশ কিংবা অন্য কিছু ?

তৃতীয়, তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ কিংবা নয় ?

চতুর্থ, তা কি প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই স্থাপিত হতে হবে ?

পঞ্চম, এই বাক্যটি কি পূর্ণাঙ্গ বাক্য, না পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয় ?

১. ভূমিকা-গ্রন্থ বলে বুঝিয়েছেন তাঁর রচিত 'উসূলে ফিকহ্' গ্রন্থ। কুরআন থেকে হুকুম আহকাম বের করার মৌল নীতিসমূহ তাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ষষ্ঠ, এই বাক্যটি নামাযেও পাঠ করতে হবে কি ?

সপ্তম, নামাযে যে সূরা বা কুরআনের অংশ পড়া হয়, তার শুরুতে তা বারবার পড়তে হবে কি ?

অষ্টম, তা উচ্চস্বর পড়তে হবে কিনা ?

নবম, তাতে যে তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে ও ব্যাপক তাৎপর্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তা প্রকাশ করা।

এর কারণ, আরবী ভাষার নিয়মে যে বাক্যেই শুরুতে ب অক্ষরটি রয়েছে , তা একটি ক্রিয়া পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তা উহ্য হোক, কি প্রকাশমান। উহ্য হলে ক্রিয়া পদের সর্বনাম (ضمير) এখানে দুটি অবস্থার যে কোন একটি হতে হবে। হয় কাজের সংবাদদান পর্যায়ের হবে, না হয় হবে কাজের আদেশ। সংবাদদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে ঃ اَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰه 'আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি ......। পরে اَبْدَأُ 'আমি শুরু করছি' অংশ উহ্য করা হয়েছে। এ সংবাদদানের বিশেষ আবশ্যকতা থাকেনি। কেননা পাঠক যে পড়া শুরু করেছে তা শব্দের উচ্চারণে বলে দেয়া প্রয়োজন থাকেনি, বাস্তব অবস্থা থেকেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। আর যদি ابدأوا 'শুরু কর' এই শব্দটি উহ্য ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে ঃ 'আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু কর।'

এ দুটি সম্ভাবনার যে কোন একটি হতে পারে। সূরা পাঠ করার ধারায় মনে হয় আদেশসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পড়াশুনা কর'। যেমন সূরা ফাতিহার শব্দ اِيَّاكَ نَعْبُدُ 'কেবলমাত্র তোমারই হে আল্লাহ্ আমরা দাসত্ব করছি'। এর পূর্বে 'তোমরা বল' উহ্য ধরা হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্' বাক্যেও এই সম্বোধন উহ্য আছে বলা যায়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই উদেশ্য স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে। যেমন ঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ 'তোমার রব্ব-এর নামে পড়'। এখানে পাঠ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করতে অর্থাৎ 'আ'উযু বিল্লাহ্' বলতে আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সংবাদদানের তাৎপর্য অনুযায়ী 'আমি পড়া শুরু করছি' এই কথা উহ্য ধরা হয়, তা হলেও তাতে আদেশ নিহিত রয়েছে মনে করা যায়। কেননা যখন জানা যাবে যে, আল্লাহ নিজেই আল্লাহ্‌র নামে পড়া শুরু করছেন, তখন সেই আল্লাহ্‌র নামে শুরু করার জন্যে আমাদের প্রতি আদেশ করা হচ্ছে বোঝা যাবে। কেননা তাঁর নাম করে পাঠ শুরু করলে তাতে বরকত হবে। আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরাও যেন তাই করি।

উপরোক্ত দুটি তাৎপর্যের উভয়ই এখানে বৈধ মনে করাও অসমীচীন নয়। অর্থাৎ এখানে যেমন সংবাদ দেয়া হয়েছে, তেমনি তা করার আদেশও করা হচ্ছে। শব্দের গঠন প্রণালীতে এ দুটিরই সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কেউ বলতে পারেন, সংবাদদানের কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে উভয় তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করার অবকাশ থাকত না।

জবাবে বলা যায়, হ্যাঁ সংবাদদানের ভাবটি (অর্থাৎ 'আমি শুরু করছি' কথা) স্পষ্ট উল্লিখিত হলে দুটি তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। কেননা একটি শব্দ থেকে একই সময় আদেশ ও সংবাদদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ করার অবকাশ থাকতো না। কেননা সংবাদদান থেকে আদেশ বোঝা হলে তা পরোক্ষ অর্থ হয়ে যেত, প্রত্যক্ষ হতো না। প্রকৃত সংবাদদান বোঝা গেলে প্রকৃতপক্ষেও তাই হতো। একটি শব্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ একই সময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা প্রকৃত অর্থ তো তাই, যে অর্থে শব্দটি মূলতই ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরোক্ষ অর্থ প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে অন্যদিকে লক্ষ্য দিলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর একই সময় ও একই অবস্থায় যথাযথ ব্যবহৃত অর্থ এবং তা বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া একটি শব্দের দ্বারা সংবাদদান ও আদেশদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ কাজ। সর্বনাম এখানে উহ্য, অনুল্লিখিত। তা ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। শব্দে দুটিরই সম্ভাবনা থেকে থাকলে উভয় অর্থ গ্রহণ কঠিন নয়। তখন তার অর্থ হবে ঃ আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। অর্থাৎ এই বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে আদেশ হচ্ছে তোমরাও আমার ন্যায় ও বরকত লাভের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নামে শুরু কর। এ দুটিরই ইচ্ছা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে এ দুটিরই দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়। কেননা তা শব্দের সাধারণ তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কোন অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে সম্ভাব্য দুটি দিকের কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে নবী করীম (স)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ –

অনিচ্ছাসত্ত্বে ভুল করা ও ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি এবং কোন কাজ জোরপূর্বক করতে বাধ্য করার দরুন কৃত কাজের দায়িত্ব আমার উম্মতের উপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ এই তিনটি পর্যায়ের কাজের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে)।

কেননা যে হুকুম সর্বনাশের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে মূল হুকুমটাই উঠে যাবার আশঙ্কা, গুনাহ্ হওয়ারও আশঙ্কা, সেখানে এ দুটিই একসাথে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। এভাবে যে, সে কাজের বাধ্যবাধকতা যেমন আমার উম্মতের উপর নেই, তেমনি তাতে আল্লাহ্‌র নিকট কোন গুনাহ্ও হবে না। কেননা ব্যবহৃত শব্দে এ দুটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। দুটিরই ইচ্ছা করা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে তা সত্ত্বেও তা শব্দের সাধারণত্বের দরুন নয়। তা হলে সে দুটিরই সংবদ্ধতা থাকতো। এই কারণে এ ছাড়া ভিন্নতর দলীলকে লক্ষ্য প্রমাণের জন্যে পেশ করা হয়েছে। দুটির কোন একটি বা উভয়টিই বোঝাবার জন্যে দলীল দাঁড় করা নিষিদ্ধ নয়। আর আরবী ভাষায় এরকম হয়ে থাকে যে, দুটি সম্ভাবনার সর্বনাম

ব্যবহার করা হল, যে দুটির এক সাথে ইচ্ছা করা সঠিক কাজ নয়। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

انَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কাজসমূহ নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।

জানাই আছে যে, এখানে যে সর্বনাম উহ্য আছে তা কাজের বৈধতা প্রমাণ করে যেমন, তেমনি কাজটির আফজালিয়ত—অতীব উত্তম হওয়ার কথাও প্রকাশ করে। তাই যখন বৈধতার অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন 'কাজের অতীব উত্তম হওয়ার' তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। কেননা বৈধতার ইচ্ছা নিয়ত না হওয়া অবস্থায় তার হুকুম প্রমাণিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর অতীব উত্তম হওয়ার ইচ্ছা গ্রহণ দাবি করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন ইতিবাচক হুকুম প্রমাণ করা হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হোক, কি অতীব উত্তম হওয়ার নিষেধের মধ্যে হোক। আর একই অবস্থায় মূল অস্বীকার করা ও পূর্ণত্বকে অস্বীকার করার ইচ্ছা করা সম্ভব নয়। যে অবস্থায় দুটি তাৎপর্যের ইচ্ছা করা মূলকে অস্বীকার করা ও ক্ষতিকে প্রমাণ করা সহীহ্ হয় না, উক্ত কথা সেই পর্যায়ের। উভয়টির ইচ্ছা প্রমাণ করতে চাওয়া সহীহ্ নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আদেশের তাৎপর্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রমাণিত হলে, তখন তা বিভক্ত হয়ে যাবে, হয় ফরয হবে, কিংবা হবে নফল। ফরয হচ্ছে নামায শুরু করার সময়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা। যেমন কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى –

নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে পরিশুদ্ধতা পবিত্রতা গ্রহণ করল এবং তার রব্ব-এর নাম উল্লেখ করে নামায কায়েম করল।

আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে উল্লেখ বা স্মরণ করার পর নামায কায়েমের কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল, এখানে তাকবীর-তাহরীমা—নামাযের সূচনাকালীন হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলার কথা বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا – (المزمل – ٨)

তোমরা রব্ব-এর নামের যিকর—স্মরণ করতে থাক ও সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়ে থাক।

তাফসীর লেখকদের মতে এ আয়াতেও তাকবীরে-তাহ্‌রীমার কথাই বলা হয়েছে ।

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى – (الفتح – ٢٦)

এবং মুমিনদেরকে তাক্‌ওয়ার নীতির অনুসারী বানিয়ে রাখলেন।

আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে অভ্যস্ত করা।

জন্তু যবেহ্ করা কালেও আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ফরয। আল্লাহ্ নিজেই তার তাগিদ করেছেন। বলেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ - (الحج - ٣٦)

কাতার বাঁধা অবস্থায় জন্তুগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর।

বলেছেন ঃ

وَلَاتَأْكُلُوْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ -

যে জন্তু যবেহ্ করাকালে আল্লাহ্‌র নাম বলা হয়নি, তা খেয়ো না। কেননা এ কাজটি ফাসিকী, ইসলামের সীমালঙ্ঘন।

এক কথায়, তাহারাত, খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা নফল অর্থাৎ ফরয নয়।

কেউ বলতে পারেন, এ কথা বলে তো তুমি বাহ্যিকতার উপর নির্ভর করে ও প্রতিপক্ষের দলীল গ্রাহ্য না করেই অযূ করাকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাও ওয়াজিব নয় বলে প্রমাণ করছে। অথচ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

যে লোক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে অযূ করেনি, তার অযূই হয়নি।

জবাবে বলতে হবে, এখানে সর্বনাম প্রকাশ্যভাবে নেই। কাজেই এর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। প্রমাণিত বলে ধরা হবে শুধু তা, যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর রাসূলে করীম (স)-এর উক্ত কথাটি অযূর অতীব উত্তম না হওয়ার কথা বুঝিয়েছে, দলীল থেকে তাই প্রমাণিত। আদপেই অযূ না হওয়ার কথা বোঝায় না।

بسم الله الرحمن الرحيم কুরআনের আয়াত—এ পর্যায়ে আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কুরআনের একটি আয়াত। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নমলে পূর্ণ আয়াত এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - (٣٠)

এই চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে এবং তা দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথমবার কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন ঃ اِقْرَأْ 'পড়।'

রাসূল (স) বললেন ঃ مَا اَنَا بِقَارِىٍ 'আমি তো পড়তে সক্ষম নই।' পরে বললেন ঃ اِقْـرَاْ بِـاسْـمِ رَبِّـكَ الَّذِىْ خَـلَـقَ – 'পড় তোমার সেই রব্ব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'।

আবূ কতন আল-মাসঊদী থেকে, তিনি আল-হারম আল-আকলী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) চিঠিসমূহের শুরুতে প্রথমে লিখতেন ঃ بِـاسْـمِـكَ اَللّٰهُمَّ হে আমাদের আল্লাহ্, তোমার নাম করে (শুরু করছি)।

পরে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖيهَا وَمُرْسٰهَا – (هود-٤١)

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (নৌকায় আরোহণ কর), যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঁচু করে ধারণ করবেন।

অতঃপর রাসূল (স) বিস্‌মিল্লাহ লিখাতে শুরু করেন। পরে নাযিল হল ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ –

বল, তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক কিংবা ডাক রহমানকে।

পর তিনি চিঠির উপর আল্লাহ্‌র পর 'রহমান'ও লিখতে থাকেন। পরে সুলায়মান (আ) সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি পূর্ণ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে শুরু করেন।

সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে—শাবী, মালিক, কাতাদাহ্ ও সাবিত প্রমুখ তাবেয়ী বলেছেন ঃ নবী করীম (স) সূরা 'আন-নম্‌ল' নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পত্রাদির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেন নি। হুদায়বিয়ার সন্ধি কালে তাঁর ও সুহায়ল ইবনে আমর-এর মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন ঃ প্রথমে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ। সুহায়ল বলল ঃ না, بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ 'হে আল্লাহ্ তোমার নামে' লিখতে হবে। কেননা আমরা রহমানকে চিনি না। নবী করীম (স) সুহায়লের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাযিল হয়নি। পরে সূরা আন-নমল নাযিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। (সূরাটি মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত)।

বিসমিল্লাহ্ কি সূরা ফাতিহার অংশ

আবূ বকর বলেছেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার অংশ কিনা—এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কূফা পন্থী কুরআন পাঠকবৃন্দ তাকে সূরা

আল-ফাতিহার অংশ গণ্য করেছেন। বলেছেন, তা এই সূরার মধ্যেরই একটি আয়াত। কিন্তু বস্‌রাপন্থী পাঠকগণ তা গণ্য করেন নি। আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের পক্ষ থেকে এ পর্যায়ে কোন স্পষ্ট অকাট্য মত বর্ণিত হয় নি, তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত তা-ও বলা হয়নি। তবে আমাদের উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী নামাযে তা উচ্চস্বরে পাঠ না করাই তাঁদের মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের মতে তা সূরা আল-ফাতিহারই কোন আয়াত নয়। কেননা তা যদি তাঁদের মতে সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত হতো, তাহলে নামাযে তা তাঁরা উচ্চস্বরে পড়ার নীতিই গ্রহণ করতেন, যেমন সূরার অন্যান্য আয়াত পাঠ করা হয়। ইমাম শাফিয়ীর মতে তা সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত। তাই তা পাঠ করা না হলে নামায আবার পড়তে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ দুটি মতের কোন একটিকে সহীহ্ বলে ঘোষণা করা মূর্খতা ও প্রচ্ছন্নতা আরোপ মাত্র। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, ইনশা আল্লাহ্।

বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই উল্লেখ্য কিনা

আবূ বকর বলেছেন, বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ্য কোন আয়াত কিনা—এ পর্যায়েও মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এই মাত্র আমরা বলে এসেছি যে, আমাদের হানাফী মনীষীদের যেহেতু তা নামাযে উচ্চস্বরে পড়ার নীতি গৃহীত হয়নি, তাই তা প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ্য কোন আয়াতও নয়। আর তা যখন সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তাই অন্যান্য সূরার ব্যাপারেও সেই কথা। অন্যান্যের মতে তা সূরা ফাতিহার অংশ নয় বটে তবে তা সূরা আল-ফাতিহার শুরুতে উল্লেখ্য আয়াত।

কিন্তু ইমাম শাফিয়ীর মত হল—তা প্রতিটি সূরার অংশ একটি আয়াত। তবে তাঁর পূর্বে এ ধরনের মত অন্য কেউ দেন নি। কেননা পূর্বগামীদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তা সূরা ফাতিহার আয়াত কিনা। তাকে সব কয়টি সূরার আয়াত কেউ-ই মনে করেন নি। তা যে সূরা ফাতিহার আয়াত নয়, একটি হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে এবং তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُسِّمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِىْ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ،وَلِعَبْدِىْ مَا سَالَ، فَاذَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، قَالَ اللّٰهُ : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ، وَاِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ : مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ اَوْ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِىْ، وَاِذَا قَالَ:

مَـالِكِ يَـوْمِ الدِّيْنِ ، قَـالَ : فَـوَّضَ اِلَـيَّ عَـبْـدِىْ، وَاِذَا قَـالَ : اِيَّـاكَ نَـعْـبُـدُ وَاِيَّـاكَ نَـسْـتَـعِـيْـنُ، قَـالَ : هٰذِهٖ بَـيْـنِـىْ وَبَـيْنَ عَـبْـدِىْ، وَلِعَبْدِىْ مَـاسَأَلَ، فَـيَـقُـوْلُ عَـبْـدِىْ، اِهْـدِنَـا الصِّـرَاطَ الْـمُـسْـتَـقِـيْـمَ اِلٰى اٰخِرِهَـا، قَـالَ : لِعَبْدِىْ مَـا سَـأَلَ-

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তার অর্ধেক আমার জন্যে আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দার জন্যে তা-ই আছে যা সে চেয়েছে। সে যখন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলে, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার হাম্দ (প্রশংসা) করেছে। যখন সে বলে 'আর-রাহমান আর-রাহীম', তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে মর্যাদাবান করেছে বা আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে মালিক ইয়াওমিদ্দীন, তখন আল্লাহ্ বলেন—আমার বান্দা আমার নিকট সব কিছু সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে ইয়্যাকা-না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, তখন আল্লাহ্ বলেন—এই কথাটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা-ই সে পাবে। এর পর বান্দা ইহ্দিনাস-সিরাতাল মুস্তাকীম সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চেয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিস্মিল্লাহ .... যদি সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হতো, তাহলে সূরাটির আয়াতসমূহের উল্লেখে সেটিরও উল্লেখ হতো। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিসমিল্লাহ.... সূরা ফাতিহার অংশ নয়। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, উপরোদ্ধৃত হাদীসে 'সালাত' বা নামাযকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলে সূরা ফাতিহাই বুঝিয়েছেন, আর তাকেই দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' যে সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তা তার মধ্যকার কোন আয়াত নয়, তা এ প্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। দুটি দিক দিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, উক্ত বিভক্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়, তা এই বিভক্তিতে থাকলে তা দুভাগে বিভক্ত হতো না। কেননা তাতে বান্দার অংশের তুলনায় আল্লাহ্‌র অংশ অনেক বড়। এই বিসমিল্লাহ্.......... আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা সমন্বিত। তাতে বান্দার কোন অংশই নেই।

কেউ বলতে পারেন যে, তা উল্লেখ করা হয়নি এ জন্যে যে, তাতে সূরার 'আর-রাহমান— আর রাহীম' দুবার উল্লেখ করতে হয়।

জবাবে বলা যাবে, দুটি দিক দিয়ে এ কথাটি ভুল। একটি এই যে, তা যখন একটি স্বতন্ত্র আয়াত যেমন বলা হয়, তখন তার উল্লেখ একান্তই জরুরী। তার উল্লেখ না করা যদি বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে মূল সূরায় যে 'আর-রাহমান, আর-রাহীম' রয়েছে তাকে যথেষ্ট মনে করাও বৈধ হতো।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, বিস্‌মিল্লাহ্‌...... কথায় আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তা আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম, এই নামে অন্য কাউকে অভিহিত করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় সূরাটির বিভক্তিকালে তার উল্লেখ একান্তই জরুরী ছিল। কেননা তার উল্লেখ পূর্বে হয়নি। সূরার আয়াত বিভক্তিতেও তার উল্লেখ কোন একটি ভাগেও নেই।

উপরোদ্ধৃত হাদীসটি অপর এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর আবূ দাঊদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কানবী মালিক থেকে, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হিশামের মুক্ত গোলাম —সায়েব) বলেছেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে, তার অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা সে অবশ্যই পাবে। বান্দা বলে 'আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার হাম্‌দ করেছে। বান্দা বলে ঃ আর-রাহ্‌মান আর-রাহীম। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে ঃ 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন,' তখন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বলেছে। আর এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। বান্দা বলে ঃ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন, এই আয়াতও আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। বান্দার তা-ই রয়েছে যা সে চেয়েছে। এই হাদীসে অতঃপর 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। এটা বর্ণনাকারীর একটি ভ্রান্তি মাত্র। কেননা 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' একান্তভাবে আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা, এতে বান্দার কিছু নেই। যেমন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-এ বান্দার ভাগের কিছু নেই। ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন-এ আল্লাহ্‌ ও বান্দা—উভয়ের অংশ আছে তা বলার কারণ হল, তাতে একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র গুণের উল্লেখ আছে, তেমনি আছে বান্দার প্রার্থনা। লক্ষণীয় যে, এর পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম-এ বিশেষভাবে বান্দার অংশ বলা হয়েছে এজন্যে যে, তাতে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন কথা নেই। এটা বান্দার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা মাত্র। অপর দিক থেকে 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন এবং অনুরূপ 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' যদি আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হতো, তাহলে তা দুভাগে বিভক্ত হতো, যারা বিস্‌মিল্লাহ.... কে সূরার একটি আয়াত গণ্য করে তারা যেমন বলে। তাহলে আল্লাহ্‌র জন্যে চারটি আয়াত হয়ে যেতো—আর-রাহমান আর-রাহীম বাদে। আর বান্দার জন্যে হতো মাত্র তিনটি আয়াত।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ .....সূরাসমূহের প্রাথমিক আয়াত না হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল তা দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যম মাত্র। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে বকর..... আবূ দাঊদ.... আমর ইবনে আওন বলেছেন .... হুশাইম আওফ আল আরাবী থেকে ...... যায়দ আল কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, আমি আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) কে বললাম ঃ

مَاحَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُمْ اِلٰى بَرَاْةٍ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنِ وَاِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ الْمَثَانِى، فَجَعَلْتُمُوْهُمَا فِى السَّبْعِ الطِّوَالِ، وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা 'বরায়াত' (তওবা) দুইশ' আয়াত সমন্বিত, সূরা আন্‌ফাল মাসানীর মধ্যে গণ্য, এ দুটিকে আপনারা সাতটি সুদীর্ঘ সূরার মধ্যে গণ্য করেছেন এবং দুটির মধ্যে বিসমিল্লাহ্... লিখেন নি, তার কারণ কি ?

জবাবে হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ নবী করীম (স)-এর প্রতি যখন বহু কয়টি আয়াত একসঙ্গে নাযিল হতো, তখন তিনি নিয়োজিত লেখককে ডেকে বলতেন, এই আয়াত অমুক সূরায় .... যাতে এই এই কথা বলা হয়েছে—শামিল কর। আর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হতো তখনও এরূপ বলতেন। সূরা আনফাল মদীনায় প্রথম নাযিল হয়েছিল, আর সূরা 'বরায়াত' কুরআনের শেষ সূরা হিসেবে নাযিল হয়েছিল। আর এ দুটি সূরার আলোচ্য সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আমি মনে করেছি, এ সূরাটি ওটির-ই অংশ। এই কারণে আমি এ দুটিকে সূদীর্ঘ সাত সূরার মধ্যে গণ্য করেছি, এ দুটির মধ্যে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ছত্রটি লিখিনি।

বোঝা গেল, হযরত উসমান (রা) বিস্‌মিল্লাহ ..কে সূরার অংশ গণ্য করেন নি, তিনি তা দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই লিখতেন মাত্র। এছাড়া অন্য কিছু নয়। উপরন্তু তা যদি প্রত্যেক সূরার অংশ হতো, অংশ হতো সূরা ফাতিহার, তাহলে তা নবী করীম (স)-এর স্থাপন নীতি থেকেই জানা যেতো, যেমন সব সূরার আয়াতসমূহের স্থাপন থেকেই তা জানা যায় এবং তাতে কোনরূপ মতপার্থক্যেরই সৃষ্টি হতো না। কেননা সকল আয়াত সম্পর্কে জানার এবং এই সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞানের উৎস তো একটাই। সকলের মিলিত উদ্ধৃতি ও বর্ণনা হল কুরআন প্রমাণের একটি মাত্র উপায়। তাই আয়াতের স্থান ও বিন্যাস পর্যায়ের জ্ঞানও সেই একই সূত্র থেকে জানতে হবে। কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ভঙ্গ করা ও কোন আয়াতকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে উঠিয়ে অন্য স্থানে বসানো যে কারোর জন্যেই জায়েয নয়, সেকথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কেউ তা করলে সে তো মূল কুরআনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাই বিসমিল্লাহ....সূরাসমূহের প্রথম আয়াত যদি হতো, তাহলে সে কথা সকলেই জানতে পারতেন, তা নিয়ে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতো না। যেমন সকলেই জানেন যে, বিস্‌মিল্লাহ্... একটি আয়াত হিসেবে সূরা আন-নম্‌ল-এ শামিল রয়েছে। কিন্তু তার অপর কোন সূরার অংশ বা আয়াত হওয়ার কথা যখন পূর্ববর্তী মনীষীরা উল্লেখ করেন নি, তখন আমাদের পক্ষে তা মনে করা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তাকে প্রত্যেকটি সূরার প্রথম আয়াতও আমরা মনে করতে পারি না।

কেউ বলতে পারেন, পূর্ববর্তীরা সব একত্রিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে একথা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে, সহীফার মধ্যে যা-ই আছে, তা সবই কুরআন। তাই সহীফার যেখানে যা যে ভাবেই আছে সে ভাবেই তা আমাদের মেনে নেয়া উচিত। জবাবে বলব, তারা সূরাসমূহের উপরে তা লিখিতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন; কিন্তু তা এসব সূরার কোনটির অংশ—সূরা নম্‌ল ছাড়া দেখান নি। যে যে সূরার উপরে তা লিখিত, তা সেই সূরার অংশ বা একটি আয়াত, তা নিয়েই আমাদের মধ্যের এই বিতর্ক। আমরা বলি, তা কুরআনের আয়াত বটে; কিন্তু যে যে সূরার উপরে তা বসানো আছে, তা সেই সূরার অংশ, তা আমরা বলতে পারি না। তা সেই সূরার সঙ্গে পড়তে হবে, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তা সেই সূরার আয়াত। কেননা কুরআনের কতক অংশ অপর কতক অংশের সাথে মিলিত, সম্পর্কিত। কিন্তু বিসমিল্লাহ.... কোন্ সূরার সাথে মিলিত সম্পর্কিত, তা বলা হয়নি। আর তার দরুন এটাও প্রমাণিত হয় না যে, এই সবটাই একটি সূরা।

কেউ যদি বলেন, সহীফা আমাদের নিকট আনা হয়েছে, বলা হয়েছে, তাতে যা-ই আছে, তা সবই কুরআন, তার সংবদ্ধতা-সংলগ্নতা ও বিন্যাস সহকারে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক সূরার উপরে যে বিসমিল্লাহ..... মূল সূরার অংশ না হলে তা তাঁরা অবশ্যই বলতেন। তাঁরা বলেছেন যে, তা প্রত্যেক সূরার উপরে বসানো হয়েছে সূরা দুটি মিলে এক হয়ে না যায় সেজন্যে।

জবাবে বলা যায়, বিস্‌মিল্লাহ... কুরআনের অংশ নয় যারা বলে, তাদের প্রতিই এই প্রশ্ন হতে পারে। যারা বলে তা কুরআনের কথা, তাদের প্রতি এই প্রশ্ন অবান্তর। কেউ যদি বলে যে, তা যদি সূরার অংশ না হতো, তা হলে, তা সকলেই জানতে পারতেন, কারোরই ভিন্ন মত হতো না। তা হলে যাঁরা বলেন, তা সূরার অংশ তাদের প্রতিও এই প্রশ্ন হতে পারে না—

তাঁকে বলা যাবে, না, তা জরুরী নয়। কেননা যা সূরার অংশ নয়, তা সব বলে দেয়া কর্তব্য নয়, যেমন যা কুরআনের নয় তা চিহ্নিত করে দেয়াও তাদের কর্তব্য নয়। যা সূরার অংশ তা উদ্ধৃত করাই তাদের দায়িত্ব। বলা কর্তব্য যে, এটা সূরার অংশ। যা কুরআনের, তা বলে দেয়া যেমন তাদের কর্তব্য। তাই তা সূরার অংশ একথা যখন বলা হয়নি এবং তা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তখন মূল কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার মত তাকেও প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের জায়েয নয়।

তা সূরাসমূহের প্রথম আয়াত নয়—এ কথা প্রমাণের আর একটি দলীল হচ্ছে অপর একটি হাদীস। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে আবান, মুহাম্মাদ ইবনে আয়ূব মুসাদ্দাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, শুবা, কাতাদা, হযরত আব্বাস আল-জাশী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (স)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

سُوْرَةٌ فِي الْقُرْاٰنِ ثَلَا ثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَلَهُ : تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ –

কুরআনে ত্রিশটি আয়াত সমন্বিত সূরা তার পাঠকের জন্যে শাফা'আত করবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যের কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন।

কুরআনের সব কারীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যে ত্রিশটি আয়াতের কথা বলা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই বিসমিল্লাহ.......গণ্য নয়। যদি তা গণ্য হতো তাহলে তো ত্রিশটি না—একত্রিশটি আয়াত হয়ে যাবে। তা হলে তা রাসূলে করীম (স)-এর কথার বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু সমস্ত দেশ ও নগরের কারী এবং ফিকাহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-কাওসার তিন আয়াতবিশিষ্ট, সূরা ইখ্লাসের মাত্র চারটি আয়াত। বিসমিল্লাহ....যদি সূরার আয়াত গণ্য হতো, তাহলে এ দু'টি সূরার আয়াত সংখ্যা একটি করে বেশি ধরতে হতো, তা ধরা হয়নি। যদি বলা হয় যে, বিসমিল্লাহ....কে বাদ দিয়েই এই সংখ্যা ধরা হয়েছে, কেননা তাঁদের নিকট এটা কোন সমস্যা নয়। আমরা বলব, তাহলে তাঁদের পক্ষে একথা বলা জায়েয ছিল না যে, সূরা ইখলাস চার আয়াতবিশিষ্ট এবং সূরা আল-কাওসার তিন আয়াতবিশিষ্ট। তিন বা চার আয়াত বললে সম্পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় না। আর তা-ই যদি হতো তাহলে সূরা আল-ফাতিহার ছয়টি আয়াত বলা উচিত ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, আবদুল হুমাইদ ইবনে জাফর, নূহ ইবনে আবূ জালাল—সাঈদ আল মকবেরী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলছিলেন—আল হাম্দুলিল্লাহ্র সাত আয়াত, তার একটি হচ্ছে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই সনদে হযরত আবূ হুরায়রার উল্লেখ অনেকেই সন্দেহ করেছেন। আবূ বকর আল-হানাফী আবদুল হুমাইদ ইবনে জাফর নূহ্ ইবনে আবূ জালাল সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ—আবূ হুরায়রা নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا قَرَأتُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَاقْرَؤُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَاِنَّهَا اِحْدٰى اٰيَاتِهَا –

তোমরা যখন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পড়বে, তখন তোমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমও পড়বে। কেননা তা সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত।

আবূ বকর বলেছেন, অতঃপর আমি নূহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন সাইদ আল-মকবেরী আবূ হুরায়রা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা শোনালেন, কিন্তু কথাটি রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তার উল্লেখ করেন নি। উক্ত হাদীসটির সনদে এমনি ভাবেরই পার্থক্য রয়েছে। তা রাসূলের কথা হওয়ায়ও মতপার্থক্য রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

হাদীসটি মূলতই মজবুত বা শক্ত ভিত্তিক নয়। তাই তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল নিজেই বিস্মিল্লাহ....কে সূরা ফাতিহার আয়াত বলেছেন। তবু তা রাসূলে করীম (স)-এর কথা হওয়াটা অসম্ভব নয়। কেননা তা আবূ হুরায়রা (রা)-এর কথানুযায়ী সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত। তার কারণ, বর্ণনাকারী অনেক সময় নিজের কথাও হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকেন এবং মূল বর্ণনা ও নিজের কথার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।.........হাদীসের বর্ণনায় এরূপ ঘটনা কিছু মাত্র বিরল নয়। তাই যে হাদীসে এরূপ হওয়ার আশঙ্কা, তা রাসূলের কথা বলে চালিয়ে দেয়া সঠিক কাজ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নিজেই এরূপ বলেছেন। কেননা তিনি [নবী করীম (স)] উচ্চস্বরে বিস্মিল্লাহ ......পড়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি হয়ত মনে করে নিয়েছেন যে, বিস্লিল্লাহ্ সূরা ফাতিহারই অংশ।

এতদসত্ত্বেও যদি প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের সনদে উল্টা-পাল্টা অবস্থানেই রাসূলের কথা হওয়ার ব্যাপারেও মতপার্থক্য নেই এবং তা আবূ হুরায়রার কথা, এই সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবু বিসমিল্লাহ....কে সূরার অংশ বলা আমাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা তা কেবল তখনই বলা যেত যদি মুসলিম উম্মতের নিকট থেকে পূর্ব থেকেই সেরূপ বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়ে আসতো, আর ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তা হয়নি।

বিস্মিল্লাহ...... কোন আয়াত কিনা এ পর্যায়ে কথা হল, তা যে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। সূরা নম্ল-এ এটি একটি অসম্পূর্ণ আয়াত বা একটি পূর্ণ আয়াতের অংশ মাত্র। এর প্রথমাংশ হচ্ছে وَاِنَّهَا مِنْ سُلَيْمَانَ 'এ চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে'। তবে সূরা আন্-নম্ল-এ তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত না হলেও অপর কোন সূরায় তা পূর্ণ আয়াত হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। কেননা কুরআনে এরূপ আরও পাওয়া যায়। সূরা ফাতিহায় 'আর-রাহমান আর-রাহীম' রয়েছে এবং তা পূর্ণাঙ্গ আয়াত হিসেবেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়—একথা সর্ববাদীসম্মত। অনুরূপভাবে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' সূরা ফাতিহায় একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত[১] কিন্তু وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এ তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াতের অংশ মাত্র। অবস্থা যখন এই, তখন তার কোন কোন সূরার আয়াতের অংশ হওয়া সম্ভব। অথবা কথিত ভাবে কোন আয়াত হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, তা সূরা ফাতিহার কোন আয়াত নয়। তাহলে সূরা আন্-নম্ল ছাড়া কুরআনের কোন পূর্ণাঙ্গ আয়াত হতে পারে, কেননা সূরা আন্ নম্ল-এ তো তা কোন পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। একটি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। হাদীসটি ইবনে আবূ মুলাইকা উম্মে সাল্মা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) নামাযে কিরাআত পাঠ করলেন এবং তিনি

১. এবং তাদের শেষ দো'আ হচ্ছে ঃ সমস্ত তারীফ সারেজাহানের মালিক আল্লাহ্র জন্যে।
—সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০

তাকে একটি আয়াত বলে অভিহিত করলেন। অন্য কথায় নবী করীম (স) বিসমিল্লাহ.......কে একটি বিচ্ছিন্নকারী আয়াত গণ্য করতেন। এ হাদীসটির সূত্র হায়সাম ইবনে খালিদ করীম ইকরামা—আমর ইবনে হারুন-আবূ মুলাইকা উম্মে সালমা নবী করীম (স)। আসবাত মুদ্দী আবদ-খায়ব আলী সূত্রের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিস্‌মিল্লাহ্‌কে একটি আয়াত গণ্য করতেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত। অবদুল করীম আবূ উমাইয়া তা আল-বাসরী ইবনে আবূ বরদাতা-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَاَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَخْبِرُكَ بِاٰيَةٍ اَوْسُوْرَةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلٰى نَبِىٍّ بَعْدَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ غَيْرِىْ فَمَشٰى وَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَخْرَجَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ مِنْ اَسْكُفَّةِ الْبَابِ وَبَقِيَتِ الرِجْلُ الْاُخْرٰى، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : بِاَىِّ شَىْءٍ تَفْتَحُ الْقُرْاٰنَ اِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ ؟ فَقُلْتُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ -

আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে এমন একটি আয়াত বা সূরা জানিয়ে দেব, যা সুলায়মান (আ)-এর পর আমার ছাড়া অন্য কোন নবীর প্রতি নাযিল হয়নি। অতঃপর তিনি উঠে বলতে লাগলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন এবং তাঁর একটি পা দরজার বাইরে রাখলেন, আর একটি পা ভেতরে ছিল, তখন আমার প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পড়ে কুরআন পড়া শুরু কর যখন নামায পড়তে শুরু কর ? বললাম—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে। অতপর তিনি বের হয়ে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, তা একটি আয়াত বটে; কেননা তার একটি আয়াত না হওয়া পর্যায়ে হাদীসসমূহের এই হাদীসটির কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই।

কেউ যদি বলেন, খবরে ওয়াহিদ-এর ভিত্তিতে তাকে একটি আয়াত প্রমাণ করতে চেষ্টা না করাই বরং তোমার কর্তব্য। তা-ই তো তোমার মূল দাবি। কেননা তুমি আগেই বলেছ যে, সূরাসমূহের উপর লিখিত বিসমিল্লাহ........সূরার কোন আয়াত নয়।

তাহলে তার জবাবে বলা যাবে, আয়াতের খণ্ড সম্পর্কে রাসূলের পক্ষ থেকে উম্মতকে নির্ধারণ নীতি দেয়ার পূর্বে তা জরুরী নয়, তাই খবরে ওয়াহিদ-এর ভিত্তিতে তাকে একটি

আয়াত প্রমাণ করা সম্পূর্ণ জায়েয।[১] তবে সূরার মধ্যে তার স্থান হওয়া তাকে কুরআনের জিনিস প্রমাণ করার মতই, তার উপায় একমাত্র মুতাওয়াতির হাদীস, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তা প্রমাণ করা জায়েয নয়। অন্যান্য সূরার ন্যায় শুধু কিয়াস করেও তা বলা যেতে পারে না। সূরা নম্‌ল-এর তা আছে বলে অন্যান্য সূরারও আয়াত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) আয়াতের স্থান নির্ধারণ (توقيف)-এর কাজ সম্পন্ন করেছেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে আমরা এর উল্লেখ করেছি। সব আয়াতের শুরু ও পরিমাণের ক্ষেত্রে রাসূলের নিকট থেকে توقيف পাওয়া যায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ আমাদের কর্তব্যভুক্ত নয়। আজ একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তা একটি আয়াত, তখন কুরআনের যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত অবশ্যই হতে পারে, সূরা সমূহের প্রথম আয়াত না হলেও অথবা এসব স্থানে এককভাবে বারবার উল্লিখিত হলেও। যেমন সমস্ত কিতাবের শুরুতে বরকতের জন্যে আল্লাহ্র নাম লেখা হয়। কাজেই যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত হতে পারে। কেননা গোটা উম্মত থেকে সেই রূপই চলে এসেছে যে, কুরআনে যা-ই লিখিত আছে, তা-ই কুরআনের জিনিস। তার মধ্যে কোন জিনিসকে খারিজ করা হয়নি। এসব স্থানে বারবার লিখিত হওয়ার দরুনই তা কুরআনের বাইরের জিনিস হয়ে যায়নি। যেমন اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ সূরা আল-বাকারা ও সূরা আল-ইমরানে উদ্ধৃত হয়েছে। আর فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'কোন্ কারণে তোমাদের দুজনের রব্বকে তোমরা অস্বীকার করতে পার', কুরআনে বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে উদ্ধৃত হয়েছে বারবার, তা একটি আয়াতের বারবার উল্লেখের কারণ নয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও তাই। নবী করীম (স) তাকে একটি আয়াত বলেছেন। তাই যেখানেই তা উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই তা একটি আয়াত গণ্য হবে।

নামাযে বিসমিল্লাহ পাঠ

নামাযে বিসমিল্লাহ্ পাঠ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা, ইবনে আবূ লায়লা, সওরী হাসান ইবনে সালেহ আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও শাফিয়ী প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, নামাযে আউযু পাঠ করার পর তা অবশ্যই পড়তে হবে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে। তবে প্রতি রাক'আত নামাযের শুরুতে সূরা শুরু করার পূর্বে তা পুনরায় পড়তে হবে কিনা, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ ইউসূফ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তা প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা শুরু করার সময় একবার পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূরা পাঠের সময় তা পুনরায় পড়তে হবে না। এ মত আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ-এর। মুহাম্মাদ ও হাসান ইবনে জিয়াদ আবূ হানীফা থেকে

১. গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিসমিল্লাহ...... যে একটি পূর্ণ আয়াত প্রমাণ করা জায়েয। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তার কুরআনী হওয়ার কথা গ্রন্থকারের বক্তব্য নয়।

বর্ণনা করেছেন, কির'আত শুরু করার সময় প্রত্যেক রাক'আতের প্রথম দিকে যখন একবার পড়া হবে, তখন সেই নামাযে সালাম ফেরানো পর্যন্ত তা আর পড়তে হবে না। তবে প্রত্যেক সূরা পাঠ কালে তা পড়া হলে খুবই ভাল। হাসান বলেছেন, মসবুক হলে যে নামায 'কাযা' করা হবে, তাতে তা পড়তে হবে না। কেননা ইমাম তো নামাযের শুরুতে পড়েছেনই। তাই ইমামের পড়া তার জন্যেও যথেষ্ট হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি, বিসমিল্লাহ..... কে কুরআনের অংশ মনে করেছেন কিরা'আত পাঠের শুরুতে। তা শুধু বরকতের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে কুরআনের জিনিস নয়—ও যেমন সব কাজের ও লেখার শুরুতেই তা পড়া বা লেখা হয়। তা তার স্থান থেকে আলাদা করে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

হিশাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ.........পাঠ এবং সূরা ফাতিহার পর যে সূরা পড়া হয় তার পূর্বে তা নতুন করে পড়া সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, ফাতিহার পূর্বে তা পড়াই যথেষ্ট। আবূ ইউসূফ নিজে বলেছেন, প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে তা পড়বে, পরবর্তী রাক্'আতে ফাতিহার পূর্বে অনুরূপ তা আবার পড়বে যখন সূরা পড়তে ইচ্ছা করবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, খুব বেশী সূরা পড়লে এবং তা অনুচ্চ শব্দে পড়লে প্রত্যেক সূরার শুরুতে তা পড়বে। আর যদি উচ্চস্বরে পড়ে, তাহলে তা পড়বে না। কেননা তখন দুই সূরার মাঝে খানিকটা সময় থেমে থাকাই পার্থক্য করার জন্যে যথেষ্ট।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদের এই কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মতে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে মাত্র কিংবা কিরা'আত শুরু করার জন্যেই তা পড়তে হয়। তা সূরার অংশ নয়। তা থেকে একথা বোঝা যায় না যে, তিনি তাকে একটি আয়াত মনে করতেন এবং তা কুরআনের অংশ নয়।

ইমাম শাফিয়ী (রা) বলেছেন, তা প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে লেখা রয়েছে। অতএব তা প্রত্যেকটি সূরা পাঠের শুরুতে পড়তে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রতি রাক্'আতেই পড়তে হবে। ইবরাহীম বলেছেন, প্রত্যেক রাক্'আতের প্রথমে তা একবার পড়লে পরবর্তীর জন্যে তাই যথেষ্ট হবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, ফরয নামাযে তা উচ্চস্বরে কিংবা গোপনে পড়বেই না। নফল নামাযে ইচ্ছা হয় পড়বে, না হয় পড়বে না। সকল নামাযেই তা পড়তে হবে। এই কথার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি উম্মে সালমা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম (স) নামায এভাবে পড়তেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর মুকতাদী হয়ে নামায পড়েছি; হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনেও পড়েছি। তাঁরা সকলেই বিসমিল্লাহ অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন। কোন কোন নামাযে তা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখতেন এবং কোন কোন নামাযে তাঁরা তা উচ্চস্বরে পড়তেন না। আর এ তো

জানাই আছে যে, তা ফরয নামাযের ব্যাপার। কেননা ফরয নামাযেই তাঁরা ইমামতি করতেন ও তাঁরা মুকতাদী হতেন। নফল নামাযে নয়। কেননা নফল নামায জামা'আতে পড়া সুন্নাত নয়। হযরত আয়েশা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল, আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) আলহামদু থেকেই কিরা'আত পাঠ শুরু করতেন। তাতে বোঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ.......উচ্চস্বরে পড়তেন না। তা আদপেই পড়তেন না, তা বোঝা যায় না।

কেউ যদি বলেন, আবূ যুরয়া ইবনে আমর ইবনে জরীর আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়াতেন, তখন আলহামদু .... দিয়েই শুরু করতেন, চুপ থাকতেন না। তাঁকে বলা হয়েছে, এতে মালিকের পক্ষের কোন প্রমাণ নেই, যদ্দারা বোঝা যাবে যে, দ্বিতীয় রাক'আতে তা পড়তেন না প্রমাণিত হয়েছে। যারা শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া যথেষ্ট মনে করেন, তাদের পক্ষে এতে দলীল রয়েছে। তবে তা আদৌ পড়তেন না, এর পক্ষেও তা কোন দলীল নয়। নামাযের শুরুতে তা পড়তেন, একথা আলী, আমর ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তা সাহাবীদের মতের বিপরীত নয়। তাতে ফরয ও নফল উভয় নামাযে তা পড়া প্রমাণিত হল। কেননা রাসূল ও সাহাবীগণ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে তাঁদের বৈপরীত্য ছাড়াই। আর ফরয ও নফল-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, না তা প্রমাণ করণে, না নিষেধকরণে। যেমন সমস্ত সুন্নাত নামাযে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রথম রাক'আতে তা পড়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন, সব রাক'আতে ও সব সূরায় তা পড়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তা থেকে একথা বোঝা যায় না যে, তাঁর মতে তা সূরাসমূহের শুরু কথা নয় যদিও তা দুই সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী নিজ স্থানে একটি আয়াত। বরকতের জন্যে তা দিয়ে শুরু করার জন্যে আমরা আদিষ্ট। পরে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা নামাযের শুরুতে পঠনীয়—পূর্বে যেমন বলেছি। সব নামাযের মর্যাদা তো এক ও অভিন্ন। নামাযের সব কাজ তাহ্রীমার উপর ভিত্তিশীল। ফলে সমস্ত নামায একটি কাজের ন্যায় অখণ্ড। তাই তার শুরুতে আল্লাহ্র নাম লওয়াই যথেষ্ট। তা বারবার পড়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না, তা যতই দীর্ঘ হোক-না কেন। যেমন কিতাবের একেবারে শুরুতে তা লেখা হয় একবার মাত্র। রুকূ, সিজদা, তাশাহ্হুদ ও নামাযের অন্যান্য সমস্ত রুকন-এ তা নতুন করে পড়া হয় না, সূরা, রাক'আতের শুরুতে তা যেমন পড়া হয়। তা তো দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশেই পড়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে বকর তা-ই বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ দাউদ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমর, সাঈদ ইবনে যুবায়র-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বিস্মিল্লাহ..... নাযিল হওয়ার পূর্বে দুই সূরার মাঝে পার্থক্যের কথা জানতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করাই বিস্মিল্লাহ্র আসল কাজ। তা সূরার অংশ নয়। তাই প্রত্যেক সূরা শুরু করার সময় তা বারবার পড়ার প্রয়োজন নেই।

কেউ যদি বলেন, বিসমিল্লাহ্‌.....র কাজ যখন দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করা, তখন তা পড়ে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করাই তো বাঞ্ছনীয়। তাহলে তাঁকে বলা হবে, তা ওয়াজিব নয়। কেননা তা নাযিল হওয়ার দ্বারাই তো এই পার্থক্য বোঝা গেল। এখন বরকতের জন্যে তা শুরুতে পড়ার দরকার মাত্র। আর নামাযের শুরুতে তা পড়া হয়েছে। দ্বিতীয় রাক'আত কালে নামায তো নতুন করে শুরু করা হচ্ছে না, যেজন্যে তা আবার পড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এজন্যে শুরুতে একবার পড়াই যথেষ্ট হবে। তা প্রত্যেক রাক্‌'আতে পড়ার একটি কারণই হতে পারে। তা হল—বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাক'আতেই কিরা'আত রয়েছে, যা তাতে শুরু করা হয়, তা তার পূর্বের রাক্‌'আতের কিরা'আতের স্থলাভিষিক্ত নয়। এ কারণে তা নতুন করে পড়া দরকার, যেমন প্রথম রাক'আতে তা পড়া হয়েছে। প্রথম রাক'আতে তা পড়া মস্‌নুন যেমন, দ্বিতীয় রাক'আতেও তেমনি করতে হবে। কেননা তখনও তো নতুন করে কির'আত শুরু করতে হয়। তবে প্রত্যেক সূরা পড়ায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, কেননা তা একই ফরয নামায। আর সূরার ব্যাপার এক রাক'আত তার পূর্ববর্তী রাক্‌আতের মতই। কেননা তা এমন কাজের ধারাবাহিকতা যা আগেই শুরু করা হয়েছে, ধারাবাহিক কাজের অবস্থা শুরুর মতই। যেমন রুকূ—যদি তা দীর্ঘ করা হয়, সিজদাও তেমনি। সমস্ত নামাযই একই কাজের ধারাবাহিকতা মাত্র। কাজেই তার দাবি শুরুর দাবি। শুরু করা যেমন ফরয, পরবর্তী কাজও তাই হবে। প্রত্যেক সূরায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন যাঁরা মনে করেন, তাঁরা দু'ভাগে রয়েছেন। এক ভাগের মনীষীরা বিসমিল্লাহকে সূরার অংশ মনে করেন না। অন্য ভাগের লোকেরা তাকে সূরাসমূহের প্রথমে উল্লিখিত মনে করেন। যাঁরা তাকে সূরাসমূহের প্রথমে উল্লিখিত মনে করেন, তাঁরা বিসমিল্লাহ...... কে পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে করেন, যেমন সূরার সমস্ত আয়াত পড়া হয়। যাঁরা তাকে সূরার অংশ মনে করেন না, তাঁরা প্রত্যেকটি সূরাকে নতুনভাবে শুরু করা নামাযবৎ মনে করেন। অতএব তা পড়েই শুরু করতে হবে, যেমন নামাযের শুরুতে করা হয়েছে। কেননা সহীফায় তেমনই তো রয়েছে। যেমন নামাযের বাইরে সূরা পড়া শুরু করা হয় বিস্‌মিল্লাহ........ পড়ে, তেমন অপর কোন সূরা পড়ার সময়ও করতে হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

'আমার উপর কিছু সময় পূর্বে একটি সূরা নাযিল হয়েছে,' এই বলে পড়তে শুরু করে পড়লেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' তার পরই পড়লেন ঃ ইন্না আ'তাইনা কাল কাওসার .....। পড়ে সূরাটি শেষ করলেন।

আবূ বুরদাতা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন—নবী করীম (স) পড়লেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) নামাযের বাইরে এই বিসমিল্লাহ্‌ ...পড়েই কুরআন পাঠ শুরু করতেন। নামাযেও এই নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সূরা ফাতিহা বিস্‌মিল্লাহ ...... পড়েই পড়া শুরু করতেন। অন্যান্য সূরাও সে ভাবেই পড়তেন। জরীর মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ইবরাহীম নামাযে আমাদের ইমামত করলেন। মাগরিবে তিনি আলামতারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা .....পড়লেন। সে সূরাটি শেষ করে তার সাথে মিলিয়ে লি-ই-লাফি .... সূরা পড়লেন। দুটি সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ ... পড়ে পার্থক্য রচনা করলেন না।

উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ

বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়ার ব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এবং সওরী বলেছেন, তা অনুচ্চস্বরে পড়বে। ইবনে আবূ লাইলা বলেছেন, ইচ্ছা হয় উচ্চস্বরে পড়বে, ইচ্ছা হয় অনুচ্চস্বরে। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, উচ্চস্বরে পড়বে। এই মতপার্থক্য ইমামের পশ্চাতে জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে। জামা'আতে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার নামাযে এরূপ করবে।

সাহাবা থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে বড় মতপার্থক্য রয়েছে। উমর ইবনে যুর তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি বিস্‌মিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন। হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উমর (রা) বিস্‌মিল্লাহ চুপে চুপে পড়তেন। পরে সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়তেন। আনাস (রা) তাঁর থেকে এইরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর সঙ্গিগণ বিসমিল্লাহ গোপনে পড়তেন, উচ্চস্বরে পড়তেন না। আনাস বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর ও উমর (রা) বিসমিল্লাহ গোপনে পড়তেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফলও তাঁর নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইমাম বিস্‌মিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়ে নামায শুরু করলে তা হবে বিদ'আত। জরীর আসিমুল-আহ্ ওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন, নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্.... উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কে ইকরামার নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, আমি এখানে একজন এ'রাবী মাত্র। আবূ ইউসূফ আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে মাসউদের এ কথাটি আমার নিকট পৌঁছেছে যে, নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্....... পড়া আরবীয় ধরন। হাম্মাদ ইবনে যায়দ কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন, হাসানকে নামাযে উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ পড়া বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এক কাজ এ'রাবীরা করে। ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে। আসেম সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে শরীক বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়েছেন। এটা হয়ত নামাযের বাইরের ব্যাপার হবে। আবদুল মালিক ইবনে আবূ হুসায়ন-ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে বিস্‌মিল্লাহ ....উচ্চস্বরে পড়া পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এটা আরবদের কাজ। হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সেটিকে একটি আয়াত গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা ধরে সূরা ফাতিহা সাত

আয়াতে সম্পূর্ণ। নামাযে তা উচ্চস্বরে তিনি পড়তেন, এমন কথা প্রমাণিত নয়। আবূ বকর ইবনে আইয়্যাশ আবূ সাইদ আবূ ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর ও আলী (রা) বিসমিল্লাহ্ ও আঊযু উচ্চস্বরে পড়েতন না। আমীন-ও জোরে বলতেন না। ইবনে উমর নামাযে তা উচ্চস্বরে পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন পূর্বে বলেছি, আসলে এ বিষয় সাহাবীগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফল বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) গোপনে পড়তেন, কোন কোন নামাযে অনুচ্চস্বরে পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফল এরূপ কাজকে বিদ'আত বলেছেন। আবূল জাওজা হযরত আয়েশা (রা)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) তাকবীর ও আল-হাম্‌দু পড়ে নামায শুরু করতেন এবং সালাম ফেরানো দ্বারা তা শেষ করতেন। আবূল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আল-কারখী (রা) বলেছেন ঃ হাযরামী মুহাম্মাদ ইবনুল-উলা-মুআবিয়া ইবনে হিশাম-মুহাম্মাদ ইবনে জাবির-হাম্মাদ-ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) ফরয নামাযে বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়েন নি। আবূ বকর উমরও নয়।

কেউ যদি বলেন, তোমার মতে তো তা নিজ স্থানে একটি আয়াত বিশেষ, তা হলে তা উচ্চস্বরে পড়াই ওয়াজিব হবে, নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার মত। বিশেষ করে যে নামাযে কুরআন উচ্চস্বরে পড়া হয়। কোন কোন নামাযের কোন রাক'আত তো উচ্চস্বরে কির'আত না পড়াই মৌলনীতি। আবার কোন কির'আত উচ্চস্বরে পড়াই নিয়ম।

জবাবে বলা হবে, তা সূরা ফাতিহার অংশ নয়, শুধু তা পড়ে শুরু করতে হয় বরকতের জন্যে, তখন তা উচ্চস্বরে না পড়াই শ্রেয়। লক্ষণীয়, ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু .... কুরআনের আয়াত হওয়া সত্ত্বেও এবং তা পড়ে নামায শুরু করতে হয়, তা সত্ত্বেও তা সব সময়ই অনুচ্চস্বরে পড়তে হয়, উচ্চস্বরে নয়। এখানেও সেই রূপ করা সমীচীন।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বিসমিল্লাহ না শুনিয়ে পড়তেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, তা সূরা ফাতিহার অংশ নয়। যদি অংশ হতো, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা উচ্চস্বরে পড়তেন অন্যান্য আয়াতের মতই। নয়ীম আল মুজবার বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রার পেছনে নামায পড়েছি, তিনি নামাযে বিসমিল্লাহ .... পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ আমি ঠিক রাসূলের মতই নামায পড়লাম। ইবনে জুরাইজ ইবনে আবূ মুলাইকা-উম্মে সালমা (রা) সূত্রে বির্ণত হয়েছে, নবী করীম (স) নিজের ঘরে নামায পড়েছিলেন, তাতে বিস্‌মিল্লাহ.... আলহামদু .... পড়তেন। জারির আল-জাফী-আবূত-তোফাইল-আলী ও আম্মার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) বিসমিল্লাহ্ জোরে পড়তেন।

এর জবাবে বলা হবে, নয়ীম আল-মুজমার-আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বিস্‌মিল্লাহ্.... উচ্চস্বরে পড়ার কোন প্রমাণ নেই। তাতে বলা হয়েছে, তিনি পড়েছেন; কিন্তু উচ্চস্বরে পড়েছেন, তা তো বলা হয়নি। হতে পারে, তিনি উচ্চস্বরে পড়েন নি।

পড়েছেন, তা তো বর্ণনাকারীর জানা-ই আছে। হযরত আবূ হুরায়রার সে বিষয় খবর মাধ্যমে, অথবা তিনি ইমামের খুব নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তা শুনতে পেয়েছিলেন। উচ্চস্বরে না পড়লে তা শুনা অসম্ভব নয়, এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম (স) যোহর ও আসর-এর নামাযে যে 'কির'আত' পড়তেন তা অনেক সময় আমরা শুনতে পেতাম। কিন্তু তা যে তিনি উচ্চস্বরে পড়েন নি, সে বিষয়ে কোন মতভেদই নেই। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ-আমরাতা ইবনুল কা'কা-আবূ জুরয়া ইবনে আমর ইবনে জরীর—আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে উঠতেন, তখন আল-হামদু...দিয়ে শুরু করতেন, থামতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিস্‌মিল্লাহ....কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন না। আর তা হয়ে থাকলে তা উচ্চস্বরে পড়ার প্রশ্ন উঠে না। যা তার অংশ নয়, তা জোরে না পড়াই তো স্বাভাবিক, তবে উম্মে সালমার হাদীস.......লাইস আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে আবূ মুলাইকা থেকে বর্ণিত, মা'লী উম্মে সালমাকে রাসূলে করীমের 'কির'আত' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে ও অক্ষরে অক্ষরে বলেন। এ বর্ণনায় রাসূলের 'কির'আত' পাঠের নিয়ম পদ্ধতিই বলা হয়েছে; কিন্তু তা নামাযে পড়ার উল্লেখ নয়, তা জোরে বা গোপনে পড়ারও কথা নয়। আর তিনি তা বহুবারই পড়ে থাকবেন, তা আর বিচিত্র কি?

অনুরূপভাবে আমরাও বলব, কিন্তু তা উচ্চস্বরে পড়া হবে না। হতে পারে নবী করীম (স) তাঁর কির'আত-এর বিবরণ দিয়েছেন, উম্মে সালমা তা-ই শুনিয়াছেন। হতে পারে, তিনি তাঁকে পড়তে শুনেছেন অনুচ্চস্বরে, তা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন নিকটে থাকার সুযোগে। এ থেকে এ-ও বোঝা যায়, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর ঘরে এভাবে নামায পড়তেন, তা ফরয নামায ছিল না। কেননা তিনি ফরয নামায কখনই একাকী পড়তেন না। জাম'আতের সাথে পড়তেন। আর আমাদের মতে এককভাবে নফল নামায গোপনে বা উচ্চস্বরে যেভাবেই ইচ্ছা পড়তে পারে। আবূত তোফাইল থেকে জাবির বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে তার বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ....তিনি বহু বর্ণনায় মিথ্যা বলেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ইমামগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। আবূ ওয়ায়েল আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তা উচ্চস্বরে পড়তেন না। যদি জোরে পড়া তাঁর নিকট প্রমাণিত হতো তাহলে তিনি তার বিরোধিতা কখনই করতেন না। জোরে বা অনুচ্চস্বরে পড়া সংক্রান্ত বর্ণনা যদি সমান সমানও হতো নবী করীম (স) থেকে, তাহলেও অস্পষ্টভাবে পড়াই উত্তম। তার দুটি কারণ। আগের লোকদের অস্পষ্টভাবে পড়ার কথা প্রকাশমান, জোরে পড়া নয়। আবূ বকর, উমর, আলী, ইবনে মাসঊদ, ইবনুল মুগাফ্‌ফল, আনাস ইবনে মালিক—সকলেই অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন। তা জোরে পড়া পর্যায়ে ইবরাহীমের কথা বিদআত। কেননা নিয়ম হচ্ছে, একই বিষয়ে রাসূলের দুটি পরস্পর

বিপরীত বর্ণনা প্রমাণিত হলে আগের কালের মহান ব্যক্তিদের আমল থেকে যা সমর্থিত হবে, তা-ই অধিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর দ্বিতীয় কারণ, জোরে পড়া যদি প্রমাণিত হয়, তা রদ করে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়—যেমন অন্যান্য সব কির'আত পর্যায়ে পাওয়া যায়, তাহলে মুতাওয়াতির বর্ণনা না পাওয়ার দরুনই বুঝতে হবে যে, তা প্রমাণিত নয়। কেননা তা জোরে পড়া মস্নুন এই কথা জানার প্রয়োজন। সূরা ফাতিহা জোরে পড়া মস্নুন হওয়ার কথা তো সেই ভাবেই জানা গেছে।

আবূল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব আল-আসম-রবী ইবনে সুলায়মান শাফিয়ী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে হাস্তম-ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রাফায়াতা তার পিতার সূত্রে পাওয়া বর্ণনা হচ্ছে মুআবিয়া মদীনায় এলেন ও তাদের নিয়ে নামায পড়লেন, কিন্তু বিসমিল্লাহ....পড়লেন না, যখন রুকূতে গেলেন ও রুকূ থেকে উঠলেন, তখন তাকবীরও বললেন না, তখন নামায ফেরানোর পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বলে উঠলেন ঃ

হে মুআবিয়া, তুমি তো নামায চুরি করেছ। কোথায় তোমার বিসমিল্লাহ্........রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় কোথায় তোমার তাকবীর ?

অতপর তিনি তাদের নিয়ে পুনরায় নামায পড়াতে বাধ্য হন। এখানে যে ত্রুটি সাহাবীগণ ধরলেন, তা হচ্ছে জোরে না বলা। তাহলে বোঝা গেল, বিসমিল্লাহ্....জোরে না পড়া নামাযে বিশেষ ত্রুটি।

এর জবাব হচ্ছে, আসলেও যদি তা-ই হতো, তাহলে তা আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনুল মুগাফফল, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যরা বিসমিল্লাহ্ চুপচাপ পড়েছেন, জোরে পড়েন নি—এরা সকলেই তা জানতেন। কেননা রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى –

বুদ্ধিমান-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই যেন আমার নিকটে থাকে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণই তো রাসূলের অতীব নিকটবর্তী লোক ছিলেন। নামাযেও তাঁরাই অন্যদের অপেক্ষা বেশি নিকটে অবস্থান নিতেন। তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তো অপরিচিত। আর বর্ণনাটিও পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ নয়। কেননা তা যে মুহাজির ও আনসারগণ বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা তো একক ব্যক্তি, একক সূত্রে বর্ণনা। তা ছাড়া তাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ.... পড়ার কথাও বলা হয়নি। তাতে বলা হয়েছে বিস্মিল্লাহ্ পড়েন নি। আমরাও তা না পড়ার কথা বলি না, তা জোরে পড়া হবে কি অনুচ্চস্বরে .... এর মধ্যে কোন্টা উত্তম, তাই নিয়েই তো আমাদের আলোচনা।

বিসমিল্লাহ্ পর্যায়ে শরীয়াতের হুকুম

বিস্‌মিল্লাহ্ .... পড়ে সব কাজ শুরু করাই শরীয়াতের হুকুম। তা বরকতের জন্যে, আল্লাহ্‌র বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যবেহ করাকালে তা বলা দ্বীন-ইসলামের বিশেষত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ম, তা বলে শয়তান তাড়ানো হয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ খাওয়ার সময় বান্দা যদি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না, তাঁর নাম উচ্চারণ না করা হলে শয়তান অবশ্যই খাওয়ায় শরীক হবে। মুশরিকরা তাদের কাজ কর্ম শুরু করে তাদের দেবদেবী মূর্তির নামে, যাদের ওরা পূজা করে। ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়, তা ভীতকে সাহসী বানায়, তা উচ্চারণ করলে বান্দা একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যেতে পারে। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, শ্রোতা তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা পায়, এতে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করা হয়। তার নিয়ামতের স্বীকৃতি হয়, তাঁর নিকট পানা চাওয়া হয়। এতে আল্লাহ্‌র দুটি বিশেষ নাম রয়েছে ঃ রহমান, রহীম। আল্লাহ ছাড়া এ নাম কারোর হতে পারে না।

নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ

আমাদের ফিকাহবিদগণ সকলেই একমত হয়ে বলেছেন, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আর একটি সূরা বা আয়াত প্রথম দুই রাক'আতেই পড়তে হবে। সূরা ফাতিহা পড়া না হলে বা তার পরিবর্তে অন্য কিছু পড়া হলে খুবই খারাপ হবে। তবে তার নামায হয়ে যাবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, প্রথম দুই রাক্‌'আতে সূরা ফাতিহা না পড়া হলে নামায আবার পড়তে হবে। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, যে কম-সে-কম পরিমাণ পড়লে নামায হয়ে যায়, তা হল সূরা ফাতিহা। তার একটি অক্ষরও বাদ দিলে—না পড়লে ও নামায শেষ করে ফেললে সে নামায আবার পড়তে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আ'মাশ খায়সামাতা-উবাদ ইবনে রব্‌যী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা ও দুই আয়াত বা তারও বেশী পড়া হবে না, সে নামায হবে না। ইবনে আলীয়াতা-জরীরী ইবনে বুরায়দা সূত্রে ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা ও দুই আয়াত বা তার বেশি পড়া হয়নি সে নামায হয়নি। মুআম্মার আইয়ুব আবূল আলীয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক রাক্‌'আতের 'কির'আত' সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কম-বেশী যাই হোক পড়। কুরআনের কম বলতে কোন জিনিস নেই। হাসান-ইবরাহীম-শা'বী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক সূরা ফাতিহা পড়া ভুলে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু পড়েছে, তার নামায ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তা হয়ে যাবে। অকী'-জরীর ইবনে হাজিম-ওয়ালদি ইবনে ইয়াহ্ইয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একদা জাবির ইবনে যায়দ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে مُدْهَامَّتَانِ পড়ে রুকূতে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, উমর ও ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে সূরা ফাতিহা ও আরও দুই আয়াত না পড়লে নামায হবে না বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ নামাযের পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। নামায একেবারেই হবে না, সে অর্থ নয়। কেননা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়লেও নামায হয়ে যাবে; এ বিষয়ে ফিকাহবিদ্দের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই। সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত দলীল ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ –

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন পড়ার স্থায়ী রীতি অবলম্বন কর।

আয়াতটির পক্ষে অসুবিধাজনক হলেও তা যথার্থ। তার অর্থ ফজরের নামাযে কুরআন পড়া। কেননা ফজরের নামাযের সময় কির'আত পাঠ ফরয না হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে মূল নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। এখানকার আদেশই ফরয প্রমাণ করে। মুস্তাহাব হওয়ার কোন দলীল নেই। অতএব বাহ্যিকভাবে যতটুকুই কুরআন পড়া হোক, তাতেই নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা তাতে কোন কিছু থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।

কুরআনের আয়াত ঃ فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন থেকে সহজেই যা সম্ভব পড়।' এই পড়ার আদেশ নামাযে কুরআন পড়া বোঝায়।

উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী কথাসমূহই তার প্রমাণ। আয়াতটির শুরু হচ্ছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ ....

তোমার রব্ব জানেন, তুমি রাতের দুই-তৃতীয়াংশ সময়, তার অর্ধেক এবং তার এক-তৃতীয়াংশ সময় তুমি নামাযে দাঁড়াও ....

মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ আয়াতে রাত্রিকালীন নামাযের কথা বলা হয়েছে। আর 'কুআনের যতটুকু বা যা-ই পড়া সহজ, তাই পড়' এই আদেশ রাত্রিকালীন নফল নামায এবং অন্য সব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। এ আয়াতে যে ফরয নফল সব নামাযই শামিল, তার প্রমাণ একটি হাদীস। হাদীসটি আবূ হুরায়রা ও রিফায়া ইবনে রাফে' বর্ণিত। নবী করীম (স) একজন এ'রাবীকে নামায পড়ার নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা সে সুন্দরভাবে নামায পড়তে পারছিল না। রাসূল (স) তাকে বললেন ঃ 'অতপর তোমার পক্ষে কুরআনের যা পড়া সম্ভব ও সহজ, তা-ই পড়।' রাসূলের এ কথাটি কুরআনেরই ভিত্তিতে বলা। কেননা একথা সর্ববাদীসম্মত যে, নবী করীম (স)-এর কোন আদেশ কুরআনে উল্লিখিত কোন হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে বলতেই হবে, তিনি এই হুকুম কুরআন থেকেই দিয়েছেন। যেমন তিনি চোরের হাত কাটা ও ব্যভিচারীকে দোররা মারা ইত্যাদির আদেশ

কুরআনের ভিত্তিতেই দিয়েছেন। কুরআন পড়া সম্পর্কিত উপরোক্ত আয়াতে ফরযকে বা দিয়ে শুধু নফল নামাযের জন্যেই আদেশ আসেনি। অতএব বুঝতেই হবে যে, উক্ত আদেশ সকল নামাযেই পালনীয়। আর এই আদেশের দৃষ্টিতে সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। দুটি দিক দিয়ে কথা বিবেচ্য ঃ একটি হল, হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, আয়াতটি সব নামাযেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, সূরা ফাতিহা ছাড়াও যে নামায হয়, তা স্বতন্ত্রভাবে তা থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা নামায হিসেবে ফরয ও নফলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'কির'আত' পাঠও উভয়ের মধ্যেই জরুরী। আর যা নফল নামাযে জায়েয, ফরয নামাযেও তা জায়েয। দুই নামযের রুকূ-সিজদার মধ্যেও কোনরূপ পার্থক্য নেই। সব নামাযের 'রুকন' এক ও অভিন্ন।

কেউ বলতে পারেন, তোমার মতে নফল ও ফরয নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা তোমার নিকটে ফরয নামাযের শেষ দুই রাক'আত কির'আত ফরয নয়। অথচ নফল নামাযে তা ওয়াজিব।

এর জবাবে বলা যাবে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের তুলনায় নফল নামাযে কুরআন পাঠের হুকুম অধিক তাগিদপূর্ণ। সূরা ফাহিতা না পড়লেও নফল নামায হয়ে যায় যখন, তখন ফরয নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এ দু'নামাযের মধ্যে কেউই পার্থক্য করেন নি। দু'এর কোন একটি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয মনে করলে অপর নামযেও তা ফরয মনে করতে হবে। আর একটিতে তা অ-ফরয ধরলে অপরটিতেও তাই ধরতে হবে। একথা যখন প্রমাণিত হল যে, আমাদের মতে আয়াতের বাহ্যিক দিক দিয়ে সূরা ফাতিহা ছাড়াও নফল নামায জায়েয, তখন ফরয নামাযেও তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সূরা ফাতিহা ছাড়াও নাময হয় একথা আয়াত থেকে কি করে প্রমাণিত হল ? জবাবে বলতে হবে, 'কুআনের যা সহজ ও সম্ভব, তা-ই পড়' এই আয়াত থেকে পূর্ণ ইখতিয়ার প্রমাণিত হয়। এ যেন বলা হয়েছে, 'পড় যা-ই তুমি ইচ্ছা কর।' কেউ যদি কাউকে বলে ঃ আর এ দাসটিকে তুমি যে-কোন মূল্যে বিক্রয় করে দাও, তা হলে এ-ই বোঝা যাবে যে, যে-কোন মূল্যে দাসটি বিক্রয় করার ইখতিয়ার রয়েছে। অনুরূপভাবে আয়াতটি যখন নামাযীকে কুরআনের যে-কোন অংশ পড়ার ইখতিয়ার দিচ্ছে, তখন তা অগ্রাহ্য করা আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারেনা। আমরা কোন একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। বলতে পারি না যে, সূরা ফাতিহাই পড়তে হবে। তা বললে আয়াতে দেয়া ইখতিয়ারকে মনসূখ করে দেয়া হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আয়াত ঃ

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

যে-কোন জন্তু কুরবানী করা সহজ হবে.... তাই কর।

এতেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ইখতিয়ারকে উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। অথচ ব্যবহৃত শব্দ هدى গরু, উট ও ছাগল ছাড়া অন্যান্য জন্তুও বোঝায়। এ করার কারণে ইখতিয়ার মনসূখ করা হয়েছে বলে তো মনে করা হয় না?

জবাবে বলা যাবে, উক্ত তিন প্রকারের জন্তুর যে-কোন একটি দেয়ার ইখতিয়ার তো রয়েছে। ফলে ইখতিয়ারের সুযোগ এখানে নষ্ট হয় নি, মনসূখ করা হয়েছে বলেও মনে করার কারণ ঘটেনি। বহু কতগুলোর মধ্য থেকে তিনটির মধ্যে সে ইখতিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন আয়াত পাঠের পক্ষে যদি সাহাবীদের কোন কথা বা কাজ পাওয়া যায়, যা এক আয়াতের কম নয়, তাহলে তাতেও মূল হুকুম মনসূখ হওয়ার কারণ ঘটে না। কেননা তখনও কুরআনের যে-কোন আয়াত পড়ার ইখতিয়ার পুরাপুরিভাবে অবশিষ্ট থাকে।

একজন মনীষী বলেছেন, 'কুরআনের যা-ই পড়া তোমার পক্ষে সহজ হবে তা-ই পড়' এই আদেশ সূরা ফাতিহা বাদে কুরআনের অপরাপর অংশ পর্যায়ে গ্রহণীয়। তাহলে তাতে কোন কিছু মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেবে না।

কিন্তু এ গ্রন্থকারের মতে তা জায়েয হতে পারে না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি এই যে, উক্ত আয়াতে কুরআন পাঠের যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা নামাযে পড়ার জন্যে কাজেই তা বাদ দিলে ইবাদতই হতে পারে না। তা নামাযের রুকন। এ রুকন আদায় না হলে নামাযই সহীহ্ হবে না।

দ্বিতীয়, নামাযে যা-ই পড়া হবে, তার সমস্তটাতেই এই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই তার কিছুকে বাদ দিয়ে অপর কিছুকে নির্দিষ্ট করা জায়েয হতে পারে না। তৃতীয় فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ 'পড় যা-ই সহজ....' একটি আদেশ। তা অবশ্যই পালনীয়। কাজেই তাকে মুস্তাহাব বলা জায়েয হতে পারে না। পড়া ফরযই মনে করতে হবে। এখানে যা বলেছি তা একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুমাল ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ, ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা—আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এই হাদীসের বক্তব্য হল এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়ল। পরে রাসূলের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালো। রাসূলে করীম (স) তার জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে নামায পড়ল পূর্বের মতই। পরে আবার রাসূলের নিকট এসে সালাম দিল। রাসূলে করীম (স) জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি আবার গিয়ে নামায পড়। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি। এভাবে লোকটি তিন তিন বার উঠে গিয়ে নামায পড়ল। শেষে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

لَاتَتِمُّ صَلَاةُ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيَضَعُ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى وَيُثْنِيْ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اللّٰهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ......

একজন লোকের নামায তখন সম্পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে, যদি সে অযূ করে, ঠিক ঠিক ভাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ ধৌত করে, পরে সে তাকবীর বলে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা করে, কুরআন থেকে ইচ্ছামত কিছু পড়ে, পরে আল্লাহু আকবর বলে রুকূ করে ও তাতে তার সমস্ত জোড়া স্থিত হয়ে বসে ....

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মসান্না, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ, সাইদ ইবনে আবূ সাঈদ তাঁর পিতা সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়লো। পরে এসে সালাম করল।...... এই সূত্রের বর্ণনা পূর্ববর্তীটির মতই। রাসূলের কথাটি তাতে এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اَقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ ارْكَعْ –

তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর দেবে। পরে কুরআনের যা পড়া তোমার পক্ষে সম্ভব পড়বে। অতপর রুকূ দেবে ....

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'অতপর যা তুমি চাও'। আর দ্বিতীয় হাদীসের কথা ঃ 'যা সহজ সম্ভব'। দু'টিতেই নামাযীকে যা ইচ্ছা পড়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সূরা ফাতিহা পাঠ যদি ফরয হতো তা হলে তার বিশেষভাবে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন। কেননা লোকটি যে নামায কিভাবে পড়তে হয় তা জানে না, একথা তো জানাই আছে। অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিকে তো অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেয়া জায়েয হতে পারে না। তাকে কতক ফরয জানানো হবে, অপর কতক ফরয জানানো হবে না, তা সমীচীন হতে পারে না। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কাবে, আহমাদ ইবনে আলী আল-জাজার, আমের ইবনে সাইয়ার আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান সুফিয়ান আবূ নজরাতা আবূ সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَأَةٍ يَقْرَأُ فِيْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ اَوْغَيْرَهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ –

এমন কির'আত—যাতে সূরা ফাতিহা কিংবা কুরআনের জন্যে কোন অংশ পড়া না হলে তার নামায হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, ওহাব ইবনে বকীয়া, খালদ, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ, রিফায়া ইবনে রাফে' সূত্রেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَاقُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ -

তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন কিবলামুখী হবে, পরে তাকবীর বলবে। অতপর সূরা ফাতিহা ও আল্লাহ্ যা পড়া পছন্দ করেন তাই পড়বে ....

এতেও সূরা ফাহিতা ও তাছাড়া অন্য কিছু পড়ার উল্লেখ হয়েছে। এ কথা অন্যান্য হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা এর বক্তব্য হল, সূরা ফাতিহা পড়বে যদি তা পড়া সহজ হয়। এতে কোন আয়াত নির্দিষ্টভাবে পড়া ফরয বলা জায়েয হতে পারে না। অন্যথায় দেয়া ইখতিয়ার মনসূখ করা হবে। এ-ও জানা আছে যে, দুটি হাদীসের কোন একটি, অপরটির দ্বারা মনসূখ হয়নি। দুটি হাদীসই তো একই ঘটনার বিষয়ে।

প্রশ্ন হতে পারে, দুটি হাদীসের একটিতে কুরআন পড়া পর্যায়ে ইখ্তিয়ার থাকার কথা রয়েছে, আর অপরটিতে কোন ইখ্তিয়ার ছাড়া-ই সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম রয়েছে, তাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর আর 'যা পড়া হোক বলে আল্লাহ চান' এই কথা বলে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া-না-পড়ার কোন ইখতিয়ার দেয়া হয় নি, ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য আয়াত পড়ার ব্যাপারে। কোন হাদীসে সূরা ফাতিহার উল্লেখ না হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, তা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে। তা ছাড়া এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত কথা হিসেবে রয়েছে কোন ইখতিয়ার ছাড়া সূরা ফাতিহা পড়ার কথা।

জবাবে বলা যাবে, যে হাদীসে ইখতিয়ারের কথা আছে তাকে যে হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ আছে তার উপর নিরংকুশভাবে প্রয়োগ করা জায়েয হতে পারে না, যেমন দাবি করা হয়েছে। কেননা সম্ভবত দুটিকেই কোনরূপ বিশেষত্ব ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। বরং আমাদের বলা উচিত যে, সাধারণভাবে যে ইখতিয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে, তার হুকুমটা সেই হাদীসেও প্রয়োগযোগ্য, যাতে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। তাতে ফাতিহা ও অন্য যে-কোন আয়াত পড়ার ব্যাপারে ইখতিয়ারটা ধারণ রূপ পাবে। যেন বলা হয়েছে, ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহা পড়তে পার তার সাথে অন্য কিছু আয়াত মিলিয়ে। তাতে সূরা ফাতিহা পড়ায় যে ইখতিয়ার রয়েছে, তার প্রয়োগ ব্যাপক হবে এবং কোনটি বাদ দিয়ে কোনটি পড়ার ব্যাপারে বিশেষত্ব আরোপ করা হবে না।

এ কথা আর একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইবরাহীম ইবনে মূসা, ঈসা, জাফর ইবনে মায়মূল বসরী, আবূ উসমান নহদী সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

أُخْرُجْ فَنَادِفِيْ الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لَاصَلَاةَ اِلَّا بِقُرْاٰنٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ -

বের হয়ে মদীনার সর্বত্র ঘোষণা করে দাও যে, কুরআন ছাড়া নামায হবে না। সূরা ফাতিহাও যদি হয়... আর তার বেশী যাই হোক (অবশ্যই পড়তে হবে)।

রাসূলের কথা ঃ 'কুরআন ছাড়া নামায হবে না' থেকে বোঝা যায়, কুরআনের যা-ই পড়া হবে তাতেই নামায হয়ে যাবে। আর 'সূরা ফাতিহাও যদি হয় তার পর যা বেশি হয়' কথাটি থেকে বোঝা যায়, সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হবে। কেননা কুরআনের কোন অংশ পড়া নির্দিষ্টভাবে ফরয হলে কথাটি এভাবে বলা হতো না, বরং সূরা ফাতিহা পড়ার কথা অকাট্যভাবে বলা হতো। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। হাদীসটি ইবনে উয়ায়না উলা ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَجٍ -

যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হবে না, তা ত্রুটিপূর্ণ।

মালিক ও ইবনে জুরাইজ আল-উলা থেকে আবূস-সায়েব হিশাম ইবনে জুহরা সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে নবী করীমের উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন। সনদে এই পার্থক্য হাসীসটিকে দুর্বল করে দেয় নি। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর পিতা ও আবূস সায়েব উভয় থেকেই শ্রবণ করেছে। তাতে বলা হয়েছে—নামাযের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা। তাতে বোঝা যায়, নামায তো হয়ে যায়, যদিও তা হয় ত্রুটিপূর্ণ। কেননা নামায বৈধ না হলে তাতে 'ত্রুটি' হওয়ার কথা বলা হতো না। ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হলে তাতে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথার বিপরীত বলা হয়। কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত না হলে তার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কোন উট যদি গর্ভবতী না-ই হয়, তাহলে একথা বলা হয় না যে, তা ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করেছে। হ্যাঁ, ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করলেই তবে বলা যাবে যে, ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাচ্চাটি জন্ম গ্রহণ করেছে, অথবা যদি গর্ভের মেয়াদ পূর্ণ না করেই প্রসব করা হয় তাহলেও তা বলা যায়। কিন্তু মূলতই যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে তার ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসবের কথা বলা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ছাড়াও নামায হয়, যদিও ত্রুটিপূর্ণভাবে। ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটা মূলকে অস্বীকার করে না। বরং মূলটা হওয়ার কথাই প্রমাণ করে। তবেই না তার সহীহ হওয়ার কথা বলা যায়।

উবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুজ জুবায়র হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

كُلُّ صَلَاةٍ لَايَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ –

যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হয়নি, তা ত্রুটিপূর্ণ।

এ নামায ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়ই হবে। ত্রুটিপূর্ণ হলে মূল নামায হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُكْتَبُ لَهُ نِصْفُهَا خُمُسُهَا عَشْرُهَا –

ব্যক্তি যেন অবশ্যই নামায পড়ে। তা হলে তার অর্ধেক, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, দশ ভাগের এক ভাগ তার জন্যে লিখিত হবে।

এতেও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুন তার কোন অংশ বাতিল হয়ে যায় নি।

কেউ যদি বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আজলান তাঁর পিতার নিকট থেকে, তিনি হিশামের মুক্ত গোলাম আবূস্ সায়েব থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলের করীম (স)-এর এই কথা রয়েছে ঃ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَلَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ –

যে লোক নামায পড়ল, কিন্তু তাতে কুরআনের কোন অংশ পড়লো না, তাতে নামায ক্ষতিগ্রস্ত হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল, অসম্পূর্ণ থাকল।

এ হাদীসটি মালিক ও ইবনে উয়ায়না বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হল, কেননা এ দুজন তাঁদের বর্ণিত হাদীসে সূরা ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, অন্য কিছুর নয়। আর নিয়ম অনুযায়ী দুটি হাদীসের একটি অপরটির বিপরীত হলে দুটিই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে যে নামায অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে সে কথা প্রমাণিত হল না।

এর জবাবে বলা যাবে, মুহাম্মাদ ইবনে আজলানের বর্ণনাকে মালিক ও ইবনে উয়ায়নার বর্ণনার বিপরীত বলা যাবে না। বলতে হবে, ভুল-ভ্রান্তি ও গাফিলতিই ও-দুজনের তুলনায় এর উপর অধিক গ্রাসী হয়েছে। অতএব তা দিয়ে ও-দুজনের বর্ণনার উপর কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। আর মূলতও এ দুটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা হতে পারে—নবী করীম (স) সব কথাই বলেছেন। পরের কখনও সূরা ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, আর অন্য বারে শুধু কুরআন পাঠের কথা বলেছেন। আর এ-ও হতে পারে যে, এ দুটি হাদীসের নির্দিষ্ট করে যা বলা হয়েছে, সাধারণভাবে সেই কথাটিই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, নবী করীম (স) দুটি কথাই বলেছেন, এ যখন তোমার ধারণা তখন দেখা যায়, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বর্ণিত হাদীস কোনরূপ কির'আত ছাড়াই নামায হতে পারে বলছে। কেননা তা কির'আত ছাড়াই নামাযকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বলছে।

এর জবাবে বলতে হবে, এ প্রশ্নটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আমরা বলব, উভয় হাদীস থেকে বাহ্যত তা-ই বোঝা যায়। তবে এতটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, কির'আত পাঠ না করলে তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে আমরা এই দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছি।

আবূ বকর বলেছেন—সূরা ফাতিহা পড়া পর্যায়ে আরও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা তা পড়া ফরয মনে করেছেন, তাঁরা সে সব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আল-উলা ইবনে আবদুর রহমান আয়েশা (রা) থেকে হিশাম ইবনে জুহরার মুক্ত গোলাম আবূস সায়েব আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এ পর্যায়ে উল্লেখ্য। তাতে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَسَمْتُ الصَّلٰوةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِى، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ، فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ ...

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাঁর অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। বান্দা যখন আলহামদুলিল্লাহ .... বলে, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার হাম্‌দ করেছে ......।

এ হাদীসের 'সালাত' বলে সূরা ফাতিহা বুঝিয়েছেন। তাতে বোঝা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ অন্যতম ফরয। যেমন وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ বলে ফজর নামাযে কুরআন পাঠ বোঝানো হয়েছে। তাতেও বোঝা যায় যে, নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ এবং রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ দাও বলেও বুঝিয়েছে নামাযে কুরআন পাঠের এবং তার ফরয হওয়ার কথা।

এর জবাবে বলা যাবে, না, বলা কথাসমূহ নামাযে কুরআন পাঠ ফরয করে দেয় না, রুকূ করার আদেশ ও রুকূ করাকেই ফরয করে ইতিবাচকভাবে। আর উপরোদ্ধৃত হাদীসে 'নামায'-এর আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হওয়ার কথা দ্বারাও নামাযে কুরআন পাঠ ফরয প্রমাণিত হয় না। তা থেকে বড় জোর এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, নামায সূরা ফাতিহাসহ আদায় করতে হবে। কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা 'নামায' বলতে নফল ও ফরয নামায সবই বোঝায়। বরং উক্ত হাদীস দ্বারা

নবী করীম (স) তা ফরয না হওয়ার কথাই প্রমাণ করেছেন। কেননা হাদীসটি শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায ত্রুটিযুক্ত।' এতে 'নামায হয়নি' বলা হয়নি, ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়েছে সূরা ফাতিহা না পড়ার দরুন। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, কথার প্রথমাংশ দ্বারা দ্বিতীয় অংশকে নাকচ করতে চাওয়া হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; এবং সেই পর্যায়ে সূরা ফাতিহার উল্লেখ থেকে নামাযে তা পড়া ফরয প্রমাণিত হয় না। এ পর্যায়ে একটি হাদীসও উল্লেখ্য। হাদীসটি শুবা আবদে রাব্বিহি ইবনে সাইদ থেকে, আনাস ইবনে আবূ আনাস থেকে আবদুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনুল উমইয়ান আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস মতলব ইবনে আবূ অদায়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاسٌ وَتَمَسَّكُنٌ وَتَقْنَعُ لِرَبِّكَ، وَتَقُوْلُ اللّٰهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِىَ خِدَاجٌ -

(নফল) নামায দুই দুই রাক্'আত করে পড়বে। প্রতি দুই রাক'আত বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, বসবে, স্থিত হবে এবং তোমার রব্ব-এর জন্যে একান্ত হবে, বলবে ঃ হে আমাদের আল্লাহ্ .... । যে তা করবে না, তার নামায ত্রুটিযুক্ত হবে।

এ হাদীসে যেসব কাজকে 'সালাত' বলা হয়েছে, তা তাতে ফরয করা হয়নি। বিরুদ্ধবাদীরা যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন, তা হযরত উবাদাত ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفُتِحَةِ الْكِتَابِ -

সূরা ফাতিহা যে না পড়বে, তার নামায হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বরক, আবূ দাউদ, ইবনে বিশার, জাফর আবূ উসমান সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَمَرَنِى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِىْ اَنْ لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ -

রাসূলে করীম (স) আমাকে এই কথা ঘোষণা করে দিতে আদেশ করেছেন যে, সূরা ফাতিহা ও আরও বেশী আয়াত না পড়লে নামায হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না'—রাসূলের এ কথাটির অর্থ দুটি হতে পারে ঃ মূলতই না হওয়া কিংবা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। যদিও আমাদের মতে বাহ্যত

মূলত না হওয়াই এর অর্থ; যেন শেষ পর্যন্ত এ কথাই বোঝা যায় যে, নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়াই এর তাৎপর্য। দুটি অর্থ একসঙ্গে গ্রহণ করা যেহেতু জায়েয নয়। কেননা যখন মূলত না হওয়ার অর্থ করা হবে, তখন তা থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। যখন পূর্ণাঙ্গ না হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্তভাবে হওয়ার অর্থ নেয়া হবে, তখন তাতে তার কিছু অংশ হওয়া প্রমাণিত হবে। দুটি অর্থ এক সাথে গ্রহণ নিষিদ্ধ, কঠিন। রাসূল (স) ও কথা বলে মূলতই না হওয়া বোঝাতে চান নি। তার প্রমাণ এই যে, তা প্রমাণিত হলে 'পড় কুরআনের যা পড়া সহজ,' এই আদেশে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তা বাতিল হয়ে যায়। তাতে আয়াত মনসূখ হওয়া বোঝায়, কিন্তু 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। আবূ হানীফা, আবূ মুআবিয়া, ইবনে ফুযায়ল ও আবূ সুফিয়ানের আবূ নজরাতা সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও উক্ত কথাই প্রমাণ করে। হাদীসটি হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَجْزِئُ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ اللّٰهِ وَسُوْرَةً فِىْ الْفَرِيْضَةِ وَغَيْرِهَا -

ফরয ও অন্যান্য নামাযের প্রতি রাক'আত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা যে পড়েনি, তার নামায জায়েয হয়নি।

তবে আবূ হানীফা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর মুআবিয়া বলেছেন ঃ لاصلاة 'নামায নেই বা হয় না।' একথা জানাই আছে যে, মূল নামায না হওয়ার কথাই তাঁরা মনে করেন নি। পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, কেননা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ফাতিহা পড়াই কুরআন পাঠের জন্যে যথেষ্ট। তার সাথে অন্য কিছু না পড়লেও নামায হয়ে যাবে।

এ থেকে বোঝা গেল—তাঁরা সকলেই নামাযের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কথাই বুঝেছেন, নামাযের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা বুঝেছেন। মূলত না হওয়া ও অপূর্ণাঙ্গ হওয়া—এ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে দুটি অর্থই একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে না। একটি শব্দের দুই পরস্পর বিপরীত অর্থ গ্রহণ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

কেউ যদি বলেন, এই হাদীসটি উবাদাতা ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। আর হতে পারে, রাসূলে করীম (স) একবার বলেছেন ঃ لَاصَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ। 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই' এ বলে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয করে দিয়েছেন। আর অন্যবারে বলেছেন, সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি যাতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর তা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কিছু না পড়লে নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না?

এর জবাবে বলা হবে, হাদীস দুটির ইতিহাস তোমার বা কারোর জানা নেই। রাসূলে করীম (স) দুই সময় দুই অবস্থায় বলেছেন, তারও কোন প্রমাণ নেই। দুইরূপ অবস্থায়

দুটি হাদীস বলা হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তোমার বিরোধী মতের লোক বলতে পারে যে, নবী করীম (স) এ দুটি কথা দুই অবস্থায় বলেছেন, তা প্রমাণিত নয় কেন ? অথচ দুটি শব্দই হাদীস দুটিকে একই হাদীসে পরিণত করেছে। কোন কোন বর্ণনাকারী হাদীসের শব্দকে সেভাবেই চালিত করেছেন। আর কেউ কেউ তার কোন কোন শব্দকে উপেক্ষা করেছেন। তা হল সূরার উল্লেখ। এমতাবস্থায় দুটি হাদীসই সমান ও অভিন্ন। বেশীর ভাগ প্রমাণ এ-ই পাওয়া যায় যে, হাদীস একই অবস্থায় বলা হয়েছিল। এর ফলে তোমার বিরোধীর পক্ষে তোমার উপর অধিক মর্যাদা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা দুটির ইতিহাস না জানার দরুন দুটিকে একই সময়ের বলে ধরে নেয়াই উত্তম পন্থা। আর এ কথা যখন প্রমাণিত হল যে, সূরার কথা বাড়তি সহ দুটি কথাই একই সময় বলেছেন। আর জানা-ই আছে যে, সূরার উল্লেখ হলেও তাতে মূলতই নামায না হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না, শুধু ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কথাই প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। আমরা এভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে চাই। ফলে কথাটি এই হাদীসের মতই হয়ে যাবে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

لاصَلٰواةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِىْ الْمَسْجِدِ –

মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে না পড়লে তা হবে না।

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا اِيْمَانَ لِمَنْ لاَاَمَانَةَ لَهُ –

যে লোক আযান শুনে তার জবাব দিল না, তার নামায নেই এবং যার আমানতদারী নেই, তার ঈমানই নেই।

কুরআনের এ আয়াতটিও সেইরূপ ঃ

اِنَّهُمْ لاَاَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ – اَلاَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْاَ اَيْمَانَهُمْ – (التوبه : ١٢-١٣)

কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়ে-ই) তারা বিরত হবে। তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই থাকে.... ?

এ হাদীস ও কুরআনের আয়াতে প্রথমে অস্বীকৃতি এবং পরে স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। মূলকে অস্বীকার করার ইচ্ছা নয়। অর্থাৎ (আয়াতটির অর্থে) ওরা ওয়াদা পূরণ করবে এমন কসম ওরা করেনি এ জন্যে সে 'কসম' বিশ্বাস্য নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, হাদীস কয়টির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হবে না কেন, আর

কুরআনের আয়াতে যে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে তা সূরা ফাতিহাকে বাদ দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, হাদীস যদি আয়াত নিরপেক্ষ ধরা হয়, তাহলেও সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়ার মত কোন অকাট্য দলীল তাতে পাওয়া যাবে না। যেমন পূর্বেই বলেছি যে, তার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা না পড়লেও মূল নামায হওয়া প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর অন্যান্য হাদীস মূলত না হওয়া ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়া দুটিরই সম্ভাবনা প্রকাশ করে। তাছাড়া এসব হাদীস যদি নামাযে নির্দিষ্ট কিছু পড়া ফরয প্রমাণ করত, তাহলে আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা এবং তাকে ফরয নামাযের বদলে নফল নামায মনে করা সঠিক হতে পারে না। এ বিষয়ে শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা পুনরায় পড়ে নিলে পূর্ণ জবাব পাওয়া যাবে, ইনশা আল্লাহ্।

আবূ বকর বলেছেন, সূরা ফাতিহা সংক্রান্ত উল্লিখিত হুকুমসহ তা পাঠ করার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, আল্লাহ বিশেষভাবে আমাদেরকে হাম্দ করার আদেশ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা তাঁর হাম্দ করব, তাঁর গুণ পরিচিতি বর্ণনা করব, কিভাবে তাঁর নিকট দো'আ করব। এ কথাও বোঝাচ্ছে যে, সর্বপ্রথম-ই আল্লাহ্র হাম্দ করতে হবে, তার পরে তাঁর তারীফ-প্রশংসা, তার পরে দো'আ করা অধিক উত্তম কাজ এবং এই পদ্ধতির দো'আই কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। এ কারণে সূরা ফাতিহার সূচনা হয়েছে হাম্দ দ্বারা, তারপর সানা ও তারীফ। বলা হয়েছে ঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন মালিক ইয়াওমিদ্দীন পর্যন্ত। তারপর তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি এবং সে কথাটি স্বতন্ত্র ও এককভাবে বলা হয়েছে ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ। তারপর তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে সেই সমস্ত কাজে ও ব্যাপারে, ইহকালীন ও পরকালীন যেসব ব্যাপারেই আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী, তা আল্লাহ্র দাস হয়ে করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। বলে। পরে হেদায়েতের উপর দৃঢ়তার প্রার্থনা করা হয়েছে। এ কারণেই তো আল্লাহ্র হাম্দ করার দরকার হয়েছে, তাঁর তারীফ করা জরুরী হয়েছে এবং তাঁর দাস হয়ে থাকা আমাদের জন্যে কর্তব্য হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে যেমন হেদায়েত প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমনি তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকার তওফীকও চাওয়া হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতের জন্যে। অতীতের জন্যে এরূপ প্রার্থনা হয় না। কাফিররা আল্লাহ্কে চিনতে পারেনি, তাঁর হাম্দ ও সানাও করেনি। ফলে তারা গুম্রাহ হয়ে গেছে। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার তওফীক চাওয়া হয়েছে। কেননা কাফিররা আল্লাহ্কে চিনতে পারেনি বলে তাঁর গজব ও আযাব পাওয়া যোগ্য হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ .... বলে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হাম্দ করার শিক্ষা যেমন দিয়েছেন, তেমনি তা করার আদেশও করেছেন ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বাক্যটিই তার প্রমাণ।

মনে রাখতে হবে, 'হাম্দ' করার জন্যে আল্লাহ্র আদেশ সূরার শুরুতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, এই কথা দ্বারা আল্লাহ্র গজব ও আযাব থেকে বাঁচতে চাওয়া

হয়েছে, আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং রোগের প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখ্য। হাদীসটি আবদুল বাকী, মুআজ ইবনুল মুসান্না, সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা, আবূ মুআবিয়া, আমাশ, জাফর ইবনে ইয়াস আবূ নজরাতা সূত্রে বর্ণিত। আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ আমরা একটি যোদ্ধা বাহিনীতে ছিলাম। আরবের কোন এক গোত্রের এলাকায় পৌঁছলাম। গোত্রের লোকেরা এসে বলল ঃ আমাদের সরদারকে সাপে দংশন করেছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে ঝাড়-ফুঁক করতে পারে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, কিছু তো করতে পারি, কিন্তু আমাদের জন্যে মেহ্‌মানদারীর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই করছি না। ফলে তখনই তারা আমাদের জন্যে ছাগলের ব্যবস্থা করল। এরপর আমি সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ে ফুঁ দিলাম। এতে সে লোকটি ভালো হয়ে গেল এবং আমরা ছাগলটি নিয়ে নিলাম।

পরে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি জানি, সূরা ফাতিহা রোগমুক্ত করে। এটা ভালো তদবীর। ছাগলের একটা অংশ আমাকেও দাও।

সূরা ফাতিহার বহু কয়টি নাম রয়েছে। একটি হল উম্মুল কিতাব। কেননা তা-ই কুরআনের প্রথম সূরা। 'উম্মুল কুরআন' ও বলা হয়। দুটি কথার একটি অপরটির বিকল্প। 'উম্মুল কিতাব' বললে উম্মুল কুরআনই বোঝা যায়। কেননা 'কিতাব' অর্থ কুরআন, তা সকলেরই জানা। তাই কখনও উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে, কখনও উম্মুল কুরআন। এই উভয় নাম রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত। ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। বলা হয় মাবউল মাসানী—বারবার আবৃত্তির সাতটি আয়াত। সাঈদ ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট 'মাবউল মাসানী' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেনঃ মাবউল মাসানী বলতে উম্মুল কুরআন-ই বোঝায়। 'মাবউল' অর্থ সাত, আর 'মাসানী' বলতে বোঝায়, তা প্রতি রাক'আতে আবৃত্তি করতে হয়।

এটাই তার নিয়ম। প্রতি রাক'আতে পড়তে হয়, সমগ্র কুরআনে এছাড়া আর কোন অংশ নেই।

সূরা আল-বাকারা

আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

যারা গায়ব-এর প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে ও আমাদের দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে।

এ আয়াতে নামায ও যাকাত-এর আদেশ রয়েছে। যেমন এ দুটি কাজ মুত্তাকী লোকদের গুণ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। তাক্‌ওয়ার শর্তও হচ্ছে তাই। যেমন 'গায়ব-এর

প্রতি ঈমান' বলে আল্লাহ্ পরকাল প্রভৃতির প্রতি ঈমান বুঝিয়েছে। এছাড়াও যুক্তি দলীলের ভিত্তিতে আরও যা যা বিশ্বাস করা প্রয়োজন তা-ও তাক্ওয়ার শর্ত। ফলে আয়াতে উল্লিখিত নামায ও যাকাত ফরয প্রমাণিত হল।

'নামায কায়েম' কথাটির কতগুলো তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত, তা সম্পূর্ণ করা, একটি জিনিসকে যথার্থভাবে দাঁড় করে দেয়া। তাকে বাস্তবায়িত করা। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِا لْقِسْطِ

এবং ন্যায়পরতা সহকারে তোমরা ওজন দাঁড় কর।—ও এই ধরনেরই কথা।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ يُقِيْمُوْنَ অর্থ 'তারা আদায় করে।' কেননা নামাযে 'কিয়াম' (দাঁড়ানো) তো কর্তব্য। এ কারণে আদায় করার কথা বোঝাবার জন্যে 'তারা কায়েম করে' বলা হয়েছে। নামাযে 'কিয়াম' ফরয, তা-ও এ থেকে বোঝা যায়, যদিও 'কিয়াম' জাড়াও নামাযে আর কয়েকটি ফরয রয়েছে। যেমন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –

কুরআনের যা পড়া সহজ সম্ভব, তাই তোমরা পড়।

অর্থাৎ নামাযে 'সালাত' সেই নামায বোঝানো হয়েছে যাতে কুরআন পাঠ করা হয়। আর فران الفجر বলতে বোঝায় ফজরের নামাযে কুরআন পড়া।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا الاَيَرْكَعُوْنَ –

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা রুকূ কর, তখন তারা রুকূ করে না।

اَرْكَعُوْا وَسْجُدُوْا

রুকূ দাও সিজদা কর।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّكِعِيْنَ –

রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ কর।

এ সব আয়াতে 'রুকূ' করতে বলা হয়েছে নামাযের একটি ফরয রুক্ন হিসেবে। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, নামাযে রুকূ করা ফরয। যা ফরয তা করার কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে " يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ তারা 'নামায কায়েম করে' বলার দরুন নামাযে কিয়াম করা ফরয হয়ে গেছে। এ রকম বলে নামাযের একটি ফরযের কথাই জানিয়ে দেয়া হল يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর আর একটি অর্থ হতে পারা ঃ তারা ফরযসমূহ তা আদায় করার নির্দিষ্ট সময়ে চিরন্তনভাবেই আদায় করে।

যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

নামায মুমিনদের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত ফরয।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট জ্ঞাত সময়ে নামায আদায় করা ফরয। قَائِمًا بِالْقِسْطِ অর্থ 'ন্যায়পরতা কায়েম করে'। তার বিপরীত কাজ করে না। চলমান নিয়মিত চিরন্তন কাজকে আরবরা 'কায়েম' বা দাঁড়োনা কিংবা 'দণ্ডায়মান' বলে। আর তা থেকেই হয় مُقِيْمٌ কায়েমকারী। বলা হয় ঃ অমুক ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা কার্যকর করে। আর যখন বাজারের লোকেরা এসে যায়, তখন বলা হয় ঃ قَامَتِ السُّوقُ বাজার দাঁড়িয়ে গেছে।' তার অর্থ ঃ সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একটি কাজ একান্তভাবে লেগে যাওয়া। আর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'নামায দাঁড়িয়ে গেছে' কথাটিও এ পর্যায়ের। আয়াতটির এ সব তাৎপর্যই হতে পারে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

তাদেরকে আমরা যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

সম্বোধনের তাৎপর্যে এই অর্থ নিহিত রয়েছে যে—এর অর্থ হচ্ছে, অর্থ ব্যয় ফরয। তা আল্লাহ্‌র হক্ হিসেবে ধার্যকৃত ব্যয় যেমন যাকাত ইত্যাদি। কেননা অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَانْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -

তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা আমার দেয়া রিয্‌ক থেকে ব্যয় কর।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ব্যয় কর।

বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীকৃত করে রাখে, তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না। ....

এ সব আয়াতেই যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই 'ব্যয়'-র কথা নামায-এর সঙ্গে একত্রিত ও পাশাপাশি রেখে বলা হয়েছে। আর নামায যেহেতু ফরয, তাই এ 'ব্যয়'টাও ফরয, তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। আর তা আল্লাহ্‌র ঈমানের কথা বলার পর বলা হয়েছে বলে সে 'ব্যয়'টা ঈমানের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এই 'ব্যয়' হচ্ছে মুত্তাকীদের অন্যতম গুণ পরিচিতি। নামায ও যাকাত উভয়ই ফরয, তা বোঝা যায় এ

ভাবেও যে, 'নামায শব্দটি যখন সিফাতহীন ও শর্তহীন ব্যবহৃত হবে, তখন তা থেকে সর্বজনপরিচিত ফরয নামাযই বোঝা যাবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ। 'সূর্য ঢলে পড়া সময়ে নামায কায়েম কর', বলা হয়েছে ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। 'তোমরা নামাযসমূহ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সময়ের নামায।'

এখানে 'সালাত' শব্দ বলে যখন ফরয নামায বোঝানো হয়েছে, তখন এই 'ইনফাক' বা ব্যয় বলতেও ফরয ব্যয় বুঝাবে। আর ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক থেকে। তা থেকে বোঝা যায়, 'রিয্ক' নাম হতে পারে শুধু মুবাহ (অ-নিষিদ্ধ) রিয্কের। নিষিদ্ধ রিয্ক এ পর্যায়ে গণ্য নয়। যা অপহরণ করা হয়েছে এবং যা অন্যের উপর জুলুম করে নেয়া হয়েছে, তা রিয্ক গণ্য হতে পারে না। কেননা তা আল্লাহ্ তাকে রিয্ক হিসেবে দেন নি। তা রিয্ক হলে তা ব্যয় করাও জায়েয হবে, অন্যকে দান হিসেবে দেয়া সঙ্গত হবে। তা দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশা করাও অসমীচীন হবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে অপহরণকারীর অপহৃত মাল-সম্পদ সাদ্কা করা হারাম। নবী করীম (স) তাই বলেছেন ঃ

لَاتُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ –

অপহৃত ধন-মালের সাদকা কবুল হয় না।

রিয্ক-এর আভিধানিক অর্থ অংশ। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ – (الواقعه – ٨٢)

আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্য মনে করছ, অবিশ্বাস করছ?

অর্থাৎ অবিশ্বাস করার ব্যাপারে তোমাদের এই অংশ....। ব্যক্তির অংশ তার ভাগ্যে একান্তভাবে যা হয় অন্যের অংশ ছাড়া। কিন্তু এখানে রিয্ক বলতে তা-ই বোঝায়, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দান করেছেন। আর তা মুবাহ্—পবিত্র। রিয্ক-এর আর-ও একটি তাৎপর্য আছে। তা হল, প্রাণীকুলের খাদ্য হিসেবে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা আল্লাহ্ই তা খাদ্য ও উপজীব্য বানিয়েছেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে, তারা মুসলমানদের নিকট এসে যে নিজেদের ঈমান জাহির করত বিশ্বাস না করেও এবং তাদের শয়তান সহযোগীদের নিকট তাদের কুফর প্রকাশ করত, এ পর্যায়ে বলেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ –

এমন লোকও রয়েছে, যারা মুখে বলে ঃ আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু আসলে তারা ঈমানদার নয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ –

ওরা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় (ধোঁকার কুফল তারা নিজেরাই ভোগ করে)।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْآ اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ –

আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু পরে যখন তারা তাদের শয়তান নেতাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, ওদের সাথে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি মাত্র।

যেসব লোক নিজেদের কুফর গোপন রাখে, তারা আরবী পরিভাষায় 'জিন্দীক'। তারা যদি ঈমান জাহির করে, তাহলে তাদের প্রতি তওবা করার দাবি জানাতে হবে। উপরোক্ত আয়াতকে তার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেছেন। তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়নি। রাসূলে করীম (স)-কে তাদের বাহ্যিক কথাকে কবুল করতে, আল্লাহ্ তাদের আসল অবস্থা ও তাদের আকীদার খারাবী সম্পর্কে যা জানিয়ে দিয়েছেন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করতে বলেছেন। একথা জানা-ই আছে যে, যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রয়োগে শত্রু নিধন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। তা মদীনায় নাযিল হয়েছে কয়েক বছর পর। অথচ হিজরতের পর-পরই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছেন। সূরা বারায়াত ও সূরা মুহাম্মাদ প্রভৃতির আয়াতেও মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মৌখিক কথাকেই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য যে মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে, তাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য না করতে বলা হয়েছে। যে পর্যায়ে আমরা তাদের সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব। 'জিন্দীক' পর্যায়ে লোকদের মতপার্থক্য এবং উপরোক্ত আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। এ কথাটি রাসূলে করীম (স) -এর এই ঘোষণা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ، فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَا لَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ –

লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। যদি তারা তা বলে তা হলে তারা আমার হাত থেকে তাদের রক্ত ও ধন-মালের নিরাপত্তা পেয়ে গেল। তবে আইন মত কিছু করা হলে বিভন্ন কথা। আর তাদের চূড়ান্ত হিসেব গ্রহণ তো আল্লাহ্র কাজ।

এক যুদ্ধযাত্রায় এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা হলে সে সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে উঠল। কিন্তু আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা হল না। হযরত উসামা ইবনে যায়দ তাকে হত্যা করেছিলেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর এই কাজ যথার্থ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁকে বললেন ঃ

هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ –

তুমি তার হৃদয়টাকে ছিন্ন করে দেখলে না কেন ?

অর্থাৎ তুমি তার মৌখিক কলেমা পাঠ থেকে তাকে ঈমানদার মনে করলে না কেন ? সে আসলেও ঈমানদার কিনা, তা দেখার কোন দায়িত্ব তোমার উপর ছিল না। আর মূলত তা জানবার কোন উপায়ও আমাদের নিকট নেই।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলা যায় না। কেননা আল্লাহ তাদের ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতির উল্লেখের পর-ই বলেছেন ঃ ওরা আসলে মুমিন নয়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, সূরা আল-বাকারার প্রথম চারটি আয়াতে মুমিনদের পরিচিতির উল্লেখ হয়েছে। পরে দুটি আয়াতে কাফিরদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে আর মুনাফিকদের সম্পর্কিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেরোটি আয়াতে।

'নিফাক' একটি শরীয়াতী পরিভাষা। যে লোক ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু কুফর গোপন রাখে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। এই নামকরণে তাদের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তারা আসলে মুশরিক। কেননা তারা সকল ক্ষেত্রেই শিরক করার দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে রয়েছে। অভিধানে এই শব্দের মূল উৎস হচ্ছে ঃ نافقاء اليربوع। তা একটি গর্ত। যা Jurbos থেকে তাড়া মাত্র বের হয়। তার বহু কয়টি গর্ত রয়েছে। যখন ইচ্ছা তার কোন একটিতে প্রবেশ করে। একদিক থেকে তাড়া করলে অন্য গর্তে চলে যায়।

আল্লাহ্র কথা, يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এখানে পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা الخديعه। আমল অর্থ লুকিয়ে রাখা। মুনাফিকরা নিজেদের শিরক লুকিয়ে রাখে ও ঈমান জাহির করে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকটতো কোন কিছুই লুক্কায়িত নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধোঁকা দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যাদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আল্লাহ এই কথাটি বলেছেন, তাদের দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই হবে। একটি, হয় তারা আল্লাহ্কে যথাযথভাবে জানতে ও চিনতে পারা

লোক হবে এবং জেনে গিয়ে থাকবে যে, কোন জিনিস গোপন করে বা রেখে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়া যায় না। কিংবা তারা আল্লাহ্‌কে আদৌ জানতে ও চিনতে পারেনি। কিন্তু তা সুদূরবর্তী ব্যাপার। কেননা তা মনে করা যথার্থ কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ব্যাপারে তা-ই প্রয়োজন করা হয়েছে। কেননা তারা কাজ করেছে ঠিক ধোঁকাবাজের মতই। আর ধোঁকাবাজির অশুভ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তাদের উপর প্রবর্তিত হবে। পরিণতি দাঁড়াল এই যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধোঁকা দিল।

কারো কারো মতে এর অর্থ—তারা ধোঁকা দিচ্ছে রাসূলে করীম (স)-কে। কিন্তু তাঁর কথাটা উহ্য করে দেয়া হয়েছে। আর রাসূলকে ধোঁকা দেয়া ভিন্ন কোন ব্যাপার নয়। কুরআনেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - (احزاب - ٥٧)

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয় ....

এর তাৎপর্য হল, তারা পীড়া দেয় আল্লাহ্‌র বন্ধুগণকে ....।

এ দুটির যেটি-ই হোক, তা পরোক্ষ কথা, প্রত্যক্ষ নয়। তা ব্যবহার করা যায় শুধু সেখানে, যেখানে তার দলীল পাওয়া যাবে। তারা রাসূলকে ধোঁকা দিয়েছে মুশরিকদের হত্যা করার জন্যে রাসূল ও মুমিনদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য। তারা মুমিনদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হওয়ার মতলবেও তারা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করে থাকতে পারে। মুমিনরা তো পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হতোই ঈমানের কারণে। পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের পরস্পরের মধ্যে। তারা এ উদ্দেশ্যেও ঈমান জাহির করে থাকতে পারে যে, তারা মুসলমানদের নিকট থেকে এ উপায়ে গোপন তত্ত্ব জেনে নেবে। তা তারা সে গোপন তত্ত্ব মুসলমানদের শত্রুদের নিকট পৌঁছাতে পারবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اللّٰه يستهزئ بهم। 'আল্লাহ্‌ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন' অনুরূপ একটি পরোক্ষ কথা। এর তাৎপর্যে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। একটি হচ্ছে, কথার জবাব অনুরূপ কথা দিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও তার আসল অর্থে নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - (الشورى - ٤٠)

খারাপের প্রতিফল অনুরূপ খারাপ

দ্বিতীয়, মূলত খারাপ নয়; বরং ভাল ও উত্তম। কিন্তু তদ্দ্বারা খারাপের মুকাবিলা করা কালে সেই খারাপ শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -
(البقره - ١٩٤)

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন কর (করতে পার), যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছেন।

সীমালঙ্ঘনের এই দ্বিতীয় কথটি মূলত সীমালঙ্ঘন নয়। অনুরূপ কথা ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - (النحل -١٢٦)

তোমরা প্রতিশোধ লও তাহলে প্রতিশোধ নেবে ততটা যতটা তোমরা নিপীড়িত হয়েছ।

এখানে প্রথম প্রতিশোধ কথাটি কিন্তু মূলত পীড়নের প্রতিশোধ, আসলে প্রতিশোধ নয়। প্রতিশোধ শব্দের মুকাবিলায়ই তা বলা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে اَلْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ 'প্রতিফল প্রতিফলের দ্বারা'। প্রথমটা কিন্তু প্রতিফল নয়। এই কবিতা ছত্রটিও অনুরূপ ঃ

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا - فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا -

সাবধান! কেউ যেন আমাদের উপর মূর্খতা না করে।

তাহলে আমরাও আমাদের মূর্খদের মূর্খতার উপরের মূর্খতা করব।

একথা জানাই আছে যে, কবি মূলতই মূর্খতাচ্ছন্ন হননি; কিন্তু কথার সাথে মিল রেখে জবাবী কথা বলাই আরবদের অভ্যাস বিধায় এরূপ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে কথাটি বলা হয়েছে কথার সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ঠাট্টা-বিদ্রূপের অশুভ ফল যেহেতু তাদেরই ভোগ করতে হবে, তখন বলা যেতে পারে যে, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে। এ তাৎপর্যও বলা হয়েছে যে, ওরা যখন দুনিয়ায় যথেষ্ট সময় অবকাশ পেয়ে গেছে, খুব দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়নি, অন্যান্য মুশরিকের ন্যায় হত্যার সম্মুখীন হয়নি, তাদের শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে, তারা এতে ধোঁকায় পড় গেছে, ফলে তাদের সাথেও যেন ঠাটা-বিদ্রূপই করা হয়েছে, এমনই হয়ে গেল।

মূলত সমগ্র কাফির ও কুফরের ধ্বজাধারীদের তুলনায় মুনাফিকদের অপরাধ অনেক বেশী কঠিন ও সাংঘাতিক। কেননা তারা ধোঁকা-প্রতারণা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ একত্রিত করেছে, যেমন বলা হয়েছে ঃ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ 'ওরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়', اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ 'আমরা তো ঠাটা-বিদ্রূপকারী'। আর এই হচ্ছে কুফর কর্মে অনেক বাড়াবাড়ি। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আগাম সংবাদ জানিয়েছেন, বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - (النساء : ١٤٥)

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে।

পরকালে তাদের যে আযাব ও অন্যান্য শাস্তি হবে, সে বিষয়ে খবর দেয়া সত্ত্বেও

দুনিয়ায় তাদের অবস্থা বিভিন্ন হবে। শিরক জাহিরকারী লোকেরা যদি ঈমান প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না, পারস্পরিক মীরাস প্রাপ্তিতেও তারা মুসলমানদের মতই আচরণ পাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার আযাবসমূহ তাদের অপরাধ অনুপাতে হবে না। এর মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত আছে, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এই দৃষ্টিতেই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এ কারণে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার জন্যে 'রজম' শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন বাধ্যতামূলকভাবে। তওবা করলেও 'রজম,' শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। নবী করীম (স) মায়েজ সম্পর্কে তাকে 'রজম' করার পর যা বলেছিলেন এবং গামেদীয়ার উপর 'রজম' শাস্তি কার্যকর করার পর যা বলেছিলেন, সেদিকে কি লক্ষ্য দাওনি ? বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ -

ওরা এমন এক তওবা করেছে, অত্যাচারমূলক কর আদায়কারী ব্যক্তিও যদি এই রকম তওবা করত, তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হতো।

অথচ কুফর ব্যভিচার থেকেও অধিক বড় গুনাহ। কোন ব্যক্তি 'কুফর' করার পর যদি তওবা করে, তা হলে তার তওবা কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ -

যারা কুফর করেছে তাদেরকে বল, তারা যদি এখনই বিরত হয়ে যায়, তাহলে যা পূর্বে হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সূরা আনফাল ঃ ৩৮)

ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীকে ৮০ দোররা মারার শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু কারোর উপর কুফর আরোপকারীর জন্যে কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি, যদিও তা জ্বিনার তুলনায় অধিক বড় গুনাহ। মদ্যপানকারীর জন্যে শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু রক্ত পানকারী ও মৃত ভক্ষণকারীর জন্যে কোন শাস্তি ধার্য হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়ার শাস্তিসমূহ অপরাধ অনুপাতে নির্ধারিত হয়নি। আর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ ও চুরির অপরাধে কোন দণ্ড মূলতই ধার্য না হওয়া যখন বিবেকসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত, পরকালীন শাস্তিকেই এসব অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি মনে করাই যখন যথার্থ, তখন এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হওয়াই সঙ্গত। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অপর কোন কোন ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক বিবেচিত হবে না। এ কারণে আমাদের ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন—নিছক কিয়াস বা ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে দণ্ড নির্ধারণ করা বৈধ নয়, যুক্তিসম্মত নয়। তা নির্ধারণের জন্যে আল্লাহ্র বিধানের (التوقيف) উপরই নির্ভর করা সমীচীন। অথবা ফিকাহ্বিদদের ঐকমত্যও তার ভিত্তি হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন, তাদের বহাল রেখেছেন এবং তাদের হত্যা করার জন্যে আমাদেরকে তিনি আদেশ করেন নি। এ একটি মৌল নীতি বিশেষ। যেসব দণ্ড ও শাস্তি ঘোষিত হয়েছে তা

রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কিংবা শরীয়াতের ব্যাপারাদি কার্যকর করার দায়িত্বশীলের করণীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আযাব হিসেবে যে কষ্ট ও পীড়া দিয়ে থাকেন, এগুলো ঠিক সেই পর্যায়ের ব্যাপার। এটা যখন সঙ্গত যে, দুনিয়ায় মুনাফিকদেরকে রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ইত্যাদির দ্বারা আযাব দেয়া হবে না; বরং এদের বিপরীত আচরণই তাদের সাথে করা হয়, তাদের কুফর ও মুনাফিকীর শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত হবে, তখন দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের কুফর ও নিফাকের শাস্তি ত্বরান্বিত করার কোন আদেশ আমাদের প্রতি না দেয়াই সঙ্গত হয়েছে। নবী করীম (স) নবুওয়াত লাভ কারার পর দীর্ঘ তেরোটি বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি মুশরিকদেরকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নেয়ার জন্যে অবিশ্রান্তভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন আদেশ তাঁকে দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে খুবই নম্রতা ও সহৃদয়তা সহকারে আহ্বান জানাতে থাকারই নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ - (النحل : ١٢٥)

তোমার রব্ব-এর দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাও যুক্তিভিত্তিক কথা, উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর বলেছেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا - (الفرقان : ٦٣)

এবং জাহিল মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক শুরু করে, তখন তারা বলে সালাম।

বলেছেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - (حم السجده : ٣٤-٣٥)

উত্তম পন্থায় প্রতিরক্ষা কর। তাহলে যার সাথে তোমার পরম শত্রুতা রয়েছে, সে-ও উষ্ণ বন্ধুতে পরিণত হবে। এই কাজ করতে পারে কেবল তারা, যারা ধৈর্যের নীতি গ্রহণ করেছে এবং তা করতে পারে শুধু বিরাট ভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি।

এই ধরনের আরও বহু আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে, যাতে উত্তমভাবে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর হিজরতের পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তো উভয় অবস্থার কল্যাণ সম্পর্কে অধিক ভালো জানেন এবং প্রত্যেক অবস্থায় বান্দার করণীয় সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কোন কোন কাফিরকে

হত্যা করার বিশেষ হুকুম দেয়া হয়ে থাকলে তা খুবই যক্তিসঙ্গত হয়েছে। ওরা হচ্ছে কট্টর ধরনের কাফির, ওরা কখনই ঈমান প্রকাশ করে না, কুফরও গোপন করে না। যদিও মুনাফিকদের অপরাধ কাফিরদের তুলনায় অনেক কঠিন ও বড়। আল্লাহ্র কথাঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا -

যিনি পৃথিবীকে শয্যা বানিয়েছেন।

অর্থাৎ স্থিতিশীল ও ধীরস্থির অ-নড়বড় বানিয়েছেন। অপর আয়াতে পর্বতকে গ্রাফী বানাবার কথা বলা হয়েছে। পর্বতকে গ্রাফী বলার তাৎপর্যে জটিলতা নেই, যেমন সূর্যকে চেরাগ বা প্রদীপ বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ কোন লোক যদি শয্যায় না শোয়ার কিরা করে এবং পরে সে জমিনের উপর শয়ন করে, তাহলে সে কিরা ভঙ্গ করল না, সেজন্যে তাকে কোন কাফ্ফারাও দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কিরা করে—সে প্রদীপের আলোতে বসবে না, আর সে সূর্যের আলোতে বসে, তবুও তার কিরা ভঙ্গ হবে না। কেননা কিরা-কসম সাধারণ পরিচিত বিষয়ের উপর হয়। কিন্তু সূর্য বা পৃথিবীকে নিয়ে এরকম কিরা কসম সাধারণভাবে করা হয় না। এটা ঠিক তেমনি, যেমন আল্লাহ্ অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্ কাফির বলেছেন। অথচ কৃষককেও (আভিধানিক অর্থে) কাফির বলা হয়। সংশয় পোষণকারীকেও কাফির বলা হয়েছে। অথচ সাধারণভাবে নিঃশর্তে এরূপ নামকরণ করা হয় না। এ থেকে শুধু তাকেই বোঝায়, যে আল্লাহ্কে অস্বীকার ও অমান্য করে। শর্তহীন নাম ও শর্তযুক্ত নামের দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। শরীয়াতের হুকুম আহকাম জানার জন্যে এগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। তাই স্বভাবত তা সাধারণ ও নিঃশর্ত, নিঃশর্তই থাকবে। আর যা শর্তাধীন তাকেই সেই শর্তের উপর রাখতে হবে। কোনটাই যেন স্বীয় স্থান অতিক্রম না করে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্র তওহীদ ও স্রষ্টার প্রমাণ বিধৃত। কোন জিনিসই মহা শক্তিশালী স্রষ্টার সমতুল্য বা সমকক্ষ নয়। তাঁকে কেউ অক্ষম করতেও সমর্থ নয়। তাতে আকাশমণ্ডলের উর্ধ্বে অবস্থান এবং কোনরূপ স্তম্ভ ছাড়াই স্থিত হয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে তা স্ব-অবস্থায় বর্তমান থাকারও উল্লেখ হয়েছে কোনরূপ নড়চড় বা স্থান বিচ্যুতি কিংবা পরিবর্তন ছাড়াই।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا - (الانبياء : ٣٢)

এবং আকাশমণ্ডলকে সংরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকতা এবং কোনরূপ কম্পন ব্যতিরেকে অবস্থিত থাকায় আল্লাহ্র একত্বের বিরাট দলীল নিহিত রয়েছে। তার স্রষ্টার কুদরত যে অসীম তা-ও প্রমাণিত হচ্ছে। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। এ সবের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের স্মরণ করার তাগিদ উৎসাহদানও রয়েছে তাতে। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ -

অতঃপর সেই বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের রিয্‌ক হিসেবে অফুরন্ত ফল ও ফসল জন্মিয়েছেন।

যেমন বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

সেই আল্লাহ্ পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِىْ السَّمٰوَاتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ -

তিনিই আসমান ও জমিনের সব কিছু তোমাদের জন্যে কর্মে নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য ও উত্তম পবিত্র রিয্‌ক বের করেছেন তা কে হারাম করে দিতে পারে ?

এই সব আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই মুবাহ্, বিবেক-বুদ্ধি এগুলো ব্যবহারে কোন দোষ দেখতে পায় না। অতএব তা মৌলিক ভাবে হারাম নয়। তবে কোনটির হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা কিছু নাযিল করেছি, সে বিষয়ে তোমরা যদি কোন সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাক, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং এজন্যে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

এ আয়াতে আমাদের নবীর নবুয়্যতের সত্যতার দলীল উপস্থাপিত হয়েছে। কয়েকটি দিক দিয়েই তা বিবেচনা করা যায় ঃ

একটি, লোকদেরকে অনুরূপ একটি সূরা পেশ করতে বলা হয়েছে। তারা যে তা করতে সক্ষম নয়, অথচ তাদের আত্মাভিমান রয়েছে প্রচণ্ড। কুরআন তাদেরই ভাষার

কালাম। নবী করীম (স) তাদের মধ্যেরই একজন আরবী ভাষাভাষী। কোন প্রভাষক তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি। কোন কবিও এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারেনি, যদিও এজন্যে তারা বহু অর্থ ব্যয় করেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্যে। তাঁর সত্যতাকে প্রমাণের সব কথা বাতিল করার জন্যে। রাসূলের দাবিকে বাতিল প্রমাণের লক্ষ্যে তারা সর্বোচ্চ মাত্রায় চেষ্টা চালিয়েছে, চেষ্টা করেছে রাসূলের সঙ্গী-সাথীগণকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে দেখা দিল। এই ব্যাপারটি প্রমাণ করল যে, কুরআন আল্লাহ্র নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে, তার মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। অনুরূপ কালাম রচনা করাও তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তারা সবচেয়ে বড় যে কথা বলছে তা হচ্ছে কুরআন পূর্বকালীন কাহিনী মাত্র, কিংবা যাদু—এ কথার জবাবে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ -

ওরা সত্যবাদী হলে তারই মত কোন কালাম রচনা করে তারা নিয়ে আসুক।

বলেছেন ঃ

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ -

তাহলে তোমরা স্বরচিত দশটি সূরা নিয়েই আস।

এ পর্যায়ের কুরআনের সংবদ্ধতাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু। কুরআনের অর্থ নয়। আর তা করতেই তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে এই কালাম রাসূলে করীম (স)-এর একটি বড় সুশিক্ষা হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এই মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন, আতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অন্যান্য সব নবীর মুজিযা তাঁদের জীবনের অবসানের সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে সব মুজিযার কথা আমরা হাদীসের বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর এই মুজিযা শাশ্বত, চিরন্তন, তাঁর চলে যাওয়ার পরও তা চিরদিন থাকবে। সব আপত্তিরই জবাব হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জ। অন্য সব কিছুর অক্ষমতাই প্রমাণিত হবে কুরআনের সম্মুখে। আর এ থেকেই তাঁর নবুয়তের পরম সত্যতা অকাট্যভাবে ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক যেমন তাঁর জীবনকালেও তা তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, মুমিন সমাজ ও নবীর নবুয়ত অস্বীকারকারী উভয়ের নিকট একথা জাজ্জল্যমান যে, মুহাম্মাদ (স) সমস্ত লোকের মধ্যে অধিক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা ও অতীব উত্তম রায়দানে সক্ষম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা-ই সম্ভব ছিল না। তাঁর ধৈর্য সহিষ্ণুতা ছিল তুলনাহীন। তাঁর রায় ও সিদ্ধান্তসমূহও ছিল নির্ভুল এবং যথার্থ। এরূপ এক মহান ব্যক্তিত্ব মিথ্যা নবুয়তের দাবি করবেন, বলবেন যে, তাঁকে সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তা কল্পনাই

করা যায় না। অতঃপর তাঁর নবুয়তের আলামত এবং তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে এক মহান কালাম নাযিল করেছেন। এই কালাম সকলের নিকট প্রকাশমান, সকলের শোবাহ্ সন্দেহের উপর চরম আঘাতকারী। যদিও একথা জানাই আছে যে, এরা সকলেই একই সমাজের ও একই সময়ের লোক। ফলে লোকদের মিথ্যাবাদিতা ও দাবির বাতুলতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জানা গেছে যে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়ারও অক্ষম বলে ঘোষণা করার একমাত্র কারণই এই ছিল যে, এই কালাম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। কোন মানুষই এরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতে পারে না।

তৃতীয়, কথার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا ......

তোমরা যদি তা না পার, —আর তা কখ্‌খনই পারবেও না.....

এতে বলা হয়েছে যে, তারা কুরআনের মুকাবিলা করতে পারে না। এ হচ্ছে 'গায়ব' পর্যায়ের সংবাদ দান। তাদের অক্ষমতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সংবদ্ধতার মুজিযার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে তা স্বতঃউজ্জ্বল প্রমাণ।

কেউ যদি বলে ঃ তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ সুস্থতা সত্ত্বেও তোমাদের কেউ আমার মস্তক স্পর্শ করতে পারবে না, আর তারা দাঁড়িয়েও এবং তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চেয়েও কেউ তা করতে না পেরে থাকে, তাহলে তাতে তার কথার সত্যতাই প্রমাণিত হবে।

তাই আল্লাহ্‌র উক্ত চ্যালেঞ্জমূলক কথাটি নবীর নবুয়তের সত্যতাই প্রমাণ করে। তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই কালাম মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের অনুরূপ কালাম রচনা করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন মানুষ, জ্বিন সহ সমগ্র সৃষ্টিলোককে। যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - (الاسراء : ٨٨)

বল, সমস্ত জ্বিন ও মানুষও যদি একত্রিত হয়ে এই কুরআনের মত কোন কোন কালাম রচনা করতে চেষ্টা করেও, তবু তারা অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হলেও।

শেষ পর্যন্ত তাদের অক্ষমতা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন তাদের বলা হল ঃ

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيٰتٍ -

তা হলে মনগড়াভাবে রচিত অনুরূপ দশটি সূরা-ই না হয় নিয়ে আসে।

তা করতেও তারা যখন অসমর্থ হল, তখন বলা হল ঃ

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ -

তা হলে অন্তত ঃ অনুরূপ একটি কথাই তারা নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

এরপর তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হল ক্ষুদ্রতম এক সূরা রচনা করে নিয়ে আসার জন্য। তা করতেও যখন তারা অক্ষম হয়ে গেল, তাদের বিরুদ্ধে দলীল দাঁড়িয়ে গেল, তখন তারা মুকাবিলা করা ত্যাগ করল। তখন যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার পথ গ্রহণ করল। আর আল্লাহও তাঁর নবীকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদেশ দিলেন। 'তোমাদের সঙ্গী-সাক্ষীদের ডাক—আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ্‌র এ কথায় তাদের দেবদেবীর কথাই বুঝিয়েছেন, যাদের তারা পূজা উপাসনা করত আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। কেননা তারা মনে করত, এরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফা'আত করবে। কারো কারো মতে এ চ্যালেঞ্জ হয়েছে যারা তোমাদের সত্য মনে করে ও তোমাদের কথার আনুকূল্য করে তাদের সকলের প্রতি। আর এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদের সকলেরই অক্ষমতা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবেও। ......এভাবে সূরা ফাতিহা থেকে এ পর্যন্তকার কালেমা একটা সংবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে আল্লাহ্‌র নাম করে শুরু করা ও তাঁর প্রতি হাম্‌দ-সানা করা এবং তাঁর নিকট দো'আ করার শিক্ষা রয়েছে। তাঁর পরিচিতি লাভের পথের সন্ধান লাভের জন্যে তাঁর প্রতি আকুল আগ্রহী হওয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে বলা হয়েছে। সেসব পথ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে যার পথিকরা আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। যারা তাঁর পরিচিতি লাভ করতে না পেরে গুমরাহ হয়ে গেছে, তাদের থেকেও পানাহ্ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাঁর দেয়া নিয়ামতের শোকর আদায় করতে বলা হয়েছে। এরপরই সূরা আল-বাকারার শুরু। শুরুতেই মুমিনদের উল্লেখ এবং তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর কাফিরদের পরিচতি দেয়া হয়েছে। এরই পর বলা হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কিত কথা, তাদের কার্যকলাপের ও চরিত্রের বর্ণনা। আমাদের সম্মুখে তাদের চরিত্রকে স্পষ্ট ও প্রকট করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি রূপক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যেন আগুন জ্বালালো। বিদ্যুৎ চমকের উদাহরণও দেয়া হয়েছে, যা নিমেষের জন্যে অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে তোলে। কিন্তু তা স্থিতি পায় না। ফলে জনগণ আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য হয়। কোথাও কিছুই দেখতে পায় না। এসবের উল্লেখের পর তওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা শুরু হয়েছে। এসব প্রমাণ অকাট্য, অনস্বীকার্য। যেমন পৃথিবীকে

বিস্তীর্ণকরণ, তাকে নিষ্কম্প বানানো, পৃথিবী থেকে মানুষের নানাবিধ ফায়দা বা কল্যাণ লাভ, তা থেকেই তাদের জীবন-জীবিকা অর্জন ও জীবনের অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া, কোনরূপ শংকা বা ভয়-ভীতি ছাড়াই তার উপর অবস্থান গ্রহণ প্রভৃতিই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এই পৃথিবী যখন একটি নতুন সৃষ্টি, তখন এর চূড়ান্ত সমাপ্তি অনিবার্য। এর ধারক, চালক ও স্থিতিস্থাপক এক সত্তা অবশ্যই আছেন। তিনি আল্লাহ্‌, তিনিই এর সৃষ্টিকর্তা, সব মানুষের সৃষ্টিকর্তাও তিনি। তিনিই তোমাদের নিয়ামত দেন, খোরাক-পোশাক দেন। ফল ও ফসল যা-ই হয়, তা তোমাদের জন্যেই তিনি উৎপাদন করেন। এই সব কাজ কেবল সেই মহা শক্তিমান সত্তাই করতে পারেন, যাঁকে কেউই অক্ষম করতে পারে না, যাঁর সমতুল্য কেউ নেই, কিছু নেই। এসব দলীল-প্রমাণ পেশ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এরপর নবী করীম (স)-এর নবুয়ত প্রমাণ করা হয়েছে। স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা কুরআনের ন্যায় কোন কালাম কখনই রচনা করতে পারে না। এসব বলার পর সকল লোককে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অতএব তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাউকেই স্বীকৃতি দেবে না। কেননা তোমরা তো জান (যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হতে পারে না)।

অর্থাৎ তোমরা তো জান যে, যাদেরকে তোমরা 'ইলাহ্‌,' বা মাবুদ বানিয়েছ, তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন তোমাদের প্রতি নিয়ামতদাতা, ওরা নয়। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, ওরা নয়।

'তোমরা জানো' কথাটির আর একটি অর্থ বলা হয়েছে ঃ কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা তো তোমরা জান। তার অর্থ, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তদ্দ্বারা তোমরা এই কথা অনুধাবন করতে পার। এ কারণেই তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা অনুধাবন শক্তি না দিয়ে মূর্খ রেখে অনুধাবনের দায়িত্ব দেয়া বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত।

দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ সব কথা যখন লোকদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল, তখন ভয়ের বাণী উচ্চারণ করা হল। বলা হল ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

তোমরা যখন পারলে না, আর তা কখনই পারবে না, সে তো জানা কথা। অতএব

তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর। এই জাহান্নাম তো কাফিরদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

এরপর মুমিনদের জন্যে পরকালীন সুখ ভোগের ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ -

সেই লোকদের সুসংবাদ দাও, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে যে, তোমাদের জন্যে পরকালে জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝরনা ধারাসমূহ সদা প্রবহমান।

আবূ বকর বলেছেন ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহ তওহীদের দলীল হওয়ার ও নবুয়তের সত্যতার দলীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও বহন করে এনেছে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধিসঞ্জাত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে হবে। আল্লাহ্‌র দেয়া দলীলসমূহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে যারা নিষেধ করে, উক্ত কথা তাদের মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। তারা মনে করে, শুধু শুনা খবরই আল্লাহ্‌কে চেনা ও রাসূলকে সত্য বলে জানার জন্যে যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ্ তার একত্ব ও রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে শুধু সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি বিবেক-বুদ্ধি সম্মত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপিত করেছেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, সুসংবাদ মানে আনন্দ উদ্রেককারী সংবাদ। আনন্দ ও সুখ বাহক সংবাদই সাধারণত ও বেশির ভাগ সুসংবাদ হয়ে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও অন্য অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়, হয় শর্তাধীন হয়ে। যেমন ঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

এ কথার একটি দৃষ্টান্ত এই—কেউ যদি বলে যে, যে দাস অমুক কন্যার সন্তান প্রসবের সুসংবাদ দেবে সে মুক্ত হবে। অতঃপর একজনের পর একজন করে বহু সংখ্যক দাস উক্ত সুসংবাদ দেয়, তাহলে হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মতে কেবলমাত্র প্রথম জনই মুক্তি পাবে, সে ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পাবে না, যদিও একই সুসংবাদ বহু কয়জন দাস দিয়েছে। কেননা সুসংবাদ কেবল সেই দিয়েছে, অন্যরা নয়। তাঁদের মতে কথাটি এরূপ নয়, যে যে দাস অমুকের সন্তান প্রসবের খবর দেবে সে মুক্ত। পরে একজনের পর একজন এই খবর দিল, তাতে সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা এ কথাটি শর্তহীন একটি খবরের উপর عقد يمين কিরা চুক্তি পর্যায়ের। এতে সকল সংবাদদাতা শামিল

হবে। কিন্তু সুসংবাদ হচ্ছে এক বিশেষ গুণবচক খবর। যা ব্যক্তিকে আনন্দ ও সুখ দেবে, কেবল তা-ই 'সুসংবাদ' নামে অভিহিত হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়—সুসংবাদের ফলশ্রুতিতে শ্রোতার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডলের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ – ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ – (عبس : ٣٨-٣٩)

সেই দিন কিছু কিছু মুখমণ্ডল ঝকঝক করতে থাকবে, হাসিখুশি ভরা ও সন্তুষ্ট স্বচ্ছন্দ হবে।

তাদের চেহারায় আনন্দ ও সুখের যে আলামতসমূহ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আয়াতে তারই খবর দেয়া হয়েছে।

সুসংবাদ দাতাকে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَبَشِيْرًا। খারাজ নয়; ভালো খবর দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে। আর সুসংবাদদাতার দেয়া খবরকে বলা হয়েছে بُشْرَى—তাতে বোঝা যায়, এই ব্যবহার সন্তুষ্টি ও সুখ উদ্রেককারী খবরই এর মধ্যে গণ্য। আর খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা থেকে সংবাদই মুখ্য। 'ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও' আল্লাহ্‌র এ কথাটির অর্থ 'ওদেরকে আযাবের খবর জানিয়ে দাও'। পূর্বে রূপক দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, প্রথম সুসংবাদদাতাই মূলত 'বশীর' বা সুসংবাদদাতা রূপে গণ্য। এ ব্যাপারে সুসংবাদাদি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে—আরবদের এরূপ কথার অর্থ সেই প্রথম সুসংবাদদাতা। সেটি তারা খারাপ অর্থে ব্যবহার করে না। যা মানুষকে চিন্তা ভারাক্রান্ত করে, তাতেও নয়।

শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিমূলক সংবাদের ক্ষেত্রেই তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে। কিছু লোক মনে করেন, মূলত শব্দটির ব্যবহার সুখের বা দুঃখের উভয় প্রকার সংবাদেই ব্যবহৃত হয়। কেননা শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, সুখের বা দুঃখের সংবাদ পাওয়ার পর শ্রোতার মুখমণ্ডলে যে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায়, তা। তবে তার অধিক ব্যবহার সুখদায়ক সংবাদে। এই ব্যবহার হচ্ছে শব্দটির বিশেষ ব্যবহার। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ –

এবং আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত (জিনিসের) নাম শিক্ষা দিলেন। পরে সেগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে তোমরা এই জিনিসগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও।

'আল্লাহ্ সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন' অর্থ সমস্ত জিনিসের নাম। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। 'পরে সেগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন' বলে সেই জিনিসসমূহের অধস্তন বুঝিয়েছেন। হাদীসের বর্ণনায় তা-ই বলা হয়েছে। রুবাই ইবনে আনাস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ আদমকে সমস্ত

জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ-ও তা-ই বোঝায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো বিবেকবান জাতীয়। কেননা هُمْ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না। এর জবাবে বলা যায়, মূলত বিবেকবান ও বিবেক-বুদ্ধিহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। আরবী নিয়মে একে تَغْلِيْب 'একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দান' বলা হয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ - (النور - ٤٥)

আল্লাহ্ সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে।

এতে বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয় শ্রেণীর সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকেই বিবেকবান পর্যায়ের ধরা হয়েছে।

আদম ও আদম বংশের ভাষা

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, সমস্ত ভাষার মৌল নীতিসমূহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত (تَوْقِيْف) আদম (আ)-এর জন্যে, যদিও তা বিভিন্ন। তিনিই তার অর্থ ও তাৎপর্য সহ আদমকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা শুধু নামের কোন গুরুত্ব নেই, তার অর্থ জানা না থাকলে। এ থেকে জ্ঞান ও শিক্ষার মর্যাদাও প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ আদমকে ফেরেশতাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান প্রমাণ করার লক্ষ্যেই তাকে সর্বাগ্রে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সবের যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য সহ। ফেরেশতাদেরও সে বিষয়ে অবহিত করেছেন। কিন্তু তারা তা থেকে সে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি, যা আদাম লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তারা আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিক মর্যাদা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

অনেকের মতে আদম ও তাঁর সন্তানদের ভাষা নূহের তুফান পর্যন্ত এক ও অভিন্ন ছিল। আল্লাহ যখন সমস্ত বিশ্ববাসীকে তুফানে ডুবালেন, কেবল নূহের সঙ্গী-সাথীরাই বেঁচে থাকল, পরে নূহ (আ)-ও চলে গেলেন, তাঁর সেই সঙ্গী-সাথীরা বংশ বিস্তার করল, সংখ্যায় তারা বিপুল হয়ে গেল, তখন তারা ব্যাবিলনে একটি বাঁধ নির্মাণ করতে চাইল তুফান-বন্যা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সময় আল্লাহ্ তাদের ভাষা পরস্পর সংমিশ্রিত করে সংশয়পূর্ণ করে দিলেন। ফলে তাদের প্রত্যেক জনগোষ্ঠি তার নিজের ভাষা ভুলে গেল। পরে আল্লাহ নতুন করে তাদেরকে শিক্ষা দিলেন সেই সেই ভাষা, যা নিয়ে

এক-একটি গোষ্ঠি সম্মুখে চলতে লাগল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নতুন করে বসতি স্থাপন করে নিজেদের ভাষার ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন করতে লাগল। অবশ্য অপর কিছু লোক এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব মেনে নেননি। তাঁরা বলেন—বিবেক সমস্ত মানুষ গতকাল পর্যন্ত যে ভাষায় কথাবার্তা বলেছে, তা সমস্তই তারা একদিনের ব্যবধানে ভুলে যাবে, তা বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসম্মত কথা নয়, মূলত তারা সব ভাষাই জানতো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত। পরবর্তীতে তারা যখন আলাদা হয়ে গেল ও এক গোষ্ঠি থেকে অনেক দূরে অন্য গোষ্ঠির বসতি গড়ে উঠল, তখন তারা নিজ ভাষা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল যে ভাষায় বর্তমানে তারা কথা বলছে, আর অন্যান্য ভাষার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে গেল। অথচ সেসব ভাষা তাদের অজানা বা অপরিচিত ছিল না, তাদের বংশধররা সেই সব ভাষার উত্তরাধিকার পায়নি বলে সমস্ত ভাষার সাথে সব আদম সন্তান সমভাবে অবহিত থাকেনি।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا –

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম ঃ তোমরা আদমের জন্যে সিজদা কর। পরে তারা সকলেই সিজদা করল।

শুবা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, এই নির্দেশ পালনটা ছিল আল্লাহ্র জন্যে, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার মাধ্যমে তা পালিত হয়েছে। এই করিয়ে আল্লাহ্ আদকে সম্মানিত করেছেন।

মামর কাতাদাহ থেকে وَخَرُّوْا لَه سُجَّدًا 'তারা সকলে আদমের উদ্দেশে সিজদায় পড়ে গেল' আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্মান প্রদর্শনের কাজটি এই সিজদা দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। এ সিজদাটা আল্লাহ্র ইবাদত হওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও তা ছিল আদমের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা। হযরত ইউসূফ (আ)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ ইউসূফের প্রতি যে সিজদা করেছিল, তা-ও এ পর্যায়েরই কাজ ছিল। কেননা ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে জায়েয নয়, কিন্তু সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন জায়েয, যে তা পাওয়ার যোগ্য তার জন্যে এক ধরনের তাজীম হিসেবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সিজদা তো আল্লাহ্র জন্যেই করা হয়েছিল, আদম ছিলেন তাদের জন্যে কিবলাস্বরূপ। কিন্তু এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাহলে তাতে আদমের প্রতি মর্যাদা প্রদানের কোন ব্যাপার ছিল, তা প্রমাণিত হয় না। অথচ এখানে আদমের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেমন যে লোক হাম্দ পাওয়ার যোগ্য অধিকারী, তার জন্যে হাম্দ করা। তা তো প্রকৃত ব্যাপার, তা পরোক্ষ ব্যাপার বলার কোন উপায় নেই। যেমন, যদি বলা হয়, অমুকের চরিত্র প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। এরূপ বলা যায়, কেননা 'শব্দ' তো তার পর্যায়ে প্রকৃতই হবে।

উক্ত আয়াত থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, সিজদা করার আদেশ করে আল্লাহ্ আদমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই চেয়েছিলেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল লক্ষ্য। ইবলীস তো সেই কারণেই বলেছিল ঃ

ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا- قَالَ أَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ -

(الاسرا : ٦١-٦٢)

আমি কি সিজদা করব তাকে, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ ? তুমি কি লক্ষ্য করনি, এতে করে তুমি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবে ?

এই কথা বলে ইবলীস জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকছে, তার কারণ হচ্ছে—আদমকে সিজদা করার জন্যে আল্লাহ্‌র এই আদেশ দ্বারা আদমকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে। আদমকে কিবলার স্থানে দাঁড় করে সিজদাকারীদেরকে সিজদা করার আদেশ করা হলে তাতে আদমের কোন সম্মান বা মর্যাদার ব্যাপার হতো না। তাতে তো আদমের কোন ব্যাপার থাকত না, মর্যাদা দানের ব্যাপারও হতো না, যাতে করে ইবলীসের হিংসা হওয়ার কারণ হতো। যেমন কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার প্রতি মুখ করেই তো নামায পড়া ও সিজদা দেয়া হয়। তাতে কাবার কোন মর্যাদা হয় না।

এ-ও বলা হয়েছে যে, আদমের শরীয়াতে সৃষ্টির জন্যে সিজদা করা জায়েয ছিল। সম্ভবত সেই শরীয়াতী বিধান হযরত ইউসূফ (আ) পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[১] ফলে তাদের মধ্যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যে সাধারণভাবেই সিজদা করা হতো। তার প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনই হতো তার উদ্দেশ্য। যেমন 'মুসাফিহা' (করমর্দন) মুয়ানিকা গলায়-গলায় মেলানো। অথবা তা ছিল হস্ত চুম্বন পর্যায়ের কাজ। হস্ত চুম্বন জায়েয হওয়া সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও তা অপছন্দ করার বর্ণনাও আছে। তবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে সিজদা করা মনসূখ হয়ে গেছে হাদীস দ্বারা। হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) জাবির (রা) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَايَنْبَغِيْ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ الْاَمَرْتِ الْمَرْأَةُ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا -

কোন ব্যক্তির উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা। এক ব্যক্তির তারই মত অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর তো অনেক বড় অধিকার রয়েছে।

---

১. কিন্তু আদমকে সিজদা করার এই ব্যাপারটি ছিল তাঁকে সৃষ্টি করার পরই। তখন কি আদমের কোন শরীয়াত ছিল ? শরীয়তের প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর দুনিয়ার জীবন শুরু করার পর। তার পূর্বে কোন শরীয়াত থাকার কথা নয়।—অনুবাদক

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَاٰمِنُوْ بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ –

এবং তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি সেই কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী হিসেবে, যা তোমাদের নিকট রয়েছে এবং তোমরাই তার প্রথম অস্বীকারকারী হবে না।

'কুফর' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থায় অত্যন্ত বীভৎস। সব মানুষকেই তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে যারা কুফরী করে, পরবর্তী লোকেরা তারই অনুসরণ করে। এ কারণে প্রথম কুফরকারীর অপরাধ সর্বাধিক বিরাট। অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ – (العنكبوت -١٣)

এবং তারা অবশ্যই তাদের বোঝাসমূহ বহন করবে, বহন করবে তাদের বোঝার সাথে আরও অনেক বোঝা।

বলেছেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِىْ الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا – (المائده :٣٢)

এ কারণেই আমরা বনি ইসরাঈলীদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে লোক অন্য লোককে কোন মানুষ হত্যা বা বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ছাড়া হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করেছে।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ الْقَاتِلَ كِفْلاً مِنَ الْاِثْمِ فِىْ كُلِّ قَتِيْلٍ ظُلْمًا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ –

অন্যায়-অকারণে যে হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হবে, তার গুনাহের একটা অংশ আদমের হত্যাকারী পুত্রের ভাগেও থাকবে। কেননা নরহত্যার প্রচলনকারী সে-ই প্রথম ব্যক্তি।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ أَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

যে লোক কোন ভালো কাজের প্রচলন করে সে তার শুভ প্রতিফল পাবে তার নিজের কাজের, তার কাজের ও যে তা করবে—কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে খারাপ কাজের প্রচলনের কথা।

নামাযের রুকূ

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ কর।

এর অর্থ প্রচলিত নামায ও যাকাত হতে পারে, যা সকলেই জানে। কিংবা হতে পারে মোটামুটি সব নামায, সব দান-খয়রাত। তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তবে এক্ষণে আমরা জানতে পেরেছি, এই আদেশ ফরয নামায ও ফরয যাকাত পর্যায়ের সব কিছুর জন্যে। আদেশ জারি হওয়ার সময়ের সব লোকই তা বুঝেছিলেন। সম্বোধন থেকে তা আরও জোরদার হয়েছে। অথবা তা ছিল মোটামুটি ধরনের কথা। পরে তার ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে। ফলে সকলেরই জানা হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ্র কথা وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ 'রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর' কথাটি থেকে নামাযে রুকূ করা ফরয প্রমাণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে বিশেষভাবে রুকূর কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, আহলি কিতাব লোকদের নামাযে রুকূ ছিল না। তাই এখানে দৃঢ়তার সাথে রুকূ করতে বলা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, রুকূ করার আদেশ দিয়ে মূল নামাযেরই হুকুম দেয়া হয়েছে, যেমন 'কুরআন থেকে যা পাঠ করা সহজ তাই পড়' বলে এবং 'ফজরের কুরআন, ফজরের কুরআনে ফেরেশতা উপস্থিত হয়' বলে মূল নামাযই বোঝানো হয়েছে। এই শেষোক্ত কথাটি ফজরের নামায বুঝিয়েছে। এতে করে দুধরনের ফায়দা পাওয়া গেল। একটি রুকূ—ফরয হওয়ার কথা জানা গেল। কেননা রুকূ নামাযে ফরয বলেই তা করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হল—নামাযীদের সাথে একত্রিত হয়ে অর্থাৎ জামা'আতে নামায পড়ার আদেশ। প্রশ্ন হতে পারে—আয়াতের শুরুতেই তো নামায কায়েম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তারপরে রুকূর আদেশ দিয়ে আবার সেই নামাযের কথাই বলা হবে—তা বাঞ্ছনীয় নয়। এর জবাব হচ্ছে, এরূপ বলা অসঙ্গত নয়। কেননা শুরুতে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, তা হল বিধিবদ্ধ নামায। এ হচ্ছে রুকূ সহ যাবতীয় ফরয আদায় সহকারে নামায। তাছাড়া আহলি কিতাবের নামায যেহেতু রুকূ বিহীন প্রথমোক্ত নামায কায়েমের হুকুমে সেই নামায বুঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শেষ কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আহলি কিতাবের নামায পড়তে বলা হয়নি, বলা হয়েছে সেই নামায পড়তে, যাতে রুকূ দিতে হয়।

সবর ও নামায

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةَ -

তোমরা সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য চাও।

এর অর্থ, আল্লাহ যা যা ফরয করেছেন, সেই সব ফরয অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আদায় করতে থাক। আর তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে বিরত থাক। ফরয নামায কার্যত আদায় কর।

সাঈদ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এই সবর ও নামায—দুটিই আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যকরণে বিশেষ সহায়ক। আল্লাহ্‌র নাফরমানী পরিহার এবং তাঁর ফরযসমূহ আদায় করায় নামায কাজটি বিশেষ আনুকূল্য ও মাধুর্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - (العنكبوت : ٤٥)

নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এ-ও হতে পারে যে, এই সবর ও নামায বলতে নফল নামায বুঝিয়েছেন। ফরয নামায নয়। তা হচ্ছে, নফল রোযা ও নফল নামায। কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, ফরয নামাযই বুঝিয়েছেন। কেননা যে-বিষয়ে আদেশ হয়েছে, সেই কাজটাই ফরয। সেদিক থেকে ফিরে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কেবল তখনই সম্ভব, যদি তার দলীল পাওয়া যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ ঃ 'এবং তা নিঃসন্দেহে বড় কাজ'।

পূর্বে দুটি জিনিস থাকা সত্ত্বেও এখানে শুধু নামাযের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় এরূপ হতে পারে। যেমন কুরআনের এই কথাটিতে রয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ - (التوبه : ٦٢)

আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশী অধিকারসম্পন্ন যে লোকেরা তাঁকেই রাজী করবে।

বলেছেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْتِجَارَةً اَوْلَهْوَ نِا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا - (اجمعة - ١١)

এবং লোকেরা যখন ব্যবসা কিংবা খেল-তামাশার ব্যাপার দেখল, তখন তারা সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এ কয়টি আয়াতে দুটি জিনিসের উল্লেখের পর ইঙ্গিত করা হয়েছে একটি জিনিসের দিকেই অর্থাৎ দ্বিবচনের পরিবর্তে একবচনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ -

জালিমদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তারা সেই কথাটিকে বদলে দিয়েছে।

যিক্‌র ও কথাবার্তা, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে তা পরিবর্তন করা ও তদস্থলে অন্য কিছু বসানো জায়েয নয়। কেননা তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত। উপরোক্ত আয়াতকে এই কথার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে, আমাদের বিপরীত মতের লোকেরাও আমাদের মতের বিরুদ্ধে এই আয়তটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে।

কেননা আমরা তো তাজীম ও তাসবীহ্ শব্দ বলেও (অর্থাৎ আল্লাহু আযম, সুবহান-আল্লাহ্ বলে,) নামাযের তাহ্‌রীমা বাঁধা জায়েয মনে করি, ফারসী ভাষায় কুরআন পাঠও জায়েয ইমাম আবূ হানীফার মতে।[১] মালিক বানিয়ে দেয়া বা এই ধরনের শব্দ বললেও হেবা বা বিক্রয় জায়েয বলে আমাদের মত। এতে তো মূল ব্যবহার্য শব্দটি ও ভাষা বদলে দেয়া হয়। অথচ উপরোদ্ধৃত আয়াতে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমরা বলব—না, এই প্রশ্ন আমাদের উপর আসে না। কেননা উক্ত আয়াতের কথা হল—যেসব লোকের জন্যে কথাটি বলা হয়েছিল, সেই মূল কথাটিকেই তারা বদলের দিয়েছিল, সেই মূল কথাটিকেই তারা বদলে দিয়েছিল, ভিন্ন কথা বলে দিয়েছিল। আমরা সেরূপ করিনি।

আল্লাহ্ কথা ঃ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ 'তোমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ কর সিজদাকারী (বিনীত-অবনত) হয়ে এবং বল ক্ষমা...ক্ষমা।' অর্থাৎ আমাদের অপরাধ আমাদের থেকে দূর করে দাও। হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন ঃ 'তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাইতে বলা হয়েছিল।'

তাঁর এই কথাটিও বর্ণিত হয়েছে, তাদের এই কথা বলার আদেশ করা হয়েছিল যে, এই কথাটি সত্য। যেমন তোমাদের বলা হয়েছে। ইকরামা বলেছেন ঃ তাদেরকে 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বলেছিল, লাল লাল গম, যব ঠাট্টাচ্ছলে বা ভুলে যাওয়ার দরুন। ইবনে আব্বাস সহ কয়েকজন সাহাবী ও হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওদেরকে যে শব্দ বলার আদেশ করা হয়েছিল সেখানে বিপরীত অর্থের শব্দ তারা বলেছিল। এই বদল করার দরুন তাদের নিন্দা করা হয়েছে এ আয়াতে। কেননা তাদেরকে তওবা করার ও মাগফিরাত চাওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তার বিপরীতটা করার উপরই অবিচল হয়ে থাকল। কিন্তু যারা অর্থ ঠিক রেখে শব্দের পরিবর্তন করেছিল মাত্র, উক্ত আয়াত তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। উক্ত আয়াত তো সেই লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে যারা শব্দ ও অর্থ উভয়ই বদলে দিয়েছিল। আর এই কাজটাই ছিল তাদের নিন্দা করার মূল কারণ। অতএব যারাই এ কাজে শরীক তারা নিন্দিত হওয়ার দিক দিয়েও শরীক। যেমন কাজ, তেমনই তার ফল। কিন্তু যারা শব্দের পরিবর্তন করেও মূল অর্থ বহাল রেখেছে, আয়াতটি তাদেরকে আওতার মধ্যে নেয়নি।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেসব লোক, যারা 'মুত'আ' বিয়ে জায়েয বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ -

তাদের স্ত্রীগণ, কিংবা তাদের দাসীগণ ছাড়া ....

---

১. কিন্তু মশহূর কথা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা পরবর্তীতে এটা প্রত্যাহার করেছেন—অনুবাদক

অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে কেবল স্ত্রীদের সাথে এবং দাসীদের সাথে। যারা المتعة। শব্দের সুযোগে তাকে মুবাহ মনে করে, অথচ نكاح 'বিবাহ' ও 'দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত অর্থাৎ দাসী এই কথা দুটি শব্দ ও অর্থ—উভয় দিক দিয়েই 'মুত্‘আ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। উক্ত আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন করাকে নিন্দনীয় কাজ বলা হয়েছে।

গাভী যবেহ্ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا –

আল্লাহ্ তোমাদেরকে গাভী যবেহ্ করার আদেশ করছেন। তারা বলত ঃ তুমি কি আমাদেরকে বিদ্রূপ করছ ?

এ পর্যায়ের শেষ আয়াত হচ্ছে ঃ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا – وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ – فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ......

এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, তখন তোমরা হত্যাকারীর সন্ধানে আন্দাজ অনুমানে লিপ্ত হয়েছিলে। কিন্তু তোমরা যা গোপন করতে চেয়েছিলে আল্লাহ তা প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন। তখন আমরা বললাম, তোমরা ওটির কিছু অংশ দিয়ে অপর অংশের উপর আঘাত দাও।

আবূ বকর বলেছেন, এসব আয়াতে এবং নিহত ব্যক্তির কাহিনী ও গাভী যবেহ করা পর্যায়ে আর যা কিছু বলা হয়েছে, তা কয়েক ধরনের আইন সম্পন্ন এবং মহান তাৎপর্যের প্রমাণ। প্রথমত, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে' তিলাওয়াতের দিক দিয়ে শেষে উল্লিখিত হলেও তাৎপর্যগতভাবে সবকিছুর আগে উল্লেখ্য। গাভী সংক্রান্ত কথার এটাই সূচনা। কেননা গাভী যাবেহ্ করার আদেশ তো এই নরহত্যার ঘটনার কারণেই দেয়া হয়েছিল। এর আরও দুই দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হত্যার উল্লেখ তিলাওয়াতের দিক দিয়ে পেছনে হলেও নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে তা অগ্রবর্তী। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—তা নাযিল হওয়ার বিন্যাস তিলাওয়াতের বিন্যাস অনুরূপই, যদিও তাৎপর্যগতভাবে তা অগ্রবর্তী। কেননা واو অক্ষরটি পরম্পরা বা বিন্যাস বোঝায় না। যেমন যদি কেউ বলে স্মরণ কর, আমি তখন যায়দকে এক হাজার দিলাম যখন সে আমার ঘর নির্মাণ করেছিল। এতে মূলত ঘর নির্মাণের কাজটি অর্থ দেয়ার পূর্বে সঙ্ঘটিত হয়েছে। গাভীর উল্লেখ আগে নাযিল হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে ঃ আমরা বললাম ওর কতকাংশ দিয়ে ওটিকে আঘাত দাও ...... আল্লাহ্র এই কথাটি। এ থেকে বোঝা গেল, গাভীর উল্লেখ এর পূর্বে হয়েছে। এই দিকেই সর্বনাম ইঙ্গিত করছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে নূহ (আ) সম্পর্কে বন্যার উল্লেখ ও তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথার পর বলা আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ط وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ - (هود : ٤٠)

আমরা বললাম ঃ নৌকায় বোঝাই দাও প্রত্যেকটি জিনিসের দুই জোড়া করে এবং পরিবারবর্গকে। তবে যার সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তাকে ছাড়া। আর তাতে আরোহী বানাও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তবে তাঁর প্রতি খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছে।

একথা জানা-ই আছে যে, বন্যায় লোকদের ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এই কথা বলা হয়েছিল। কেননা কথার অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা واو অক্ষর দ্বারা বলা হলেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাওয়া জরুরী নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً -

আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ কর।

এ থেকে বোঝা গেল, অজ্ঞাত-অপরিচিত ও অনির্দিষ্ট যে-কোন একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দেয়া বৈধ কাজ। তাতে আদিষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যে কোন একটা গাভী যবেহ করলেই আদেশ পালন হয়ে যায়। এখানে দুই পর্যায়ের কথা রয়েছে। এ পর্যায়—কথাটি সাধারণ আর দ্বিতীয় পর্যায়, কথাটি অনির্দিষ্ট, প্রত্যেক মতের সমর্থনে দলীল পেশ করা হয়েছে। যাদের মতে কথাটি সাধারণ ও অনির্দিষ্ট, তাদের দলীল হচ্ছে, কথাটি তো নিঃশর্ত এসেছে। ফলে এ এক বাধ্যতামূলক আদেশ, তা একক সমূহের প্রত্যেকের জন্যেই পালন করা বাধ্যতামূলক। ওরা যখন বারবার আল্লাহ্‌র নবীর নিকট এসে গাভী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, তখন আল্লাহও তাদের প্রতি আদেশটি কড়া ও কঠোর করে তুললেন। বারবার নবীকে প্রশ্ন করার জন্যে আল্লাহ ওদের নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ -

শেষ পর্যন্ত ওরা গাভী যবেহ করল, যদিও ওরা তা করতে পারছিল না।

হাসান বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

والذى نفسُ محمدٍ بيدهِ لواعترضُوادنى بَقَرةٍ فَذَبَحُوها لَاَجْزَت عَنْهُمْ ولكنّهم شدّدوا فَشَدّد الله عليهم -

যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ওরা যদি যে কোন একটি গাভী ধরে এনে যবেহ করে দিত, তা হলে তা-ই ওদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ওরা কঠোরতা করেছে, আল্লাহ্‌ও ওদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করেছেন।

এরূপ একটি বর্ণনা ইবনে আব্বাস, উবায়দা, আবুল আলীয়া, হাসান ও মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে।

যারা এটাকে সাধারণ আদেশ মনে করেন না, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে বলেছেন, বারবার নবীকে প্রশ্ন করার শুরুতে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করেন নি। তোমরা যেমন বলছ, প্রথম আদেশ কার্যকর করাই যদি তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হতো তা হলে প্রশ্ন করার শুরুতেই অস্বীকৃতি ও অসম্মতি প্রকাশ পেতো।

কিন্তু এদের এই কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের প্রতি তো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছেই। প্রথমত, তাদের কাজটিকে ক্রমশ শক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ-ও এক ধরনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ - (النساء : ١٦٠)

ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকদের জুলুমের কারণে আমরা তাদের প্রতি হারাম করেছিলাম সেসব পাক-পবিত্র খাদ্য যা তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ওরা করতে চায়নি ....'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুরুতে ওরা আদেশ পালন এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কেননা ওদের তো কর্তব্য ছিল আদেশ পাওয়া মাত্রই দ্রুত ও অবিলম্বে গাভী যবেহ কাজে চলে যাওয়া। এ কারণে আয়াতটি থকে কতিপয় তাৎপর্য পাওয়া গেছে।

একটি, শব্দের সাধারণত্ব গণ্য করাই কর্তব্য, যখন তা করা সম্ভব। দ্বিতীয়—আদেশটি ছিল তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয়। আর আদিষ্টের কর্তব্য ছিল সাধ্যানুযায়ী অবিলম্বে তা পালন করা, যতক্ষণে বিলম্ব করা বৈধ হওয়ার দলীল পাওয়া না যায়। তৃতীয় —গুণ-পরিচিতির অনুপস্থিতি সহকারে কোন কাজের আদেশ করা অসঙ্গত নয়। তবে উল্লেখ করা নামের কাজটি না পাওয়া পর্যন্ত তা পালনে বিলম্ব করা আদিষ্টের পক্ষে অসঙ্গত নয়। চতুর্থ—আদেশ পালন অবশ্য কর্তব্য। তাকে অবশ্য কর্তব্য মনে না করার দলীল পাওয়া গেলে অন্য কথা। কেননা আলোচ্য শর্তহীন আদেশ এড়িয়ে গেলে তবেই তা নিন্দনীয় হতে পারে, কোনরূপ ভর্ৎসনার উল্লেখ ব্যতিরেকে। আর পঞ্চম —আদেশ পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজটি করার পূর্বে তা নাকচ করা অসঙ্গত নয়। কেননা গাভীর গুণ বর্ণনায় একটির পর একটির উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বের গুণটি নাকচ করে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ্ কর।

যে-কোন একটি গাভী যবেহ করারই দাবি করছিল। তারা যে-কোন ধরনের গাভী যবেহ্ করলেই আদেশ পালন হয়ে যেতো, আর তা করতে তারা সক্ষম ছিল। কিন্তু তারা যখন বলল ঃ

اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ -

আমাদের জন্যে তোমার রব্বকে বল, গাভীটি কি রকম তা তিনি বলে দেবেন।

তখন আল্লাহ্র বললেন ঃ

اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَّلَابِكْرٌ- عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْامَا تُؤْمَرُوْنَ.

গাভীটি বেশী বয়স্ক নয়, আর এমন যে, এখনও বাচ্চা দেয়নি, বরং এ দুয়ের মাঝে মধ্যম বয়সের। অতএব তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই কর।

গাভী যবেহ করা সংক্রান্ত প্রথম আদেশে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা ছিল, এ কথা দ্বারা তা নাকচ হয়ে গেল। কেননা এ আদেশে গাভীর ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি গুণের শর্ত আরোপিত হয়েছে, যা প্রথম আদেশে ছিল না। এখন তো বর্ণিত গুণের গাভী যবেহ করতে তারা বাধ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ

তোমাদেরকে যে ধরনের গাভী যবেহ করতে বলা হয়েছে, তোমরা তাই কর। তার বর্ণ বা অবস্থা যা-ই হোক না কেন। তা চাষ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকুক আর না-ই থাকুক।

কিন্তু লোকেরা বললো ঃ

اُدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا -

হে নবী, আপনি আমাদের জন্যে আপনার রব্ব-এর নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে গাভীর বর্ণনাটা কি, তা বলে দেন।

পূর্ববর্তী আদেশ পর্যন্ত বর্ণের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ছিল, যে কোন বর্ণের গাভী যবেহ করলেই আদেশ পালন হয়ে যেতো, তা এই কথায় নাকচ হয়ে গেল। অবশ্য এখনও অন্য দিকগুলোতে স্বাধীনতা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তা-ও নাকচ করবার জন্যে তারা যখন আবার এলো, বর্ণিত গুণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হল, তখন তা করাই ফরয হয়ে দাঁড়াল দৃঢ়ভাবে। এতে কষ্ট বেড়ে গেল, দায়িত্ব কঠিন হয়ে গেল। মনসূখ বা নাকচ হওয়া পর্যায়ে এই যা কিছু আমরা বলছি, এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন হুকুম চূড়ান্তভাবে স্থির হওয়ার পর মূল হুকুমে কিছু অতিরিক্ত কথা এলে পূর্ববর্তী কথা নাকচ হয়ে যায়। আর লোকদের বারবার ফিরে এসে নতুন করে গাভীর পরিচিত জিজ্ঞাসা করায় সেই বারবারই পরবর্তী কথার উপর বাড়তি কথা বলা হয়েছে। ফলে পূর্ববর্তী কথা মনসূখ হয়ে যায় এবং পরবর্তী কথা চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে কিছু লোক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোন ফরয আদায় করার নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বেই তো মনসূখ করা জায়েয। কেননা একথা জানা ছিল যে, লোকদের উপর শুরুতে একটি নির্দিষ্ট গাভী যবেহ করাই ফরয ছিল। কিন্তু তা কার্যত করার পূর্বেই তা মনসূখ হয়ে যায়।

কিন্তু এই যুক্তি প্রদান ভুল। কেননা উল্লিখিত প্রত্যেকটি হুকুম পালন আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সম্ভাব্য অবস্থায় সেটাই তাদের উপর দৃঢ় স্থিত

ফরয ছিল। কিন্তু কাজ করার পূর্বেই তা মনসূখ করা হয়। ফলে সেটি দলীল হিসেবে ধরা যায় না এবং বলা যায় না যে, কাজটি করার সময় আসার পূর্বে তা মনসূখ করা জায়েয। ফিকাহ্‌র উসূল-এর গ্রন্থে এ পর্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ, আল্লাহ্‌র কথা ঃ বেশী বয়সের নয়, নয় নাবালিকা, বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী বয়সের .... এই কথা থেকে শরীয়াতের বিধানে ইজতিহাদ করা ও অগ্রবর্তী ধারণা প্রয়োগ করা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। কেননা গাভীটি বেশী বয়সের, না কম বয়সের, তা ইজতিহাদ ছাড়া অন্য কোনভাবে জানা যেতে পারে না।

সপ্তম, অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে বিপরীত হওয়া জায়েয হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক দিককে ব্যবহার করা। আল্লাহ্‌র কথা ঃ مُسَلَّمَةٌ لاشِيَةَ فِيْهَا দাগ কলংকমুক্ত, বর্ণের বিকৃতি নেই তাতে।

এই কথাটির প্রকৃত অবস্থার দিক দিয়ে আমরা জানতে পারি না। শুধু বাহ্যিকভাবেই আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি। তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সেটির মধ্যে কোন ত্রুটি কমতি হওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়।

অষ্টম, সর্বশেষে লোকেরা বলেছিল ঃ

وَاِنَّا اِنْ شَاءَاللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ –

এবারে আমরা আল্লাহ চাইলে সঠিকভাবে কাজটা করতে পারব।

এই কথায় লোকেরা সংবাদটিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে যুক্ত করেছে—'ইনশা আল্লাহ্‌' বলেছে। ফলে পরে আবার তাদের ফিরে এসে নতুন করে দো'আ করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকল না। যা করতে বলা হয়েছে, তা করতে তারা এক্ষণে সক্ষম হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এ সময় তারা যদি ইনশা আল্লাহ না বলত, তা হলে তারা কখনই সঠিকভাবে কাজটি করতে পারত না। তাদের মধ্যে মন্দ অবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও সেই পর্যায়ের وَمَاكَادُوْا يَفْعَلُوْنَ 'ওরা আসলে এ কাজটি করবার মত অবস্থায় ছিল না।' একথা বলে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সংবাদ দেয়ার সময় 'ইনশা আল্লাহ্‌' অবশ্যই বলতে হবে। তাহলে আল্লাহ্‌র মাশিয়াত' (সিদ্ধান্ত) পাওয়া যাবে। অন্য স্থানেও আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَلَاتَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا – اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ

(الكهف : ٢٣ –٢٤)

আমি আগামীকাল এই কাজ করব, এরূপ কথা তোমরা বলো না। বরং বল ঃ যদি আল্লাহ চান তাহলে .....

এরূপ বলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া হয়, কাজটির সম্পূর্ণতা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে

দেয়া হয়, তাঁর অসীম কুদরত এবং ইচ্ছার কার্যকরতা স্বীকার করা হয়। প্রকারান্তরে বলা হয় যে, কাজের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ্‌, ব্যবস্থাপক একমাত্র তিনি-ই।

নবম, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ –

বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ ? বললে ঃ আমি জাহিল লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্‌ চাই।

আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এক ধরনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত। উক্ত কথাটিতে মূসা (আ) ঠাট্টাকারী হওয়াকে অস্বীকার করে বললেন, আমি মূর্খতার মধ্যে ডুবে নেই। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, দ্বীনি ব্যাপারটি লয়ে ঠাট্টা -বিদ্রূপ করা অন্যতম কবীরা—অত্যন্ত বড় গুনাহ্‌। যদি তা না হতো, তাহলে মূসা (আ) মূর্খতার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া থেকে এভাবে পানাহ চাইতেন না।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসায়েব উল্লেখ করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আল-হাসান-আল আনবরী আল-কাযীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি পশমের একটা জুব্বা পরিহিত ছিলেন। উবায়দুল্লাহ ছিলেন খুব ঠাট্টা-মশকরা করা লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরনের জুব্বাটি ভেড়ার চামড়ার তৈরী, না ছাগলের চামড়ার ? আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি মূর্খতা দেখাবেন না, আল্লাহ্‌ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তিনি বললেন ঃ আমি মূর্খতার কারণেই হাসি-ঠাট্টা করছি। তখন আমি উক্ত আয়াত পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি এই কথা বাদ দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যার বাহ্যিক দিকে কুফরী দেখতেন, মূসা (আ) তাকে হত্যা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মূলত তিনি আদিষ্ট ছিলেন লোকদের বাহ্যিক কথা গণ্য করার জন্যে। কেননা আল্লাহ্‌র নবীকে তারা বললে ঃ 'আপনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন; এ কথাটি কুফরী। এ কথাটি ঠিক সেই কথার মতই, যেমন তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ

اِجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ – (الاعراف : ١٣٨)

আমাদের জন্যে একটি 'ইলাহ' বানাও যেমন ওদের বহু ইলাহ রয়েছে।

অবশ্য তাদের এই কুফরীর দরুন তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। হযরত মূসা (আ) তা করতে তাদেরকে আদেশ করেন নি। তাদের সাথে তাদের স্ত্রীদের বিবাহ বহাল রাখার কথাও বলা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ –

তোমরা যা গোপন রাখছ, আল্লাহ তা অবশ্যই বের করবেন।

এ থেকে বোঝা যায়, বান্দা ভালো বা মন্দ যা-ই গোপন করে, তা তারা যতদিন-ই গোপন রাখুক, আল্লাহ্ একদিন-না-একদিন তা অবশ্যই প্রকাশ করাবেন। তখন তা আর গোপন থাকবে না। রাসূলে করীম (স) থেকেও এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ

انَّ عَبْدًا لَوْ اَطَاعَ اللّٰهَ مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حِجَابًا لَاَظْهَرَ اللّٰهُ لَهُ ذَلِكَ عَلٰى اَلْسِنَةِ النَّاسِ وَكَذٰلِكَ الْمَعْصِيَةُ -

বান্দা যদি সত্তরটি পর্দার আড়ালে থেকেও আল্লাহ্‌র বন্দেগীর কোন কাজ করে তা হলেও আল্লাহ্ তা জনগণের মুখে মুখে প্রকাশ করে দেবেন। গুনাহ্-নাফরমানীর ব্যাপারও তেমনি।

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ 'আপনি বনূ ইসরাইলীদেরকে তাদের নেক আমল আমার জন্যে গোপন করতে বলুন। জানিয়ে দিন, তা প্রকাশ করার দায়িত্ব আমার।' আল্লাহ্‌র 'তোমরা যা গোপন কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন', কথাটি সার্বিক ও সাধারণ (common)। কিন্তু তার তাৎপর্য বিশেষ ও নির্দিষ্ট। কেননা তারা সকলেই নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারীকে জানত না। এ কারণে হত্যাকারী সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দেয়। আল্লাহ্‌র উক্ত কথাটি সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেও সাধারণ হতে পারে। কেননা কথাটি মূলত ভবিষ্যৎ পর্যায়ের। আর তাদের ও অন্যদের ব্যাপারে তা সাধারণ কথা। এই কাহিনী পর্যায়ে আমরা যা কিছু বলেছি তাছাড়া আরও একটি কথা নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে হত্যাকারীর বঞ্চিত হওয়া। আবূ আইয়ূব ইবনে সিরীন উবায়দাতা-আস-সালমানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বনূ ইসরাইলী বংশের এক ব্যক্তির একজন নিকটাত্মীয় ছিল, সে ছিল তার উত্তরাধিকারী। সে তাকে হত্যা করল তার উত্তরাধিকার আগেই দখল করার মতলবে। পরে নিহত ব্যক্তির লাশ অন্য লোকদের বাড়ির দরজায় রেখে দিল, এরপর গাভী সংক্রান্ত উক্ত কাহিনীর উল্লেখ করল। তারপর উল্লেখ করেছে যে, হত্যাকারী তার উত্তরাধিকার পায়নি।

হত্যাকারীর মীরাস প্রাপ্তি

হত্যাকারীর মীরাস প্রাপ্তি পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। উমর, আলী, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে—হত্যাকারী মীরাস পাবে না। সে হত্যা ইচ্ছাপূর্বক হোক, কি ভুলবশত। নিহতের দীয়ত থেকেও কোন অংশ পাবে না। তার অন্যান্য মাল থেকেও নয়। ইমাম আবূ হানীফা, সওরী, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর এই মত ঘোষণা করেছেন। তবে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ হত্যাকারী নাবালেগ বালক বা পাগল হলে সে মীরাস পাবে। উস্‌মান আল-বত্তী বলেছেন, ভুলবশত যে হত্যা করেছে, সে মীরাস পাবে। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকরী পাবে না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, ভুলবশত হত্যাকারী ও মীরাস পাবে না। ইবনে ওহাব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা

করেছেন ঃ ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী নিহতের দীয়ত থেকেও তার ধন-মাল থেকে মীরাস বাবদ কিছুই পাবে না। আর যদি ভুলবশত হত্যা করে, তার মূল সম্পত্তির মীরাস পাবে; কিন্তু তার বাবত প্রাপ্ত দীয়ত থেকে কিছুই পাবে না। হাসান বসরী, মুজাহিদ, জুহরী থেকেও এরূপ মত পাওয়া গেছে। ইমাম আওজায়ীর মতও তাই। আল-মুজানী ইমাম শাফিয়ীর এই মত বর্ণনা করেছেন, বিদ্রোহী যদি ন্যায়পরায়ণকে হত্যা করে কিংবা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি বিদ্রোহীকে হত্যা করে, তাহলে তারা পরস্পরের মীরাস পাবে না। কেননা তারা দুজন-ই হত্যাকারী।

আবূ বকর বলেছেন, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী বয়স্ক-সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হলে এবং না-হক্ হত্যা করলে সে নিহত ব্যক্তির মীরাস পাবে না, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। ভুলবশত হত্যাকারীর ব্যাপারে বিভিন্ন দিক দিয়ে মতের পার্থক্য হয়েছে। সে দিকসমূহ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আবদুল বাকী, আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্বামাতা ইবনে লকীত-আজ্‌জরী-আলী ইবনে হাজার-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ ইবনে জুরাইজ আল-মুসান্না-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাইদ-আমর ইবন শুয়াইব তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ 'হত্যাকারীর জন্যে মীরাসের কিছুই নেই'।

আবদুল বাকী মূসা ইবনে জাকারিয়া আত-তস্তুরী সুলায়মান ইবনে দাউদ-হিফ্‌চ ইবনে গিয়াস আল হাজ্জাজ-আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা-তাঁর দাদা-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ 'হত্যাকারীর জন্যে কোন মীরাস নেই'। লাইস ইসহাক ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে আবূ ফরওয়াতা-জুহরী-হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান-আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْقَاتِلُ لاَيَرِثُ হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ-মক্‌হুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْقَاتِلُ عَمَدًا لاَيَرِثُ مِنْ اَخِيْهِ وَلاَمِنْ ذِيْ قَرَابَتِهِ شَيْاءً وَيَرِثُ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ نَسَبًا بَعْدَ الْقَاتِلِ -

ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী তার ভাইর ও নিকটাত্মীয়ের মীরাস পাবে না। তখন নিহতের বংশীয় নিকটবর্তী লোকেরা হত্যাকারী বাদে ওয়ারিস হবে।

হিচ্‌ন ইবনে মাইসারাতা আবদুর রহমান ইবনে হারমালাতা-আদী-আল-জুযামী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বললাম ঃ আমার দুজন স্ত্রী ছিল। ওরা পরস্পর মারামারি করেছে। তখন আমি ওদের একজনের উপর তীর নিক্ষেপ

করলাম। রাসূলে করীম (স) বললেন, তুমি তার দীয়ত দাও, কিন্তু তুমি তার ওয়ারিস হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী ও ভুলবশত হত্যাকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর কথা সার্বিক ও নির্বিশেষ। ফিকাহবিদগণ এই হাদীসটিকে ভিত্তি করেছেন এবং এটিকে গ্রহণ করেছেন। ফলে হাদীসটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যেমন রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই, করা যাবে না।' যেমন তাঁর এই কথা ঃ

لَاتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا -

কোন মেয়েলোক তার ফুফু বা খালার সতীন হিসেবে বিবাহিতা হতে পরবে না।

দুটি বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা দুটিই প্রত্যাহৃত হবে। ব্যক্তির থেকে বর্ণিত আরও অনেক হাদীস এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ফলে তা মুতাওয়াতির রূপে গণ্য হয়েছে। কেননা ফিকাহবিদগণ তা গ্রহণ করেছেন, তাকে ভিত্তি করে মাসলার রায় দিয়েছেন। ফলে মীরাস সংক্রান্ত আয়তকে এই পর্যায়ে 'খাস্' করে দেয়া সঙ্গত বিবেচিত হয়েছে। ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত উভয় প্রকারের হত্যাকারীই যে এ ক্ষেত্রে অভিন্ন, পার্থক্যহীন বরং সমান, তা অপর একটি হাদীস থেকেও জানা যায়। হাদীসটি হযরত আলী, উমর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অভিন্নভাবে বর্ণিত। সাহাবীগণের এই ধরণের বর্ণনায় কোনরূপ মতপার্থক্য হতে পারে না। তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত বলে কোন তাবেয়ীর কথা নিয়ে তার উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। ইমাম মালিক এই মত দিয়েছেন যে, নিহতের বাবদ প্রাপ্ত দীয়ত থেকেও হত্যাকারী মীরাস পাবে না। এই মতটি নিহতের সব মাল-সম্পত্তিতেই প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক, তার কয়েকটি কারণ আছে। একটি এই যে, তার বাবদ প্রাপ্ত দীয়তও মূলত তারই মাল, তারই মীরাস। কেননা তা থেকেই তার ঋণ শোধ করা হয়, তার কোন অসিয়ত থাকলে তা-ও কার্যকর করা হয়। আল্লাহ্ যেমন সম্পত্তি বণ্টনের বিধান করেছেন তেমনি তার সকল সম্পত্তি বণ্টিত হবে। অন্যান্য ওয়ারিস তা যথারীতি পাবে। দীয়ত থেকেও হত্যাকারী মীরাস পাবে না, এ ব্যাপারে সকলেই যখন একমত, তখন অন্যান্য যাবতীয় মাল-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথাটিও চূড়ান্ত। যেমন সব মাল থেকে মীরাস পেলে তার বাবদ প্রাপ্ত দীয়ত থেকেও পাবে, মীরাস প্রাপ্তির ব্যাপারে সব ধন-মাল সর্বতোভাবে অভিন্ন। পক্ষান্তরে যখন প্রমাণিত হল যে, তার দীয়ত থেকে অংশ পাবে না, তখন তার অন্যান্য যাবতীয় মাল সম্পর্কেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। কেননা হাদীসে এই দুই ধরনের মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম মালিক বলেছেন ঃ ভুলবশত হত্যাকারী দীয়ত ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় মালের মীরাস পাবে, কেননা তার এই হত্যা আগাম মীরাস দখল করার মতলবে হয়েছে, তা মনে করা যায় না। দীয়তের ক্ষেত্রেও এই সম্ভাবনা বিদ্যমান। তা বরং উক্ত

সন্দেহ থেকে আরও অনেক দূরে অবস্থিত। এই কারণে তার দীয়তের অংশ পাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। ইচ্ছামূলকভাবে হত্যাকারী বা প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যাকারী নিহতের যাবতীয় সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে না, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যে কোন মতবৈষম্য নেই, যেমন দীয়তের অংশ পাওয়ার ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। ভুলবশত হত্যাকারীর ব্যাপারেও এই সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা দীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিক দিয়ে এ দুজন অভিন্ন। উপরন্তু ইচ্ছামূলক ও প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যায় এই সন্দেহ প্রবল যে মীরাস আগাম দখল করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে, ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রেও এই সন্দেহ বিরাজমান। কেননা বাহ্যত সে হয়ত অন্য কারোর দিকে আক্রমণ করা দেখিয়ে তার প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে, যেন তাকে হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত না করা হয় এবং মীরাস থেকেও বঞ্চিত না হয়। এই সন্দেহ যখন বর্তমান, তখন এই সন্দেহ ইচ্ছামূলক ও প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যার ক্ষেত্রেও তা থাকতে পারে। আর মোট সম্পত্তির কিছু অংশের মীরাস হওয়া ও অপর কিছু অংশের না হওয়া মীরাসের মৌল নীতি বহির্ভূত। কেননা তাতে এমন লোক হবে যে তার মীরাসের কোন অংশের মীরাস পেল, তাতে তার সমস্তটারই মীরাস পেয়ে গেল। আর যে লোক তার কিছু অংশের মীরাস থেকে বঞ্চিত হল সে সবটা থেকেই বঞ্চিত হল। আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, বালক ও পাগল হত্যাকারী হলে তারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। তার কারণ হচ্ছে, তারা শরীয়াত পালনে বাধ্য مكلف নয়। আর মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি হল মৌলিকভাবে এক প্রকারের শাস্তি বা দণ্ড। এ কারণে তাদেরকে ভুলবশত হত্যাকারীর স্থানে গণ্য করা হয়েছে। যদিও ভুলবশত হত্যাকারী রক্ত দিয়ে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয় না। যদিও তাতে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে বা তাকে মেরে তাকেই হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কার্যত তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ-ও হতে পারে যে, সে অন্য কারো নিয়োজিত ব্যক্তি হবে। যার সম্পর্কে তা জানা যাবে, তাকেও সেখানেই গণ্য করা হবে। বালক ও পাগলের যে অবস্থাই হোক না-কেন, তারা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ -

তিন শ্রেণীর লোকের আমল লেখা হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ জাগ্রত না হয়। পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। বালক, যতক্ষণ না পূর্ণ বয়স্কতা পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই হাদীসটি বাহ্যত এই তিনজনের হত্যাকার্য ও মূলত দণ্ডমুক্ত হবে। দীয়ত দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্তি দেয়া হতো, যদি তার দলীল না থাকত।

প্রশ্ন হতে পারে, নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় কোন শিশুর উপর পড়ে যদি তার মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সেও কি মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে ? জবাবে বলা হবে, তখন সে ভুলবশত হত্যাকারী মাত্র। হতে পারে—সে নিজেকে নিদ্রিত জাহির করেছে, কিন্তু আসলে সে নিদ্রিত ছিল না। অথবা ইমাম শাফিয়ীর কথা ঃ ন্যায়পরায়ণ বিদ্রোহীকে হত্যা করলে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এখানেও সেই ব্যাপার। কেননা সে তো বাস্তবিকই তাকে হত্যা করেছে। আর বিদ্রোহী তো হত্যার যোগ্যই ছিল। তাহলে তার মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়। আর যাকে দণ্ড দেয়া আবশ্যক, তাকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্যের কথা আমাদের জানা নেই। হ্যাঁ, ন্যায়পরায়ণ যদি বিদ্রোহীকে হত্যা করে আর সেজন্যে সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তো সে যদি যুদ্ধকারী হয়ে 'হদ' স্বরূপ হত্যা দণ্ডের উপযুক্ত হয় তাহলে তার মীরাস মুসলিম জনগণের জন্যে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান—ইমাম—আইন কার্যকরকরণে গোটা সমাজে স্থলাভিষিক্ত। তাই এই হত্যাকারী যেন সমস্ত লোককেই হত্যা করেছে। এরূপ অবস্থায় মুসলমান জনগণ যদি তার মীরাস পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে ইমাম যেহেতু সেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত, তাই একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আইনের কারণে কেউ নিহত হলে হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমাদের ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, এক ব্যক্তি পথে একটা গর্ত খুড়ল কিংবা কোন প্রস্তর রেখে দিল। তাতে যদি কোন লোক মরে যায়, তাহলে তদ্দরুন সে ব্যক্তি মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা প্রকৃত হত্যাকাণ্ডটি সে নিজে তো ঘটায়নি। সে নিজে হত্যাকারী ছিলনা। নিহতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কারণও তার দ্বারা ঘটেনি। তার দলীল হচ্ছে—'হত্যা' তিন প্রকারের ঃ ইচ্ছামূলক হত্যা, ভুলবশত হত্যা এবং প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা। পথে প্রস্তর স্থাপনকারী এর মধ্যে কোনটাতেই পড়ে না।

যদি বলা হয়, গর্ত খোড়া ও পাথর স্থাপন হত্যার কারণ, যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও অস্ত্র দ্বারা আক্রমণকারী যখমকারী। ওরা দুজনই হত্যাকারী। কেননা ওরা দুজনই কারণ সৃষ্টি করেছে। জবাবে বলা হবে, তীর নিক্ষেপ ও তৎসৃষ্ট তীর যাওয়া এটা তার কাজ। আর তাতেই হত্যাকাণ্ড সজ্ঘটিত হয়েছে, যখমও তারই কাজ। অতএব সে অবশ্যই হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা তার কৃত কর্মটিই নিহতের মরার কারণ হয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পাথরের সাথে আঘাত খাওয়া এবং ব্যক্তির গর্তে পড়ে যাওয়া সেই লোকটির কাজ নয়, যে গর্ত খুঁড়েছিল বা পাথর রেখে দিয়েছিল। অতএব এ দুজন হত্যাকারী সাব্যস্ত হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ
كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

তোমরা কি এই বাসনা পোষণ কর যে, ওরা তোমাদের ন্যায় ঈমানদার হবে ? অথচ ওদেরই এক গোষ্ঠী আল্লাহ্র কালাম শুনে পরে তাকে বিকৃত করে দিচ্ছিল তা স্পষ্ট বুঝে নেয়ার পর এবং জেনে শুনে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সত্যকে যে জানে, সে-ই যদি তার বিরোধী হয়, তাহলে সে নিশ্চিতই সত্যপথ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সে কোন্ দিন সংশোধন গ্রহণ করবে, জাহিল ব্যক্তির তুলনায় তার প্রতি এ ব্যাপারে অধিক নৈরাশ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা কি এই বাসনা পোষণ কর যে, ওরা তোমাদের জন্যে ঈমানদার হবে'। তাদের সৎপথ প্রাপ্তির ব্যাপারে বাসনা পোষণ করাকে অযৌক্তিক বলা হয়েছে। কেননা ওরা সত্যকে জানার পর নিজেরা তার অহংকার করেছে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً –

মাত্র গণা কয়েকটি দিন ছাড়া আমাদেরকে আগুন কখ্খনই স্পর্শ করতে পারবে না।

'গণা কয়েকটি দিন' অর্থ অল্প কয়েকটি দিন মাত্র। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ এই 'গণা কয়েকটি দিন' বা 'অল্প কয়েকটি দিন' বলতে চল্লিশ দিন বুঝেছেন। কেননা তারা এই চল্লিশ দিন পর্যন্তই বাছুর-পূজা করেছিল। হাসান বসরী, মুজাহিদ বলেছেন, তার অর্থ মাত্র সাতদিন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ – اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ –

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল এই আশায় যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে। তা মাত্র গণা কয়েকটি দিন ....।

আয়াতে রোযা রাখার দিনগুলোকে 'গণা কতিপয় দিন' বলা হয়েছে। রমযান মাসের সব দিনই বুঝিয়েছে এই 'গণ কতিপয় দিন' বলে।

আমাদের ফিকাহবিদ উস্তাদগণ বলেছেন, হায়য-এর কম-সে-কম ও বেশি দিন থেকে বেশি দিন হল তিন ও দশ দিন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا –

হায়য-রোগী নামায পড়বে না তার অপবিত্র থাকার দিনগুলোতে।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

دَعِي الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ –

তোমার হায়য-এর দিনগুলোতে নামায ত্যাগ কর।

এ কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা বলেছেন, হায়য-এর মেয়াদকে 'গণা কতিপয় দিন' নাম দেয়া হয়েছে। এর কম-সে-কম হল তিন দিন, আর বেশির দিন হল দশ দিন। কেননা তিন দিনের কম তো হতে পারে এক বা দুই দিন। আর দশের বেশি হলে তাকে এগার দিন বলা হবে। এই শব্দ তিন থেকে দশ পর্যন্তকার সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয়। অতএব তা তার কম ও বেশি দিনের উপর ব্যবহৃত হতে পারে।

এই দলীল উপস্থাপনের উপর কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন এই বলে যে, 'গণা দিন' বলতে মাসের সমস্ত দিন বোঝায়। আর لَّاَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً বলে চল্লিশ বুঝেছেন কেউ কেউ। কিন্তু উক্তরূপ দলীল উপস্থাপন আমাদের মতে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়। কেননা আল্লাহ 'কতিপয় গণ্য দিন' বলে হতে পারে তিনি কম দিন বুঝিয়েছেন। যেমন دراهم معدودة 'কতিপয় গণা দিরহাম' বোঝায়। একথা বলে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়নি। পরিমাণ ও সুনির্দিষ্টকরণ توقيف ঈপ্সিত নয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে, লোকদের উপর কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়—এমন রোযা ফরয করা হয়নি। ওকথা দ্বারা কোন অস্পষ্ট সময়ও বোঝানো হতে পারে। যেমন বলা হয়, বনু উমাইয়্যার যুগ 'হাজ্জাজের দিন'। একথা বলে দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। এ থেকে বোঝাতে চাওয়া হয় তাদের শাসনকাল। নবী করীম (স)-এর কথা 'তোমার অপবিত্র থাকার দিনগুলোতে নামায ত্যাগ কর' থেকে কিন্তু দিন নির্দিষ্টকরণ-এর ইচ্ছাই বোঝায়। কেননা 'হায়য'-এর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা অনিবার্য। যা হবে বিশেষ দিন, যা অতিক্রম করা হবে না, যার কম-ও হবে না। তাই 'দিনসমূহ'-এর সাথে কোন বিশেষ সংখ্যা যুক্ত হলে তিন থেকে দশ পর্যন্তকার দিনগুলো শামিল হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

বরং যে লোক কোন পাপের কাজ করবে ও তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবে, ওরা তো জাহান্নামী হবে, চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে।

এ থেকে বোঝা গেছে যে, অর্জিত পাপ ও পাপ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফল হচ্ছে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন। এতে প্রতিফল ভোগ করতে বাধ্য হবে দুটি শর্তের উপস্থিতিতে। তার একটি উপস্থিত না হলে তা হবে না। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যে লোক দুটি শর্তের ভিত্তিতে কিরা করবে—দাসমুক্তি বা তালাক দান ইত্যাদি কোন কাজ সম্পর্কে, তার একটি পাওয়া গেলেও অপরটি পাওয়া না গেলে কিরা ভঙ্গ করবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

স্মরণ কর, আমরা যখন বনু ইসরাইলের নিকট থেকে এই চুক্তি গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো দয়াপূর্ণ ব্যব্যহার করবে ....।

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে অধিক তাগিদ করা হয়েছে এবং গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাদের প্রতি দয়াপূর্ণ ভালো ব্যবহার করা একান্তই কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা দুজন কাফির হোক কিংবা মুমিন। কেননা আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদতের আদেশের সাথে মিলিয়ে এই আদেশটি দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَذِى الْقُرْبٰى এবং নৈকট্য সম্পন্ন লোক—নিকটাত্মীয়। এ থেকে সেলায়ে রেহমী করা এবং ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি দয়া করা কর্তব্যের কথা বোঝায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حَسْنًا এবং লোকদের জন্যে উত্তম কথা বল। আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন, এর অর্থ, সমগ্র মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, সব মানুষই মুসলিম-কাফির—নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্যে আদিষ্ট।

কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

তোমার রব্ব-এর পথের দিকে আহ্বান জানাও যুক্তি-কৌশল ও উত্তম উপদেশ-নসীহত দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হও সেসব কথা নিয়ে, যা অতীব উত্তম।

এসব আয়াতে যে, ইহ্সান-এর উল্লেখ হয়েছে, তা হচ্ছে, প্রত্যেককেই আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানো এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে সুপরামর্শ দেয়া। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ্র কথা বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে যুদ্ধের জন্যে দেয়া আদেশ দ্বারা। তাছাড়া আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّامَنْ ظُلِمَ –

কোন খারাপ কথা প্রকাশ করে দেয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে যদি কেউ মজলুম হয়, তার কথা আলাদা।

আল্লাহ কাফির লোকদের উপর অভিশাপ বর্ষণ, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং গুনাহ্গার লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণের আদেশ করেছেন। এ ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের শরীয়াতসমূহের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। বোঝা গেল, উত্তম কথা বলা ও ভালো

আচরণ করার এই আদেশের দুটি দিক। হয় তা বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্যে হবে নির্দিষ্টভাবে, যারা অভিশাপ ও ঘৃণা পাওয়ার যোগ্য নয়, তারাও এদের মধ্যে শামিল, যদিও তা সাধারণ পর্যায়ের হুকুম। আর তা হচ্ছে, সকলের কল্যাণের জন্যে দো'আ করা, ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা—এসবই উত্তম। আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাইলের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। মূলত তা এক তাগিদপূর্ণ চুক্তি। হয় তা ভীতিপূর্ণ কথা সহকারে হবে অথবা হবে কিরা সহকারে। এ ঠিক তেমন, যেমন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে নবী করীম (স)-এর হাতে বায়'আত করার জন্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে আদেশ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَاءَ كُمْ وَلَاتُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ -

স্মরণ কর, আমরা তোমাদের নিকট থেকে চুক্তি গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের রক্তপাত কর না এবং তোমরা নিজেদের লোকদের বহিষ্কৃত কর না তোমাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে।

এর দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি তারা পরস্পরকে হত্যা করবে না। যেমন তাঁর এই কথা ঃ وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা কর না।' এমনিই আদেশ ঃ তোমাদের নিজেদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত না করা এবং তাঁর কথা ঃ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا 'এবং তারা পরস্পর হত্যাকার্য-যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে।' আর দ্বিতীয়টি, কেউ-ই নিজেকে হত্যা করবে না। এ কাজ প্রত্যক্ষভাবে নিজে করবে না, যেমন ভারতীয় হিন্দু বা বৌদ্ধরা করে কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। অথবা একজন অপরজনকেও হত্যা করবে না, যার দরুন সে নিজে নিহত হতে পারে। তাও আত্মহত্যারই শামিল। ব্যবহৃত শব্দ এই উভয় অর্থ-ই দেয়। এসবই তাদের জন্যে অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ্ এই ভাষায় যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা তওরাত কিতাবের শরীয়াতের হুকুম। ইয়াহুদীরা এই হুকুম গোপন করে রাখছিল। এটা ছিল তাদের অবমূল্যায়নের ব্যাপার। আর তার জন্যে তারা নিন্দনীয় হয়েছে অনিবার্যভাবে। এজন্যে আল্লাহ তাঁর নবীকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই কাজকে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এ থেকে প্রমানিত হয়েছে যে, তারা নবীর নবুয়তকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। কেননা নবী কিতাব পাঠ করেন নি। তাতে কি লেখা আছে, তা-ও তিনি জানতেন না। জানতেন শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিতেন। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত কয়টির পর আরও যা যা বলেছেন তা সবই এ পর্যায়ের কথা। যেমন বলেছেন ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

পূর্বে তারা এ কথা বলে কাফিরদের উপর বিজয় লাভের দাবি জানাত।

এ ছাড়া আরও যেসব কথা বলা হয়েছে, তা সবই আল্লাহ্র নিকট থেকে توقيف পর্যায়ের কথা। সে কথা তারা যা গোপন করে রাখত সেই বিষয়ে। তাদের জুলুম, কুফরী ও মন্দ সমূহ প্রকাশ ঘটানোর ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করা ইত্যাদি বিষয়ে। আর এই সবই হযরত মূসা (আ)-এর নবুয়তের দলীল ও প্রমাণ মাত্র।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ –

তোমাদের নিকট বন্দী লোক এলে তোমরা তাদেরকে ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নাও, অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর, আর অপর কতকাংশ কর অবিশ্বাস ?

আয়াতটি বলছে, বন্দীদের 'ফিদিয়া' বা বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্ত করা তোমাদের জন্যে কর্তব্য ছিল। সেই সাথে তাদের একাংশকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বঞ্চিত করাও তাদের উপর হারাম ছিল। তাদের কতককে যখন তাদের শত্রুরূপে বন্দী করে, তখন ফিদিয়া দেয়া তাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাই তাদেরকে বহিষ্কার করায় তারা কিতাবের কতকাংশের অমান্যকারীতে পরিণত হয়, কেননা তারা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করেছেন। আবার তারা যখন ফিদিয়া দিয়ে বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নিত, তখন তারা কিতাবের কতকাংশের প্রতি ঈমানদার প্রতিপন্ন হতো। কেননা তারা আল্লাহ্র ওয়াজিব করে দেয়া কাজটি করত।

বন্দীদের ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে আনা আমাদের উপরও প্রযোজ্য প্রমাণিত হয়েছে। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত হিকাম তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, তাদের আকেলা দেয়ার ব্যাপারাদিতে তারা আকেলাদের এবং তাদের বন্দীদের জন্যে ফিদিয়া দেবে প্রচলিত নিয়মে। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে কল্যাণ স্থাপন করবে। মনসূর শফীক ইবনে সালমা থেকে আবূ মূসা আল-আশআরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَاَفْشُوْا السَّلَامَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْا الْعَانِىْ.

তোমরা খাবার খাওয়াবে, নামায ছড়িয়ে দেবে, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করবে, দেখবে এবং বন্দীকে মুক্ত করবে।

এ দুটি হাদীসই বন্দীদের মুক্ত করার বিধান দিয়েছে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন ও সালমা ইবনুল আক্ওয়া বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) কতিপয় মুসলিম বন্দীকে মুশরিকদের সাথে বিনিময় করেছেন। সওরী আবদুল্লাহ্ ইবনে শরীক, বশার ইবনে গালিব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হুসায়ন

(রা)-এর নিকট কিসের ভিত্তিতে বন্দীকে ফিদিয়া দিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ যে জমিনের জন্যে যুদ্ধ হচ্ছিল সেই জমিনের ভিত্তিতে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বল, পরকালটা যদি আল্লাহ্‌র নিকট অন্য লোকদের থেকে কেবল তোমাদের জন্যেই খালেস হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যুর কামনা করত, তাহলে তারা মরে যেত এবং তারা জাহান্নামে তাদের আসনসমূহ দেখতে পেত! আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে যারা 'মুবাহিলা' করতে চেয়েছিল, তারা যদি বের হতো, তা হলে তারা ফিরে গিয়ে তাদের বংশ পরিবার ও ধন-মাল কিছুই বর্তমান দেখত না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইয়াহূদীরা মৃত্যুর কামনা করলে তারা তার সাথে যুক্ত হয়ে যেত এবং অবশ্যই মরে যেত। মৃত্যুর কামনা পর্যায়ে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। একটি—হযরত ইবনে আব্বাসের কথা, ওরা চ্যালেঞ্জ করেছিল এই বলে যে, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে এই কথার উপর যে, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে গোষ্ঠী মিথ্যাবাদী হবে, সে মরবে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ ওরা যখন বলেছিল যে, যারা ইয়াহূদী বা খৃস্টান, তারা ছাড়া কেউ-ই কখ্‌খনই জান্নাতে দাখিল হবে না, বলেছিল আমরাই আল্লাহ্‌র সন্তান, তাঁর প্রিয়জন। তখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর। কেননা যার অবস্থা এরূপ তার জন্যে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় মৃত্যুই শ্রেয়। আয়তটির দুটি অর্থ। একটি হল, তাদের মিথ্যাবাদিতা ও সেজন্যে তাদের কান্নাকাটির কথা প্রকাশ করা। আর দ্বিতীয়, নবী করীম (স)-এর নবুয়ত প্রমাণ করা । আর তা এজন্যে যে, তারা এর উপর চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। খৃস্টানদের চ্যালেঞ্জের জবাবে তাদেরকে 'মুবাহিলা' করতে ডাকা হয়েছিল। রাসূলে করীম (স) সত্যতা ও তাদের নিজেদের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে তারা পূর্ণমাত্রায় অবহিত না হতো, তাহলে তারা মৃত্যুর কামনা করতে একটুও বিলম্ব করত না। আর খৃস্টানরা 'মুবাহিলা' করার জন্যে অবশ্যই এগিয়ে আসত। তাদের উভয় গোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি তা করে, তাহলে অবশ্যই মৃত্যু হবে, তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। মৃত্যুর কামনা ও মুবাহিলার কথা বলায় তাদের মিথ্যাবাদিতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রতি যার ওয়াদা করা হয়েছিল, তা নাযিল না হলে তাদের প্রমাণ খণ্ডিত হয়ে যেত। কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও তারা যখন তা থেকে বিরত থাকল এবং এই কথার সহজতার সঙ্গে আযাবের ভয় দেখান হল, তখন প্রমাণিত হল যে, তারা নবীর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তারা তাদের কিতাব থেকে তাই জেনেছিল। কেননা তাতে রাসূলের গুণ-পরিচিতি বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত রয়েছে।

যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -

ওরা যেসব পাপ কাজ অগ্রে পাঠিয়েছে, সেই কারণে ওরা কখ্‌খনই মৃত্যুর কামনা করবে না।

এতে নবীর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের আর একটি দলীল পাওয়া গেল। তা হল, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে না, যদিও মনে প্রচ্ছন্নভাবে সে কামনা রয়েছে, উচ্চারণকারীর পক্ষে তা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, তাদের মুখে ভাষাও ছিল সুস্থ-সঠিক। ফলে একথাটি ঠিক এরূপ হল, যেমন, তাদেরকে যদি বলা হয় ঃ আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে, তোমাদের কেউ-ই তার মাথা স্পর্শ করবে না, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও। মাথা স্পর্শ করা তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। পরে তারা কেউই তার মাথা স্পর্শ করল না। যদিও তার প্রতি তাদের দুশমনি ছিল তীব্র প্রবল এবং তাঁকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে তাদের আগ্রহ ছিল। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল পূর্ণ সুস্থ। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হবে যে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে। তা দুইভাবে। এক—কোন বুদ্ধিমান মানুষই তার শত্রুদেরকে এই ধরনের কথা বলে চ্যালেঞ্জ দেয় না। কেননা এরূপ চ্যালেঞ্জ দিলে তা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, একথা জানা-ই আছে। আর দ্বিতীয়—এটা গায়ব পর্যায়ের সংবাদ দান। কেননা ওদের একজনও মৃত্যুর কামনা করেনি। ওদেরকে কুরআনের প্রসঙ্গে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, এটা ঠিক তেমনি। ওদেরকে অনুরূপ অন্তত একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল এবং শেষ পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, ওরা তা করবে না। কথাটি এই ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا -

তোমরা যদি না কর, আর তা কখ্‌খনই করতে পারবে না বা করবে না।

একজন বলেছেন, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে না। কেননা তা যদি ওরা করে, তাহলে তা হবে লোকদের থেকে সম্পূর্ণ গোপন ও প্রচ্ছন্নভাবে। একথা বলা যেত যে, তোমরা অন্তর থেকে মৃত্যুর কামনা করেছ।

এর জবাবে বলা যায়, এই কথা দুটি কারণে বাতিল। একটি এই যে, অন্তরের কামনা-বাসনা প্রকাশ করার জন্যে আরবদের ভাষায় দুটি বাক্য পরিচিত ঃ হায়, আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা করতেন এবং যায়দ যদি আসত; এই ধরনের আরও কিছু বাক্য এবং এও এক ধরনের উক্তি। কেউ যখন এই কথা বলে তখন তাদের মতে সে কামনাকারী গণ্য হয়, তার মন ও আকীদার হিসাব করা ছাড়াই। যেমন তারা খবর, খবর চাওয়া এবং আওয়াজ দেয়া বা ডাকার ব্যাপারে বলে। মৃত্যুর কামনা করতে বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া তাদের ভাষায় সেই কথার মুখাপেক্ষী যা কামনার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, প্রয়োজনের সময় চ্যালেঞ্জ দেয়া এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কিত তাদের জ্ঞানের উপর توقيف ও মিথ্যা আরোপের ব্যাপার, তাঁর ব্যাপারে তাদের অহংকার প্রদর্শন।

তারপর তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া যে, তারা যেন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর কামনা করে। অথচ সকলেরই জানা যে, মনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। তাই তা থেকে কথার সত্যতা বোঝায় না, তার খারাবীও নয়। এই কথা বলে চ্যালেঞ্জদাতার পক্ষে একথা বলা সম্ভব যে, আমি আমার মন দ্বারা এই কামনা করেছি। তার এই কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মত কোন দলীল তার প্রতিপক্ষের নিকট নেই। তা যদি হৃদয় দ্বারা কামনা করার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, মুখের কথার উচ্চারণ ছাড়া, তাহলে তারা অবশ্যই বলত ঃ আমরা আমাদের হৃদয় দ্বারা সে কামনা করেছি। তাতে তারা সম্পূর্ণ সমান সমান হয়ে যেত। তাতে তাদের মিথ্যুক হওয়া প্রমাণ করা যেত না। নবুয়তের সত্যতাও প্রমাণিত হতো না। কিন্তু তারা যখন তা বলেনি। কেননা তারা যদি তা বলত, তাহলে তার উল্লেখ হতো। যেমন তারা যদি যে কোন ধরনের কালাম দ্বারা কুরআনের মুকাবিলা করত, তা হলে তারও উল্লেখ করা হতো। এ থেকে জানা গেল যে, মূলত চ্যালেঞ্জটা দেয়া হয়েছিল মুখে শব্দের মাধ্যমে কামনা করার জন্যে শুধু, মনে মনে ও বিশ্বাসগতভাবে কামনা করার জন্যে নয়।

সিজদা ও যাদুকর প্রসঙ্গ

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ –

সেই সব জিনিস তারা মানতে শুরু করল, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বের নামে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনই কুফরি করেনি।

কাহিনীর শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচ্য। আবূ বকর বলেছেন, সর্বপ্রথম 'যাদু' সম্পর্কিত কথাই আলোচনায় নিয়ে আসা কর্তব্য। কেননা তা আগে বিদ্বজ্জনের নিকটই অস্পষ্ট। সাধারণ মানুষের কথা আর কি-ইবা বলা যায়। পরে সে সম্পর্কে শরীয়াতের রায় আলোচনা করব। আয়াতের তাৎপর্য ও তৎনিঃসৃত হুকুমসমূহের এটাই দাবি। আমাদের বক্তব্য হল, ভাষা বিশারদ উল্লেখ করেছেন, অভিধানে 'যাদু'র মূল অর্থে তাই বোঝায়, যা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্নতার কারণ। আর سَحَرٌ অর্থ খাদ্যপ্রাণ, তা প্রচ্ছন্ন ও তার চলাচল খুবই সূক্ষ্ম। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

تَوَفَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِىْ وَبَحْرِىْ –

রাসূলে করীম (স) ইন্তিকাল করে গেছেন আমার এক দুর্বোধ্য রহস্যময় অবস্থায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ – (الشعراء : ١٨٠)

নিশ্চয়ই তুমি যাদু-আহত ব্যক্তিগণের একজন।

অর্থাৎ সে-ই সৃষ্টিকূলের মধ্যের একজন, যারা খায়, পান করে। এই রকমই কথা ঃ

مَـا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا - (الشعرا : ١٥٤)

তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ বই তো নও।

এই কথাটিও অনুরূপ ঃ

مَـالِ هٰـذَا الـرَّسُـوْلِ يَـاْكُـلُ الـطَّـعَـامَ وَيَـمْـشِى فِى الْاَسْـوَاقِ - (الفرقان-٧)

এই রাসূলের কি হয়েছে, সে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে ?

প্রথমোক্ত কথাটির ঃ 'তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ বই তো নও' অর্থ ঃ আমাদের মতই যাদুওয়ালা হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে 'যাদু' শব্দের উল্লেখ হয়েছে এসব অবয়বের দুর্বলতার কারণে। এ সবের সূক্ষ্মতার কারণে। তা সত্ত্বেও মানুষের সত্তার ও কাঠামোর অবস্থিতি রয়েছে। অতএব যার গুণ এইরূপ, সে তো দুর্বল, অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী। অভিধানে ঃ سحر শব্দের এই-ই অর্থ। পরে তা ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেকটি প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম কারণের জিনিসের জন্যে। যা অবাস্তব কল্পনা পর্যায়ের, তার জন্যে। তা সম্মোহন, বিভ্রান্তি ও ধোঁকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি যদি কোন শর্ত বা রূপ বর্ণনা ছাড়াই ব্যবহৃত হয়, তাহলে যাদু কাজ যে করে তার নিন্দার তাৎপর্য আছে মনে করতে হবে। যেখানে তা প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে শর্তাধীন উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন রাসূলে করীম (স)-এর কথা, '

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -

নিশ্চয়ই ভাষণ-বর্ণনায়ও এক প্রকারের যাদু আছে।

আবদুল বাকী ইবরাহীম আল-হাররানী, সুলায়মান ইবনে হরব, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, মুহাম্মাদ ইবনুয-যুবায়র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ

রাসূলের করীম (স)-এর নিকট জবরকান ইবনে বদর, আমর ইবনুল আহ্‌তম ও কায়স ইবনে আসেম উপস্থিত, তিনি আমরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আমাকে জবরকান সম্পর্কে সংবাদ দাও।' বললেন ঃ তিনি তাঁর সমাজের আনুগত্য পান, শক্ত কঠোর প্রতিরোধক, পেছনে পড়ে থাকা জিনিসের নিষেধকারী। জবরকান বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম, সে জানে যে, আমি তার তুলনায় উত্তম। আমর বললেন ঃ তিনি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, সংকীর্ণ অবস্থান স্থান, পিতার দিক দিয়ে বোকা, খালুর দিক দিয়ে তিরস্কৃত হেয় রাসূল, আমি ওদের দুজনের ব্যাপারে সত্য কথাই বলেছি। আমি যা জানি, তার উত্তম কথাই বললাম। সে আমাকে ক্রুদ্ধ-অসন্তুষ্ট করেছে। পরে বললাম, তার খারাপ যা জানি তা। তখন রাসূলে করীম (স)-বললেন ঃ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -

নিশ্চয়ই তোমার এ বর্ণনায় যাদু রয়েছে।

ইবরাহীম আল হাররানী মুসয়িব ইবনে আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস, যায়দ ইবনে আসলাম, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

দুজন লোক এগিয়ে এল। তাদের একজন ভাষণ দিল। তা শুনে লোকেরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে।'

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ফারেস, সাইদ ইবনে মুহাম্মাদ আবূ নুমাইলাতা, আবূ জাফর নাহ্ভী আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত, সখর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দাতা তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স) কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جِهْلاً وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا وَاِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالاً –

নিশ্চয়ই বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে। জ্ঞান বা বিদ্যার মধ্যেও এক ধরনের মূর্খতা আছে, কাব্য বা কবিতায় যুক্তিপূর্ণ কথা আছে। আর কথার-ও একটা ঝুঁকি বা বোঝা আছে।

সা'সয়া ইবন সুহান বলছেন, নবী করীম (স)-এর এই কথাটি সত্য। বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে—এই কথাটি প্রসঙ্গে বলা যায়, যে কথা বলে সে ব্যক্তির উপর একটা হক আছে। সে হয়ত খুব যুক্তি দেখাতে অধিক পারঙ্গম হবে যার হক তার অধিক। ফলে তার সুমিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে জনগণ হয়ত যাদুকৃত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে সেই অন্য লোক হক নিয়ে নেবে। এটা অসম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান বা বিদ্যায়ও মূর্খতা আছে, কথাটি সত্য এজন্যে যে, দেখা যায়, অনেক আলিম জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে এমন সব বিষয়ে স্বীয় জ্ঞানের বা বিদ্যাবুদ্ধির সম্ভার দেখায় যে-বিষয়ে মূলত সে কিছুই জানে না। ফলে সে মূর্খতার পরিচয় দেয়। 'কাব্য-কবিতায় যুক্তি আছে' কথাটিও এ পর্যায়েরই। জনগণ যে সব ওয়ায-নসীহত মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং যার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা এই ধরনের। আর 'কথাবার্তার ঝুকি আছে'—তার তাৎপর্য হল, তোমার কথাই তোমার সম্মান, যাকে যা বলা উচিত নয়, তাকে তা বলা এ পর্যায়ে পড়ে। অথচ সে হয়ত তা বলতে চায়নি। এ জন্যেই নবী করীম (স) কোন কোন কথা বা বক্তৃতা ভাষণকে যাদু বলে অভিহিত করেছেন। কেননা কথক হয় কোন হক সম্পর্কে খবর দেবে, সে সেটিকে স্পষ্ট করে তুলবে, উদ্ভাসিত করবে তার বিশ্লেষণ দক্ষতার দ্বারা। অথচ পূর্বে তা প্রচ্ছন্ন ছিল।

বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সম্মুখে খুব উচ্চতর অলংকার সমৃদ্ধ কথা বলল। উমর বললেন ঃ هذَا وَاللّٰهِ السِّحْرُ الْحَلَالُ আল্লাহ্র কসম, হালাল যাদু এই। কেউ হয়ত বাতিলকে তার বক্তৃতার যাদু বলে সত্য রূপে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। তা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তার সম্মোহন শক্তি দ্বারা অভিভূত করে দিতে পারে। এই 'যাদু' শব্দটি নির্গুণ বা শর্তহীন ব্যবহৃত হলে তা হবে বাতিল সম্মোহনকারী ব্যাপার। তার প্রকৃত বাস্তবতা কিছু নেই। তা স্থিতিশীলও নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ - (الاعراف - ١١٦)

ওরা লোকদের চোখকে যাদু প্রভাবিত করেছিল।

অর্থাৎ তাদের উপর বিভ্রান্তি চাপিয়ে দিল, সম্মোহিত করে দিল। তারা ধারণা করতে লাগল যে, ওদের রশি ও লাঠিগুলো দৌড়াচ্ছে এবং বলেছে ঃ

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى - (طه : ٦٦)

যাদুকরদের যাদুর প্রভাবে তার মনে হল—ওটি দৌড়াচ্ছে।

আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, ওরা যে মনে করেছে ওটা দৌড়ায়, তা প্রকৃতপক্ষে দৌড়াচ্ছিল না। ওটা ছিল শুধু কল্পনা। বলা হয়েছে যে, ওটির ভেতর শূন্য একটি লাঠি ছিল এবং তা পারদে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে রশিগুলো চামড়া দিয়ে তৈরী ছিল, পারদে ভর্তি ছিল। এর পূর্বে তারা বহু কয়টি স্থানে গর্ত খুড়ে রেখেছিল। তারা লম্বা ঘর বানিয়ে রেখেছিল এবং আগুনে ভর্তি করে ফেলেছিল। যখন তার উপর তা ফেলা হল এবং পারদ উত্তপ্ত হয়ে নড়ে উঠল। কেননা পারদের ধর্মই হচ্ছে, তাতে আগুন লাগলে তা উড়তে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, ওটা ছিল সম্মোহন, প্রকৃত কোন জিনিস ছিল না। এই কারণে আরবরা এক প্রকারের অলংকারকে বলে যাদুকৃত। অর্থাৎ যে তা দেখবে তাতে সে যাদুর প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়বে। তাই যে বর্ণনা-বিশ্লেষণ-বক্তৃতা-ভাষণ সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে তা হালাল যাদু। কিন্তু যার দ্বারা লোকদের সম্মোহিত করা ও ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য, বাতিলকে সত্য রূপে উদ্ভাসিত করা যার মূলে নিহিত ইচ্ছা, তা নিন্দিত যাদু।

যদি বলা হয়, যাদুর উদ্দেশ্যই যখন সম্মোহন, প্রচ্ছন্নকরণ, তখন তদ্দ্বারা কোন সত্য উদ্ভাসিত হতে পারে কেমন করে বলা যায়। সত্য সম্পর্কে যে খবর দেয়া হয়, তা-ই তো যাদু, যা প্রচ্ছন্ন তা জাহির করে দেয়। যা প্রকাশমান তাকে গোপন করা এবং তা জাহির করাটাও অবাস্তব।

জবাবে বলা যায়, তাকে যাদু বলা হয় শ্রোতার বিজয়ী ধারণা অনুসারে কেননা কোন ঘৃণ্য শব্দ দ্বারা যদি কোন তত্ত্ব বোঝান হয়, তাহলে তা কবুল হবে না, সেদিকে মনোযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু কোন তাৎপর্যপূর্ণ কথা যদি সুমিষ্ট ভাষায় শুনতে পাওয়া যায়, তাতে অনভিপ্রেত কিছু না থাকে, তা ঘৃণার উদ্রেক না করে, তা হলে তা কবুল হবে। তাই তা মিষ্ট শব্দে বলা ও উত্তমভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। যা শুনলে নাবুঝ লোক-ও সে দিকে উৎকর্ণ হবে, তা শুনবে ও কবুলও করবে। তাই এই বর্ণনা-বিশ্লেষণের প্রতি মনের ঝোঁক অনুযায়ী এক ধরনের যাদু বলে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন করে যাদুকর উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে কথার যাদুজালে জড়িত ও সম্মোহিত করে। বর্ণনা-বিশ্লেষণ ও বক্তৃতা-ভাষণকে এই দৃষ্টিকোণে যাদু বলা হয়েছে, সে দৃষ্টিকোণে নয়, যা তুমি মনে করেছ। বর্ণনা-বিশ্লেষণকে এ কারণে যাদু নাম দেয়া হতে পারে যে, এ রূপ বর্ণনা দানে সক্ষম ব্যক্তি অনেক সময় উত্তম কথাকেও খারাপভাবে বলে। যা প্রকৃতই অসুন্দর, তাকে

বর্ণনার যাদু দ্বারা সুন্দর করে তোলে। যেমন সম্মোহনকারী অসত্য ও অবাস্তব কথা দিয়ে সম্মোহনের সৃষ্টি করে।

আবূ বকর বলেছেন, বর্ণনা-ভাষণকে যাদু বলার ব্যাপারটি পরোক্ষ, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কথা নয়। প্রকৃত কথা—যেমন আমরা বলেছি—শব্দটির প্রয়োগকালে এমন প্রত্যেকটি ব্যাপার গণ্য হবে, যা সম্মোহনকারী, যার দ্বারা ধোঁকা দেয়াই উদ্দেশ্য। গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং যা প্রকৃত নয়, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, স্থিতি নেই, তা প্রকাশ করাই যার একমাত্র কাজ। এই কারণে আমরা বলেছি যে, অভিধানের দৃষ্টিতে سحر বা যাদুর আসল অর্থ এবং প্রয়োগ তাৎপর্য পর্যায়ে—এই নামটি যে সব জিনিসকে শামিল করে, তার ব্যবহারকারী তদ্দ্বারা যা কিছু করতে ইচ্ছা করে এবং যে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই সব পর্যায়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চেয়ে বলব ঃ তা কয়েক প্রকার দিকে বিভক্ত হয়ে থাকে। ব্যবিলনবাসীদের ব্যবহৃত যাদুও তার একটা প্রকার। আল্লাহ্ তাঁর এই কথায় তাদেরই উল্লেখ করেছেন ঃ

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَارُوتَ -

ওরা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং ব্যবিলনে হারুত মারুতের এই ফেরেশতার প্রতি যা নাযিল হয়, তাও শিক্ষা দেয়।

ব্যবিলনবাসীরা সাবেয়ী ধর্মের অনুসারী ছিল। ওরা সাত তারকার পূজা-উপাসনা করত এবং সেগুলোকেই ইলাহ্ বলত। তারা বিশ্বাস করত যে, সমগ্র বিশ্ব জাহানে যা কিছু ঘটে তা সবই এদের কাজ। আসলে ওরা নাস্তিক। একক সৃষ্টিকারী তারকা ও বিশ্বের তাবত অবয়বের অস্তিত্ব দানকারী হিসেবে ওরা কাউকে বিশ্বাস করত না। আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের প্রতিই তাঁর খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র শিখিয়ে দেয়া যুক্তি ও দলীল পেশ করে তিনি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন, যার প্রতিরোধ করার কোন সাধ্যই তাদের ছিল না। পরে তারা তাঁকে অগ্নিকুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ্ সে আগুনকে শীতল ও শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ তাঁকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্যবিলন, ইরাক-এলাকা, সিরিয়া, মিসর ও রোম—এই সব দেশের জনগণ বিউয়ারাসিব-এর সময় পর্যন্ত যাকে আরব যা 'দহাক' নামে অভিহিত করে—এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েছিল। দাম্বাওন্দ অধিবাসী আফরীদুন এসব অঞ্চলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেছিল। যারাই তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, তাদের সাথে চুক্তি করেছিল। তার কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার রাজত্ব নিঃশেষ করে দেন। তাকে বন্দী করে দিলেন। আমাদের সমাজের জাহিল নারী-পুরুষ বিশ্বাস করে যে, আফরীদুন বিউয়ারাসিবকে দাম্বাওন্দ পর্বত-শীর্ষে বন্দী করে রেখেছে, সে জীবিত রয়েছে

সেখানে বন্দী অবস্থায় এবং যাদুকররা তার নিকট সেখানে আসে এবং তার নিকট থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। সে শীঘ্র মুক্তি ও প্রকাশিত হবে এবং সমগ্র পৃথিবী জয় করে নেবে। বস্তুত সে-ই হচ্ছে দাজ্জাল, রাসূলে করীম (স) তার সম্পর্কেই আগাম সংবাদ দিয়েছেন। তার সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের—রচয়িতার ধারণা এই সব কথা অগ্নিপূজকদের নিকট থেকেই শুনা ও পাওয়া গেছে। তার ব্যবিলন সাম্রাজ্য ফারেসের দখলে চলে গেছে। তাদের কোন কোন লোক কখনো কখনো সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানেই বসবাস শুরু করেছে। তারা অবশ্য মূর্তিপূজারী ছিল না। তারা তওহীদ বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আগুন-পানি-মাটি-বাতাস—এই চার মৌল উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। কেননা তাতে সৃষ্টিকূলের জন্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার দ্বারা জীবের স্থিতি। অগ্নিপূজক জনগোষ্ঠী এদের মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তীকালে কুশ্তাসিবের সময়ে। যারদাশ্ত তাকে আহ্বান করেছিল। সে তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল কতিপয় শর্তের ও বিষয়ের ভিত্তিতে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ব্যবিলনের যাদুকরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। পারসিকরা যখন এসব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন তারা যাদুকরদের হত্যা করত ধর্মীয় কাজ হিসেবে। তাদেরকে ধ্বংস করার তাদের এ অভিযান বহুদিন চেলেছে। তাদের মধ্যে অগ্নিপূজার ধর্ম উদ্ভূত হওয়ার পরও, এমনকি তাদের রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও। পারসিকদের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ব্যবিলনীয়দের জ্ঞান-বিদ্যা ছিল কলা কৌশলী, انير نجيات তারকা নক্ষত্রের নিয়মাদি। তারা মূর্তিপূজা করত। এই মূর্তিগুলো তারা বানিয়েছিল সপ্ত তারকার নাম অনুসারে এবং প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা 'হায়কাল' বা মন্দির বানিয়েছিল। তাদের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা তার নৈকট্য অর্জন করত। এসব অনুষ্ঠান হতো সেই নক্ষত্রটির নিকট প্রার্থিত আনুকূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী। এই প্রার্থিত বিষয় কখনো ভাল হতো, কখনো হতো মন্দ। 'ভালো' চাইত, কল্যাণ পাওয়ার আশা করত, তার ধারণা অনুযায়ী সে বৃহস্পতি গ্রহর নিকট উপস্থিত হতো। তা হতো ধুয়া তাবীজ, গিরা ও তার উপর 'ফু' দেয়া। আর যে মন্দ, যুদ্ধ, মৃত্যু ধ্বংস ইত্যাদির কোন একটি চাইত অন্য কারো জন্যে, সে Satura গ্রহের নৈকট্য অর্জন করত তার উপযুক্ত অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে। যে বিদ্যুৎ, জ্বলন, মহামারী চাইত, সে তার ধারণানুযায়ী মঙ্গল গ্রহের নৈকট্য অর্জন করত। তার সাথে সামঞ্জস্যশীল অনুষ্ঠানাদি পালন করত। যেমন, জন্তু যবেহ করা। তাবীজগুলো নিবতী ভাষায়। তাতে সেসব তারকা-নক্ষত্রের প্রতি তাযীম-সম্মান দেখানো হতো। ভালো, মন্দ, ভালোবাসা, ক্রোধ ইত্যাদি যা চাইত, তার জন্যে। তা তাদেরকে তাই দিত। ফলে তারা মনে করত যে, তারা তার নিকট যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। অন্যাদের প্রতিও তারা যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পারে, তাতে কোন দোষ হবে না। তারা যেসব নক্ষত্রের নিকট যা চায়, তাকে সন্তুষ্ট করা ও তার নেকট্য লাভের জন্যে তারা তা-ই করত। তাদের সাধারণ ধারণা এই ছিল যে, ওরা মানুষকে গাধা বা কুকুর বানিয়ে দিতে পারে। পরে আবার

তাকে 'মানুষ' বানিয়ে দিতে পারে। ওরা ডিম্ব, গির্জা ও নির্জন ধ্বংস প্রাপ্ত স্থানে থাকে। বাতাসে উড়ে। ইরাক থেকে ভারত পর্যন্ত চলে যায়। চলে যায় যে কোন দেশে ইচ্ছা হয়। পরে সেই রাতেই ফিরে আসে। সাধারণ জনগণেরই এই বিশ্বাস ছিল। কেননা ওরা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। এই ভক্তি-শ্রদ্ধায় তারা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করত। যাদুকররা এরই মধ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করত। জনগণের উপর সম্মোহন চাপিয়ে দিত তাদের সুস্বাস্থ্যের আশা দিয়ে। তাদের কথাকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা ছাড়া আর কেউ এসব করে উপকার পেতে পারে না। তাদের রাজা-বাদশাহ্রা তাদের এসব কার্যকলাপের উপর কোন আপত্তি তুলতো না। বরং যাদুকররা মহিমান্বিত মহলে অবস্থান করত। কেননা সাধারণ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, মহামহিম মনে করত। কেননা সে সময়ের রাজা বাদশাহ্রা তা-ই বিশ্বাস করত, যা যাদুকররা তারকা-নক্ষত্র সম্পর্কে প্রচার করত। এ ভাবে সেসব রাজত্বও নিঃশেষ হয়ে যায়।

লক্ষণীয়, ফিরাউনের বাদশাহীর আমলে জনগণ জ্ঞান-বিদ্যা, যাদু, কলা-কৌশল ও অগ্নি প্রজ্বলন ইত্যাদির দক্ষতা অর্জন করেছিল, এ কারণেই হযরত মূসা (আ) তাদের প্রতি নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন অসি ও এমন সব নিদর্শন, যে সম্পর্কে যাদুকররা নিশ্চিতই জানত যে, তা কোনক্রমেই যাদুর ব্যাপার নয়। সে কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, যা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই রাষ্ট্র ও সম্রাট যখন বিলীন হয়ে গেল, তারপর তথায় তওহীদবাদীদের অবস্থান হয়েছিল। তারা পূর্ববর্তীদের সন্ধান করছিল এবং তাদেরকে হত্যা করে আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করত। তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষকে এবং মূর্খদের আহ্বান জানাচ্ছিল। এই সময় যারা তার আহ্বান জানাচ্ছিল তাদের বহু লোকই মেয়েলোক সহ ডাকছিল। মূর্খরা একত্র হয়ে গিয়েছিল, যারা তাদের জন্যে এই কাজ করে দেবে—এমন লোকদেরকে তারা আহ্বান জানাচ্ছিল, তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করার জন্যে। তাদেরকে যারা সত্য বলে মেনে নিত, তারা কাফির হয়ে যেত কয়েকটি দিক দিয়ে। এক—তারকা নক্ষত্রের তাযীম করা ও সেগুলোর নাম 'ইলাহ' রাখা কর্তব্য বলে তারা বিশ্বাস করত। দুই—এ কথা বিশ্বাস করা যে, তারকা-নক্ষত্রগুলো তার ক্ষতি করতে পারে যেমন, তেমনি উপকারও করতে পারে। তৃতীয়—যাদুকররা নবীগণের মতই মুজিযা দেখাতে সক্ষম একথা স্বীকার করা। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি দুজন ফেরেশতা পাঠালেন। ওরা যে জিনিসের দাবি করছিল তার নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁরা প্রকাশ করে দিচ্ছিল এবং তারা যেসব কথার উল্লেখ করে তার বাতুলতা উদ্ঘাটিত করছিল। যে সব উপায়ে ওরা জনগণকে সম্মোহিত করছে, তার বিভ্রান্তির জাল তারা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। ওসব তাবীজ-তুমারের তাৎপর্যও জানিয়ে দিচ্ছিল। বলে দিচ্ছিল যে, তা শিরক ও কুফর। তারা যে সব কৌশল দ্বারা জনগণকে সম্মোহিত করতে সমর্থ হতো তাও বলে দিচ্ছিল। তার মূলে কি রহস্য রয়েছে তা-ও প্রকাশ করে দিত। তা গ্রহণ করার ও সে সব আমল করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করে দিচ্ছিল। আল্লাহ্র বলা এই কথাটি তারা বলত ঃ

اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

মূলত আমরা তোমাদের মহাপরীক্ষার জন্যে এসেছি। অতএব তোমরা কুফর করো না।

এই হচ্ছে ব্যবিলনের যাদুর মৌল কাহিনী। বরং এসব সত্ত্বেও যাদুর অন্যান্য সব দিক ও ধরন তারা প্রয়োগ করত। পূর্বোল্লিখিত কলা-কৌশল ব্যবহার করতেও তারা সংকোচ করত না। সে সব দ্বারা তারা জনগণের উপর প্রচণ্ড সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করত। তারকা-নক্ষত্রের কার্যক্রমের কথা বলে তারা শক্তি অর্জন করত। সে বিষয়ে কোন বিতর্কে তারা অবতরণ করত না। লোকেরা তা মেনে নিক—এটাই ছিল তাদের একমাত্র চেষ্টা।

মূলত যাদু পর্যায়ে অনেক চিন্তা কল্পনা রয়েছে। তার প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত তার বাহ্যিক প্রকাশ। এক প্রকারের যাদু আছে, জনগণ তা জানে অভ্যাস চলার মাধ্যমে। অভ্যাসের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। কোন কোনটা প্রচ্ছন্ন ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার নিগূঢ় তত্ত্ব যে কি, তা জানা-বোঝা যায় না। তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বুঝাবার উপায় নেই। তার পরিচিতি মেনে নিতে হয়। কেননা প্রত্যেক প্রকারের বিদ্যার ধর্ম হল তা প্রকাশমান বা প্রচ্ছন্ন এই প্রকারের হবে। হবে জাহির ও সূক্ষ্ম। প্রকাশমান যা, তা যে তা দেখবে সে-ই বুঝতে পারবে। বিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে তা শোনা হয়েছে। আর সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন যা, তা তার উপর দক্ষতা সম্পন্ন লোক ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না। সে বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। তার দৃষ্টান্ত এই, যেমন, নৌকার আরোহী যখন খালে চলছে, তখন সে দেখতে পায় যে, তীরে অবস্থিত গাছপালা ও ঘরবাড়িও তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। অথবা যেমন উত্তর আকাশে অবস্থিত চন্দ্রকে দেখে দক্ষিণ আকাশের মেঘের ছায়ায় চলছে। যেমন সুগন্ধিযুক্ত পাউডারের গোল পাত্র; সেটিকে একটি গোল কলারের মত দেখে। কোন চাকা যখন খুবই দ্রুতগতিতে আবর্তিত হতে থাকে, তখনও এই রকম দেখে। কোন কাষ্ঠের এক মাথায় থাকলে সেটিকে যদি কেউ ঘুরায়, তা হলেও সেটিকে গোল গলাবন্ধনীর মত দেখা যাবে। যেমন পানি ভরা পাত্রে রক্ষিত একটি আঙুর জাম সদৃশ দেখা যাবে। যেমন ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি কুয়াশার মধ্যে বিরাট বড় ব্যক্তি মনে হবে। যেমন জমিন নিঃসৃত বাষ্প সূর্যের উদয় কালে তার কিরণ বিরাট দেখা যাবে। যখন তুমি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সূর্য উপরে উঠে যাবে, তখন তা ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দেবে। যেমন সোজা ঋজু বংশদণ্ড পানির মধ্যে ভাঙ্গা বা বাঁকা দেখা যাবে। যেমন অঙ্গুরীয়কে তোমার চোখের নিকটে এনে দেখলে প্রশস্ত বালারূপে দেখা যাবে। এ পর্যায়ের দৃষ্টান্তরূপে বিপুল, অসংখ্য জিনিসের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা তার আসল অবস্থা থেকে ভিন্নতর কল্পিত হবে। জনগণ তা চিনতে পারবে। এমন জিনিসও আছে যা খুবই সূক্ষ্ম। তবে তা ধরলে ও চিন্তা করলে প্রকৃত জিনিস বোঝা যাবে। যেমন যাদুকরের সূতা, কখনো তা লাল, কখনো হলুদ, আবার কখনো কালো দেখা যায়। যাদুকররা তা নেড়েচেড়ে দেখিয়ে থাকে, কিন্তু তার আসল অবস্থার বিপরীতটা কল্পনায় প্রকাশ করে। যেমন একটা চড়ুই পাখী যবেহ করা হয়েছে; কিন্তু তোমাকে দেখাবে, পাখীটি চট করে উড়ে গেছে যবেহ করার পরই

তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে। আসলে তা হয় তার হালকা গতিশীলতার কারণে। যেটি যাবেহ করা হয়েছে, সেটি নয়, উড়ে গেছে অন্যটি। কেননা যাদুকরদের নিকট দুটি চড়ুই থাকে। তার একটিকে লুকিয়ে রাখে, অপরটিকে প্রকাশ করে। যবেহ্কৃতটির হালকা নড়া-চড়ার কারণে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। যাদুকর প্রকাশ্যভাবে দেখায় যে, সে একটি মানুষকে যবেহ করেছে, তরবারি তার উপর চালিয়ে দিয়েছে, তা তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসলে কিছুই নয়। এভাবেই সব যাদুকর একেবারে শূন্য থেকে নামা, নড়া-চড়া বা গতিবিধির মাধ্যমে নানা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। যেমন দেখায়, দুজন অশ্বারোহী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, একজন অপরজনকে হত্যা করল। এজন্যে নানা কৌশল অবলম্বন ও ব্যবহার করা হয়। তারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিতান্ত শূন্য থেকে বিরাট কিছু দেখিয়ে দেয়। যেমন একজন অশ্বারোহী, তার হাতে একটি পটাহ। দিনের একটি ঘন্টা অতিবাহিত হলেই সেই পটাহ্টিকে স্পর্শ না করেই সেটির উপর আঘাত হানে, সেদিকে একটু অগ্রসরও হয় না। কলবী উল্লেখ করেছেন, একজন সৈনিক সিরিয়ার কোন এলাকায় শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি কুকুর ও একটি দাস (গোলাম), তখন সে একটি বিরাট অজগর দেখতে পেল। তা দেখে কুকুরটি ক্ষেপে উঠল, ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। তখন অজগরটি সেখানকার একটি গর্তে প্রবেশ করল, তার পেছনে পেছনে কুকুরটিও তাতে প্রবেশ করল। অনেকক্ষণ ধরে কুকুরটি বের হল না। তখন গোলামটিকে সেই গর্তে প্রবেশ করতে বলল। পরে সেও প্রবেশ করল। সৈনিকটি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বহু সময় অপেক্ষা করার পরও যখন কুকুর বা গোলাম কেউ বের হল না, তখন সে নিজেও সেই গর্তে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এই সময় সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। সে তাকে অজগর, কুকুর ও গোলাম সম্পর্কে খবর দিল। এদের একটিও যে বের হয়নি, তা তাকে বলল। এখানে সে নিজেও গর্তে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হয়েছে। এই কথা শুনে আগত ব্যক্তি তার হাত ধরল ও তাকে সহ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। তারা একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছে গেল এবং চলতে লাগল। তারা পৌঁছে গেল একটি ঘরে। ঘরের আলো তাদের সম্মুখে একটি স্থান উজ্জ্বল করে তুলেছিল, যেখানে দুটি সিঁড়ি নেমেছে। তারা প্রথম সিঁড়িতে চড়ে বসল। তখন কিছু সময়ের জন্যে ঘরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটি তাকে বলল ঃ তাকাও। সে তাকাতে কুকুর, গোলাম ও অজগর—তিনটিকেই দেখতে পেল নিহত অবস্থায়। সহসা ঘরের মাঝখানে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। সে লৌহ বর্ম পরিহিত। তার হাতে একটি তরবারি। সে লোকটিকে বলল—দেখেছ ? এখানে যদি এক হাজার ব্যক্তিও আসত, তাহলেও সে সেই সবকে হত্যা করে ফেলত। জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবে ? বলল ঃ কেননা সে একটি পন্থা উদ্ভাবন করে যথাযথ সাজ-সরঞ্জাম সহকারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই কোন ব্যক্তি এই দ্বিতীয় সিঁড়িটিতে পা রাখে নিচে যাওয়ার জন্যে, তখনই সে এগিয়ে এসে তাকে তরবারির দ্বারা আঘাত হানে। অতএব তুমি সেদিকে যাবে না, সাবধান। সে বললে, তাহলে এখন উপায়। বললে, উপায় হচ্ছে তুমি লোকটির পেছনের দিক দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ করবে। সেই সুড়ঙ্গ পথে তুমি তার

নিকটে যাবে। সেই দিক দিয়ে তুমি যদি তার নিকটে পৌঁছতে পার, তাহলে লোকটি নড়া-নড়া করতে পারবে না। তখন সৈনিক লোকটি মজুরীর বিনিময়ে কারিগর নিয়োগ করে লোকটির পেছন দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খুড়ল। তখন তারা সেই পথে লোকটির নিকট পৌঁছে গেল। দেখা গেল, যাদুকৃত ব্যক্তি সশস্ত্র হয়েছে ও তরবারি দিয়ে দিয়েছে। তখন তাকে উৎপাটিত করল। সেই ঘরেই তখন আর একটি দরজা দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলল। দেখল, সেখানে একটি সমাধি রাজবংশের কোন ব্যক্তির। ব্যক্তিটি পালংকের উপর মরে পড়ে আছে।

যাদুর এ ধরনের কার্যকলাপের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। রোম ও ভারতীয় চিত্র প্রদর্শকরা এ ধরনের যাদুর অনেক চিত্র তৈরী করে রেখেছে। দর্শক একজন মানুষ ও চিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। যে লোক আগে থেকে ওটিকে একটি বানানো প্রতিকৃতি রূপে জেনে না নেবে সে সেটি দেখে কোন সন্দেহই করতে পারবে না। বরং সেটি একটি জীবন্ত মানুষই মনে হবে তার কাছে। সে হয়ত দেখবে, মানুষটি হাসছে কিংবা কাঁদছে। এমন কি লজ্জার হাসি ও আনন্দের হাসির মধ্যেও এবং ক্রোধান্বিতের হাসির মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। এগুলো আসলে খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। আকাশ-কুসুম কল্পনার ব্যাপার, এক দুরন্ত প্রচ্ছন্ন ও গোপন ব্যাপার। এ পর্যায়ের কিছু কিছু স্পষ্ট ব্যাপার আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ফিরাউনের যাদুকরদের যাদুর ব্যাপারটিও এই ধরনেরই ছিল। যষ্ঠি ও রশির কলা-কৌশলের কীর্তি প্রসঙ্গে আমরা বয়ান করেছি। প্রাচীন ব্যবিলন অধিবাসীদের বিভিন্ন মত, তাদের যাদু ও কলা-কৌশলের বিভিন্ন রূপ ও ধরন পর্যায়ে আমরা যে সব ব্যাপারে উল্লেখ করেছি, এর বিষয়ে অবহিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকেই আমরা শুনেছি ও জেনেছি। বইতে লিখিতও পেয়েছি তার কিছু কিছু। নিবতী ভাষা থেকে একটি ঘটনা আমি আরবীতে অনুবাদ করেছি। তাদের যাদু ও তার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ একটি কিতাবে লিখিত পেয়েছি। এগুলোর মূলে নিহিত রয়েছে তারকার প্রতি তাযীম ও তার উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, সেই সাথে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিসসা-কাহিনী। সেগুলোর উল্লেখ এখানে সামঞ্জস্যশীল নয়। আর তাতে ফায়দা তো কিছু নেই।

আর এক প্রকারের যাদু আছে। তা জ্বিন শয়তান সম্পর্কিত কাহিনী, তাদের পূজা ও অনুসরণে তাবীজের ব্যবহার। ওরা এ সবের সাহায্যে ওদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় কতগুলো ব্যাপারকে এগিয়ে দিয়ে, যা লোকদের কর্তৃক ব্যবহৃত, এই উদ্দেশ্যেই তারা তা প্রস্তুতও করেছে। জাহিলিয়াতের জামানায় আরব গণকরা সেগুলো চালু করেছিল। তার অধিকাংশই মানুষকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মনগড়াভাবে বানানো। উক্ত বইটি না থাকলে এ পর্যায়ে কিছু বলাই সম্ভব হতো না। আমি সে বিষয়ে জানবার জন্যে অনেকগুলো মনগড়া কাহিনীর উল্লেখ করেছি। এ ধরনের মনগড়া কাহিনী অনেক রয়েছে। তা বলিষ্ঠ সংকল্পসিদ্ধ লোকদের জন্যে ক্ষতিকর। অবশ্য লোকদেরকে বিপদে ফেলা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। এই জন্যে তারা লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ কথা বলে যে, জ্বিন তাদের আনুগত্য করে আল্লাহ্ তা'আলার নামে তাবীজের কারণে। ওরা এর দ্বারা যার যার জবাব দিতে চায়, তাদেরকে জবাব দেয়। যার জন্যে ইচ্ছা তারা জ্বিন বের করে।

এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে, তারা তাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা ওদের সামনে প্রকাশ পায় যে, জ্বিনেরা আল্লাহ্‌র নামের কারণে ওদের আনুগত্য করছে। সুলায়মান ইবনে দাঊদ (আ)-এরও ওরা আনুগত্য করত এই আল্লাহ্‌র নামের বরকতে। ওরা তাদেরকে প্রচ্ছন্নতা ও চুরি করে নানা বিষয়ে সংবাদ দিত। মুতাজিদ বিল্লাহ (আব্বাসীয় খলীফা) বিপুল দাপট-প্রতাপ ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সব যাদুকরের কথায় প্রতারিত হয়েছিলেন। ইতিহাস লেখকগণ তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অন্দরমহলে যেখানে তিনি তাঁর বেগম ও পরিবারবর্গের সাথে একান্তে মিলিত হতেন—এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল। তার হাতে ছিল তরবারি। সে বিভিন্ন সময়ে প্রায়ই তথায় দেখা দিত। তবে যুহরের সময়ই বেশী আসত। কিন্তু তাকে ধরার জন্যে যখনই তার খোঁজ করা হতো, তাকে ধরা যেত না। তার কোন চিহ্নও কোথাও দেখা যেত না শত তালাশ করা সত্ত্বেও। অথচ তিনি কয়েকবারই তাকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাষ্ট্রের চিন্তাশীল পদাধিকারী লোকদের ডাকলেন। তারা এলে সেই সঙ্গে আরও বহু পুরুষ ও নারীকেও উপস্থিত করা হল। মনে করা হল যে, এদের মধ্যেরই কোন ব্যক্তি হবে। তিনি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্যে। তারা তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করল। মনে করল যে, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তিই হবে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। এর পরই লোকটি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন তারা দিশা হারিয়ে ফেলল, এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। তাকে তো তারা দেখছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল, দিশা পাওয়া গেল না। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা অতি মাত্রার চালাকি। এরূপ কীর্তি খুব একটা সাধারণ নয় এবং তা সম্ভব জ্বিনের আনুগত্যের কারণে। জ্বিনের সাহায্যেই এই আত্মগোপন সক্ষম হয়েছে। যখনই সে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখনই সে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই কারণে মুতাজিদের নিকট ব্যাপারটি অসহ্য হয়ে পড়ে। তবুও তিনি তাদের সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটি তার ঘরে সময় সময় আত্মপ্রকাশ করে। লোকেরা তাঁর প্রতি কতগুলো জিনিস আরোপ করে, তাদের নিকট যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে বিষয়ে না জেনেই তাঁর মন ভিন্ন দিকে মগ্ন হয়ে গেল। তখন তিনি লোকদেরকে ফিরে যেতে ও উপস্থিত প্রত্যেককে পাঁচ দিরহাম করে দেয়ার আদেশ করলেন। পরে তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করেন, যতটা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি ঘরের প্রাচীরসমূহে এমন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিলেন, যেন কারোর পক্ষে তা টপকানো বা উপর থেকে প্রবেশ করা সম্ভব না হয়। আর প্রাচীরের উচ্চ ভাগে এমন বাধা স্থাপন করে দিয়েছিল, যেন চোর যেরূপ সেগুলো ফেলে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে সেরূপ প্রবেশ করা কারোর পক্ষে সম্ভব না হয়। অতঃপরও অবস্থা এই ছিল যে, সেই ব্যক্তির পূর্বের ন্যায় ঘরের মধ্যে সময় সময় আত্মপ্রকাশ চলতেই থাকে। এই অবস্থার মধ্যেই মুতাজিদ ইন্তিকাল করে যান। অথচ প্রাচীরের উপর স্থাপিত বাধা-বিপত্তি যথাযথ বর্তমান ছিল। মুতাজিদ নির্মিত সেই প্রাচীর সেই অবস্থায় আমি দেখতে পেয়েছি। তখন আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী শাসক মুক্তাদির বিল্লাহ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই

জানতেন না। তিনি পরে তা জানতে পরেছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মুকতাদির বিল্লাহ্‌র শাসনামলেই প্রকৃত ব্যাপার জানা যায়। সে ব্যক্তি আসলেই ছিল বাড়ির একজন খাদেম। সাদা বর্ণের লোক ছিল। তার নাম ছিল ইয়াকাক। শাহী হেরেমের অভ্যন্তরে বসবাসকারী কোন দাসীর প্রতি সে আকৃষ্ট ছিল। সে বিভিন্ন রঙ ও বর্ণের দাড়ি নিজের নিকট রাখত। তার কোন একটি যখন সে নিজের মুখে লাগাত, তখন যে-ই তাকে দেখত, সে দাড়ি যে তার নিজের মুখে গাজান, এ বিষয়ে দর্শকের মনে কোন সংশয় জাগত না। সে যে-সময় যে দাড়ি ইচ্ছা পরিধান করত এবং নতুন বেশে সেখানেই সে আত্মপ্রকাশ করত। তার হাতে তরবারি কিংবা অন্য কোন অস্ত্র থাকত। আর এর-ই উপর মুতাজিদের নযর পড়ত। পরে যখন তাকে খোঁজ করা হতো, তখন বাগানের গাছপালার মধ্যে প্রবেশ করত। অথবা কোন চলাচল পথে বা আশ্রয়স্থলে চলে যেত। সে যখন তার খোঁজকারীর দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত, তখন তার মুখের দাড়ি টেনে খুলে ফেলত এবং সেটি আস্তিনে বা কেটে গর্ত করা অঙ্গে লুকিয়ে রাখত। হাতিয়ারটি তার নিকটে থেকে যেত। তখন মনে হতো, সে এ বাড়িরই একজন কর্মচারী, কোন ব্যক্তির সন্ধান কাজে নিয়োজিত। তাকে কেউ সন্দেহ করত না। তাকেই বরং লোকেরা জিজ্ঞাসা করত এই বলে যে, এ দিকে কাউকে আসতে দেখেছ? আমরা একটি লোককে এদিকে আসতে দেখেছি। জবাবে সে বলত—না, আমি তো কাউকে দেখিনি। ঘরের মধ্যে এ কারণে একটি ভীতির সঞ্চার হতো। তখন ঘরের অভ্যন্তর থেকে দাসীরা বের হয়ে আসত এই স্থানটিতে। তখন সে তার কাঙ্ক্ষিত দাসীটিকে দুই চোখ ভরে দেখত এবং মনের মত কথা-বার্তা বলত। আসলে তার এ সব কাজের মূলে দাসীটির সাক্ষাৎ পাওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। মুকতাদির বিল্লাহর সারা শাসন আমলব্যাপী তার এই ভাবে কথা বলা চলতে থাকে। তারপর সে দেশ বিদেশের সফরে বের হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তরসূস-এ উপনীত হয়। সেখানেই সে অবস্থান গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত সে মরে যায়। পরে সেই দাসীটি তার কাহিনী বর্ণনা করেছে। তাতে তার অবলম্বিত কলা-কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেছে। বস্তুত এ হচ্ছে একজন খাদেমের অবলম্বিত বিচিত্র লীলাখেলা। তা এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, মুতাজিদ বিল্লাহ্‌র শত চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তবু তার এ সব কার্যকলাপ কোন নতুন উদ্ভাবিত কলা-কৌশল ছিল না। এগুলোকে অনেকে আবার জীবিকার উপায় হিসেবেও গ্রহণ করেছে।

আর এক প্রকারের যাদু হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ রচনা ও প্রচার (calumny)। লোকসমাজে তা ব্যাপকভাবে প্রচার ও ঘরে ঘরে পৌছানো (Slander) এবং এর মাধ্যমে সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা এবং গোপন প্রচ্ছন্ন উপায়ে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকরণ। বস্তুত এই ব্যাপারটি জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসারিত। বর্ণনা করা হয়েছে, একটি মেয়েলোক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির সংকল্প গ্রহণ করে প্রথমে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, তোমার স্বামী তোমার প্রতি বিরাগভাজন। তার উপর যাদু করা হয়েছে, তাকে তোমার দিক থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। এ জন্যে আমিও তোমার

খাতিরে তার উপর যাদু করাবো, যেন সে তোমাকে ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোযোগী না হয়, অন্য কারোর দিকে চোখ তুলে না তাকায়। কিন্তু সেজন্যে তার তিন গাছি মাথার চুলের দরকার, যা তুমি ক্ষুর দিয়ে কেটে আমার হাতে দেবে। তাতেই কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। স্ত্রী তার কথায় প্রতারিতা হল, তাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করল। এর পর সেই স্ত্রীলোকটি স্বামীর নিকট গেল। বলল, তোমার স্ত্রী তো অপর এক ব্যক্তির গলায় ঝুলে পড়েছে। এখন সে তোমাকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। আমি তার এই সংকল্প সম্পর্কে তার নিকট থেকেই জানতে পেরেছি এবং তদ্দরুন আমি তোমার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার কল্যাণ কামনাই আমাকে তোমার নিকট আসতে ও এ বিষয়ে তোমাকে অবহিত করতে বাধ্য করেছে। তোমার জন্যে উপদেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর কুহক-জালে পড়ো না, তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। সে তোমাকে হত্যা করবে ক্ষুর দ্বারা। তুমি নিজেই তা দেখতে পাবে। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। রাতে স্বামী তার ঘরে ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়েছে। স্ত্রী যখন মনে করল তার স্বামী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে এক ধারাল ক্ষুর নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হল এবং তার মাথা থেকে তিনটি চুল কেটে নিতে উদ্যত হল। ঠিক তখনই স্বামী চোখ খুলে দেখতে পেল, তারই স্ত্রী ক্ষুর দিয়ে তার গলা কাটতে উদ্যত হয়েছে। সে যে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছে, এ বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহই থাকল না। তখন সে চট করে স্ত্রীকে হত্যা করল। শেষে এই হত্যার বিনিময়ে সে-ও নিহত হল। এই ধরনের কুচক্রের অনেক কাহিনীই রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না।

আর এক প্রকারের যাদু আছে, তা হচ্ছে খাদ্যে এমন ঔষধ সংমিশ্রণ যা বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত ও বিলুপ্ত করে। যেমন গাধার মগজ কোন মানুষ খেলে তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে, তার বুঝ-সমঝ হারিয়ে যাবে বা কম হয়ে পড়বে। এ ছাড়া আরও অনেক ঔষধ আছে, যার উল্লেখ তিব-এর কিতাবে রয়েছে। লোকেরা সেই ঔষধ খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়। কেউ তা খেলে তার বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পেয়ে যাবে, তখন সে নানা অবাঞ্ছিত কাজকর্ম করে। লোকেরা তখন বলে—এই ব্যক্তির উপর যাদু করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ বিবেক বুদ্ধি বলে দেয়—এগুলো সব কল্পিত—এর মূলে কোন বাস্তবতা নেই। এ পর্যায়ে লোকেরা দাবি করে যে, যাদুকর ও সংকল্পকারী যদি তাদের দাবিকৃত উপায়ে মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে পারত, যদি উড়তে, গায়বের জ্ঞান জানত, দূরবর্তী নগর জনপদের খবর দিতে সক্ষম হত, গোপন বিষয়ে জানিয়ে দিতে পারত, চুরির হদিস করতে পারত বা উল্লিখিত উপায় ছাড়া অন্যভাবে মানুষের ক্ষতি-উপকার করতে পারত, তা হলে তো তারা রাজ্য, সাম্রাজ্যও উড়িয়ে দিতে পারত, মাটির তলায় রক্ষিত মূল্যবান সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে এবং রাজা-বাদশাহকে হত্যা করে দেশের পর দেশ জয় করে নিতে পারত। অথচ তা করতে গিয়ে তারা নিজেরা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সম্মুখীন হতো না, কোন খারাপ অবস্থায় পড়ত না। তারা যে-কোন ইচ্ছা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকত না। মানুষের হাতের সম্পদ দাবি করার কোন প্রয়োজনই তাদের হতো না। কিন্তু তার কোনটাই যখন হয় না; বরং ওসব ক্ষমতার

দাবিদারদের অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ওদের অধিকাংশই হয় লোভী, নানা কৌশল অবলম্বন করে লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা পাওয়ার জন্যে। নিজেদের দারিদ্র্য লোকদের নিকট প্রকাশ করে। এ থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ওরা আসলে কিছুই করতে পারে না। সমাজের মূর্খ ও শীর্ষস্থানীয় বোকা লোকেরাই ওদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে যাদুকরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটাবার ভিত্তিহীন দাবি। যারা তাদেরকে সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে, ওরা তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে। ওরা স্বকপোলকল্পিত বানোয়াট অনেক কথাবার্তাই প্রচার করে সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন হাদীসে একটি বর্ণনা রয়েছে। একটি মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে একজন (স্ত্রী) যাদুকর। আমার এই গুনাহ্ থেকে তওবা করার কোন পথ আছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি যাদুকর? জবাবে বলে, আমি ব্যবিলনে হারুত-মারুতের অবস্থান স্থানে ভ্রমণ করেছি এই যাদুবিদ্যা লাভের জন্যে। তারা দুজনই বলেছে—না, হে আল্লাহ্র বান্দী, তুমি দুনিয়ার সুখ লাভের লোভে পরকালীন আযাবের পথ অবলম্বন করবে না। কিন্তু আমি তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করি। তখন তারা দুজন আমাকে বলে ঠিক আছে, তুমি ওদিকে ছাই-স্তুপের উপর গিয়ে প্রস্রাব করে আস। আমি তাদের আদেশ মত তাই করতে চলে যাই। তখন আমার মনে দ্বিধা জাগল, আমি কথাটি বিবেচনা করলাম। ফলে আমি তা করলাম না। অথচ ওদের নিকট ফিরে এসে আমি ওদের কথামত কাজ করেছি বলে জানালাম। তারা বলল ওখানে কি দেখেছ? বললাম কিছুই দেখতে পাইনি সেখানে। তখন ওরা দুজনই বলল ঃ না, তুমি আমাদের কথামত কাজ করনি। যাও, যা বলেছি, তাই করে এস। তখন আমি আবার গেলাম প্রস্রাব করলাম। তখন দেখলাম, আমার গুপ্তস্থান (স্ত্রী-অঙ্গ) থেকে লৌহ বর্ম পরিহিত এক অশ্বারোহী বের হয়ে এসেছে। পরে সে আকাশে উঠে গেল। তখন ওদের নিকট ফিরে এসে ঘটনার খবর দিলাম। তখন ওরা দুজন বলল—ও হচ্ছে তোমার ঈমান, তোমার ঈমান তোমার কাছ থেকে চলে গেছে। তুমি ভালো যাদুকর হয়ে গেছ। বললাম—তা কেমন করে? বলল—এক্ষণে তুমি যা-ই করতে চাইবে, তার কল্পনা মনে মনে করে নেবে, তা-ই হয়ে যাবে। তখন আমি মনে করলাম যবের একটি দানা। আর অমনি যবের একটি দানা পেয়ে গেলাম। আমি দানাটিকে লক্ষ্য করে বললাম—এখন ফসল ফলাও। অমনি অল্প সময়ের মধ্যে তা গাছ হয়ে তাতে ছরা ধরল। সেই যবের ছরার দানাসমূহকে গুড়ি হয়ে আটায় পরিণত হয়ে রুটি হয়ে যেতে বললাম। অমনি তাই হয়ে গেল। এভাবে আমি মনে যে জিনিসেরই ধারণা বা কল্পনা গ্রহণ করি, বাস্তবে তাই হয়ে যায়। এসব শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন—না, তোর তওবা নেই। বর্ণনায় তার 'কিসাস' হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ মূর্খ মানুষের নিকট এই ধরনের কথা বর্ণনা করা হলে তারা তা সত্য বলে মেনে নেয়। তারাই তা প্রচার করে।

এ পর্যায়ে আর একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয় ইবনে হুরায়রা সম্পর্কে। বলা হয়—সে একটি যাদুকর মেয়েলোক আটক করে। সে তার নিকট যাদু করার বিষয়ে স্বীকারক্তি করে। তখন ইবনে হুরায়রা শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের ডাকেন এবং এই যাদুকর স্ত্রীলোকটির

কি শাস্তি হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা রায় দিলেন যে—ওকে হত্যা করতে হবে। ইবনে হুরায়রা বলেন, আমি ওকে হত্যা করব পানিতে ডুবিয়ে। তিনি একটি লৌহ নির্মিত চরকির সাথে ওর পা শক্ত করে বেঁধে ফোরাত নদীতে ফেলে দিলেন। পরে সে সেই লৌহ চরকিটিসহ্ পানির উপর ভেসে উঠে এবং পানির সাথে ওলট-পালট খেতে লাগল। তা দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ইবনে হুরায়রা ঘোষণা করল—ওকে যে ধরে দেবে তাকে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন পুরুষ যাদুকর ছিল। সে সে-কাজে আগ্রহী হয়ে বলল আমাকে একটি পানি ভর্তি কাঁচের পেয়ালা দিন। লোকেরা তা উপস্থিত করল। লোকটি সে পাত্রের উপর বসে প্রস্তরের নিকটে গেল। পাত্র দ্বারা পাথরটি ভাঙ্গল টুকরা টুকরা করে। তখন সে স্ত্রী যাদুকরটি ডুবে গেল। লোকেরা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল।

কিন্তু যে লোক এইসব কীর্তিকলাপকে প্রকৃত ও সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে নবুয়তকে বুঝতে পারবে না। সে মনে করবে, নবী-রাসূলগণের মুজিযাও বুঝি এই ধরনেরই ব্যাপার। তারাও নাউজুবিল্লাহ—যাদুকর ছিলেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى - (طه : ٦٩)

যাদুকর যা-ই নিয়ে আসুক, সে কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

যাদুকরদের এরও অধিক খারাপ ও বীভৎস কার্যাবলীর লোকশ্রুতি রয়েছে। ওরা ধারণা করেছে, নবী করীম (স) যাদু করেছেন—(নাউজুবিল্লাহ) এবং যাদু কার্যের মধ্যেও বুঝি সত্য নিহিত আছে। এমনকি এতদূরও বলা হয়েছে যে, মনে খেয়াল জাগে যে, আমি কিছু বলছি বা করছি। অথচ আসলে আমি কিছু বলিওনি, করিওনি। বলা হয়, এক ইয়াহূদী নারী রাসূলে করীম (স)-কে চিরুনী ও চুল ইত্যাদি সহযোগে যাদু করেছিল। এই সময় জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। ঐসব জিনিস একটি কূপের তলদেশে লুক্কায়িত ছিল। সেগুলো বের করা হল। ফলে তিনি ভাল হয়ে গেলেন। যাদুর প্রভাব তাঁর উপর থেকে দূরীভূত হয়ে গেল। কিন্তু কাফিররা নবী করীম (স) সম্পর্কে যা বলত, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের সে কথাকে মিথ্যা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذْيَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا - (الاسرا : ٤٧)

জালিম-কাফিররা বলে যে, তোমরা তো একজন যাদু প্রভাবিত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

নাস্তিক মুলহিদ লোকেরা বহু কথাই বলেছেন। বলে, খাদ্যের মাধ্যমে তাঁকে যাদু করা হয়েছে। আর এ সবের সাহায্যে তারা নবী-রাসূলগণের মুজিযাকে বাতিল প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে ব্যাপারে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, নবী-রাসূলগণের মুজিযা ও যাদুকরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—এ

সবই একই পর্যায়ের জিনিস। যারা নবীগণকে সত্য মানে, তাঁদের মুজিযাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার সেই সাথে যাদুকরদের এসব কার্যকলাপ কেউ যথার্থ বলে বিশ্বাস করে, তাদের নীতি খুবই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ 'যাদুকররা যা-ই নিয়ে আসুক, কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।' তা করে তারা সত্য মানে তাকে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন, যাদের দাবি ও কলা-কৌশলকে বাতিল বলে জানিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা অসম্ভব নয় যে, ইয়াহুদী নবী মূর্খতাবশতই সে কাজ করেছিল একথা মনে করে যে, এর ফলে শরীর প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হবে। নবী করীম (স) সম্পর্কেও সে তাই মনে করে ঐ কাজ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদুর জিনিস লুকিয়ে রাখার স্থানটির গোপনীয়তা দূর করে তাঁকে সব জানিয়ে দিলেন। তাতে স্ত্রীলোকটির মুর্খতা-ই প্রমাণিত হল। তাই জানিয়ে দেয়াটা নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত। না, তাঁকে তা এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি, তাঁর নবুয়তের ব্যাপারটিও অস্পষ্ট মিশ্রিত করতে পারে নি। সব কয়জন বর্ণনাকারী রাসূলে করীম (স)-এর ব্যাপার অস্পষ্ট সংমিশ্রিত করেছিল বলে বর্ণনা করেন নি। আসলে এ সম্পর্কিত কথা মূল হাদীসে বাড়তি ও সংযোজন ছাড়া কিছুই নয়। তার কোন ভিত্তি নেই।

বস্তুত নবী-রাসূলগণের মুজিযা এবং উল্লিখিত ধারণা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবী-রাসূলগণের মুজিযা বাস্তব ভিত্তিক, পরম সত্য। তার বাহ্যিক যেমন, ভেতরের দিক থেকেও তা ঠিক তেমনি। যতই চিন্তা বিবেচনা করা হবে, তার সত্যতা সম্পর্কে দৃষ্টি ততই সূক্ষ্ম ও প্রসারিত হবে। সমগ্র সৃষ্টিও যদি তার মুকাবিলা ও বিরোধিতা করতে চেষ্টা করে বা অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত করতে চেষ্টা করে, তবুও তা করতে সক্ষম হবে না। তাতে তাদের অক্ষমতা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। প্রমাণিত হবে যে, যাদুকরদের মনগড়া সব কার্যকলাপ ও কল্পনা ধারণা এক প্রকারের কলা-কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভিত্তিহীন জিনিস প্রকাশ করার একটা কৌশল মাত্র। আর তারা ভিত্তিহীন যে সব জিনিস প্রকাশ করে, একটু চিন্তা পর্যালোচনা করলেই তার অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। আর এ জিনিস যে-ই যখন চাইবে শিখতে পারবে। তাতে দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে এবং অন্যরা যেমন দেখিয়েছে তারাও তেমনি সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারবে, যার মূলে আসলেই কোন বস্তু নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ পর্যন্তকার আলোচনায় যাদুর তাৎপর্য ও তার সারবস্তু সম্পর্কে অনেক তত্ত্বকথা বলেছি। পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। এই কলা-কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা, তার সকল দিক ও শাখা প্রশাখার ব্যাখ্যা দেয়া দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। এজন্যে আমরা স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন বোধ করি। এখানে প্রসঙ্গত যাদুর শুধু তাৎপর্য ও সে সম্পর্কে কুরআনে সিদ্ধান্ত আলোচনা করা মুখ্য। এখন যেখানে আমরা এসে পৌঁছেছি তাতে ফিকাহ্বিদদের মতামত উল্লেখ এবং এ পর্যায়ের আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে। যাদু ও যাদুকরদের গুনাহ্ অনুপাতে তাদের শাস্তি নির্ধারণ তাদের কাজের দরুন সৃষ্ট বিপর্যয়ের বিপুলতা ও ব্যাপকতার পর্যালোচনা এখানেই করতে হবে। প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

যাদুকরদের ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত

এ বিষয়ে আগের কালের শরীয়াতবিদদের মন্তব্য

আবদুল বাকী উসমান ইবনে উমর আযযবী আবদুর রহমান ইবনে রিজা ইসরাইল, আবূ ইসহাক হুরায়রা সূত্রে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا اَوْسَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যে লোক কোন গণকদার বা গোপন কথার খোঁজদাতা কিংবা কোন যাদুকরের নিকট গেল এবং সে যা বলে তাকে সত্য বলে মেনে নিল, সে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি কাফির হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ নাফে—ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি দাসী হযরত হাফ্সা (রা)-এর উপর যাদু করেছিল। লোকেরা তার যাদুর জিনিসপত্র পেয়ে গেল। দাসীও স্বীকার করল যাদু করার কথা। তখন আবদুর রহমান ইবনে যায়দ তাকে হত্যা করলেন। এই সংবাদ হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি এই কাজকে অপছন্দ করলেন। পরে হযরত ইবনে উমর (রা) তার নিকট এলেন এবং দাসীটি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁকে জানলেন।

পরে দেখা গেল যে, হযরত উসমান (রা) এই হত্যাকে অপছন্দ করেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়াই তা করা হয়েছিল।

ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দীনার থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বাজালাকে বলতে শুনেছেন—আমি জজী ইবনে মুআবিয়াকে লিখতে চেয়েছিলাম। এ সময়ই হযরত উমর (রা)-এর চিঠি এসে গেল এই ফরমান নিয়ে ঃ

اَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ -

প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী যাদুকরকে হত্যা কর।

অতঃপর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

আবূ আসিম আশ্আস-হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ السَّاحِرُ وَلَا يُسْتَتَابُ -

যাদুকরকে হত্যা করতে হবে, তাকে তওবা করতে বলা যাবে না।

আল-মুসান্না ইবনুস্ সালাহ্ আমর ইবনে শুয়াইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি যাদুকরকে ধরে বুক পর্যন্ত মাটিতে দাফন করে রেখে দিয়েছিলেন। পরিণামে সে মরে গিয়েছিল।

সুফিয়ান আমর সালিম ইবনে আবুল জায়াদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কায়স

ইবনে সাদ মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তখন কেউ তার গোপন কথা সব প্রকাশ করে দিচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, আমার সব গোপন কথা কে প্রকাশ করে দিচ্ছে? লোকেরা বলল ঃ এখানে একজন যাদুকর আছে। সে-ই তা করছে। তাকে তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। বলল, আপনি যখন খোলা চিঠি পাঠান তখন আমরা তার বিষয়বস্তু জানতে পারি। কিন্তু চিঠি সিলমোহরকৃত বন্ধ থাকলে আমরা তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। পরে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়।

আবূ ইস্‌হাক শায়বানী জামে' ইবনে শাদ্দাদ-আস্‌ওয়াদ ইবনে হিলাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْعَرَّفِيْنَ كُهَّانُ الْعَجَمِ، فَمَنْ اَتَى كَاهِنًا يُؤْمِنُ لَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَهُوَ بَرِىٌّ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

এসব গোপন কথা ফাসকারী লোকেরা অনারব গণকদার। যে লোক কোন গণকদারের নিকট আসবে ও সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন হয়ে যাবে।

মুবারক হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক (তিনি জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী) একজন যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন।

ইউসুফ জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ سَاحِرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَايُقْتَلُ سَاحِرُ اَهْلِ الْكِتَابِ –

মুসলমানের যাদুকরকে হত্যা করা হবে। আহলি কিতাব যিম্মীদের যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না।

কেননা নবী করীম (স)-কে একজন ইয়াহূদী ব্যক্তি যাদু করেছিল। তার নাম ছিল ইবনে আসাম। আর খায়বরের এক ইয়াহূদী নারী যাদু করেছিল। তার নাম ছিল যয়নব। কিন্তু নবী করীম (স)-সে দুজনকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করেন নি।

উমর উবনে আবদুল আজীজ বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ السَّاحِرُ –

যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আগের দিকের ফিকাহবিদগণ যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ একমত। কেউ কেউ অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে যাদুকরের কাফির হওয়ার কথা প্রমাণ করেছেন।

একালের বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদরা যাদুকর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ইবনে শুজু' হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

যাদুকরকে হত্যা করা যাবে যখন নিঃসন্দেহে জানা যাবে যে, সে একজন যাদুকর। তার নিকট থেকে তওবা কবুল করা যাবে না। আমি যাদু ত্যাগ করব। এবং তওবা করব তার এই কথাও গ্রহণ করা যাবে না। সে যদি স্বীকার করে যে, সে একজন যাদুকর, তাহলে তার রক্তপাত সম্পূর্ণ হালাল। দুজন সাক্ষী যদি তার যাদুকর হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তার কাছে যাদু কাকে বলে তার পরিচিতিও পেশ করা হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, তাকে তওবা করতে বলা যাবে না। সে যদি স্বীকার করে যে, আমি একজন যাদুকর এবং আজ থেকে বহু পূর্বেই আমি তা ত্যাগ করেছি, তাকে হত্যা করা যাবে না। অনুরূপ যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, হ্যাঁ, সে কোন এক সময় যাদুকর ছিল এবং সে তা বহুকাল পূর্বে ত্যাগ করেছে, তাহলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে সাক্ষীরা যদি বলে যে, সে এখনও একজন যাদুকর, আর সে-ও তার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। মুসলমান গোলাম, যিম্মী ও স্বাধীন যিম্মী যদি সাক্ষীদের নিকট স্বীকার করে যে, সে একজন যাদুকর, তাহলে তার রক্তপাত হালাল। তাকে হত্যা করা হবে। তার তওবা কবুল করা যাবে না। অনুরূপ কোন ক্রীতদাস কিংবা যিম্মী সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুর গুণ পরিচিতি সহ সে জানে যে, তা-ই যাদু, তা হলে তার তওবা কবুল করা যাবে না, তাকে হত্যা করা হবে। দাস বা যিম্মী যদি নিজেকে যাদুকর বলে স্বীকারোক্তি করে কিংবা বহুকাল পূর্বেই তা ত্যাগ করেছে বলে দাবি করে আর যদি বহু লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে অতীতে কোন এক সময় যাদু করছিল, সেই সময়ও সে যাদুকর বলে লোকেরা সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কোন নারী সম্পর্কে যদি লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুকর কিংবা সে নিজেও তার স্বীকৃতি দেয়, তাহলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করে তার উপর মারপিঠ করতে হবে। শেষে যদি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, সে যাদু কাজ ত্যাগ করবে, অথবা দাসী ও নারী যিম্মী সম্পর্কে যদি লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুকর বা সে নিজে তা স্বীকার করে তবু তাকে হত্যা করা যাবে না। তাকে আটক করে রাখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে যে, সে সব কিছু ত্যাগ করেছে। এই সবই ইমাম আবূ হানীফার কথা। ইবনে শুজা বলেছেন, যাদুকর পুরুষ স্ত্রীর ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে, যা মুর্তাদ পুরুষ নারী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। তবে তাকে ধরে নিয়ে এলে সে যদি যাদুকর হওয়ার কথা স্বীকার করে বা কেউ তার সাক্ষ্য দেয় যে, তা-ই তার কাজ, তাহলে তা তার মুর্তাদ হওয়ার প্রমাণ হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে শুজা আবূ আলী আর-রাযী থেকে বর্ণনা করেছেন—আমি ইমাম আবূ ইউসুফকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, ইমাম আবূ হানীফা যাদুকরকে হত্যা করতে ও তার তওবা কবুল না করতে বলেছেন। কিন্তু সে মুর্তাদের ন্যায় নয় ? জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ হ্যাঁ, যাদুকর কুফর করার পর সে সমাজে পির্যয় সৃষ্টিও করতে চেষ্টা করেছে। আর সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে চেষ্টাকারী যদি হত্যাকাণ্ড করে তবে তাকে দণ্ডস্বরূপ নিশ্চয়ই হত্যা করতে হবে। তখন আবূ ইউসূফ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—যাদুকর কে? বললেন, ইয়াহূদী ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর প্রতি যে আচরণ করেছিল, তারই মত কাজ যে করবে, সে-ই যাদুকর। তার দেয়া সংবাদের ফলে কোন হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হলে

উভয়কেই হত্যা করা হবে, কোন হত্যাকাণ্ড না ঘটলে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা লবীদ ইবনুল আসাম রাসূলে করীম (স)-কে যাদু করেছিল; কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করেন নি, কেননা সেই যাদুর কারণে কোন হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই যা বলা হয়েছে, তাতে সেই যাদুর তাৎপর্য বলা হয়নি, যার দরুন যাদুকরকে হত্যা করা প্রয়োজন দেখা দেয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) সম্পর্কে এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, তিনি যাদু সম্পর্কে সেই বিশ্বাস পোষণ করবেন, যা বাজে লোকেরা পোষণ করে। কোনরূপ স্পর্শ করা বা ঔষধ সেবন করানো ব্যতিরেকেই যাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম, এরূপ ধারণা তিনি পোষণ করতে পারেন না। এটাও সম্ভব যে, ইয়াহূদী ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে কোন খাদ্য দ্বারা হত্যা করতে ইচ্ছা করেছিল। ঠিক সময়ে আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার গোপন ইচ্ছার কথা। যেমন ইয়াহূদী যয়নব বিষাক্ত ছাগলের গোশ্ত খাইয়ে তাকে হত্যা করতে সংকল্প গ্রহণ করেছিল। ছাগলটিই তাঁকে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছিল। তখন রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ এই ছাগীটিই আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে একটি বিষাক্ত ছাগী।

আবূ মুসয়িব ইমাম মালিক-এর এই মত বর্ণনা করেছেন যে, কোন মুসলিম ব্যক্তিও যদি যাদুকর্মের কর্তা হয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। তারও তওবা গ্রহণ করা হবে না। কেননা বাহ্যত মুসলিম ব্যক্তি যদি গোপনে মুর্তাদ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মুসলমানিত্ব প্রকাশ করার দরুন তার তওবাকে 'তওবা' গণ্য করা যায় না।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেছেন, আহ্লি কিতাবের যাদুকরকে ইমাম মালিকের মতে—হত্যা করা যাবে না! হ্যাঁ, তদ্দরুন মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। কেননা সে এই কাজ করে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, যাদুকর যদি বলে যে, আমি কাউকে হত্যা করার লক্ষ্যে একটা আমল করি। তবে কখনো এই আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার কখনো সঠিকভাবে কাজ করে। অমুক ব্যক্তি আমারই আমলের কারণে মরেছে। তাহলে তাকে দীয়ত দিতে বাধ্য করা হবে। সে যদি স্বীকার করে যে, আমার কৃত আমল যার উপর হবে, সে নিহত হবে। আর আমি তাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েই তা করেছি, তাহলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে শাস্তিস্বরূপ। যদি বলে আমার আমলের দরুন সে রোগাক্রান্ত হয়েছে, মরে যায়নি, আর মৃতের অভিভাবকগণ যদি 'কসম' করে বলে যে, তার দরুনই সে মরেছে, তাহলে দীয়ত ধার্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী যাদুকরকে যাদুর কারণে কাফির গণ্য করেন নি। তাকে একজন সাধারণ অপরাধী গণ্য করেছেন মাত্র, যেমন অন্যান্য অপরাধী হয়ে থাকে। অথচ আগের কালের ফিকাহ্বিদদের যে মতের আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে যাদুর বিষের দরুন নিহত হওয়ার যোগ্য অবশ্যই হবে বলে প্রমাণিত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, তারা তাকে কাফির গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর মত সমস্ত ফিকাহবিদদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। তাঁদের একজন তাকে হত্যা করার পক্ষে।

কেননা সে অন্য একজনকে হত্যা করেছে তার যাদুকর্মের দ্বারা। অতএব তাকে হত্যা করা ওয়াজিব (ফরয)।

আবূ বকর বলেছেন, এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য এবং তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছি। তার মধ্যে প্রথম প্রকারের যে যাদুর কথা আমরা বলেছি, তা হচ্ছে ব্যবিলনবাসীদের যাদু। তা অতি প্রাচীন কালের ব্যাপার। সাবেয়ীদের ধর্মমত এই যাদু থেকেই গড়ে উঠেছে। আর আল্লাহ এই যাদু সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 'আর যা নাযিল হয়েছে সেই দুজন ফেরেশতার প্রতি,' তাতে মনে হয় প্রকৃত কথা আল্লাহ জানেন, এই যাদুর পক্ষপাতী ও তার সত্যতা স্বীকারকারী এবং সেই যাদুকর্ম যে করে সে সম্পূর্ণ কাফির। আমার মতে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এই বিষয়েই বলেছেন যে, তার তওবা কবুল করা যাবে না। কুরআনের আয়াতে এই ধরনের যাদু সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তার দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা আবদুল বাকী ইবনে নাফে' ফতীর-আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাতান-আবদুল্লাহ্ ইবনুল আখনাস-ওয়ালীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইউসূফ ইবনে মাহিক সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তা হল নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ –

যে লোক তারকা-গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ সম্পর্কিত কোন বিদ্যা অর্জন করল, যে যাদুর একটা শাখা আয়ত্ত করল।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আয়াতে সেই যাদুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, যা গ্রহ-তারকার গতিবিধির উপর ভিত্তিশীল। আর আমরা তাকেই বলেছি সাবেয়ীন ও ব্যবিলনবাসীদের যাদুবিদ্যা। কেননা আমাদের উল্লিখিত সমস্ত প্রকারের যাদুরই সম্পর্ক তারকা-গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে নয়। আর দ্বিতীয় নিন্দিত যাদুর শব্দটি তন্মধ্যে কেবল এই প্রকারের যাদুকেই শামিল করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আগের কালের ফিকাহ্বিদদের নিকট এই প্রকারের যাদুই পরিচিত ছিল। মুজিযা সম্পর্কে যা কিছু দাবি করা হয়, তা তারকা-নক্ষত্র-গ্রহের সাথে সম্পর্কিত না হলেও আমাদের উল্লিখিত প্রকারসমূহ ছাড়া অন্য কিছু। এই কাজ যে করে তাকে হত্যা করার মূলে এই লক্ষ্যই নিহিত। কেননা তাতে ঔষধ, মিথ্যা অপবাদ রটানো, বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ভোজবাজি-ম্যাজিক (Jugglary) দেখানো দ্বারা যাদুর কর্তা ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, এই যাদুর এই প্রকারসমূহ তার কর্তাকে হত্যা করা ফরয করে দেয় না। কেননা তাতে মানুষের পক্ষে অসাধ্য মুজিযা সৃষ্টির দাবি করা হয় না। প্রমাণিত হল যে, যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয় যদি মুজিযার যাদু করার দাবি করা হয়, তবে। কেননা তা এবং তার মত ঘটনা ঘটানো কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণ কর্তৃকই সম্ভবপর। এসবের দ্বারাই তাঁদের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়টি দুটি তাৎপর্যে বিভক্ত। একটি—প্রথমেই আমরা ব্যবিলনবাসীদের যাদুর উল্লেখ করেছি। আর

দ্বিতীয় হচ্ছে—যে সম্পর্কে তার কর্তারা তা শয়তানের বিচিত্র সেবা-সহযোগিতার মাধ্যমে করা হয় বলে দাবি করে। এই উভয় গোষ্ঠীই কাফির। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী কাফির এজন্যে যে, তাদের কৃত যাদুকে গ্রহ-তারকা-নক্ষত্রের প্রতি তাযীম শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন রয়েছে এবং সেসবকে 'ইলাহ' পর্যায়ে গণ্য করা হয়। আর দ্বিতীয়োক্ত গোষ্ঠী কাফির এজন্যে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও এই বিশ্বাসটাও তাদের রয়েছে যে, জ্বিন তাদেরকে গায়ব-এর সংবাদ দেয়। জীব-জন্তু, বাতাসে উড্ডয়নকারী পাখী, পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলা প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবর্তনশীল ক্ষমতা দান করে বলে মনে করা হয়। নবী-রাসূলগণের সংবাদ দানকে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা খবরদাতাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চাওয়া হয়। আর এরূপ বিশ্বাস যাদের, তারা নবী-রাসূলগণের সত্যতা সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাগণের দ্বারা যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা এবং নবী রাসূলগণের সংবাদ দান কখনই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এই গোষ্ঠী কাফির হয়েছে তো এই কারণে। ওরা তো নবী-রাসূলগণের সত্যতা সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাগণের সত্যতার পরম মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অজ্ঞ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যাদুকরদের পর্যায়ে তাদের অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা ও তাদের কৃত যাদুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদের হত্যা করা সম্পর্কে যে মত দিয়েছেন, তারা হচ্ছে সেসব যাদুকর, যাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَوَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ -

ওরা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেয় তা, যা সেই দুজন ফেরেশতার প্রতি নাযিল হয়।

শুরুতে যাদুর যে বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করেছি, এরা হচ্ছে সেই যাদুকর। ওদের যাদুবিদ্যার মূল উৎস প্রাচীন ব্যবিলনবাসীদের যাদুবিদ্যা। সেই সময় হয়ত সেই যাদু বিদ্যাই সাধারণ ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-ও অসম্ভব নয় যে, তখন এই সর্বপ্রকারের যাদুর ধারক লোকও পাওয়া যেত। তারা গায়ব সম্পর্কে সংবাদদান, ব্যবিলনীয় পদ্ধতিতে জীব-জন্তুর আকার-আকৃতি বদলে দেয়ার দাবি করত। আরব গণকদাররাও উল্লিখিত সর্বপ্রকারের যাদুর ধারক হতো বলে সকলেই কুফর-এর পথের অনুসারী ছিল এসব দাবি-দাওয়ার কারণে। তারা নবী-রাসূলগণের মুজিযায় তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকেও তারা জায়েয মনে করত। মোটকথা, আগের কালের শরীয়াতবিদদের নিকট যাদু বলতে এই জিনিসই প্রচলিত ও চিহ্নিত ছিল। যাদুকরকে হত্যা করা ফরয বলে তাঁরা যে মত দিয়েছেন, তা কোন অপরাধের উস্কানিদানের পর্যায়ে গণ্য নয়। বরং যাদু সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল এবং তার দ্বারা তারা অন্যদের উপর যে অপরাধজনক কর্মকাণ্ড ঘটাত, কেবল সেই কারণেই তাদেরকে হত্যা করা ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভোজবাজির খেলা প্রদর্শনকারী, হাতের নাড়ানো-চাড়ানোর-লুকানোর মাধ্যমে বা ঔষধ দ্বারা মানুষকে নির্বোধ বানানো কিংবা প্রাণ সংহারকারী বিষ প্রয়োগে যা করত, মিথ্যা দোষ আরোপ, দুর্নাম রটানো, মারধোর ও বিপর্যয় সৃষ্টি ইত্যাকার যারা করত, তারা সেগুলোকে নিতান্ত কলা-কৌশল বলত, মনগড়াভাবে উদ্ভাবন করত, লোকদের নিকট

থেকে তারা তা গ্রহণ করত, ওরা কাফির হতো না। ওদের জন্যে কড়া শাসনের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের সাহায্যে এসব কাজ থেকে ওদের বিরত রাখাই যথেষ্ট এবং সম্ভবপর।

আয়াতে যে যাদুকরদের উল্লেখ হয়েছে, তাদের উপর যে 'কাফির' শব্দটি যথার্থভাবে প্রয়োগ হতে পারে, তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র এই কথা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ –

ওরা অনুসরণ করত সেই জিনিসের, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বে পাঠ করে শুনাত। তবে সুলায়মান কিন্তু কুফরী করেনি।

তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ ملك سليمن অর্থ—সুলায়মানের রাজত্বকাল। আর, تَتْلُوْا অর্থ, খবর দিত, পাঠ করত। আল্লাহ্র এই কথাটিও ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا –

সুলায়মান কুফরী করেনি; বরং শয়তানেরা কাফির হয়ে গেছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানেরা যেসব খবর দিত এবং বলত যে, তারা সুলায়মানের উপর যাদু করেছে তা-ই ছিল কুফরী। সুলায়মানের কুফরীকে আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করেছেন, তিনি কুফরী করেননি বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। তবে শয়তানেরা যে কুফরী করেছে, সে কথা তিনি ইতিবাচকভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। ওরাই কুফরীর ধারক এবং কুফরী নীতিতে আমলকারী। এই কথার সাথে যুক্ত (عطف) করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

আর যা নাযিল হয়েছে ব্যবিলনের হারুত-মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি, তারা তার-ই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এই জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে হুঁশিয়ার করে দিত যে, দেখ, আমরা নিছক একটা পরীক্ষা মাত্র। তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হয়ো না।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যাকেই কিছু শিক্ষা দিতেন, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন যে, তোমরা কুফরীর মধ্যে পড়ে যেও না এই যাদুকর্মের কারণে এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই কাজটি কুফর, যখন তার উপর আমল করা হবে এবং সেই বিশ্বাস গ্রহণ করা হবে। অতঃপর বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ –

তারা ভালো করেই জানত যে, এই জিনিস যে লোকই ক্রয় করবে, পরকালে তার ভাগ্যে কোনই কল্যাণ নেই।

অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্‌র দ্বীনের বদলে যাদুকে অবলম্বন করবে, পরকালে তার কোন অংশ নেই। এর পর বলেছেন ঃ

وَالَبِئْسَ مَا شَرَوْابِه اَنْفُسَهُمْ - لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা যে কত নিকৃষ্ট, সে কথা যদি ওরা জানতে পারত।

এ আয়াতে যাদুকর্মকে ঈমানের বিপরীতে দাঁড় করা হয়েছে। কেননা তারাই ঈমানকে বাদ দিয়ে তার বিপরীতে যাদুকে অবলম্বন করেছে।

এ থেকেও বোঝা যায় যে, যাদুকর কাফির। যাদুকরের কাফির হওয়া প্রমাণিত হল তখন, তার পূর্বে মুসলিম থেকে থাকলেও কিংবা সে বাহ্যিকভাবে কোন এক সময়ে নিজে ইসলাম পালন করে থাকলেও এই যাদুকর্মের দরুন সে কুফরী করে বসেছে। অতএব সে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ -

যে লোক তার দ্বীন বদলে দিয়েছে, তাকে তোমরা হত্যা কর।

ইমাম আবূ হানীফার কথা হাসান উল্লেখ করেছেন, তা হল যাদুকরকে হত্যা করা হবে। তার তওবা কবুল করা হবে না। হানাফী মাযহাবের কোন ইমাম এর বিপরীত কথা বলে তাঁর বিরোধিতা করেছেন বলে আমরা জানি না। ইমাম আবূ ইউসূফ যাদুকর ও মুর্তাদ এই দুজনের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলে ইমাম আবূ হানীফা থেকে ভিন্ন মত দিয়েছেন বলে যে কথা বলা হয়, তা হল এই যে, যাদুকর তার কুফরীর সাথে মিলিয়ে নিয়েছে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টাকে।

কেউ বলতে পারেন, গলা বা শ্বাস রুদ্ধকারী ও যুদ্ধকারীকে তোমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর কেবল তখন, যদি তারা কোন হত্যাকাণ্ড করে। তাহলে যাদুকর সম্পর্কে তোমরা সেরকম বল না কেন?

জবাবে বলা হবে, এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উক্ত দুজন হত্যাকাণ্ড করার পূর্বে এবং পরেও কাফির হয়নি। অতএব তাদেরকে হত্যা করার প্রশ্ন উঠে না। কেননা যে কারণে কেউ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে তারা সেই কারণ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু যাদুকর যাদুকর্মের দরুনই কাফির হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে, সে নিজে হত্যাকাণ্ড করেছে কিংবা না-ই করেছে, তার প্রশ্ন পরে। তার কুফরীর কারণেই সে হত্যার যোগ্য হয়েছে। এই কুফরীর সাথে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির কাজও যখন সে করল, তাকে হত্যা করা ফরয হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 'হদ্দ'—শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি। এ শাস্তি তওবার দ্বারা এড়ানো যায় না। যেমন যুদ্ধকারী ব্যক্তি যখন হত্যাযোগ্য হয়, তখন তওবা করলে তাকে রেহাই দেয়া যায় না। সে এই দিক দিয়ে যুদ্ধকারীর সদৃশ হল যে, সে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাকে হত্যা করাই তার জন্যে 'হদ্দ'। তওবা করে তা থেকে মাফ পাওয়া যেতে পারে না। আর মুর্তাদের সাথে তার পার্থক্য হয় এই দিক দিয়ে যে, মুর্তাদ হত্যার দণ্ড

ভোগ করবে তার কুফরীর উপর স্থির হয়ে দাঁড়ানোর কারণে। আর এই যথেষ্ট কারণ। তা থেকে সে সরে গেলে কুফরও তার থেকে দূরে সরে যাবে, সেই সাথে মৃত্যুদণ্ডও বাতিল হয়ে যাবে। এই যা বললাম, তার কারণে যিম্মী যাদুকর ও মুসলিম যাদুকরের মধ্যে তাঁরা পার্থক্য করেন নি। যেমন যিম্মী যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয়, হয় কোন মুসলিম তা হলেও কোন পার্থক্য করা হয় না। উভয়ই এই যুদ্ধকর্মের দরুন হত্যার যোগ্য হবে। এই কারণে স্ত্রী যাদুকরকে হত্যা করা হয় না। কেননা যুদ্ধকারী স্ত্রীলোককে দণ্ড হিসেবে হত্যা করা হয় না। হত্যা করা হয় শুধু হত্যার দণ্ড হিসেবে। যাদুকরের তওবা কবুল না করা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার মতের আর একটি কারণ ইমাম তাহাভী উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তার পিতার নিকট থেকে—আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ

اُقْتُلُوْا الزِّنْدِيْقَ سِرًّا فَاِنَّ تَوْبَتَهُ لاَتُعْرَفُ -

নাস্তিককে গোপনে হত্যা কর, কেননা তার তওবা পরিচিত কিছু নয়।

আবূ ইউসূফ এর বিপরীত কিছু বলেন নি, যাদুকরের ব্যাপারটি এই আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা যাদুকর তো গোপনেই কুফরীর পথে চলে যায়। ফলে সে নাস্তিকরূপে গণ্য হয়। অতএব তার তওবা কবুল না করাই সমীচীন।

যদি বলা হয়, তাহলে তো যিম্মী যাদুকরকে হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, কেননা সে বাহ্যত কাফির। সেই জন্যে তাকে হত্যা করা যায় না।

জবাবে বলা যাবে, তার যে কুফরকে আমরা বাহ্যত মেনে নিয়েছি, তা হচ্ছে তার বাহ্যত কাফির হওয়া। কিন্তু যাদু কর্মের দরুন তার যে কুফরী, তা তো মেনে নেয়া হয়নি। তা মেনে নিয়ে তাকে যিম্মী হয়ে থাকতেও দেয়া হয়নি। লক্ষণীয় যে, জিযিয়া দিয়ে সে যদি যাদুকর্ম করার জন্যে আমাদের যিম্মী হয়ে থাকতে চাইত, তা হলে আমরা তাকে কিছুতেই অনুমতি দিতাম না। তাকে সে কাজ করতেও অনুমতি দিতাম না। তার ও আহ্‌লি মিল্লাতের যাদুকরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উপরন্তু যিম্মী যাদুকর যদি তার কুফরীর দুরুন হত্যাযোগ্য না হয়, তাহলেও দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টার অপরাধে সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হতো, যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যক্তি—যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—আর জিন্দীক নাস্তিকের তওবা কবুল না করা পর্যায়ে যা বলা হয়েছে, সেদিক দিয়ে ইসমাঈলীদেরও তওবা কবুল না করা বাঞ্ছনীয়। আর সমস্ত নাস্তিক, তাদের কুফরী বিশ্বাসের কথা জানা গেছে, তারা সমস্ত নাস্তিক যিম্মীর মতই। তারা তওবা প্রকাশ করলেও তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই যা বললাম, এর ভিত্তিতেই যাদুকরকে হত্যা করা কর্তব্য। ইবনে কানে' বিশর ইবনে মূসা ইবনুল ইস্‌ফাহানী আবূ মুআবিয়া ইসরাঈল ইবনে মুসলিম—হাসান ইবনে জুনদব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ -

যাদুকরের শাস্তি তরবারির আঘাত দিয়ে দিতে হবে।

ওয়ালীদ ইক্‌বা'র সময়ে কূফা নগরে জুনদব যে যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন, সে কাহিনী সবারই জানা। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ -

যাদুকরের দণ্ড হয়েছে তরবারি দিয়ে মারা।

এর দুইটি অর্থ হতে পারে। একটি—তাকে হত্যা করা একান্তই কর্তব্য। দ্বিতীয়—তা এমন শাস্তি, যা তওবা দ্বারা প্রত্যাহৃত হতে পারে না। শরীয়াতের সব 'হদ্দ'ই এরূপ, যখন তা সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন তা অবশ্যই কার্যকর করতে হয়।

তাকে যুদ্ধকারীর ন্যায়ই হত্যা করতে হবে বলে যা বলেছি, সে পর্যায়ে হাদীস রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, লোকটি যখন বলল ঃ 'আমি যাদুকর ছিলাম'—প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকে হত্যা করা যাবে না। সে যেন সেই ব্যক্তির মত, যে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ছিল। এক্ষণে সে তওবাকারী হয়ে এসেছে। এই ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত ঘোষণার কারণে ঃ

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

তবে যারা তাদেরকে তোমাদের ধরে ফেলার পূর্বে তওবা করে, তারা এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। তোমরা জানবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যাদের উপর দণ্ড কার্যকর হওয়া যথারীতি সাব্যস্ত হয়েছে, তাদেরকে তোমাদের ধরে ফেলার পূর্বেই যদি তারা তওবা করে, তবে তাদের তওবা কবুল করা হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا .....

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির তৎপরতা করে, তাদের চূড়ান্ত শাস্তি ....

এই বাহ্যিক অর্থের আলোকে দণ্ডস্বরূপ যাদুকরকে হত্যা করা কর্তব্য হয় বলে দলীল পেশ করা হয়। কেননা যাদুকর তার যাদুকর্মের দ্বারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মধ্যে শামিল। ওরা তো লোকদেরকে সেই কাজে শরীফ হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতে থাকে। সাফাদ সৃষ্টি করে। সেই সাথে তারা যাদুর কারণে কুফরীও করেছে।

তবে মালিক ইবনে আনাস (রা) যাদুকরকে জিন্দীক বা নাস্তিকদের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। তাই তাঁর তওবা কবুল না করারই পক্ষপাতী তিনি, ঠিক যেমন নাস্তিককে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। তাঁর মতে যিম্মী যাদুকরকে হত্যা করা যায় না

এজন্যে যে, তার কুফরীর দরুন সে হত্যার যোগ্য নয়। তাকে আমরা থাকার সুযোগ তো আগেই দিয়েছি। তাই তাকে হত্যা করা যাবে শুধু তখন, যদি সে মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করে। কেননা তার এই কর্মটি চুক্তিভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। কেবল এই কারণেই তাকে হত্যা করা যাবে, যেমন যুধ্যমান শত্রুকে হত্যা করা যায়। যিম্মী যাদুকর ও নাস্তিক যে সমান, সে কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। কেননা যিম্মী নতুন করে কুফরী করেছে যাদু কর্ম করে গোপনভাবে। তাই জিযিয়ার বিনিময়ে সেই নতুন কুফর করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। তাই যিম্মী লোক এবং মিল্লাতে ইসলামের বেশ ধারণকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব—আগেই বলেছি—আগের লোকদের মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা এ মাযহাবের অনুসারীদের কেউ যাদুর কারণে হত্যা করার পক্ষপাতী নয়। অথচ আগের ফিকাহ্‌বিদগণ নিঃশর্তভাবেই—যাদুকর পরিচিতির কারণেই হত্যা করার পক্ষপাতী। তা সত্ত্বেও কথাটির দুটি দিক রয়েছে, তার কোন-না-কোন একটি দিককে সামনে রাখতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, যাদুকরকে হত্যা করা যাবে সে অন্য কাউকে হত্যা করেছে বলে। যাদুকরের এই হত্যাকর্ম যে প্রত্যক্ষভাবে হয়নি, তার রচিত কোন কারণের ফলশ্রুতিতে নয়—যেমন যাদুকররা দাবি করে থাকে। আর তা অত্যন্ত গর্হিত ও বীভৎস ব্যাপার। আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কিত ইল্‌ম ধারকদের কেউ-ই তাকে যাদুকরের বৈধ কাজ বলে মেনে নেননি। যেমন তার ব্যাখ্যায় আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, তা নবী-রাসূলগণের ঘোষণাবলীর পরিপন্থী। অথবা তা ঔষধ পান করানোর মাধ্যমে করে থাকবে। যদি তা-ই হয়, তা হলে কোন লোককে কেউ ঔষধ দিলে সে যদি মরে যায়, তাহলে ঔষধ সেবনকারী নিজ ইচ্ছায়ই যদি নিজের উপর অপরাধ চাপিয়ে নিয়ে থাকে, তা হলে তার কোন দীয়ত দেয়া ফরয হবে না। কেননা এ ঘটনাটি ঠিক এরূপ, যেমন কেউ এক ব্যক্তিকে একটি তরবারি দিল। সে ব্যক্তি তরবারি দ্বারা নিজেই নিজেকে হত্যা করল। কাজেই সে জন্যে সে নিজেই দায়ী, অন্য কাউকে বা হত্যার উপকরণদাতাকে তো দায়ী করা যেতে পারে না। ঔষধদাতা এ জন্যে তো ঔষধ দেয় নি যে, তা অবশ্যই পান করতে হবে বা তাকে তা পান করতে বাধ্যও করেনি। যেমন তরবারিদাতা তাকে হত্যা করেনি, তেমনি ঔষধদাতাও। তা পান করা বা না করার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল পানকারীর। জোরপূর্বক বা নিদ্রিত অবস্থায় কেউ তাকে পান করতে বাধ্য করেনি। তবে যদি সে তার ইচ্ছাই পোষণ করত, তা হলে তাতে যাদুকর ও অন্যরা সমান।

তা ছাড়া যাদুকর যখন বলেছে যে, তার পদক্ষেপ কখনো ঠিকমত হয়, কখনো সে ভুল করে বসে। এই ব্যক্তি আমার কাজের ফলেই মরেছে। অতএব তাতে দীয়ত দিতে সে বাধ্য। অন্যথায় তার কোন অর্থ নেই। কেননা এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে আহত করে লোহার দ্বারা, তা হলে এ ধরনের আঘাতের যখমে লোকটি মরেই যেতে পারে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে নাও মরতে পারে। কিন্তু এ অপরাধের 'কিসাস' অবশ্যই হবে। কখনো মরে, কখনো মরে না—এটা 'কিসাস' প্রত্যাহারের কোন যুক্তি দেয় না। কেননা আঘাতকারীর হাতে লৌহদণ্ড থাকাই তার প্রধান কারণ। বিশেষত এজন্যে যে, যাদুকর নিজেই স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারই কাজের ফলে লোকটি মারা গেছে।

যদি বলা হয়, এই পদক্ষেপটিকে বড়জোর ‘প্রায়-ইচ্ছামূলক’ বলা যায়। আর লাঠির দ্বারা আঘাত ও থাপ্পর তো এমন যে, তার দ্বারা মানুষ কখনো নিহত হয়, কখনো হয় না।

এর জবাবে বলা যায়, তা হলে লাঠির দ্বারা হত্যা ও থাপ্পরের তুলনায় লৌহদণ্ড ব্যবহার করা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ দুটির মধ্যে যদি পার্থক্য করা হয়, বলা হয় এটি অস্ত্র আর ওটি অস্ত্র নয়, তা হলে যেটা অস্ত্র হবে না তার দ্বারা হত্যা করা হলে তার ‘কিসাস’ না হওয়াই উচিত। আর অস্ত্র সাব্যস্ত হলে তারই দণ্ড দেয়া একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়বে। ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে, যদি বলে যে, তার কাজের দরুন লোকটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাতে মরেনি, মৃতের অভিভাবকদের ‘কসম’ করে বলতে হবে যে না, সে তার কারণেই মরেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর এই কথা মৌলিকভাবে অপরাধ আইনের পরিপন্থী। কেননা যে একটি লোককে আহত কারেছে, পরে আহত ব্যক্তি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তার এ অপরাধ দণ্ডণীয় হবে। কেননা মৃত ব্যক্তি যখমের কারণেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছে। সেখানে অভিভাবকদের কিরা-কসমের প্রয়োজন হবে না। যাদুকরের ক্ষেত্রেও এই রূপই হতে হবে, যদি সে স্বীকার করে যে, তার যাদুর কারণেই যাদুকৃত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

যদি বলা হয়, আঘাতে সৃষ্ট যখমের দরুন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া ব্যক্তির ব্যাপারেও আমরা তাই বলব। কেননা সে তো সেই কারণেই অব্যাহতভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন মত পোষণ করলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হবে না যতক্ষণ আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ তার মৃত্যু সম্পর্কে কসম করে সাক্ষ্য না দেবে।

এর জবাবে বলা যাবে, তাহলে অনুরূপ কথা বলাই বাঞ্ছনীয় হবে যদি তাকে তরবারি দ্বারা মারা হয় এবং সেই মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়ে যায়। তখন আঘাতকারী বলল, এই দ্বিতীয় বার তরবারি মারার পূর্বেই সে একটা রোগে আক্রান্ত ছিল, আঘাতের পর সে পূর্বের রোগের কারণেই মারা পড়েছে। অথবা বলল, আল্লাহ্ই তাকে ডেকে নিয়েছেন, আমার আঘাতে মরেনি। এ ব্যাপারে মৃতের অভিভাবকদের ‘কসম’ লওয়া হোক। কিন্তু একথা কেউ বলবে না বা বলতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্তকার আলোচনা আমরা যাদুর তাৎপর্য পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যাদুকর সম্পর্কে ফিকাহ্বিদদের মতের পার্থক্যের কথাও আমরা যথেষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এক্ষণে আমরা কুরআনের মূল আয়াত পর্যায়ে কথা বলব। আয়াতের দাবি ও চাহিদাও ব্যাখ্যা করব।

আমাদের কথা হল আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ –

ওরা অনুসরণ করেছে সেই জিনিসের, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বকালে পাঠ করত।

এ আয়াত পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইয়াহূদীরা, দাউদ (আ)-এর পুত্র মুসলায়মান (আ)-এর সময়ে যে ইয়াহূদীরা ছিল। নবী করীম (স)-এর সময়ে যে সব ইয়াহূদী রয়েছে, এ কথা তাদের সম্পর্কেও। ইবনে জুরাইজ ও ইবনে ইসহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। রুবাই ইবনে আনাস ও মুদ্দী বলেছেন, আয়াতে সুলায়মান (আ)-এর সময়ে ছিল, তেমনি ছিল রাসূলে করীম (স)-এর সময়েও। কেননা ইয়াহূদীরা সেই সুলায়মানের সময় থেকেই সর্বকালে যাদুর অনুসরণকারী ছিল কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই রাসূল করীম (স)-এর সময়কাল পর্যন্ত। আয়াতে এই ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, ওরা কুরআন গ্রহণ করেনি। কুরআনকে ওরা পৃষ্ঠদেশে নিক্ষেপ করেছে। সেই সাথে রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি কুফরও করেছে। কুরআনকে বাদ দিয়ে ওরা সুলায়মানের সময়ে শয়তানেরা যা পাঠ করে শুনিয়েছে, তারই অনুসরণ করেছে। শয়তানেরা বলতে জ্বিন ও মানুষ উভয় গোষ্ঠীর শয়তানদের কথাই বোঝানো হয়েছে। تَتْلُوْا অর্থ সংবাদ দিত, পাঠ করত। বলা হয়েছে تَتْبَعُ 'অনুসরণ করে'। কেননা পেছনের অধীন লোকেরা তো অনুসরণকারীই মাত্র। আর عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ অর্থ বলা হয়েছে সুলায়মানের শাসনামলে। তাঁর রাজত্বকালে। সেকালে ওরা তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করেছিল। কেননা 'খবর' যখন 'মিথ্যা' হয়, তখনই বলা হয় ঃ تَلَا عَلَيْهِ আর খবর সত্য হলে বলা হয় تَلَا عَنْهُ আর যদি অস্পষ্ট হয়, তাহলে এই উভয় অর্থ-ই হতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সেই কথা বল, যা তোমরা জান না।

ইয়াহূদীরা বলত, যাদু তো সুলায়মান কর্তৃক প্রচলিত হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, তাঁর রাজত্বটা ছিল এই যাদুর বলে। আল্লাহ্ এ কথার প্রতিবাদ করে তাঁকে এই মিথ্যা অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও কাতাদাহ থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসাহাক বলেছেন, কোন কোন ইয়াহূদী পণ্ডিত বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে বিস্মিত হবে না। তিনি মনে করেন, সুলয়মান নবী ছিলেন না, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো ছিলেন একজন যাদুকর মাত্র। এর-ই প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ -

না, সুলায়মান কুফর করে নি।

অনেকে বলেছেন, ওরা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বানাবার লক্ষ্যেই যাদুকে সুলায়মানের সাথে সম্পৃক্ত করত, যেন ওদের যাদু জনগণ মেনে নেয়। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি তারা আস্থাবান হয়। কিন্তু এরূপ করে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ এ-ও বলেছেন—সুলায়মান (আ) যাদুবিদ্যার কিতাবাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সে সবগুলোকে তাঁর সিংহাসনের তলায় দাফন করে রেখেছিলেন কিংবা তাঁর খাজাঞ্চিখানায় রেখে দিয়েছিলেন, যেন তা ব্যবহৃত হতে না পারে। পরে তিনি ইন্তিকাল করে গেলে সে

সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন শয়তানেরা বলাবলি করল যে, এর-ই জোরে সুলায়মানের রাজত্ব চলেছে। এই কথাটি ইয়াহূদীদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তারা এটা ধারণা করে এবং যাদুকে সুলায়মানের নামে চালাতে শুরু করে। এই শয়তান বলতে মানুষ শয়তান-ও অর্থ হতে পারে। এ-ও হতে পারে যে, শয়তানেরাই ওসব সুলায়মানের সিংহাসনের তলায় পুতে রেখেছিল তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে। পরে তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করে এবং সুলায়মানের নামে চালিয়ে দেয়। মানুষ শয়তানেরাও এ কাজ করতে পারে। তারাই তাঁর ইন্তিকালের পর তা বাইরে নিয়ে আসে ও লোকদেরকে এই ধারণা দেয় যে, সুলায়মানই লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এই কাজ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ –

আর সেই হারুত-মারুত নামের দুই ফেরেশতার প্রতি যা নাযিল করা হতো।

হারুত মারুত দুজন ফেরেশতা ছিলেন বলে বলা হয়েছে । আর অন্যরা বরং বলেছেন, তাঁরা ফেরেশতা ছিল না।

এ পর্যায়ে দহাক-এর মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজন ব্যবিলনবাসী কাফির ছিল। আমার মতে এই দু'ধরনের পাঠ সহীহ। এ দুটির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। হতে পারে, আল্লাহ্‌ই দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন এ দুজন বাদশাহ্‌র সময়ে তাদের উপর যাদুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ দুজনের দ্বারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। যে সব লোক এ দুজনের কথা গ্রহণ করে এবং তা মেনে নেয়। দু'জন ফেরেশতা যখন তা পৌঁছাতে এবং তাদের দুজন ও সমস্ত মানুষকে যাদুকর পরিচিত বানাবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, যাদুর অস্বাভাবিক কার্যাবলীর কথা বলতে ও তা অস্বীকার করার কথা বলতে এসেছিল তারা। এটা সম্ভব। এই দুই ফেরেশতার উপরই তা নাযিল হতো। এ-ও হতে পারে যে, লোকদের নিকট থেকে সে দুজনকে অনেক কথাই বলা হতো। কেননা ফেরেশতাদ্বয় তা পৌঁছিয়ে দেয়া ও পরিচিতকরণের জন্যে নিয়োজিত ছিলেন। যেমন রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ – (النحل : ٨٩)

এবং সব জিনিসের বিশ্লেষণ সম্বলিত কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি।

অপর একটি আয়াত ঃ

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا –

বল—আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি।

দুটি আয়াতের একটি আয়াতে রাসূলের প্রতি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর অপরটিতে জনগণের প্রতি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কেননা যে রাসূলের প্রতি

কুরআন নাযিল হয়েছে তিনি তো জনগণের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। ফেরেশতাদ্বয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তারা দুজন সকলের নিকট পরিচিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ও নির্দেশিত ছিল। কেননা জনগণ ফেরেশতাদ্বয়ের অধীন ছিল। তাই যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণে সব কিছুর তুলনায় বেশী প্রচারিত ছিল। তার বাতিল হওয়ার কথা বোঝাবার জন্যে ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে এ কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে, যেন জনগণ সে দুজনকে অনুসরণ করে। যেমন মূসা ও হারুনকে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى – فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى – (طه -٤٣-٤٤)

তোমরা দুজন ফিরাউনের নিকট যাও। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘন করেছে, পরে তোমরা দুজন তাকে নরম কথা বল। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে অথবা ভয় করতে শুরু করবে।

এরা দুজন যেমন ফিরাউনের প্রতি প্রেরিত ছিলেন, তেমনি প্রেরিত হয়েছিলেন ফিরাউনের অধীন প্রজা-সাধারণের প্রতিও। কিন্তু নির্দেশ দানের বাক্যে কেবল ফিরাউনের উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষভাবে। বস্তুত তার এবং তার অধীন প্রজা-সাধারণের ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্যে এটাই ছিল অধিক সুফলদায়ক। অনুরূপভাবে নবী করীম (স) কিস্‌রা ও কাইজারের প্রতি আদালা আলাদা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। চিঠিতে বিশেষভাবে তাদের দুজনের উল্লেখ ও সম্বোধন ছিল, প্রজা-সাধারণের জন্য তাতে কোন কথা ছিল না, যদিও তিনি সমগ্র মানুষের জন্যে রাসূল হয়ে এসেছিলেন। এর কারণ, যেমন পূর্বে বলেছি, জনগণ তো শাসকের অধীন। এই জন্যেই রাসূলে করীম (স) কিসরার প্রতি লিখিত পত্রে বলেছিলেন ঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاِلَّا فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ –

অতঃপর কথা এই যে, তুমি এই চিঠি পাওয়ার পর ইসলাম কবুল কর, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। অন্যথায় তোমার উপর অগ্নিপূজকের অপরাধ ধার্য হবে।

আর কাইজারকে লিখেছিলেন ঃ

اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاِلَّا فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِسِيِّيْنَ –

ইসলাম কবুল কর, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে। নতুবা তোমার উপর এরীসীনের অপরাধ আরোপিত হবে।

অর্থাৎ তুমি যখন ঈমান গ্রহণ করবে, তখন তোমার প্রজা-সাধারণও তোমার অনুসরণ করবে। আর তুমি যদি তা অস্বীকার কর, তাহলে তোমার প্রজা-সাধারণ ইসলাম থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, তা গ্রহণ করবে না তোমার ভয়ে। ইসলাম বা কুফর গ্রহণের ব্যাপারে ওরা তোমার অনুসরণকারী বৈ তো নয়।

এখানেও অনুরূপ কথা; প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র। ব্যবিলনবাসীদের মধ্য থেকে দুজন বাদশাহ্‌র প্রতি দুজন ফেরেশতা বিশেষভাবে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ - (الحج : ٧٥)

আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও রাসূল বাছাই করেন, আর মানুষের মধ্য থেকেও।

যদি বলা হয়, ফেরেশতা কি করে লোকদের নিকট প্রেরিত হতে পারে? তারা তাদের উপর নাযিলই বা হয় কি করে?

এর জবাবে বলা যাবে, এটা তো খুবই সম্ভব, বৈধ এবং তা তো হয়ে-ই থাকে। কেননা আল্লাহ্ কোন কোন ফেরেশতাকে অপর কোন কোন ফেরেশতার প্রতি পাঠিয়ে থাকেন, যেমন তাদেরকে নবী-রাসূলগণের প্রতি পাঠান। তাদের দেহ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং মানুষের আকৃতি ধারণ করে, যেন মানুষ তাদেরকে অপরিচিত বা অবাঞ্ছিত মনে না করে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا - (الانعام : ٩)

নবী বা রাসূল হিসেবে যদি একজন ফেরেশতাকেই পাঠাতাম তাহলে তাকে অবশ্যই মানুষের আকৃতিতে পাঠাতাম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ -

তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দেয়, আর যা দুই ফেরেশতার প্রতি নাযিল হয় তা-ও।

তার অর্থ—আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন—আল্লাহ দুজন ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তারা লোকদেরকে যাদুর অর্থ বোঝাবে এবং তাদের জানিয়ে দেবে যে এটা একটা কুফর, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন জিনিস, ধোঁকা ও সম্মোহন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তারা যেন তা পরিহার করে চলে। যেমন রাসূলগণের জবানীতে আল্লাহ্ সব হারাম ও নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কথা বলিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন সেসব গ্রহণ না করে। তাই যাদু যখন কুফর, সম্মোহন ও ধোঁকা, অথচ সে কালের লোকেরা তার প্রতারণায় পড়ে গিয়েছিল, তারা যাদুকে সত্য মনে করে গ্রহণ করেছিল। যাদুকর তা তার ভিত্তিতে জনগণের নিকট অসাধ্য সাধনের ক্ষমতার দাবি করেছিল এই দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে, যেন মূর্খতার অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং তাদেরকে এই ধোঁকা থেকে রক্ষা করা যায়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ -

এবং (ভালো ও মন্দের) উভয় স্পষ্ট পথই আমরা তাকে দেখিয়েছি।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন—ভালো ও কল্যাণের এবং মন্দ ও অকল্যাণের পথের বিবরণ আমরা বলে দিয়েছি। যেন লোকেরা ভালো ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করে এবং

মন্দ ও অকল্যাণের পথ পরিহার করে চলে। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলা হল, অমুক ব্যক্তি মন্দ কি জিনিস, তা জানে না, চেনে না। শুনে তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষে তোমাদের মন্দের মধ্যে পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।

বস্তুত যাদুর তাৎপর্য বলে তা থেকে লোকদেরকে হুঁশিয়ার করা এবং কুফর যত প্রকারের হতে পারে, মা ও বোন মুহররম হওয়ার, যিনা, সূদ ও মদ্যপান হারাম হওয়ার কথা বলার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা নিষিদ্ধ ও খারাপ জিনিসগুলো লোকদের দ্বারা পরিহার করানোই আসল উদ্দেশ্য। তা ভালোর কথা বলার মতই ব্যাপার। কেননা তা বুঝিয়ে না দিলেও সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ না হলে তা কার্যত করা কখনই সম্ভব হয় না। আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ ও কর্তব্যসমূহ—যেমন তা কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে—পালনের জন্যেই মন্দের কথা বলা প্রয়োজন, যেন তা পরিহার করা যায়। অন্যথায় মন্দকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে না। তা সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের পরই।

কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ্র, 'আর যা নাযিল হয় ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, শয়তানেরা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হওয়া বাণীকে অসত্য মনে করেছে, যেমন অগ্রাহ্য ও অমান্য করেছে সুলায়মান (আ)-কে। ওরা যে যাদু প্রয়োগ বা তার কথা প্রচার করে, তা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হয়নি। মনে করে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا 'লোকেরা সে দুজনের নিকট শিখে' এর অর্থ, যাদু ও কুফর কি জিনিস তা জেনে নেয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا 'বরং শয়তানরাই কুফর করেছে'-এর মধ্যে যে 'কুফর' শব্দটি রয়েছে, তা সে দুজনের প্রতি আরোপিত হয়। অর্থাৎ শয়তানেরা সে দুজনকে অমান্য করেছে। যেমন আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى –

নিশ্চয়ই নসীহত কবুল করবে যে ভয় করে এবং তা এড়িয়ে যাবে খারাপতম ব্যক্তি।

অর্থাৎ নসীহত অগ্রাহ্য করবে সেই ব্যক্তি, যে লোকদের মধ্যে অধিক বদ।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ –

অর্থাৎ ফেরেশতাদ্বয় তা কাউকেই শিখায় না। তা সত্ত্বেও তারা তা না শিখিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকে তাও নয়; বরং তারা চূড়ান্ত মাত্রায় নিষেধও করে তা শিখা থেকে। তখন তারা দুজন বলে ঃ

اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

নিঃসন্দেহে আমরা একটা পরীক্ষা, অতএব তুমি কুফর করো না।

এরূপ ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে জিনিস, তা হল, ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ যাদু নাযিল করতে পছন্দ করেন না। যদিও তিনি যাদুবিদ্যা ও যাদুকরের নিন্দাবাদ করেছেন।

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা জরুরী নয়। কেননা নিন্দিত হচ্ছে তো সে যদি কর্ম করে। তা লোকদেরকে যে বলে ও তা থেকে সাবধান করে, সে নয়।

যেমন লোকদের মধ্য থেকে যে-ই যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারবে, তার কর্তব্য হচ্ছে তা তাকে বলা যে তা জানে না এবং তা থেকে তাকে নিষেধ করবে। যেন সেই লোক তা পরিহার করে চলে। এটা তো একটা ফরয কাজ। আল্লাহ তা'আলাই তা আমাদের উপর ধার্য করেছেন, যখন আমরা দেখব যে, একটি লোক তা দ্বারা প্রতারিত ও সম্মোহিত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

আমরা তো পরীক্ষা মাত্র, অতএব তুমি কুফর করো না।

কেননা 'ফিতনা' বলতে তা বোঝায় যদ্দ্বারা কোন জিনিসের ভালো বা মন্দ হওয়া প্রকাশিত হয়। আরবরা বলে ঃ

فَتَنْتُ الذَّهَبَ اِذَا عَرَضْتُهُ عَلَى النَّارِ –

আমি স্বর্ণকে আগুনের উপর রেখে পরীক্ষা করি। তখনই জানা যায় তা খাঁটি কিংবা ভেজাল।

যাচা-ই পরীক্ষাও তাই। কেননা তাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তা হয় পরীক্ষিত বস্তু।অন্যত্র 'ফিতনা' শব্দটি আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ – (الذريت : ١٥)

তোমরা তোমাদের আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর।

ফেরেশতাদ্বয় যখন যাদুবিদ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য ও অর্থ প্রকাশ করছিলেন, তখন তারা দুজন বলতেন, আমরা কিন্তু ফিতনা—আযাব। কাতাদাহ বলেছেন—আমরা 'ফিতনা' অর্থ আমরা বিপদ। এই অর্থও যথার্থ। কেননা নবী-রাসূলগণ যে লোকদের প্রতি প্রেরিত হন, তাদের জন্যে 'বালা' বা বিপদ। কেননা তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে, তার যাচাই ও পরীক্ষা হয়ে যায়। 'ফিতনা' শব্দের অর্থ হিসেবে তারা দুজন আত্মরক্ষার উপায়ও মনে করতে পারে। কেননা যারা তাদের দুজনের নিকট থেকে তা জেনে নেবে, তারা তা খারাপ কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং তার মধ্যে পড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ নয়। তখন তা একটা রক্ষামূলক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াতে পারে, অন্যান্য সমস্ত ইবাদত যেমন। সে দুজনের কথা ঃ فَلَا تَكْفُرْ 'অতএব তুমি কুফর করো না' থেকে বোঝা যায় যে, যাদুকর্ম একটি কুফর। তারা দুজন বিশেষ করে এই জিনিসটির শিক্ষা দেয় যেন তদানুযায়ী কাজ করা না হয়। তারা দুজনই জানে যে, যাদু কি, তার কলা-কৌশল কিরূপ কার্যকর হয়, যেন তা এড়িয়ে চলা হয় এবং যেন তার দ্বার জনগণকে সম্মোহিত করা না হয়। এই কাজ

নবী-রাসূলের কাজের পর্যায়ে গণ্য। অতএব এই কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা বাতিল। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ –

লোকরা তাদের দুজনের নিকট থেকে সে জিনিসই শিখে, যদ্দারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

এই বিচ্ছেদ ঘটানো দুভাবে হতে পারে। হতে পারে, শ্রোতা সেই অনুযায়ী আমল করবে। আর তখন সে কাফির হয়ে যাবে। তাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। স্ত্রী মুসলিম হলে স্বামী মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার দরুন এই বিচ্ছেদ। এর বিপরীতটাও হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চোগলখুরী করে এককে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে মিথ্যা-মিথ্যা বানোয়াট কথা বলে এককে অপরের প্রতি ঘৃণ্য বানিয়ে এবং তার পরিণতিতে উভয়ের মধ্যের সম্পর্ক বিপর্যস্ত করে বিচ্ছেদ ঘটানো। এটা মূলত বাতিল পন্থায় সম্মোহনমূলক কাজ। তাতে প্রত্যেকেই নিজেকে সত্য ভাবতে শুরু করে। তার পরে একজন অপর জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ –

তারা যাদুর দ্বারা কারোরই একবিন্দু ক্ষতি করতে পারে না। তবে আল্লাহ্র অনুমতি হলে ভিন্ন কথা।

আয়াতে اِذْنٌ। অর্থ অনুমতি। অর্থাৎ ক্ষতি করার সুযোগ দেয়া। হাসান বলেছেন, আল্লাহ যাকে চাইবেন নিষেধ করবেন। তখন যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না আর যাকে চাইবেন উভয়ের মধ্যকার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। তখন তা ক্ষতি সাধন করতে পারবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ –

তারা নিঃসন্দেহে জেনে নিয়েছিল যে, এই জিনিস যে লোক ক্রয় করবে, পরকালের কোন কল্যাণই তার ভাগ্যে নেই।

বলা হয়েছে, এর অর্থ, আল্লাহ্র দ্বীনের বদলে যে লোক যাদুবিদ্যা গ্রহণ করবে, পরকালে তার কোন কল্যাণের অংশ নেই। হাসান বলেছেন, তার দ্বীন নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাদু কর্ম ও যাদু গ্রহণ অবলম্বন সুস্পষ্ট কুফর ।

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ –

তারা নিজেদেরকে যে জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তা অত্যন্ত খারাপ।

এ থেকেও বোঝা যায়, যাদু গ্রহণ ও তার সাহায্যে কাজ করা কুফরী। আল্লাহ্র এই কথা ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا –

যদি তারা ঈমান আনত এবং ভয় করে চলত-টিরও দাবি হচ্ছে তাই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা 'রায়েনা' (আমাদের খেয়াল রাখুন) বলো না।

কুত্‌রুব বলেছেন এটা হিজাযীদের ব্যবহৃত শব্দ। গালি স্বরূপ তারা এই শব্দটির ব্যবহার করে। এও বলা হয়েছে, এই শব্দটি ইয়াহুদীরা বলত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِيْ الدِّيْنِ – (النساء :٤٦)

ওরা বলে 'সামেনা'-আ-আসাইন,. আস্‌মা গায়রা মুস্‌মায়িন ও 'রায়েনা' জিহ্বা ওলট-পালট করে এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা এরূপ শব্দ উচ্চারণ করত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বীনের বিরুদ্ধে ঠাট্টা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا جَاۤءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ – (المجادله :٨)

ওরা যখন তোমার নিকট আসে, তখন ওরা তোমাকে সালাম করে এমন সব শব্দে যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে সম্ভাষণ করেন নি।

কেননা ওরা বলত ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ওরা শব্দ উচ্চারণে এই ধারণা দিতে চাইত যে, ওরা আপনার প্রতি সালাম করছে। পরে ওদের এই হীন মানসিকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে অবহিত করেন এবং মুসলমানদেরকে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করে দেন। তাদের উচ্চারিত শব্দ رَاعِنَا -এর অর্থ হতে পারেঃ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন। কিন্তু শব্দটি গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে ইয়াহূদীরা ব্যবহার করত ঠাট্টা ও বিদ্রূপ অর্থে, তাই এই শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে নিষিদ্ধ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্রূপাত্মক ভাবধারা পূর্ণ মাত্রায় নিহিত রয়েছে। যদিও আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন—এই অর্থও তার হয়। আরবী অভিধানে এর দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে যেমন اَلْوَعْدُ ভালো ও মন্দ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا – (الحج : ٧٢)

জাহান্নাম, আল্লাহ কাফিরদের জন্য তার-ই ওয়াদা করেছেন।

বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ –

এ এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না।

'ওয়াদুন' শব্দটি নিঃশর্ত ব্যবহৃত হলে তা থেকে কল্যাণই বোঝা যাবে, মন্দ বা অকল্যাণ নয়। 'রায়েনা' শব্দের অর্থেও দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। তা নিঃশর্ত ব্যবহৃত হলে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' বা 'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন' এই বিশেষ অর্থের পরিবর্তে বিদ্রূপের অর্থটি প্রবল হয়ে উঠে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থে ভালো ও মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এ-ও জানা যায় যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে উপহাস (Derision) নিষিদ্ধ। এরূপ উভয় সম্ভাবনামূলক শব্দের ব্যবহারও নিষিদ্ধ।

মূলত আল্লাহ্-ই তাঁর কিতাবের প্রকৃত তাৎপর্য অধিক ভালো জানেন।

সুন্নাত দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হওয়া এবং মনসূখ হওয়ার বিভিন্ন দিক

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا –

আমরা যে আয়াতকেই মনসূখ (নাকোচ) করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার থেকে অধিক উত্তম কিংবা তার মতই (আর একটি) নিয়ে আসি।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে 'নুসূখ' অর্থ দূর করা। অন্যরা বলেছেন ঃ বদলে দেয়া। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ – (الحج : ٥٢)

শয়তান যা উদ্রেক বা প্রবর্তিত করে, আল্লাহ্ তা দূর করেন।

করে দেন এবং তদস্থলে সুদৃঢ় আয়াত বসিয়ে দেন। 'নুসূখ'-এর অর্থ কেউ কেউ বলেছেন স্থানান্তরকরণ। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ – (الجاثيه : ٢٩)

তোমরা যে কাজ করছিলে আমরা তা স্থানান্তর করে সংরক্ষিত করছিলাম।

মতের এই পার্থক্য তার আসল স্থানে অভিধান ভিত্তিক ব্যাপার। মূল আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক, শরীয়াতী প্রয়োগে তা হচ্ছে আদেশটির মুদ্দত, পাঠের সময়কাল। অনেক সময় শুধু পাঠের দিক দিয়েই 'নুসূখ' হয়, যদিও তার হুকুমটা বহাল থাকে। এর বিপরীত পাঠ থেকে যায়, হুকুমটা নাকচ হয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, ফিকাহ্বিদগণ উত্তর কালের মনীষীদের কেউ কেউ মনে করেছেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াতে নুসূখ (অর্থাৎ বাদ করে দেয়া) নেই। নুসূখ

পর্যায়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা হযরত মুহাম্মাদ (স) পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলের শরীয়াত রদ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কথা, যেমন শনিবার দিনের উৎসব, কাবার দিক ছাড়া অন্যদিকে ফিরে নামায আদায়, কেননা আমাদের নবী হল সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উক্ত কথা যে ব্যক্তি বলেছেন, তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, যা এখন সংরক্ষিত নয়। ফিক্‌হ, উসূলে ফিকাহও তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। তার আকীদাও সঠিক ছিল, নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলতেন না। তাঁর এই পরিচিতি সকলের জানা ছিল না। তাই এই কথাটি প্রকাশ করার সুযোগ পান নি এবং তাঁর পূর্বেরও কেউ এ কথা বলেনি। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, প্রাচীন ও পরবর্তীকালের মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী দ্বীনের ও শরীয়াতের মনসূখ হওয়া অনেক কিছুই একত্র করে আমাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন, যা কেউ সন্দেহও করেনি। তার ব্যাখ্যা দেয়ারও সুযোগ পায়নি।

যেমন মুসলিম উম্মাহ্ বুঝেছেন যে, কুরআনের কথাসমূহ সাধারণ عام বিশেষ خاص সুদৃঢ় অপরিবর্তনীয় محكم এবং সুস্পষ্টভাবে অর্থ নির্ধারণ করা যায় না এমন (متشابه) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহতে নুসূখ থাকার প্রতিরোধক যেমন তার 'খাস' ও 'আম' মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্-এর প্রতিরোধ হবে। কেননা সবই উপস্থিত এবং একই দিক দিয়ে চলে এসেছে। তখন এই ব্যক্তি মনসূখ হওয়া ও মনসূখকারী আয়াত এবং তার হুকুম নির্ধারণে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছে যা মুসলিম উম্মাহর কথার বাইরে এবং তদ্দরুন অর্থ ও তাৎপর্যও হয়ে গেছে অনেক কঠিন। আমি জানি না, কোন্ জিনিস এই ব্যক্তিকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে আমার অধিক মাত্রার ধারণা হচ্ছে পূর্বের লোকদের কথা বর্ণনার ব্যাপারে তার ইলম ছিল খুবই অল্প। সে ব্যাপারটি ভালো করে না জেনেও তাতে নিজের মত জাহির করেছে। আগের লোকেরা কি বলেছেন তা-ও যেমন তার জানা ছিল না, উম্মত সেই কথাগুলো পরবর্তীদের নিকট কিভাবে পৌঁছিয়েছে, তাও ছিল তার অজানা। অথচ লোকটি রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী ঃ

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ –

যে লোক কুরআনের নিজ ইচ্ছা ও মতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দেবে, তা যথাযথ হলেও সে বড় ভুল করে বসেছে।

আল্লাহ্ আমাদিগকে ও তাকে মাফ করুন।

উসূলিল ফিকাহ-এর কিতাবে 'নুসূখ' সম্পর্কে বিস্তারিত কথা আলোচনা করেছি, কোন্ ধরনের 'নুসূখ' হতে পারে, কোন প্রকারের নয়, তাও বিস্তারিত বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ পর্যায়ে তাই যথেষ্ট। আল্লাহর কথা أَوْنُنْسِهَا অথবা তা ভুলিয়ে দিই। শব্দটির মূল نَسِيْتُ – وَنَنْسَاهَا এর অর্থ, আমরা বিলম্বিত করলাম তা। এ থেকে গঠিত اَلنَّسِيْئَةُ এর অর্থ বিলম্বিত ঋণ। কুরআনের আয়াত ঃ

اِنَّمَا النَّسِىْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ –

হারাম মাস বিলম্বিতকরণ কুফরিত্বে প্রবৃদ্ধি।

অর্থাৎ মাস বিলম্বিতকরণ। কিন্তু এর যখন ভুলে যাওয়া অর্থ করা হবে, তখন আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তার পাঠ লোকদেরকে ভুলিয়ে দেবেন, যেন তারা তা পাঠই না করে। এটা দুভাবে ঘটে। একটি, হয় আল্লাহ্ তার পাঠ ত্যাগ করতে বলবেন। ফলে লোকেরা কালের অতিক্রমণে তার পাঠ ছেড়ে দেবে। হঠাৎ করে তা ভুলে যাওয়াও সম্ভব। তাদের চিন্তা থেকেই তা দূর হয়ে যাবে। আর তা হবে নবী করীম (স)-এর একটি মুজিযা। আর শব্দটি نَنْسَاهَا 'আমরা তা ভুলে যাই' হলে তার অর্থ হবে ঃ তা বিলম্বিত করা হবে, তা নাযিল করবেন না, তার পরিবর্তে তা নাযিল করবেন যা সেটির স্থলাভিষিক্ত হবে কল্যাণের কাজে অথবা বান্দাদের জন্যে তা হবে অধিক কল্যাণকর অপরটির তুলনায়। অথবা এও হতে পারে যে, পরবর্তীটা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত সেইটি নাযিল করার কাজ বিলম্বিত করে দেবেন। অতঃপর তার বদলে অন্যটি নাযিল হয়ে যাবে। সেটি যদি পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হতো, তাহলে কল্যাণের দিক দিয়ে সেটিই তার স্থলাভিষিক্ত হতো। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

نَاْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا –

আমরা নিয়ে আসি তার তুলনায় বেশি কল্যাণের জিনিস কিংবা তার-ই মত জিনিস।

হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তার তুলনায় তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর সহজতা ও সুবিধাজনকতার দিক দিয়ে। যেমন, যুদ্ধে একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলার জন্যে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল বিশজনের পরিবর্তে। তখন আল্লাহ্‌র কথা সত্য হয়েছিল ঃ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ এক্ষণে তোমাদের দায়িত্ব অনেকটা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। অথবা অনুরূপ, যেমন বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবার দিকে মুখ করার আদেশ। এটা তাদের জন্যে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক। আর হাসান থেকে এর অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ তাৎক্ষণিকভাবে তা অধিক কল্যাণকর কল্যাণের বিপুলতার দিক দিয়ে কিংবা তার অনুরূপ। এক্ষণে সকলেরই মতৈক্য হল এই তাৎপর্য যে, তা তোমাদের জন্যে অধিক মঙ্গলজনক বোঝা হালকা হওয়ার দিক দিয়ে কিংবা কল্যাণের বিপুলতার দিক দিয়ে পাঠে অধিক কল্যাণকর, এ অর্থ কেউ-ই বলেন নি। কেননা কুরআনের কতকাংশ পাঠের দিক দিয়ে অধিক কল্যাণকর অপর কতকাংশের তুলনায় একথা বলা জায়েয হতে পারে না। কেননা কুরআনের সব কিছুই মুজিযা তা—একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কালাম।

আবূ বকর বলেছেন, অনেকেই বলেছেন, সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। কেননা সুন্নাত আর যা-ই হোক, তা কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর হতে পারে না। এই কথাটি যিনি বলেছেন, খুব বুঝে শুনে বলেছেন বলে মনে হয় না কয়েকটি কারণে। একটি এ যে, পাঠের দিক দিয়ে ও নজম—সুসংবদ্ধতার দিক দিয়ে কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর, এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নজ্‌ম-এর মুজিযা হওয়ার ক্ষেত্রে মনসূখকারী ও মনসূখ—দুটিই সমান মানের। আর দ্বিতীয়, আগের কালের মনীষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'নজম' উপস্থিত নেই। কেননা তাঁদের কথা

দুটি কথার একটিকে ভিত্তি করে হয়েছে। হয় বোঝা হালকাকরণ কিংবা কল্যাণময়তা। আর তা সুন্নাত দ্বারাও হতে পারে। যেমন হতে পারে কুরআন দ্বারা। তাদের কেউ বলেন নি যে, পাঠের কথাই বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোদ্ধৃত আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাত দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হওয়া (অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া) জায়েয। একথা অধিক সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান তা জায়েয না হওয়ার কথার তুলনায়। উপরন্তু একথার নিগূঢ় অর্থ হল পাঠ মনসূখ হওয়া। আয়াতে এর কোন হুকুম নেই। আল্লাহ্ কথা مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ আয়াত থেকে যা মনসূখ করি। আর আয়াত হল তা যা পাঠ করা হয়। আর পাঠ মনসূখ হলে হুকুমটাও মনসূখ হবে—এমন কথা নেই। অবস্থা যখন এই, তখন এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আয়াতের পাঠ যদি মনসূখ করি কিংবা ভুলিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের জন্যে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস নিয়ে আসি সুন্নাতের পথে, যা মুহকাম—সুদৃঢ় ও মজবুত। এই বিষয়ে ব্যাপক কথা 'উসুলিল ফিকাহ্' কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি, যা খুবই যথেষ্ট। তা পাঠ করলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব জানা যাবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ -

অতএব তোমরা ক্ষমা করে দাও, ঝঞ্ঝাট দূর কর, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার ফরমান নিয়ে আসবেন।

মূ'মার এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ্‌র এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াতটিকে মনসূখ করেছে আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে যেভাবেই তাদেরকে তোমরা পাবে।

আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফজল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামন আবূ উবায়দ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ মুআবিয়াত ইবনে সালিহ আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস থেকে لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'তুমি তাদের উপর দারোগা নও' এবং আল্লাহ্‌র কথা: وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ 'তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তিকারী নও' فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ 'তাদের দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও এবং সাফ সাফাই করে নাও। আয়াত ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ -

ঈমানদার লোকদেরকে বল, তারা যেন ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ্‌র শাসনামলকে যারা আশা করে না, তাদেরকে।

বলেছেন যে, এই সব কয়টি আয়াতকেই মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ 'মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই যেভাবেই তোমরা পাবে।' আর এই আয়াতটিও ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ ....

তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে তারা হারাম (বন্ধ) ঘোষণা করেনি এবং দ্বীন পালন করছে না ....

এই আয়াতটিও অনুরূপ ঃ

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا –

যে লোক আমার দ্বীন ও বিধান থেকে পেছনে সরে গেছে এবং কেবলমাত্র এই বৈষয়িক জীবনটাকেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, হে নবী, আপনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতও ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ – فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ –

এবং ওদের সাথে আপনি বিতর্ক করুন উত্তম কথাবার্তার দ্বারা। অবস্থা যদি এই হয় যে, তা ও আপনার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, তাহলে সে খুবই উচ্ছসিত বন্ধু হয়ে যাবে। (সূরা নহল ঃ ১২৫ ও সূরা হা-মীম-সিজদা)

এই কথাটিও ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا –

তাদেরকে জাহিল লোকেরা যখন (খারাপ কথা দ্বারা) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন, যুদ্ধ করা ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নাযিল হওয়া এসব আয়াতের নির্দেশ যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর আর কার্যকর নয় (অন্তত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা কালে—অনুবাদক)। এসব আয়াত হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। আর এসব কয়টি আয়াতেরই লক্ষ্য ছিল কাফির-মুশরিকদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং তা হিজায এলাকায়। নবী করীম (স)-এর মুজিযা—যা আল্লাহ্ তাঁর দ্বারা দেখিয়েছিলেন—বিবেচনা করলে একথা অনস্বীকার্য হবে যে, নবী-রাসূল ছাড়া এ কাজ অন্য কারো দ্বারা সাধিত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ – (سبا : ٤٦)

বল, আমি তোমাদেরকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তা হল তোমরা দুজন করে বা এক একজন আল্লাহ্‌র জন্যে (দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর) চিন্তা করে দেখ, তোমাদের এই সঙ্গীর উপর জ্বিনের কোন আসর নেই বা পাগলামীর কিছুই নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ -

বল, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে নীতি-আদর্শের অনুসারী পেয়েছ, তার চাইতেও অধিক উত্তম হেদায়েতের বিধান যদি আমি নিয়ে এসে থাকি, তাহলেও .....

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَافِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى- فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ -

তাদের নিকট কি অকাট্য প্রমাণ আসেনি, যা প্রাথমিক সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে? তা হলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ? (সূরা ত্বহা ঃ ১৩৩ ও আনফাল ঃ ৯৫)

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও না?

فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ -

তা হলে তোমাদেরকে কোন্ দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

এই ধরনের আয়াতসমূহে নবী করীম (স)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপের আদেশ রয়েছে। নবুয়তের চিহ্ন ও নিদর্শন এবং তার সত্যতা অকাট্য দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান রয়েছে। পরে নবী করীম (স) যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা তখন দলীল প্রমাণ পেশ করার পর্যায় এবং তাদের ওযর-অক্ষমতা প্রকাশের স্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নগরবাসী ও মরুবাসী, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল লোকের নিকট নবীর মুজিযা, তাঁর নিদর্শনাদি স্থিতি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা কুফর ও শিরকের উপর অবিচল হয়ে রয়েছে। অথচ তারা নিজেদের চোখে ওসব প্রমাণাদি করেছে, নির্ভুল খবরও পেয়ে গেছে। তা থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তা কোন ক্রমেই মিথ্যা হতে পারে না, তার সত্যতা অস্বীকার করা যেতে পারে না। যুদ্ধ ফরয হওয়ার আয়াতসমূহের তাফসীর লেখার সময়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا - أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خٰئِفِيْنَ -

যারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহে আল্লাহ্র নামের যিকির নিষিদ্ধ করে এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাদের তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে ? ওদের পক্ষে সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া অন্যভাবে প্রবেশ করার অধিকার থাকতে পারে না।

মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন; বখ্তে নসর বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করেছিল। খৃস্টানরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া ওদের পক্ষে সেখানে ওদের প্রবেশ করার অধিকার থাকতে পারে না' দ্বারা খৃস্টানদেরকেই বুঝিয়েছেন। ওরা তথায় চুরি করেই প্রবেশ করে। ওদের উপর শক্তি স্থাপিত হলে ওদেরকে এই দুনিয়ায়ই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শাস্তি দেয়া হবে। ওরা নিজেদের হস্তে-আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে।

ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ থেকে এ আয়াতের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ওরা খৃস্টান। তারাই বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করেছে।

আবূ বকর বলেছেন, কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনাকারী থেকে সম্ভবত ভুল হয়ে গেছে। কেননা প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই যে, বখ্তে নসর ছিল ঈসা মসীহ্ (আ)-এর জন্মের পূর্বে একজন বাদশাহ, সে-ও অনেক দীর্ঘকাল পূর্বের। আর নাসারা খৃস্টানদের উৎপত্তি তো হয়েছে ঈসা (আ)-এর পর। তা হলে তারা বায়তুল মাকদিস ধ্বংসের ব্যাপারে কি করে বখ্তে নসরের সাহায্যকারী হতে পারে বা তারাই বা তার ধ্বংসকারী হতে পারে কি রূপে ? সম্রাট কসতনতাইনের শাসনামলে তারা সিরিয়া ও রোমে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। দ্বীন-ইসলামের দুই-আড়াইশ বছর পূর্বে এই ঘটনা, তার পূর্বে তারা ছিল সাবেয়ী—মূর্তিপূজারী। এই সময় খৃস্টধর্ম গ্রহণকারীরা ছিল প্রচ্ছন্ন, আত্মগোপনকারী সমাজ ও সরকারের ভয়ে। তা সত্ত্বেও খৃস্টানরা বায়তুল মাকদিসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে (অবশ্য ইয়াহূদীরাও তাই)। এমতাবস্থায় তারা বায়তুল মাকদিসের ধ্বংসের কাজে সাহায্য করেছে—তা অকল্পনীয়। কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতটিতে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারাই মক্কায় অবস্থিত মাসজিদুল হারামে আল্লাহ্র ইবাদত করা থেকে মুসলমানদের বাঁধা দিয়েছিল। তাকে ধ্বংস করার জন্যে চেষ্টা করার যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, সেখানে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকার করে তাকে আবাদ রাখা থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে যিম্মী-বিধর্মী রাষ্ট্রানুগত নাগরিকদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করার দলীল রয়েছে। তা দুটি কারণে ঃ একটি আল্লাহ্র কথা উপরোদ্ধৃত আয়াত। এই নিষেধ দুভাবে হতো। একটি মসজিদে হারামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ও শক্তি প্রয়োগ করে। আর দ্বিতীয়টি হতো কাফির-মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস, ধর্ম ও আইন-শাসন। কেননা ধর্ম পালনের দিক দিয়ে বিশ্বাসের কারণে যারা মুসলমানদেরকে সেখানে এক আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত করতে বাধা দিত, তাদের

সম্পর্কেও কথা বলা সঙ্গত যে, তারা মুসলমানদেরকে তাদের ইবাদত-বন্দেগী করতে বাধা দিয়েছে। তাহলে এখানে নিষেধ বা বাধাদান অর্থ আপত্তি তোলা, অপছন্দ করা। যেমন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে কুফর করতে নিষেধ করেছেন। নাফরমানদেরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ, তাদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করা হয়েছে, সে কাজ করলে তাদের পরিণতি খারাপ হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ব্যবহৃত শব্দ উভয় অর্থই দিচ্ছে। তাই শব্দটি থেকে উভয় অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'ওদের অধিকার থাকতে পারে না ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া তথায় প্রবেশ করার' এ থেকে বোঝা যায় যে, সেখান থেকে ওদের বহিষ্কার করা মুসলমানদের কর্তব্য, যদি তারা তথায় প্রবেশ করে। অন্যথায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে কিভাবে! وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا আর দ্বিতীয় ' তারা তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। তা-ও দুভাবে হতে পারে। একটি তারা ধ্বংস করবে নিজেদের হাতে। আর দ্বিতীয়, তাকে ধ্বংস করা হবে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। কেননা তাদের ধর্মেরই দাবি হচ্ছে তাই। এর পরই বলা হয়েছে—ওদের অধিকার নেই সেখানে প্রবেশ করে। হলেও হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের এই নিষেধকরণ সেভাবেই, যেমন বলেছি। আর নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনও হতে পারে ঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ -

মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহের নির্মাণ কাজ করবে।

এই নির্মাণ দুভাবে হতে পারে। একটি হচ্ছে তা বানানো, তার সংস্কার করা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তথায় উপস্থিত হওয়া, তার সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন। যেমন বলা হয়, 'অমুকে মজলিস নির্মাণ করে'। অর্থাৎ সে মজলিসে উপস্থিত হয়। কোন মজলিস থেকে সে দূরে থাকে না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ -

তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত দেখবে, সে যে একজন ঈমানদার তার সাক্ষ্য তোমরা দেবে।

তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ -

আল্লাহ্র মসজিদসমূহ নির্মাণ করে কেবল সে লোকই, যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে।

লোকটির মসজিদে হাজির হওয়াকে মসজিদ নির্মাণের কাজ বলা হয়েছে। আমাদের মাযহাবের ফিকাহবিদগণ মসজিদে তাদের প্রবেশ করা জায়েয বলেছেন। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইন্শাআল্লাহ্। এ-ও জানা যায় যে, এ হুকুম মসজিদ সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র বায়তুল মাকদিস সম্পর্কেই এই কথা নয়, নয়

কেবল মসজিদুল হারাম সম্পর্কে। কোন্‌টির জন্যে এটা বিশেষ হুকুম, তা কেবলমাত্র দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে।

যদি বলা হয়, মসজিদের প্রত্যেকটি স্থানকেই মসজিদ বলা সঙ্গত। যেমন মজলিসের প্রত্যেকটি স্থানকেই মজলিস বলা যায়। এই কারণে কখনও সমগ্রটার উপর এই নাম প্রয়োগ করা হবে, আবার কখনও সিজদার প্রতি স্থানকেই মসজিদ বলা হবে?

এর জবাবে বলা যাবে, ভাষাবিদের মতে একটি মসজিদকে বহু বচনে مَسَاجِدُ বলা অসঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে مَسْجِدَانِ দুটি মসজিদ বলা যায় না একটি মসজিদকে। যেমন একটি ঘরকে বহু ঘর বলা যায় না। এতে প্রমাণিত হল যে, শুধু মসজিদ বললে তা শামিল করে না। যদিও সিজদার স্থানসমূহকে মসজিদ নাম রাখা হয়ও। তা বলা যাবে শর্তাধীন, নিঃশর্তে নয়। বিনাশর্তে তার ব্যবহার হবে যেখানে তার চাহিদা এবং সমস্ত মসজিদের ক্ষেত্রে নিঃশর্তে বলা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তুমি তো বিশেষভাবে কতক মসজিদকে অপর কতক মসজিদকে বাদ দিয়ে বোঝাতে চাইছ। কিন্তু তা দলীল ছাড়া মেনে নেয়া যায় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ –

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্যে। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ করবে সে দিকেই আল্লাহ্ রয়েছেন (সে দিকই আল্লাহ্‌র দিক)।

আবূ আশ্‌য়াম আস-সামান আসিম ইবনে উবায়দুল্লাহ-আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে রবী'আতা তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন কিবলা কোন্ দিকে তা আমরা ঠিক পাচ্ছিলাম না। তখন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে দিকে কিবলা মনে করেছিল, সে দিকে ফিরে নামায পড়েছি। যখন সকাল হল, তখন ব্যাপারটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রকাশ করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আইউব ইবনে উতবা কায়স ইবনে তলক্-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কতিপয় লোক এক সাথে সফরে বেরিয়েছিল। তারা এক সাথে নামায পড়ল, কিন্তু কিবলা ঠিক করতে পারল না। পরে তারা বুঝতে পারল যে, কিবলার ভিন্ন দিকে তারা নামায পড়েছে। পরে এই ঘটনার বিবরণ রাসূলে করীম (স)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ

تَمَّتْ صَلَاتُكُمْ –

তোমাদের নামায সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেছে।

ইবনে লেহ্ইয়াতা বকর ইবনে সওয়াদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে সফরে কিবলা ভুল করে নামায পড়ে। জবাবে তিনি বললেন ঃ 'যেদিকেই তোমরা মুখ কর সেটিই আল্লাহ্‌র দিক।'

আবূ আলী আল-হুসায়ন ইবনিল হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আল-ওয়াসেতী-আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হালাল আল-আম্বরী থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন ঃ বলেছেন, আবূ উবায়দ আল-হাসানের কিতাবে লিখিত পেয়েছি যে, আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান আল আরজামী আতা ইবনে আবূ রিবাহ্-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) এক যোদ্ধা বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আমি তার মধ্যে একজন ছিলাম। এক স্থানে অন্ধকার আমাদেরকে গ্রাস করল। তাই তখন কিবলা ঠিক পেলাম না। তখন কতিপয় উত্তর দিক দেখিয়ে বললে—এ দিকেই কিবলা। তখন সকলে সেই দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন এবং কয়েকটি রেখা আঁকলেন। অপর কিছু লোক দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বললে—কিবলা এই দিকে এবং সেদিকেও কয়েকটি রেখা এঁকে রাখলেন। পরে সকাল হলে ও সূর্যোদয় হলে দেখা গেল অংকিত রেখাগুলো কিবলার বিপরীত দিকে রয়েছে। সফর থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে করীম (স)-কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলে করীম (স) নিশ্চুপ থাকলেন। পরে উক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ 'তোমরা যে দিকেই মুখ করবে, সেটাই আল্লাহ্‌র দিক।

আবূ বকর বলেছেন, এ সব হাদীসের পেছনে আয়াতটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ রয়েছে এবং তার কারণ ছিল সেই সব লোকের কিবলার দিক ছাড়া অন্য দিকে নামায পড়া।

অপর এক হাদীসে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবী করীম (স) তাঁর সওয়ারীর উপর বসে নামায পড়ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনার দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে ঃ 'তোমরা যে দিকেই মুখ করবে, সেটাই আল্লাহ্‌র দিক।' এ আয়াত পর্যায়ে কাতাদাহ্ থেকে মা'মর বর্ণনা করেছেন ঃ এটা ছিল প্রথম কিবলার সময়ের ব্যাপার। পরে তা বাতিল হয়ে যায় এবং মসজিদুল হারাম কিবলা নির্দিষ্ট হয়। বলা হয়েছে, কাবার দিককে কিবলা বানানোর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। কেননা নবী করীম (স) প্রাথমিক পর্যায়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। কেউ কেউ বলেন, নবী করীম (স)-এর জন্যে ইখতিয়ার ছিল, তিনি যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়তে পারতেন। বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়াটা তাঁর ইখতিয়ারের ব্যাপার ছিল। তা তাঁর জন্যে ফরয ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাবাকে কিবলা বানানোর আদেশ দেয়া হল এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ যে দিকেই ফিরবে, তা-ই আল্লাহ্‌র দিক কথাটি সেই সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল। তা ছিল কাবাকে কিবলা বানানোর আদেশ দানের পূর্বের ব্যাপার।

আবূ বকর বলেছেন, সফরে কিবলা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করে যে-লোক নামায পড়ল, পরে প্রমাণিত হল যে, কিবলা ভুল হয়েছে, তার নামায সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ সকলে এবং সওরী বলেছেন, জিজ্ঞাসা করে কিবলা নির্ধারণ না করলে এবং তার কারণে ভুল কিবলার দিকে নামায পড়া হলে তার নামায সহীহ্ হবে না। জিজ্ঞাসা করার লোক পাওয়া না গেলে নিজেই চিন্তা-বিবেচনা চেষ্টা করে

ভুল কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়লে তার নামায হয়ে যাবে। তা কিবলাকে পেছনে রেখে নামায পড়া হোক কিংবা সে দিকেই মুখ করে পড়া হোক। এই মত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম, আতা শবী থেকেও পাওয়া গেছে। হাসান জুহরী, রবী আতা ও ইবনে আবূ সালমা বলেছেন, পরে সঠিক কিবলার সন্ধান পেলে নামায আবার পড়ে নেবে যদি সময় থাকে। আর সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকলে পুনরায় পড়তে হবে না। ইমাম মালিকের এই মত। ইবনে অহব তাঁর থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন। আবূ মুসয়িব তাঁর থেকেই এই মত বর্ণনা করেছেন যে, কিবলাকে পেছনে রেখে নামায পড়ে থাকলেও সময় অতিবাহিত না হয়ে গিয়ে থাকলে পুনরায় নামায পড়ে নেবে। যদি কিবলার দিকে থেকে সামান্য বামে বা ডানে ফিরে নামায পড়ে থাকে, তাহলে পুনরায় নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে লোক চেষ্টা করেও পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়েছে, পরে দেখা গেল, কিবলা রয়েছে পশ্চিম দিকে, তাহলে নামায আবার শুরু করবে। যদি পূর্ব দিকে হয়ে থাকে, পরে দেখল যে, তা বাঁকা তাহলে তা সেই একই দিক গণ্য হবে। বাঁকা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যা পড়া হয়ে গেছে, তা সহীহ্ গণ্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা সহীহ্ হবে। কেননা আল্লাহ্র কথা, 'যে দিকেই মুখ করবে তাই আল্লাহ্র দিক'-এর অর্থ, সে দিকেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, সে দিকে মুখ করার জন্যেই তুমি আদিষ্ট। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ -

তোমাদেরকে খাবার দিই কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে, তিনি আমাদের নিকট তা-ই পেতে চেয়েছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ -

আল্লাহ্র 'সত্তা' ছাড়া আর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে, তাঁর ইচ্ছানুক্রমে, তা ধ্বংস হবে না।

আমর ইবন রবী'আতা ও জাবির-এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেছে যে, আয়াতটি এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

যদি বলা হয় ঃ এ কথাও তো বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি জন্তুযানের উপর নফল পড়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে এবং কিবলার বর্ণনা দেয়ার জন্যেই তা নাযিল হয়েছে।

তাহলে জবাবে বলা যাবে এসব অবস্থা একই সময়ে ও এক সাথে বিরাজমান থাকা তো অসম্ভব বা নিষিদ্ধ কিছু নয় এবং নবী (স)-কে এই প্রত্যেকটি অবস্থায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তার পরেই আল্লাহ্ আয়াতটি নাযিল করেছেন এবং এর দ্বারা সব প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন। লক্ষণীয়, প্রত্যেক অবস্থার উল্লেখ করেই যদি কথা বলা হতো,

বলা হতো তোমরা যদি কিবলার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত অবহিত হও এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়তে সমর্থ হও, তাহলে জানবে, সে দিকেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, সেদিকে ফিরেই নামায পড়। আর তোমরা যদি কিবলার দিকে ফিরতে ভীত হও কিংবা থাক সফরে, তাহলে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, সে দিকেই রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর তোমরা যদি দিগ্ভ্রান্ত হয়ে পড় বা দিক সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়, তা হলে যে দিকে ফিরে নামায পড়বে, সেদিকই আল্লাহ্র দিক। এই সব অর্থ একসাথে গ্রহণ করতে যখন নিষেধ কিছুই নেই, তাহলে আয়াতটির তাৎপর্য সেভাবেই গ্রহণ করা কর্তব্য। তাহলে এই সবই আল্লাহ্রই ইচ্ছানুরূপ হবে, যেমন বলছি।

জারি ও আমর ইবনে রবী'আতা বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য হল আয়াতটি নাযিল হয়েছে মুজতাহিদ (চেষ্টাকারী) সম্পর্কে যদি সে ইজতিহাদে অর্থাৎ কিবলা নির্ধারণে চেষ্টা কারেও ভুল করে বসে। এ প্রসঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, নামাযটা কিবলা পেছনের দিকে রেখে হোক, ডান দিকে রেখে হোক বা বাম দিকে রেখে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা সে লোকদের কেউ উত্তর দিকে কেউ দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায পড়েছে। এ দিক দুটি পরস্পর বিপরীত। তা যে জায়েয, সে বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি আবূ সাঈদ (বনু হাশিমের মুক্ত দাস) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর উসমান ইবনে মুহাম্মাদ সাঈদুল মুকবেরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ –

পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে কিবলা।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সব দিকই কিবলারূপে প্রমাণিত। কেননা এ কথা ঠিক এই কথার মত-ই সমস্ত দিগন্ত।

লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'পূর্ব ও পশ্চিমের রব্ব'। এ কথা বলে সমগ্র জগত—সমস্ত দুনিয়া বোঝানো হয়েছে। লোকদেরকে যখন সমগ্র দুনিয়া বোঝাতে চাওয়া হবে, তখন পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের উল্লেখ করা হয়। এই শব্দ সমগ্র জগতকেই শামিল করে। উপরন্তু যেমন বলেছি, আগের কালের মনীষিগণ বলেছেন, এ ব্যাপারটি প্রকাশমান ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্মিলিতভাবে, কারো থেকে কোন ভিন্নমত প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। এ থেকে একথাও বোঝায় যে, যে লোক মক্কায় অনুপস্থিত, তার বাইরে অবস্থিত, তাকে কাবার দিকে নামায পড়তে হলে অবশ্যই ইজতিহাদ অর্থাৎ দিক জানতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা কাবার বিপরীত দিকে বসে যে লোক নামায পড়ছে সে যে ঠিক কাবার দিকে মুখ করতে পেরেছে, তা থেকে ভিন্ন দিকে নয়, তা নিশ্চয় করে বলতে পারে না। তাহলে সকলের নামাযই সহীহ—বৈধ। কেননা এছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয়, করতে বলাও হয়নি।

অনুরূপভাবে সফরে গিয়ে যে লোক কিবলা নির্ধারণের চেষ্টা করে ফরয নামায আদায় করল, তার নামাযও হবে। কেননা এছাড়া তার আর কোন দায়িত্ব নেই। এরূপ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা কর্তব্য যাঁরা বলেন, তারা আর একটা ফরয চাপিয়ে দেন

মাত্র। কিন্তু ফরয ছাড়া অপর একটি ফরয বিনা দলীলে চাপিয়ে দেয়া অসঙ্গত। যে কাপড় পরে নামায পড়া হল, পরে জানা গেল, সে কাপড় নাপাক, অথবা যে পানি দ্বারা 'তাহারাত' অর্জন করা হল, পরে জানা গেল, সে পানি পাক ছিল না—এ উভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায়ই ফরয আদায় হয়ে গেছে; কিন্তু দলীলের ভিত্তিতে উভয় অবস্থায়ই পুনরায় নামায পড়া ফরয হবে। কিন্তু কিবলার দিক নির্ধারণের চেষ্টা করার পর নামায আদায় করা সত্ত্বেও পুনরায় নামায পড়া ফরয করা বিনা দলীলে হবে। কেননা নামায তো যে-কোন দিকে ফিরে পড়লেই আদায় হয়ে যাবে। বিশেষ করে সওয়ারীর উপর নফল নামায। এ নামায জরুরী নয়। কেননা তা তার উপর ফরয নয়। অ-জরুরী নামায যখন অ-কিবলার দিকে জায়েয, তখন অ-কিবলার দিকে ফরয নামায—যা পড়তে বাধ্য—পড়া হলে যখন জানা যাবে যে, কিবলা ভুল ছিল, তখনও তা আবার পড়ার কোন দায়িত্ব নেই। আর প্রয়োজন ছাড়া নাপাক কাপড়ে নামায এবং নাপাক পানি দিয়ে 'তাহারাত' অর্জন—এরূপ অবস্থায় পুনরায় পড়া কর্তব্য।

অন্যদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সঠিক কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারী তার মত যে তায়াম্মুম করে নামায পড়েছে পানি না পাওয়ার কারণে। পানি পাওয়ার পর সে নামায আবার পড়া ফরয নয়।

কেননা নামাযে যে দিকে মুখ করেছে, সেদিকটিই তার জন্যে আসল কিবলার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। যেমন তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু নাপাক কাপড়ে নামায পড়ায় ও নাপাক পানি দিয়ে তাহারাত করার স্থলাভিষিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। তখন তার অবস্থা তায়াম্মুম বা অযূ ছাড়াই নামায পড়ার মত। এ থেকে আর একটি মৌল বিষয় জানা যায়। যার ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ে আলো পাওয়া যায়। তা হল—ভয় পাওয়া ব্যক্তির নামায পড়া অ-কিবলার দিকে ফিরে। দুটি দিক দিয়ে এতে ভিত্তি পাওয়া যায়। একটি—সেই দিকটি যে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া হয়েছে, সেই দিকটি ছাড়া বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন দিকই তার নেই। দ্বিতীয় সে দিকটি আসল কিবলার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অতএব তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না, যেমন 'তায়াম্মুম' করে যে লোক নামায পড়ল, পরে পানি পেলেও অযূ করে পুনরায় পড়তে হবে না। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ সেদিকেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, এর তাৎপর্য হচ্ছে, অ-কিবলার দিকে নামায পড়া। কেননা জানা-ই আছে, কাবার পরিধি কাবা থেকে দূরে অবস্থিত লোকদের জন্যে পরিব্যাপক নয়। প্রত্যেকটি মানুষ-ই সোজা-সঠিক কাবামুখী হয়ে নামায পড়তে পারে না। কাবা থেকে দূরে অবস্থিত লোকদের পরিধি ব্যাপ্তি কাবার পরিধি-ব্যাপ্তির তুলানায় কয়েক গুণ বেশী। সে ব্যাপ্তির মধ্যে যে সব লোক নামায পড়ে, তারা সকলেই ঠিক ঠিক ভাবে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তে পারে না। অথচ সেই সব লোকেরই নামায বৈধ ও সঙ্গত। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই সব লোকের দায়িত্ব ছিল সেই দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, যে দিকটি তাদের বিবেচনায় কাবামুখী। ঠিক কাবার অপর দিকের মুখী হতে পারার কোন দায়িত্ব তাদের ছিল না।

এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ওযরের সময় প্রত্যেকটি দিকই কাবার দিকের স্থলাভিষিক্ত।

যদি বলা হয়, উল্লিখিত সমস্ত লোকের নামাযই সঙ্গত ও বৈধ। কেননা তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কাবামুখী হতে পারে, যারা কাবা থেকে দূরে তাদের ছাড়া। কাবার দিক ছাড়া অন্য দিকে মুখ করেছে, পরবর্তীতে তা প্রকাশিত-ও হয়নি। তার নামায সহীহ্ হয়ে গেছে এই কারণে। কিন্তু এ ব্যাপারটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত নয়। কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেই চেষ্টাকারী, যে প্রকৃত কিবলার দিক জানার জন্যে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নামাযের পর স্পষ্ট হয়েছে যে, যেদিকে মুখ করে সে নামায পড়েছে সেদিকে কিবলা নয়।

এর জবাবে বলা যাবে, দুটির মধ্যে পার্থক্যের এটাই যদি আসল ও সমগ্র কারণ হয়ে থাকে, তা হলে তো সকলের নামায সঙ্গত না হওয়াই আবশ্যক। কেননা সোজা কাবামুখিতার পরিমাণ যদি হয় বিশ গজ, অতঃপর আমরা দেখলাম পূর্ব ও পশ্চিমের লোকদের নামায হয়ে গেল একথা জানা সত্ত্বেও যে, যারা যথার্থভাবে কাবামুখী হয়ে দাঁড়াতে পেয়েছে, তারা খুবই কম সংখ্যক, সকলের তুলনায় তাদের সংখ্যা অতি স্বল্প। তা সত্ত্বেও ঠিক কাবামুখী হয়েছে এমন লোক তাদের মধ্যে নেই—এ ও সম্ভব। অতঃপর সকলের নামায সম্পন্ন হয়ে গেল। তাতে আম লোকদের অবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ রূপে গণ্য করা হয়নি। যদিও নীতির দিক দিয়ে অধিক ও 'আম' লোকদের সাথে-ই শরীয়াতী হুকুমের সম্পর্ক। কেননা ইসলামী রাজ্যে (দারুল ইসলাম) ও শত্রু রাজ্যের (দারুল হরব) প্রত্যেক ব্যক্তি সংক্রান্ত হুকুম অধিক সংখ্যক ও 'আম' লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট, স্বল্প সংখ্যক 'খাস' লোকদের সাথে নয়। এ কারণে দারুল-ইসলামের লোকদের হত্যা করা নিষিদ্ধ যদি জানা যায় যে, তাদের মধ্যে মুর্তাদ, নাস্তিক, শত্রু যোদ্ধা ইত্যাদি হত্যাযোগ্য লোক আছে, তা সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে 'দারুল হরব'-এর লোকদের হত্যা করা মুবাহ যদি জানাও যায় যে, তাদের মধ্যে মুসলিম ব্যবসায়ী বা বন্দী আছে। শরীয়াতের সব মূলনীতি-ই এই দৃষ্টিকোণেই নির্ধারিত হয়েছে। কাজেই নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ 'আম' লোকের জন্যে কোন হুকুম নেই, একথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা যথাযথভাবে কাবামুখী হতে পারেনি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এজন্যে দায়িত্বশীল যে, নামাযের সময় হলে কাবামুখী যে দিকটিই তাদের সম্মুখে প্রতিভাত হবে, সেদিকেই নামায আদায় করবে। তার পক্ষে সঠিক কিবলা জানার জন্যে যতটা চেষ্টা করা সম্ভব ছিল তা সে করেছে। এদের কারোর-ই আবার নামায পড়তে হবে না।

যদি বলা হয়, কারোর নিকট জিজ্ঞাসা করে কিবলা নির্ধারণ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় যে লোক যে-কোন একটি দিকে ফিরে নামায পড়েছে, পরে বিপরীত দিকে কিবলা প্রমাণিত হলে তার জন্যে নামায আবার পড়া কর্তব্য বলে তুমি রায় দিয়েছ?

জবাবে বলা হবে, জিজ্ঞাসা করে সঠিক কিবলা জানতে পারা গেলে তখন নিজস্বভাবে সেজন্যে চেষ্টা করার কোন প্রশ্ন থাকে না। যেখানে জিজ্ঞাসা করে জানার উপায় নেই,

কেবল সেখানেই নিজস্বভাবে চেষ্টা করা ছাড়া উপায় থাকে না বলে সে অবস্থার নামাযকে আমরা বৈধ ও সঙ্গত বলেছি। কিন্তু যেখানে জিজ্ঞাসা করে জানার উপায় আছে সেখানে নিজস্ব চেষ্টায় কিবলা ঠিক করে নামায পড়ার কোন দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়নি। তখন জিজ্ঞাসা করে নেয়ারই দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। যা বলেছি তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)-এর নিকট অনুপস্থিত লোকেরা নিজস্ব চেষ্টায় কিবলা ঠিক করে নেবে, এতো জানাই আছে। সে ফরয তার উপর থেকে মনসূখ হয়ে যাওয়াও জায়েয। প্রমাণিত হয়েছে যে, কুবাবাসীরাও বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন, এই সময় একজন লোক এসে তাঁদেরকে খবর দিলেন যে, কিবলা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এক্ষণে কাবাই কিবলা হয়েছে। তখন তাঁরা নামাযের মধ্যেই কাবার দিকে ঘুরে গেলেন। অথচ পূর্বে তাঁরা কাবাকে পেছনের দিকে রেখেই নামায পড়ছিলেন। কেননা মদীনায়ও যে লোক বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করবে কাবা পড়বে তার পেছনের দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে পুনরায় শুরু থেকে নামায পড়তে বলা হয়নি। অথচ তারা নামাযের কতকাংশ বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে পড়েছেন, আর তা তখন মনসূখ হয়ে গেছে। এ-ও সত্য যে, তারা নামায শুরু করেছেন যখন, তখন সে কিবলা মনসূখ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তাদের গোটা নামায সহীহ্ হয়েছে। কেননা পূর্বের কিবলা মনসূখ হওয়ার কথা নবী করীম (স)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে মদীনায়। সংবাদদাতা 'কুবা' গেছেন মনসূখ হওয়ার পর। এই দুই জনপদের মাঝে দূরত্ব কয়েক ফার্লং মাত্র। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা নামায শুরু করেছেন আগের কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর। মদীনা থেকে 'কুবা'য় যাওয়ার পথ অতিক্রমে যে সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে অবস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বের কিবলা মনসূখ হওয়ার পূর্বে যদি তারা শুরু করে থাকতেন, তা হলেও তাদের পক্ষে একটা দলীল হতো। ফলে তাঁরা নামাযের কতক অংশ বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পড়েছেন সে কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের পূর্ণ নামাযই সহীহ্ হয়েছে।

যদি বলা হয়, তাঁদের নামায জায়েয হয়েছে এজন্যে যে, তাঁরা নামায শুরু করেছেন সে কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পূর্বে। আর তখন তা-ই তাঁদের জন্যে ফরয ছিল। এছাড়া অন্য কিছু করা তাদের জন্যে ফরয ছিল না।

এর জবাবে বলা যাবে, যে লোক চেষ্টা করে কিবলা ঠিক করে নামায পড়েছে তার অবস্থাও অনুরূপ। সেটাই তার জন্যে ফরয ছিল। এছাড়া অন্য কিছু করা তার জন্যে ফরয ছিল না।

যদি বলা হয়, যখন জানা যাবে যে, সে কাবার দিকে ফিরে নামায পড়েনি, তা হলে তার চেষ্টা করে কিবলা ঠিক করাটা একটা দুর্ঘটনা মনে করতে হবে। পরে সে দলীল পেয়েছে। তাই তখন তার চেষ্টা বাতিল গণ্য হবে এই দলীলের কারণে।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপারটা তা নয়, যা মনে করা হচ্ছে। কেননা কাবার দিকে মুখ করার দলীল তো তখন, যখন তা দেখা যাবে কিংবা সে বিষয়ে জানা যাবে। আর

নামাযের জন্যে কোন একটি দিক নির্দিষ্ট নয় যে, সব নামাযী কেবল সেদিকে ফিরেই নামায পড়বে। সমস্ত দিক-ই নামাযীর নামায পড়ার দিক। অবস্থার ও অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে এক-একটা দিক ব্যবহৃত হয়। যে লোক কাবা দেখছে বা সেদিকটি জানতে পারছে কাবা থেকে দূরে থাকা অবস্থায়, তার জন্যে ফরয হচ্ছে সেই দিকে ফেরা, যেদিকে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব। কাবা তার জন্যে ফরয দিক নয়। দিক অনির্দিষ্ট হয়ে গেলে চিন্তা ও চেষ্টা করে একটা দিক ঠিক করে নামায পড়াই তার জন্যে ফরয। কাজেই তোমার কথা সে চেষ্টা-ভাবনা করে দলীলের দিকে এসেছে ঠিক নয়, ভুল কথা। কেননা সে যখন চেষ্টা করে দিক ঠিক করছিল, তখন ঠিক কাবার দিকটি তার জন্যে ফরয ছিল না। দলীল তো সেখানে কাজে আসে যেখানে সেদিকে মুখ করে নামায পড়া সম্ভব বা সে দিকটি জানা যাবে। কাবা থেকে দূরবর্তী ব্যক্তির জন্যে চেষ্টাই একমাত্র উপায়। কাবার দিক জানুক আর না জানুক। যদি তা সেই দলীলের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়, তা হলে চেষ্টা-ভাবনার কোন অবকাশ থাকতো না। কেননা জানা আছে যে, হুকুমের পেছনে আল্লাহ্র একটি نَصّ অকাট্য দলীল আছে। কিন্তু দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোন হুকুমের পেছনে আল্লাহ্র কোন দলীল নেই, একথা জানা-ই আছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ - بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ -

আর ওরা বলেছে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। না, তিনি তো মহান-পবিত্র। বরং সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে সব-ই তো একমাত্র তাঁরই।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে প্রমাণ করছে যে, সন্তানের উপর মানুষের (তার পিতার) মালিকানা অবশিষ্ট নেই। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকানার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ আসমান জমিনের সব কিছু আল্লাহ্র মালিকানা, তাঁর সন্তান কেউ নয়। এই কথাই ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا - (مريم: ٩٢ - ٩٣)

রহমান আল্লাহ্র পক্ষে সন্তান গ্রহণ শোভন হতে পারে না। বরং আসমান-জমিনের যা কিছুই আছে, তা সবই রহমান-আল্লাহ্র বান্দা হয়ে আছে।

অতএব কারোর সন্তান যদি তার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে তাহলে তখনই মুক্ত হয়ে যাবে পিতার মালিকত্ব থেকে। নবী করীম (স)-এর সময়ে ঘটনাক্রমে পিতা সন্তান দাসের মালিক হয়ে পড়েছিল। নবী করীম (স) তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ

لَايَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ -

সন্তান তার পিতার বিনিময় হবে না। তবে পিতা যদি তাকে মালিকানাধীন পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্রয় করবে এবং মুক্ত করে দেবে।

এ দৃষ্টিতে আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে—পিতা সন্তানের মালিক হয়ে পড়লে সে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাবে। হাদীসটি থেকেও প্রমাণিত হয় পিতা সন্তানের মালিক হলে পিতা তাকে মুক্ত করবে।

কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি বলেছে, সন্তান যদি পিতার মালিক হয়ে বসে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া সন্তানের কর্তব্য নয়। আপনা-আপনিও মুক্ত হয়ে যাবে না। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তাকে ক্রয় করবে। অতঃপর তাকে মুক্ত করবে। এ কথা মালিক হওয়ার পর তাকে নতুন করে মুক্ত করবে। এই ব্যক্তি ভাষা ও প্রচলন সবই ভুলে গেছে। কেননা যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে, ক্রয় করতেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। তাকে ক্রয় করাই মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। নবী করীম (স)-এর কথাও অনুরূপ। বলেছেন ঃ

اَلنَّاسُ غَادِيَانِ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا، وَمُشْتَرٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا -

মানুষ দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ। সে নিজের বিক্রেতা। ফলে সে নিজেকে ধ্বংস করে এবং সে নিজের ক্রেতা। ফলে তাকে মুক্ত করে।

এর অর্থ, ক্রয়ের দ্বারাই সে তার মুক্তিদাতা। ক্রয়ের পরে নতুন করে মুক্তি দানের অপেক্ষা নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا بْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ -

ইবরাহীমকে তার রব্ব যখন কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন, তখন তিনি সে কয়টি বিষয় পূর্ণ পরিণত করে দিল।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত-কুরবানী ইত্যাদি দিয়ে ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। হাসান বলেছেন, তাঁর নিজের পুত্রকে হত্যা করার আদেশ তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছিল। তাঁকে তারকা-চন্দ্র-সূর্য দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মাথায় পাঁচটি ও দেহে পাঁচটি পবিত্রতার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। মাথার পাঁচটি পবিত্রতা হচ্ছে ঃ গোঁফ কাটা, কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা, মিসওয়াক করা ও মাথায় সিঁথি কাটা। আর দেহে পাঁচটি পবিত্রতা হচ্ছে—নখাগ্র কাটা, নাবীর নিচের পশম কাটা, খাতনা করানো, বগলের পশম উপড়ানো, পায়খানার অবশিষ্ট ধৌতকরণ—(শৌচ কর্ম করা) প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা ধোয়া।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ দশটি কাজ

স্বভাবসম্মত।[১] তারপর তিনি উক্ত কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি মাথায় সিঁথি কাটার স্থলে দাড়ি ছেড়ে দেয়া (না কাটা)-র কথা বলেছেন। তাতে আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে কিন্তু এই কথা বলা হয়নি। আম্মার, আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সে বর্ণনায় কার্যাবলীর উল্লেখে বেশি কমের পার্থক্য রয়েছে। তার সনদসমূহের উল্লেখ করছি না, তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর তাৎপর্যও বলছি না আলোচনার দীর্ঘতা এড়াবার জন্যে। বিশেষত এ বিষয়গুলো তো প্রখ্যাত। লোকেরা মুখের কথা দ্বারা যেমন এর প্রচার করেছে, তেমনি নিজের আমল দ্বারাও। এগুলো রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত হিসেবেও পরিচিত।

উদ্ধৃত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আমরা আগের মনীষীদের বিভিন্ন উক্তির উল্লেখ করেছি। সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তার বান্দা ও বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে এক সাথে এই সব দিক দিয়েই পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকতে পারেন, তা অসম্ভব কিছু নয় এবং আয়াতের অর্থে এই সবগুলো শামিল থাকাও বিচিত্র নয়। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ইবরাহীম (আ) এই সব গুলো পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রত্যেকটাকেই তিনি পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ যেমন করে আদেশ করেছেন, তিনি প্রতিটি কাজ তেমনিভাবেই পালন ও পূরণ করেছেন, কোন দিক দিয়ে এক বিন্দু কম করেন নি, ত্রুটি রাখেন নি।

কেননা সম্পূর্ণ করার বিপরীত কথা হচ্ছে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ করা। কিন্তু আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ فَاَتَمَّهُنَّ সে সেই সবগুলোই সম্পূর্ণ করেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, দশটি কাজ মাথা ও দেহে প্রকৃতসম্মত। এ ব্যাপারে, হতে পারে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ্-ই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا – (النحل : ١٢٣)

অতঃপর হে নবী! তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি এই বলে যে, তুমি একমুখী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে চল।

আরও নির্দেশ ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ – (الانعام : ٩٠)

উপরোক্ত লোকেরাই এমন যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়েত দিয়েছেন। অতএব হে নবী! আপনি তাঁর পদাংক অনুসরণ করুন।

উপরোক্ত কার্যাবলী ইবরাহীমী ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাত রূপে প্রমাণিত ও প্রচাতি হয়েছে। এই কাজগুলো পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও মলিনতা-আবর্জনা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে। এর ফলে শরীর ও পরিচ্ছদ থেকে ময়লা দূর হয়। আর এই

---

১. من الفطرة অর্থ, নবীগণের সুন্নাত। এ কয়টি কাজ করে তাঁদের অনুসরণ করার জন্যে আমরা আদিষ্ট। 'নিহায়া' গ্রন্থেও এরূপ বলা হয়েছে।

লক্ষ্যেই তা বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেমন ইহ্রামে চুল-নখ দূর করার বিধান করেছেন, তাই হালাল হওয়ার জন্যে তা কাটার ব্যবস্থা করেছেন। বলেছেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ – (الحج : ٢٩)

অতঃপর যেন তারা শেষ করে তাদের নখ ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা।

হাদীসেও এই কথা বলা হয়েছে। জুম'আর দিনের গোসল পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَنْ يَّسْتَاكَ وَاَنْ يَّمَسَّ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ –

যেন মিস্ওয়াক করে এবং ঘরে রাখা সুগন্ধি স্পর্শ করে।

এই কাজগুলো খুবই ভালো ও পছন্দনীয় সহজ বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও। স্বভাব ও নৈতিকতার দিক দিয়েই অতীব উত্তম বলে বিবেচিত। রাসূলে করীম (স) কর্তৃকও এগুলো নির্ধারিত।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হায়্যান আত্তামার-আবুল-ওয়ালীদ আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক-কুরায়শ ইবনে হায়্যান আল-আজলী সুলায়মান ফররুখ আবূ ওয়াসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আবূ আইউবের নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম ও 'মুসাফিহা' (করমর্দন) করলাম। তিনি আমার নখগুলো বড় বড় ও বাড়তি দেখলেন। তখন বললেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এলো। সে তাঁকে আসমান জগতের খবরাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী করীম বললেন ঃ

يَجِئُ اَحَدُكُمْ يَسْئَلُ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاظْفَارُهُ – كَاَنَّهَا اَظْفَارُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيْهَا الْخَبَاثَةُ وَالتَّفَثُ –

হ্যাঁ, তোমাদের এক-একজন এসে আসমানের খবর জানতে চায়, কিন্তু তার নিজের অবস্থা হচ্ছে, তার নখগুলো যেন পাখীর নখ। তাতে যত মলিনতা ও আবর্জনা জমা হয়ে থাকে।

আবদুল বাকী আহমাদ ইবনে সহল ইবনে আইউব, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, আল হায্যা-দাহক ইবনে যায়দ আল-আহ্ওয়াজী, ইসমাঈল ইবনে খালিদ, কায়স ইবনে আবূ হাজিম সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনি ভুল করছেন।[১] জবাবে বললেন ঃ আমি কেন ভুল করব না ? অথচ তোমাদের এক-একজনের অবস্থা হচ্ছে, তোমাদের নখ ও অঙ্গুলীর মধ্যে রয়েছে পুঞ্জীভূত ময়লা ও আবর্জনা।

---

১. হাদীসে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে تهم অর্থ غلط ভুল। অপর বর্ণনার শব্দ হল انك لتوهم। নিশ্চয়ই আপনি ভুল ধারণা করেছেন। رفغ احد كم তোমাদের এক-একজনের ময়লা। رفغ-এর বহুবচন ارفاغ। অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের জোড়া, বগল ইত্যাদি এবং তাতে যে ময়লা আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয় তা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁর নখ কাটতেন, গোঁফ ছাটতেন জুমআর দিনে জুম'আর জন্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, অকী, আওজায়ী, হাস্‌সান, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সূত্রে বর্ণিত। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদের নিকট উপস্থি হলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে আলু-থালু-মলিন অবস্থায় দেখতে পেলেন। লোকটির মাথার চুল ছিল আউলানো-ঝাউলানো। তখন তিনি বললেন ঃ

اَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ –

এ লোকটি তার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্যে কোন কিছু পায় না না-কি ?

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে আকাবা আস্‌সকুমী, আবূ উমাইয়্যাতা ইবনে ইয়ালা, হিশাম ইবনে ওরওয়াতা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

خَمْسٌ لَمْ يَكُنِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُنَّ فِىْ سَفَرٍ وَلَاحَضَرٍ : اَلْمِرْاٰةُ وَالْمِكْحَلَةُ وَالْمَشْطُ وَالْمُدْرِىْ وَالسِّوَاكُ –

নবী করীম (স) সফরে ও বাড়ী পাঁচটি জিনিস কখনই হাতছাড়া করতেন না। তা হল, আয়না, সুর্মাদানী, চিরুনী, মুদারী[১] ও মিসওয়াক। একটি বর্ণনায় এসব জিনিস ব্যবহারের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে চল্লিশ দিন।

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনুল মুসান্না-মুআয মুসলিম ইবনে ইবরাহীম মাদাকাতুদকীক আবূ ইমরান আওজাওকী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেছেন ঃ

وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا –

রাসূলে করীম (স) নাভীর নিম্নের পশম কামানো, গোঁফ খাটো করা ও বগলের চুল উপড়ানোর জন্যে চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই চুলায় আগুন ধরাতেন।

আবদুল বাকী ইদ্‌রীস, আল-হাদ্দাম, আমিম ইবনে আলী, কামিল ইবনুল উলা হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেছেন ঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطْلٰى وَلِىَّ مَغَابِنَهُ بِيَدِهِ –

---

১. المدرى মুদারী এমনএকটা জিনিস যা লোহা কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয় চিরুণীর কাটার আকৃতিতে ও তা থেকে লম্বা। তা দিয়ে তিনি মাথা ঘষতেন।

আবদুল বাকী মতীর, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির, মাআন ইবনে ঈসা ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন; হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলছেন ঃ

اَطَّلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلاهُ رَجُلٌ فَسَتَرَ عَوْرَتَهُ بِثَوْبٍ وَطَلَى الرَّجُلُ سَائِرَ جَسَدِه، فَلَمَّا فَرْغَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ عَنِّيْ ثُمَّ طَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْرَتَهُ بِيَدِهِ -

রাসূলে করীম (স) মর্দন করেছেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁকে মর্দন করে। তখন একটি কাপড় দিয়ে তাঁর লজ্জাস্থানকে আবৃত করে নেয়। লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর সমগ্র দেহ মর্দন করে। লোকটি কাজ শেষ করলে নবী করীম (স) লোকটিকে বললেন, তুমি এখন যাও। অতঃপর তিনি নিজের লজ্জাস্থান নিজে মর্দন করেন।

হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত হযরত আনাস (রা) থেকে একথাটি বর্ণনা করেছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايَتَنَوَّرُ فَاِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ

নবী করীম (স) সাধারণত চুল কাটতেন না। চুল বেশী হয়ে গেলে তা কামিয়ে ফেলতেন।

এই হাদীসটির বক্তব্য সম্ভবত এই যে, নবী করীম (স)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল মাতা মুণ্ডন করানো। আর এটাই ছিল তাঁর সাধারণ ও অধিক সময়ের অভ্যাস। এরূপ তাৎপর্যে দুটি হাদীসই সহীহ্ প্রমাণিত হয়। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে যে চল্লিশ দিনের মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সম্ভবত এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত ও দেরী করা জায়েয। চল্লিশ দিনের পরও বিলম্বিত করা নিন্দনীয়। যে তা করবে সে তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য সুন্নাতের বিরোধিতা করার কারণে। বিশেষ করে গোঁফ কাটা ও নখ কাটার ব্যাপারে।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ জাফর ত্বহাতী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা, জুফার, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (স)-এর মাথার চুল ও গোঁফ সম্পর্কে মত হচ্ছে, তা খাটো করার পরিবর্তে কিছুটা লম্বা করা উত্তম। যদিও তাতে কিছু চুল মুণ্ডন করতে হয়।

ইবনুল হায়সাম ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, আমার মতে গোঁফ বাড়ানো চেহারার বিকৃতি সাধন। মালিক (রা) এ-ও বলেছেন, গোঁপ বাড়ানো পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, তাকে বড় উচ্চ করে রাখা। তার উপর থেকে কাটা তিনি পছন্দ করতেন না। শুধু বৃদ্ধি করে বিনির্মাণে প্রশস্ততা দিতেন, আশহুব তাঁর এই মত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে লোক তার গোঁফ বাড়ায়, তার সম্পর্কে ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন ঃ

أَرَى أَنْ يُوْجِعَ ضَرْبًا -

আমি মনে করি, তাকে মেরে ব্যথা করে দেয়া উচিত।

এটা নবী করীম (স)-এর হাদীস নয়। গোঁফ বাড়ানো পর্যায়ে তিনি বলেছেন ঃ গোঁফ বাড়ানোর অবস্থা এই ছিল যে, ওষ্ঠের দুই পাশ প্রকাশমান হতো। অতঃপর বললেন, গোঁফ কামানোর যে প্রচলন রয়েছে, তা বিদআত। কোন ব্যাপার যখন হযরত উমর ফারুক (রা)-কে ভাবান্বিত করত, তখন তিনি মুখে 'ফুঁ' দিতেন এবং তাঁর গোঁফ পাকাতেন। ইমাম আওজায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—এক ব্যক্তি তার মাথা কামিয়ে ফেলেছে, এ বিষয়ে আপনার মত কি ? বললেন—বাড়িতে অবস্থানরত (সফরে নয়) থাকা অবস্থায় কেবলমাত্র কুরবানীর দিন-ই করা পছন্দনীয় ও তার প্রচলন আছে। আবাদাতা ইবনে আবূ লুবাবাতা এই কাজে বিরাট শুভফল আছে বলে উল্লেখ করতেন। ফিকাহবিদ লাইস বলেছেন, তোমাদের কেউ তার গোফ কামিয়ে ফেলুক, আমি তা পছন্দ করি না। কেননা তাতে চামড়া প্রকাশমান হয়ে পড়ে। বরং তা আমি ঘৃণা করি। তবে গোঁফের চারধারে যে পশম থাকে তা কেটে খাটো করা উচিত। আর লম্বা গোঁফও আমি অপছন্দ করি।

ইসহাক ইবনে আবূ ইসরাঈল বলেছেন, আমি আবদুল মজীদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবূ দাউদকে মাথা মুণ্ডন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মক্কায় তা করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এই শহরটাই হল মাথা মুন্ডনের শহর। তার বাইরে অন্যান্য স্থানে তা করা উচিত নয়।

আবূ জাফর বলেছেন, এ পর্যায়ে ঈমাম শাফেয়ীর কোন দলীলভিত্তিক মত পাইনি। তাঁর সঙ্গী ছাত্র আল-মুজানী ও রুবাইকে আমি দেখেছি,. তাঁরা দুজনই তাদের গোঁফ বড় করে রাখতেন। বোঝাই যায় যে, তাঁরা ইমাম শাফেয়ী থেকেই এই নিয়ম গ্রহণ করেছেন। হযরত আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْفِطْرَةُ عَشَرَةٌ مِنْهَا قَصُّ الشَّارِبِ -

স্বভাবসম্মত কাজ দশটি। তন্মধ্যে রয়েছে গোঁফ কাটা।

মুগীরা ইবনে শুবা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর গোঁফ কেটেছেন মিসওয়াকের ওপর রেখে। এটা জায়েয ও মুবাহ নিঃসন্দেহে, যদিও তার বিপরীতটাও উত্তম, তখন পরিমাণ মতো কাটার কোন অস্ত্র না থাকার দরুনও সে কাজ করে থাকতে পারেন।

ইক্‌রামা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর গোঁফ কাটতেন। সম্ভবত একটু বড় করেই কাটতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَحْفُوْا الشَّارِبَ وَاَعْفُوْا اللِّحَى -

তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি রেখে দাও।

এ থেকে বোঝা যায়, প্রথমোক্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে গোঁফ খাটোকরণ, যেন চুল সরে যাওয়ায় চামড়া প্রকাশমান হয়। আরবী কথনে বলা হয় رَجُلٌ حَافٌ খালি পা ব্যক্তি।

حَفِيَتْ رِجْلُهُ - حَفِيَتِ الدَّابَّةُ

পায়ের নিম্নভাগে যখন আঘাত লাগে, তখন এই শব্দ বলা হয়। শব্দটি حفا থেকে এসেছে।

আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ উসাইদ, রাফে ইবনে খদীজ, সহল ইবনে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই তাঁদের গোঁফ খুব ছোট করে রাখতেন। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা) কে দেখেছি, তিনি তাঁর গোঁফ কামাচ্ছেন, অর্থাৎ গোঁফের পশমগুলো যেন উপড়াচ্ছেন। বাড়তি কথা এ-ও কেউ বলেছেন যে, তার ফলে তাঁর চামড়ার শ্বেত দেখা যাচ্ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, গোঁফ খাটো করা যখন সুন্নাত সকলের মতে, তখন কামিয়ে ফেলা তো অধিক উত্তম কাজ হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ - ثَلَاثًا -

আল্লাহ্ রহমত করেছেন মুণ্ডনকারীদের প্রতি।

এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। এবং যারা গোঁফ কেটে খাটো করে রাখে, তাদের জন্যে তিনি একবারই রহমতের দো'আ করেছেন।

এতে মাথা মুণ্ডন চুল খাটো করার তুলনায় উত্তম প্রমাণিত হয়। ইমাম মালিক দলীলরূপে পেশ করেছেন যে, উমর (রা) তাঁর গোঁফ উচুঁ করে পাকাতে থাকতেন যখন তিনি ক্রুদ্ধ হতেন—এই কথার ব্যাখ্যায় বলা যায়, হয়ত তিনি কোন সময় গোঁফ রেখে দিয়েছেন, যেন তা পাকানো মোড়ানো যায়। পরে কামিয়ে ফেলেছেন। এ রকম তো অনেক লোককেই করতে দেখা যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا -

আমি তোমাকে জনগণের ইমাম (নেতা) রূপে বানাব।

ইমাম তো বলা হয় তাকে, যাকে সকলে মানে, আনুগত্য ও অনুসরণ করে দ্বীনি ব্যাপারাদিতে নবীর দেখানো পন্থায়। এ দৃষ্টিতে সব নবী-রাসূলই জনগণের ইমাম। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে অনুসরণের জন্যে বাধ্য করেছেন। দ্বীনি ব্যাপারাদিতে তাঁদেরকে মেনে চলতে বলেছেন। খলীফাগণও জনগণের ইমাম কেননা তাঁরা তো এমন মর্যাদায়

অভিষিক্ত যে, জনগণ তাদের আনুগত্য অনুসরণ করতে বাধ্য, তাঁদের আদেশ-নিষেধ, কথা ও বিচার ফায়সালাও তারা অবশ্যই মানবে। ফিকাহবিদগণও ইমাম তা এই দিক দিয়ে যে, যার ইমামতিতে লোকেরা নামায আদায় করে সে নামাযীদের ইমাম। তার পেছনে যে-ই নামাযে দাঁড়াবে, সে তাকে অনুসরণ করেই নামায পড়বে, তাকে ইমাম মেনে নিলেই তখন তার নামায সহীহ্ হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا -

ইমামকে ইমাম বানানোই হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে অনুসরণ করে নামায পড়া হবে। অতএব ইমাম রুকূতে গেলে তোমরাও রুকূতে যাও, ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাও।

বলেছেন ঃ

لَاتَخْتَلِفُوْا عَلَى إِمَامِكُمْ

তোমরা তোমাদের ইমামের সাথে পার্থক্য করো না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যার অনুসরণ বাধ্যতামূলক, তাকেই 'ইমাম' বলে অভিহিত করা যাবে। দ্বীনি ব্যাপারাদিতে যাকে মানতে হয়, যে কোন বিষয়েই হোক সে-ই তো ইমাম রূপে বরিত। হ্যাঁ, বাতিল ইসলাম বিরোধী কাজে যাকে মেনে চলা হয়, তাকেও ইমাম বলা যায়। তবে তাতে এই দুই ইমাম অভিন্ন ও সমান সমান হয়ে যায় না। বাতিল পথে যাদেরকে মানা হয় কুরআনে তাদেরকেও 'ইমাম' বলা হয়েছে। আয়াতে ঃ

وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ - (القصص : ٤١)

এবং আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি যারা (লোকদেরকে) জাহান্নামের দিকে ডাকে।

বাতিল পথের নেতৃত্ব দানকারীরাও কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী 'ইমাম' নামে অভিহিত। কেননা তারাও দ্বীনি বা ধর্মীয় ব্যাপারে এমন স্থানে অবস্থিত, যে লোকেরা তাদেরকে মেনে চলে। তাদের অনুসরণ করে। যদিও তাদেরকে ইমাম (নেতা) মেনে তাদের অনুসরণ করা ফরয নয়। তার কোন শুভ ফলও নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ الِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ -

তাদের যেসব ইলাহ্ তাদেরকে ডাকে, তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে নি।

বলেছেন ঃ

وَانْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا - (طه : ٥٧)

দেখ, তাকাও তোমার সেই ইলাহ্‌র প্রতি, যার সম্মুখে তুমি একান্ত হয়ে বসে পড়েছ।

অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস ও ধারণায় যে তোমার ইলাহ্ তার দিকে নজর দাও। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِى اَئِمَّةٌ مُضِلِّيْنَ –

আমার উম্মতের উপর যে সব বিপদের আমি ভয় করি, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয় হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের ব্যাপারে।

এই সাধারণ কথায় সেই সব নেতাই গণ্য, যাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীন, সত্য ও হেদায়েতের ব্যাপারে অনুসরণ করা কর্তব্য বলে মনে করা হয়। লক্ষণীয়, আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীমকে বলেছেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا –

আমি তোমাকে লোকদের ইমাম বানাব।

এখানেও 'ইমাম' এর কোন গুণ পরিচিতির শর্তের উল্লেখ হয়নি। কিন্তু পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর নেতাদের কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে পরিচিতির শর্তেরও উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে'। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'ইমামত' (নেতৃত্ব) শব্দটি সকলকেই শামিল করে। নবীগণ ইমামতের উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁদের পর খলীফা রাশেদগণ। তাঁদের পর আলিমগণ, শরীয়াত অনুযায়ী বিচারকগণ, আর যারা তাদের মেনে চলার নীতি গ্রহণ করেছেন তাঁরা। এঁদের পরে আসেন নামাযের ইমামগণ। এমনিভাবে আরও অনেক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে জনগণের ইমাম বানাবেন। ইবরাহীম (আ) وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও ? পূর্ব কথার পরই এই কথা এসেছে। ফলে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, আমার বংশধর-সন্তানদের মধ্য থেকেও বানাও। এ-ও হতে পারে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেও 'ইমাম' বানানো হবে কিনা, তা তিনি জানতে চেয়েছেন। জবাবে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لاَيَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ –

জালিমরা আমার প্রতিশ্রুতি পেতে পারে না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। হ্যাঁ, তাঁর বংশধর সন্তানদের মধ্যে থেকেও ইমাম বানাবেন। তিনি যা জানতে চেয়েছেন সেই বিষয়ে তাঁকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে। অথবা তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে যে ইমামত চেয়েছেন, সে বিষয়ে জবাবস্বরূপ উক্ত কথাটি বলা হয়েছে। কেননা 'আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও' কথাটির অর্থ তা-ই দাঁড়ায়। এ-ও হতে পারে যে, তিনি উভয় দিকে লক্ষ্য রেখেই কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর সন্তানদের নেতা বানাবার জন্যে বলেছেন এবং তাঁর পরবর্তী ইমামত সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন। আর উক্ত কথাটি তার এই উভয় প্রার্থনার জবাবস্বরূপ এসেছে। কেননা হযরত ইবরাহীমের জিজ্ঞাসার জবাব যদি না হতো—তাহলে বলা

হতো—না, তোমার বংশে কেউ ইমাম হবে না, অথবা বলা হতো তোমার বংশের কেউ আমার এই প্রতিশ্রুতির আওতার মধ্যে নয়। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ -

জালিম লোকেরা আমার এই প্রতিশ্রুতি পাবে না।

তাতে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র এই জবাবে বলে দেয়া হয়েছে, তোমার বংশে ইমাম হবে। তবে তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা জালিম তারা ইমাম হবে না। তাদেরকে নেতৃত্ব দান ও অনুসরণের কেন্দ্রস্থলে কখনই বসানো হবে না।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত এ আয়াতের عهد অর্থ নবুয়ত। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন যে, জালিম ইমাম হবে না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বলেছেন, জালিমকে দেয়া ওয়াদা পূরণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই কোন জুলুমের কাজে শরীক হওয়ার কারো সাথে তোমার চুক্তি হলে তুমি তা ভেঙ্গে দাও। হাসান বলেছেন, এর অর্থ, আল্লাহ্র নিকট জালিমদের জন্যে এই প্রতিশ্রুতি নেই যে, তিনি পরকালে তাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।

আবূ বকর বলেছেন, আসলে আয়াতটির এই সব অর্থই একসাথে হতে পারে এবং তা-ই বুঝতে হবে। ব্যবহৃত শব্দ এই সব অর্থই দেয়। আল্লাহ্ হয়ত এই সত্য কথাই বলতে চেয়েছেন ঐ ছোট কথাটির মাধ্যমে। আমার মতে এই কথাই সত্য। অতএব জালিম কখনও নবী হতে পারে না। খলীফা হতে পারে না কোন নবীর। বিচারক হতে পারে না, দ্বীনের ব্যাপারে যার কথা শোনা লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক, জালিম তেমন হতে পারে না। জালিম মুফতি হতে পারে না, সাক্ষী হতে পারে না। নবী করীম (স) থেকে কোন সংবাদদাতা (বা হাদীসের বর্ণনাকারী) হতে পারে না। আয়াতটি বলে দিয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে মান্যতার স্থানে আসীন হওয়ার জন্যে ন্যায়বাদী العدلة। ও কল্যাণকামী হওয়া জরুরী শর্ত। উপরন্তু এ আয়াত এ-ও বলছে যে, নামাযের ইমামকে হতে হবে সালিহ্—নেক আমলকারী। ফাসিক লোক নামাযেরও ইমাম হতে পারে না, জালিমরাও নয়। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারের ন্যায়পর হওয়া শর্ত। কেননা আল্লাহ্র عهد হচ্ছে, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ। জালিমদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করার নীতি ইসলামে গ্রহণীয় নয়। দ্বীনের কোন কিছুই তাদের নিকট রক্ষিত নয়। কেবলমাত্র নেক্কার লোকদের কথা কবুল করারই অনুমতি আছে, লোকদেরকে তা করারই আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকেই মেনে চলতে, অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্র এ কথাটি বিবেচ্য ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

হে আদম সন্তানগণ, আমি কি তোমাদের সাথে এই চুক্তি করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

অর্থাৎ শয়তানের ব্যাপারে আগেই তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ বলেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি এই ওয়াদা করেছেন। খলীফাগণের অধীন আঞ্চলিক শাসক-কর্মকর্তাদের সাথেও বিচারপতিদের সাথেও এরূপ চুক্তিই থাকে। এরাই হচ্ছে নিম্নস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। এদের প্রতিই খলীফাগণ থেকে অগ্রিম আদেশ আসে, তারা সেই অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করে, তারই ভিত্তিতে লোকদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। তা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌র চুক্তি যখনই হয়, তখন তা তাঁর আদেশ-নিষেধ সমন্বিত ব্যাপার হয়। তাতেই নিহিত থাকে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ 'জালিমরা আমার চুক্তি প্রতিশ্রুতি পেতে পারে না'। অর্থাৎ জালিমরা আদিষ্ট নয়, এ কাজে নিয়োজিত বা নিয়োগ প্রাপ্ত নয়। অথবা জালিমরা এমন পদে আসীন হতে পারে না, যার নিকট থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ গ্রহণ করা যেতে পারে, মানা যেতে পারে তাদের হুকুম। কেননা তাদের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস কিছুই নেই। অতএব প্রথম দিকটা বাতিল হয়ে গেল। কেননা মুসলমানগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, আল্লাহ্‌র আদেশ জালিমদের জন্যে বাধ্যতামূলক, যেমন অন্যান্যদের জন্যেও বাধ্যতামূলক। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অমান্য করেই তো জুলুমের দিকে চলিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় দিকটিও প্রমাণিত হয়ে গেল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য, সে ব্যাপারে তারা অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্য নয়। আর এ কারণেই তারা দ্বীনের ইমাম হতে পারে না। তাই এই আয়াতের আলোকে ফাসিক লোকদের 'ইমামত' বা নেতৃত্ব বাতিল প্রমাণিত হল। ওরা মুসলমানদের খলীফাও হতে পারে না। যে লোক নিজেকে এই উচ্চতর আসনে আসীন বানাবে, সে ফাসিক, লোকেরা তাকে মানতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। নবী করীম (স)-এর এ কথাটি এই অর্থেই ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

স্রষ্টা—আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।

একথাও বোঝা গেল, ফাসিক শাসক হতে পারে না। তার দেয়া আদেশ-ফরমানসমূহ কার্যকর হবে না, হুকুম দানের দায়িত্বশীল সে নয়। এই লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যেতে পারে না। নবী করীম (স)-এর দিক থেকে তার দেয়া খবরও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সে মুফতি হয়ে ফতোয়া দিলে তা মানা যাবে না। নামাযে তাকে ইমামতি করতে দেয়া যেতে পারে না। যদি ফাসিক ব্যক্তিকে নামাযের ইমামতি করতে দেয়া হয় এবং তার ইমামতিতে নামায পড়ে কোন মুক্‌তাদী—তার নামায হবে না, তা আল্লাহ্‌র এই কথার আওতার মধ্যে এসে যায় 'জালিমরা আমার অঙ্গীকার পেতে পারে না।' এ সবই উক্ত আয়াতের অর্থ।

কেউ কেউ মনে করে, হানাফী মাযহাব বুঝি ফাসিকের ইমামতি জায়েয মনে করে। ফাসিক ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনেও বসানো যায়। এই মাযহাব ইমাম ও শাসকের মধ্যে পার্থক্য করে বলে শাসকের হুকুম দানের অধিকার স্বীকার করে না। কোন কোন মুসলিম দার্শনিক কালামবিদ থেকে এই কথার উল্লেখ এসেছে। এই ব্যক্তির নাম

জরকান। কিন্তু উক্ত কথা মিথ্যা। ভিত্তিহীন কথা বলা হয়েছে হানাফী মাযহাব সম্পর্কে। এ লোকের বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়।

মূলত ইমাম আবূ হানীফার মতে বিচারক, বিচারপতি ও খলীফার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, এই দিক দিয়ে যে, উভয় ক্ষেত্রেই عدالة ন্যায়পরতা, সততা, বিশ্বস্ততা শর্ত হিসেবে স্বীকৃত। তাই ফাসিক খলীফা হতে পারে না, শাসক হতে পারে না, যেমন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না, তার দেয়া খবরও গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করীম (স) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলেও তা গ্রহণ অযোগ্য। এরূপ ব্যক্তি খলীফা কি রূপে হতে পারে, তার বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্য। তার আদেশ-নিষেধ—ফরমান অকার্যকর। কাজেই উক্ত মত ইমাম আবূ হানীফা (রা)-কে বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্যে তাঁর উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁকে এজন্যে নির্মম নির্যাতনের শিকার বানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তা থেকে বিরত রয়েছেন। এ জন্যে তাঁকে কয়েদ করা হয়। তখন ইবনে হুবায়রা প্রতিদিন অসংখ্যবার চাবুক মেরে তাঁকে জর্জরিত করতো। এই অবস্থায় তাঁর জীবনের ব্যাপারে যখন আশংকা দেখা দিল, তখন অন্যান্য ফিকাহবিদ সরকারী কিছু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে—যেন তার উপর থেকে এই নির্মম অত্যাচার নিঃশেষ হয়ে যায়—পরামর্শ দিলেন। অতঃপর খলীফা মনসুরও তাঁকে এরূপ কোন কাজ গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলেন। কিন্তু ইমাম তা অস্বীকার করলেন। তখন আবার তাঁকে বন্দী করা হয়। সেখানে বাগদাদ নগরের প্রাচীর নির্মাণের কাঁচা ইট দিয়ে তাঁকে মারা হয়।

বস্তুত জালিম ও অত্যাচারী শাসক-প্রশাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার মত অত্যন্ত প্রখ্যাত ও প্রবল। এই কারণে ইমাম আওজায়ী বলেছেন, আবূ হানীফাকে আমরা সব জিনিসের জন্যেই সামলিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু তিনি জালিমদের বিরুদ্ধে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করার ব্যাপারটি নিয়ে যখন এলেন, তখন আর আমরা তাঁকে সামলাতে পারিনি। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলতেন, মুখের কথার দ্বারা 'আমার বিল মারুফ ও নিহী আনিল মনকার'—'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা' ফরয। কিন্তু তা যদি কার্যকর না হয়, তাহলে তরবারি ব্যবহার দ্বারাই তা কার্যকর করতে হবে। নবী করীম (স) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। খুরাসানের সর্বজনমান্য বড় ফিকাহ্‌বিদ ইবরাহীম আয্‌যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বহু সংখ্যক হাদীসেও এ কথাটি এসেছে। তিনি বলেছেন, তা ফরয। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণিত হাদীসেও এই কথাটারই সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلٰى اِمَامٍ جَائِرٍ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقُتِلَ -

শহীদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এবং এমন ব্যক্তি যে কোন অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মারুফের আদেশ ও মুনকার-এর নিষেধ করলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

পরে ইবরাহীম 'মরো' নগরে উপস্থিত হল। সেখানে রাষ্ট্রচালক ও শাসক ছিলেন আবূ মুসলিম। তিনি তাকে আদেশ ও নিষেধ করলেন এবং তাঁর জুলুমের প্রতিবাদ করলেন, অন্যায়ভাবে রক্তপাত করার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। ফলে তাঁর উপর কয়েকবার নির্মম হামলা চালানো হয় এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। যায়দ ইবনে আলীর সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগ ও সহযোগিতার কথা সকলেরই জানা। তিনি মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি গোপনে এই ফতোয়াও প্রচার করেছেন যে, যায়দ ইবনে আলীর সাহায্য করা এবং যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হওয়া সকলেরই কর্তব্য। আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের দুই পুত্র—মুহাম্মাদ ও ইবরাহীমের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। আবূ ইসহাক আল-ফুজারী তাঁকে বললেন, "আপনি আমার ভাইকে ইবরাহীমের সাথে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করার জন্যে উস্কানি দিয়েছেন কেন, যার ফলে সে নিহত হয়েছে ?" এর জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিদ্রোহ তোমার বিদ্রোহের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দ। আবূ ইসহাক বসরায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মূলে ছিল হাদীস বর্ণনাকারী লোকদের তাঁর প্রতি অস্বীকৃতি ও অসহযোগিতা। ফলে 'আমার বিল মারূফ ও নিহি আনিল মুনকার' কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর এরই ফলে জালিম লোকেরা ইসলামের ব্যাপারাদির উপর বিজয়ী হয়ে বসল।

'আমর বিল মারূফ ও নিহি আনিল মুনকার' পর্যায়ে এই যার ভূমিকা ও অবদান, তিনি কি করে ফাসিকের ইমামত (নেতৃত্ব) জায়েয বলতে পারেন ?....... এটা যে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তাতে এক বিন্দু সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতি উক্ত রূপ মিথ্যা অভিযোগের আরও একটা কারণ রয়েছে। ইরাকী সব বিশেষজ্ঞেরই মত হচ্ছে, বিচারক নিজে যদি ন্যায়পরায়ণ-নিরপেক্ষ হন এবং তিনি যদি অত্যাচারী শাসকের পক্ষ থেকে নিয়োজিত হন, তাহলে তার আদেশাবলী কার্যকর হওয়া জায়েয এবং তাঁর বিচার ও রায়সমূহ সহীহ গণ্য হবে। তার ইমামতিতে নামাযও জায়েয হবে শাসকদের ফাসিক ও জালিম হওয়া সত্ত্বেও। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই মত ঠিক। কিন্তু এতে এ কথা প্রমাণ করে না যে, হানাফী মাযহাব ফাসিকের ইমামত জায়েয় মনে করে। এই মতের পক্ষে যুক্তি হল, বিচারক যদি ন্যায়পরায়ণ হয়, তা হলে তার পক্ষে ফায়সালা ও বিচারসমূহ কার্যকর করা হয়ত সম্ভবপর হবে। তার হাতে একটি শক্তি ও কর্তৃত্ব আসতে পারে, যে তা মানতে অস্বীকার করবে, তা সে কবুল করতে বাধ্য হবে। প্রয়োজনে সে তার উপর জোর প্রয়োগ করতে পারবে। কে তাকে এই পদে নিয়োজিত করেছে, সে প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর। কেননা তার নিয়োগকারী তো তার বহু সংখ্যক সাহায্যকারীর মধ্যে একজন মাত্র। আর বিচারকের সাহায্যকারীদেরও 'ন্যায়পর' হতে হবে, তার কোন শর্ত নেই। যেমন যে দেশের কোন সার্বভৌম শাসক ও চালক নেই; সেখানকার জনগণ যদি একজন ন্যায়পরায়ণকে এই কর্তৃত্বের অধিকারী বানায় সকলে একমত হয়ে, তা হলে তা কি বাস্তবায়িত হবে না ? এই বিচার কার্যটিও এই পর্যায়েরই। যে লোকই বিচার বা হুকুম মানতে অস্বীকার করবে তাকে তো মানতে বাধ্য করার জন্যে এরা সাহায্যকারী হবে।

তাহলে বিচারকের বিচার ও রায় কার্যকর হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাসীন নেতার দিক দিয়ে তাকে ক্ষমতা না দিলেও তাতে কিছুই আসে যায় না। এই যুক্তির ভিত্তিতেই কাযী শুরাইহ ও তাবেয়ী যুগের বহু সংখ্যক বিচারক বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। শুরাইহ বিচারপতি ছিলেন কূফা শহরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের শাসন আমল পর্যন্ত। আর সমগ্র আরব ও মারওয়ান বংশের খলীফা আবদুল মালিকের চেয়ে বড় জালিম, বড় কাফির আর কেউ ছিল না। আর আবদুল মালিকের প্রাদেশিক শাসকবর্গের মধ্যে হাজ্জাজের তুলনায় অধিক বড় জালিম ও কাফির আর কেউই ছিল না। সে লোকদের জিহ্বা কেটে দিত 'আমর বিল-মারূপ ও নিহি আনিল-মুনকার' করলে। খলীফা আবদুল মালিক মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি মারাত্মক ভাষণ দেন। বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আমি কোন দুর্বল খলীফা নই। [অর্থাৎ উসমান (রা)] কৃত্রিমভাবে বানানো খলীফাও (মুআবিয়া) আমি নই। তোমরা আমাকে এমন অনেক কাজ করতে বলো, যা করার দায়িত্ব তোমাদেরও আছে, যা তোমরা ভুলে যাও। আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি অতঃপর যে লোকই আমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া গ্রহণ করার নসীহত করবে, আমি তার গর্দান মেরে দেব, আলিম-ফিকাহ্‌বিদগণ বায়তুল মাল থেকে জীবিকা পেয়ে থাকতেন। মিথ্যাবাদী মুখতার ইবনে আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফীয়া ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সর্বজনমান্য ব্যক্তিকে ধন-মাল দিতেন। তারা তা গ্রহণও করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আজলান কাকার সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুল আজীজ ইবনে মারওয়ান হযরত ইবনে উমর (রা)-কে লিখে পাঠালেনঃ

ارْفَعْ اِلَيَّ حَوَائِجَكَ -

আপনার প্রয়োজন পরিমাণের কথা আমার নিকট তুলে ধরুন।

জবাবে তিনি লিখলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَاَحْسِبُ اَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِى وَاَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى يَدُالْاٰخِذِ، وَاِنِّىْ لَسْتُ سَائِلُكَ شَيْئًا وَلَارَادًّا عَلَيْكَ رِزْقًا رَزَقْنِيْهِ اللّٰهُ مِنْكَ، وَالسَّلَامُ -

উচ্চ হাত নিম্ন হাতের তুলনায় অনেক উত্তম। আমি মনে করি, উচ্চ হাত হচ্ছে দাতার হাত আর নিম্ন হাত হচ্ছে গ্রহীতার হাত। আমি তো তোমার নিকট কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে দাঁড়াইনি। আর আল্লাহ্ তোমার মাধ্যমে আমাকে যে রিযিক দেন, তার প্রত্যাখ্যানকারীও আমি নই।

হাসান, সাঈদ ইবনে জুরাইর, শাবী, সব তাবেয়ী এসব জালিমদের নিকট থেকেই তাঁদের জীবিকা গ্রহণ করতেন। তাদের এই রিযিক গ্রহণ এ জন্যে ছিল না যে, তাঁরা জালিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বরং তা ছিল এ জন্যে যে, তা ছিল তাঁদের অধিকার। ঘটনাক্রমে তা দেয়ার কর্তৃত্ব এসব ফাসিক-ফাজির-জালিম লোকের হাতে পড়ে গেছে।

তাবেয়ীগণ কখনও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। তারা তো হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের ন্যায় প্রতাপ-দাপটশালী ব্যক্তিকেও তরবারি দিয়ে আগাত দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাবেয়ী যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ, এ কালের ফিকাহবিদ ও হাফিজ-কারীদের চার হাজার ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আশয়াস-এর সঙ্গে মিলে আহওয়াজ নামক স্থানে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পরে বসরা এবং তারও পর ফুরাত নদীর পাশে কূফা নগরের কাছাকাছি দীরুল জামাজুম নামক স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁরা সকলে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণকারী ও তাদের জুলুম-দুঃশাসনের দায়িত্ব অস্বীকারকারী ছিলেন। হযরত আলী (রা)-কে শহীদ করার পর মুআবিয়া (রা) যখন জোরপূর্বক ক্ষমতাসীন হয়ে বসলেন, তখনও তাবেয়ীদের পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কিরামগণও এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা)-ও দান গ্রহণ করতেন। এ কালে অন্যান্য যে সব সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবিত ছিলেন, তারাও তা-ই করতেন। তাঁরা কেউই জালিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। তাদের নির্যাতনমূলক শাসনের সাথে তেমনি নিঃসম্পর্ক ছিলেন। যেমন হযরত আলী (রা) নিজের জীবনের শেষ পর্যন্ত এই পথের অনুসারী ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাদের পক্ষ থেকে অর্পিত বিচারকের পদ এবং তাদের দেয়া দান গ্রহণের অর্থ কখনই এই হতে পারে না যে, তাঁরা জালিমদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন করতেন কিংবা তাদের ইমামত বা নেতৃত্বের প্রতি তাঁরা কিছু মাত্র আস্থাবান ছিলেন।

রাফেযী গোষ্ঠীর নির্বোধ লোকেরা অনেক সময় 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমরা পাবে না'—আল্লাহ্র এই কথাটিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর ইমামত প্রত্যাখ্যান করার দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। কেননা তাঁরা তো এক সময় মুশরিক-কাফির ছিলেন ইসলামের পূর্বে জাহিলয়াতের যামানায়। কিন্তু এটা যে কত বড় মুর্খতা ও বাড়াবাড়ি তা না বললেও চলে। কেননা আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে সেসব লোকের সাথে যারা সারাজীবন অব্যাহতভাবে জুলুমের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা তা থেকে তওবা করে দ্বীন কবুল করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে এই আয়াত প্রযোজ্য নয়। কেননা কোন আয়াতের হুকুম যখন কোন গুণ-এর সম্পর্কিত হয়, তাহলে সেই গুণ দূর হয়ে গেলে হুকুমটাও কার্যকর হয় যায়। আল্লাহ্র কথা ঃ 'জালিমরা আল্লাহ্র নেতৃত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি পাবে না' কথায় প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার জন্যে 'জালিম' হওয়া দরকার। জালিম না হলে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার অধিকার প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا – (هود : ١١٣)

এবং তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

এ আয়াতে লোকেরা যতক্ষণ জালিম থাকবে, জুলুমের কাজে রত থাকবে, ততক্ষণ তাদের প্রতি মনকে ঝুঁকাতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্র এই কথাটিও এ পর্যায়েরই ঃ

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ -

মুহসিন লোকদের জন্যে কোন পথ নেই।

এই কথাটিও কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মুহসিন থাকবে, অতএব 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমরা পাবে না' আল্লাহ্‌র এই কথাটি সেই লোকদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে না, যারা জুলুম থেকে তওবা করেছে। কেননা এই সময় ও এই অবস্থায় তাদেরকে জালিম বলা যায় না। যেমন কুফর থেকে তওবাকারীকে কাফির বলা যায় না। যে লোক ফিস্‌ক থেকে তওবা করেছে, তাকে ফাসিক বলা যায় না। হ্যাঁ, বলা যেতে পারে, অতীতে সে কাফির বা ফাসিক ছিল, জালিম ছিল। আল্লাহ তো বলেন নি—যে জালিম ছিল, সে আমার প্রতিশ্রুতি পাবে না। বলেছেন, যে এখন জালিম, জুলুম কাজে রত, সে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا -

স্মরণ কর, আমরা যখন আল্লাহ্‌র ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিলাম ....

البيت। বলতে আল্লাহ্‌র বায়তুল হারাম। بيت শব্দের উপর আলিফ ও লাম বসিয়ে ক্ষান্ত থাকা হয়েছে, যথেষ্ট মনে করা হয়েছে বায়তুল্লাহ্ বোঝাবার জন্যে। এ থেকে সেই সর্বজন পরিচিত ঘরই বোঝায়। অথবা বোঝায় ঘর জাতীয় সব। যাদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলা তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন যে, এখানে البيت। অর্থ সাধারণ ঘর জাতীয় সব নয়; বরং একান্ত ও নির্দিষ্টভাবে কাবা। আর লোকদের আবর্তনের কেন্দ্র তো মক্কায় অবস্থিত কাবা-ই। হাসান থেকে বর্ণিত, এর অর্থ লোকেরা প্রতি বছর এই ঘরে আসে ও এখান থেকে চলে যায়। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, এই ঘর থেকে কেউ-ই ফিরে যায় না বরং সে এখান থেকে তার উদ্দেশ্য পূরণ করে নিয়ে যায়। তখন তারা প্রত্যাবর্তন করে। এ-ও বলা হয়েছে যে, লোকেরা এই ঘরে এসে হজ্জ করে। সে জন্যে তারা বিপুল সওয়াব পেয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, অভিধান-জ্ঞানীরা বলেছেন ঃ ثَابَ يَثُوْبُ مَثَابَةً وَثَوَابًا বলা হয় যখন কেউ প্রত্যাবর্তন করে। অন্যরা বলেছেন مَثَابَةً শব্দে ة বা و বসানো হয়েছে অর্থের আতিশয্য বোঝাবার জন্যে। কেননা যে লোক এখানে আসে, সে বিপুল সওয়াব পায়। যেমন نَسَّابَةٌ বংশতালিকা-পারদর্শী, عَلَّامَةٌ অতিশয় ইল্‌ম-ওয়ালা। مَثَابَةٌ سَيَّارَةٌ খুব দ্রুত চলমান। ফররা বলেছেন—এ শব্দটি যেমন বলা হয় المقامة والمقام শব্দটিও ঠিক তেমনি। আগের কালের তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, লোকেরা প্রতি বছর এই ঘরে আসে ও চলে যায়, ব্যবহৃত শব্দে এই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অন্যরা বলেছেন, এখান থেকে যে-ই ফিরে যায়, সেই-ই পুনরায় এখানে আসতে আগ্রহী বা লোকেরা এখানে এসে হজ্জ করে। ফলে সে বিপুল সওয়াবের

অধিকারী হয়, এ সব-ই এই আয়াতের অর্থ ও বক্তব্য হতে পারে। ফিরে যাওয়ার পর আবার এখানে আসবার জন্যে লোকেরা আগ্রহী হয়, এই অর্থ যারা করেছে, তাঁদের কথার সমর্থন রয়েছে এই দো'আর মধ্যে ঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ – (ابراهيم : ٣٧)

অতএব লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি আকৃষ্ট বানিয়ে দাও।

মূলত مَثَابَةً শব্দটি কাবার তওয়াফ করা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। কেননা আল্লাহ্র ঘরই লক্ষ্য, তওয়াফের কেন্দ্রস্থল। এই যে ফরয, শব্দটি তা বোঝায় না, তা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, একথা নিশ্চিত। যারা উমরা করা ফরয মনে করেন, তারা এই আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ নিজেই যখন কাবাকে مَثَابَةً আবর্তিত হয়ার ও সওয়াব পাওয়ার কেন্দ্র বানিয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, লোকেরা এখানে বারবার আসবে বলেছেন, তখন সেখানে হজ্জ আদায়ের পর উমরা করার জন্যেই বারবার যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই তাৎপর্য গ্রহণীয় নয়। কেননা উমরা করা ওয়াজিব বা ফরয, এমন অর্থ আয়াতের কোন শব্দ থেকেই পাওয়া যায় না। এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে, কাবাকে আল্লাহ এমন স্থান বানিয়েছেন যেখানে লোকেরা বারবার আসবে, সেজন্যে তাদেরকে সওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। এতে বড় জোর মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়, ফরয নয়। কেউ যদি বলে তুমি উমরা কর এবং তুমি সেখানে নামাযও পড়তে পার; তাতে তো বোঝা যাবে না যে, সেখানে যাওয়া ও নামায পড়া ফরয। দ্বিতীয়ত সেখানে বিশেষভাবে কেবল উমরা করার জন্যেই যেতে হবে, হজ্জ করার জন্যে নয়, এমন কথাও প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও হজ্জে তওয়াফুল কুদুম, তওয়াফুয যিয়ারত ও তওয়াফুস-সদর করতে হয় আর সে জন্যে সেখানে বারবার যেতে হয়, ফিরে আসতে হয়। যখন কেউ তা করে, সে শব্দের দাবি পূরণ করে। তাহলে এ আয়াতে উমরা ফরয হওয়ার কোন কথা নেই, তা-ই সত্য প্রমাণিত হল।

আর اَمْنًا। শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্র ঘরকে শান্তিপূর্ণ হওয়ার পরিচিতিতে পরিচিত করা হয়েছে। এর আওতায় সমগ্র হারাম এলাকা পড়ে, যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ। কাবা পর্যন্ত পৌছে যাওয়া কুরবানী।

এর আওতায় সমগ্র হারাম, কেবলমাত্র কাবাই নয়, তার কারণ, কাবাতে তো কুরবানীর জন্তু যবেহ করা হয় না, মসজিদে হারামেও নয়। তাই জন্তু যবেহ্ করার স্থান এর মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ – (الحج : ٢٥)

আর মসজিদে হারামকে আমরা জনগণের জন্যে বানিয়েছি, সেখানে অবস্থানকারী ও বাইরে থেকে আগমনকারী সকলেই সমান।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এই কথা এজন্যে যে, মসজিদের সবটাই হারাম বা হারামের সবটাই মসজিদ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন।

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا - (التوبة : ٢٨)

নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তারা এই বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটেও আসতে পারবে না।

আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা মুশরিকদের হজ্জের স্থানসমূহে আসতে না পারার বা তাদের আসতে না দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সূরা বরাআত নাযিল হলে তা সহ হযরত আলী (রা)-কে এই ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন যে, এ বছরের পর মুশরিকরা হজ্জ করতে আসতে পারবে না। এটা ঠিক উদ্ধৃত আয়াতেরই বক্তব্য। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا -

ওরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমরা হারামকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানিয়েছি ?

ইবরাহীম (আ)-এর দো'আর উল্লেখ করেছেন এই ভাষায় ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا -

হে রব্ব, তুমি এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও।

এই সব কয়টি আয়াতে আল্লাহ্র ঘর—হারাম-নগরকে শান্তিপূর্ণ বানাবার কথাই বলা হয়েছে। এতে সমগ্র হারাম এলাকাই গণ্য। আর হারাম-এর এই 'হুরমাত' বা মর্যাদা-মাহাত্ম্য আল্লাহ্র ঘরের সাথে সম্পৃক্ত, তাই 'বায়ত' বা ঘর নামে অভিহিত করা সঙ্গত। [redacted] সেখানেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত। সেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ। হারাম মাসসমূহের 'হুরমাত'-ও এই ঘরের সাথেই সম্পৃক্ত। এখানকার শান্তি ও নিরাপত্তা হজ্জের জন্যে। এই হজ্জ তো আল্লাহ্র ঘরকে কেন্দ্র করেই পালিত হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'আমরা যখন ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও শান্তিপূর্ণ বানালাম। মূলত এটা আল্লাহ্র হুকুম। শুধু একটা খবর দেয়াই এর উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ 'হে রব্ব, এই নগরকে শান্তিপূর্ণ বানাও' এবং 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে'—এসবই হুকুম-নির্দেশ হিসেবে বলা হয়েছে। নিছক সংবাদ শোনানোই এর উদ্দেশ্য নয় যে, সেখানে যে প্রবেশ করবে, সে কোন মন্দের সম্মুখীন হবে না। যদি নিছক খবর হতো, তাহলে খবরদাতা যে খবর দিচ্ছে সে তা পেত। এ তো আল্লাহ্র তরফ থেকে ঘোষণা। তাই যার উপর এই খবর দেয়া হয়েছে তার অস্তিত্ব বা উপস্থিতি জরুরী। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

ওদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করো না মসজিদে হারামের নিকট, যতক্ষণ না ওরা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। তারাই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।

এ আয়াতে মসজিদে হারামে হত্যা সজ্ঘটিত করার খবর দেয়া হয়েছে। বোঝা গেল, উপরোক্ত আদেশ সেখানে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র এই হুকুম। আর সেখানে যে পানাহ নেবে, আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। বস্তুত ইবরাহীম (আ) থেকেই হারাম সংক্রান্ত এই হুকুম কার্যকর ছিল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা রয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগেও আরবরা হারামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করত। সেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোকে অতি বড় গুনাহ্ মনে করত। কেননা তখন পর্যন্ত ইবরাহিমী শরীয়াতের রেশ অবশিষ্ট ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, আওজায়ী, ইয়াহ্ইয়া, আবূ সালমা সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর রাসূলের দ্বারা মক্কা বিজয় করেন, তখন রাসূলে করীম (স) ভাষণ দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র হামদ্ সানা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আল্লাহ মক্কা থেকে হাতীবাহিনী বিরত রেখেছেন। তৎপরিবর্তে তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনদের তার উপর আধিপত্যশালী বানিয়ে দিলেন। আমার জন্যে দিনের কিছু সময়ের তরে এই নগরকে 'হালাল' করে দিয়েছেন, তার পরই তা কিয়ামত পর্যন্ত 'হারাম' হয়ে গেছে। এর বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, এখানকার শিকার (হত্যার জন্যে) তাড়ানো যাবে না। এখানে প্রাপ্ত পড়ামাল কেবল তার জন্যেই হালাল হবে, যে তার ঘোষণা দিয়ে তার মালিক পাবে না। তখন হযরত আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। ঘাস কি এর বাইরে গণ্য ? কেননা তা আমাদের কবর ও ঘর-বাড়ির জন্যে জরুরী। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, হ্যাঁ, ঘাস এর বাইরে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর, মনসূর, মুজাহিদ, তায়ূস সূত্রে ও হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে এই হাদীসটির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে কোন শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়নি। বলেছন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই হারাম করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে এই নগর কারোর (প্রয়োজনীয় রক্তপাতের) হালাল করা হয়নি। আর আমার জন্যেও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের (এক ঘন্টার) জন্যে হালাল করা হয়েছে।

ইবনে আবূ যেব সাঈদুল মুকাবেরী, আবূ শুরাইহ্ আল-কাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ঘোষণা করেছেন—নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষের কেউ তাকে হারাম করেনি। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না। আল্লাহ্ আমার জন্যে দিনের এক ঘন্টাকালের তরে তা 'হালাল' করে দিয়েছেন। তা-ও সাধারণ মানুষের জন্যে নয়।

রাসূলে করীম (স) এই সংবাদও দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাকে হারাম করেছেন

আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন এবং এখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই নগরের 'হুরমাত' কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাক, এই খবরও দিয়েছেন। মক্কাকে 'হারাম' করার মধ্যে এখানকার শিকার, বৃক্ষ কর্তন ও শূন্যতা শামিল ও গণ্য।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ঘাসকে নিষেধের আওতার বাইরে রাখার কারণ কি ? যা হযরত আব্বাসের প্রশ্নের ফলে রাখা হয়েছে। অথচ তার পূর্বে তিনি সবকিছুই নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ ও ব্যাপক কথা বলেছিলেন ? আর এটা তো জানা-ই আছে যে, কোন কিছু নাকচ করা কাজটা বাস্তবভাবে করার পূর্বে হতে পারে না ?

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘাসকে মুবাহ করার ইখতিয়ার তাঁর রাসূলকে নিজেই দিয়েছেন। যে লোক তার মুবাহ হওয়ার প্রশ্ন করলেন, তার জবাবে তা বলে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ - (النور : ٦٢)

তারা যখন তাদের কোন কোন অবস্থার কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাইবে, তখন তাদের মধ্য থেকে তোমার যাকে ইচ্ছা হবে তাকে অনুমতি দেবে।

এ আয়াতে অনুমতি চাইলে তখন অনুমতি দানের ইখ্‌তিয়ার রাসূলে করীম (স)-কে আল্লাহ্‌ নিজেই দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ অকাট্য দলীল (ص) দ্বারা মক্কার 'হুরমাত' পর্যায়ে যা হারাম করেছেন, সেই সাথে তওকীফও (আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারণ), তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র তওহীদের নিদর্শন এবং প্রমাণ। তা মক্কার জন্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ ঘোষণা পর্যায়ের। অতএব এর তাযীম করা এবং তথায় শিকারের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে তা অত্যন্ত বড় ব্যাপার। এ প্রেক্ষিতে সমস্ত হারাম এলাকা সমগ্র পৃথিবীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে হরিণ ও কুকুর একত্র হয়। কুকুর হরিণ শিকারে লাফিয়ে উঠে না। হরিণও কুকুর দেখে পালায় না। কিন্তু হারাম থেকে উভয়েই বাইরে চলে গেলে কুকুর হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হরিণ পালিয়ে যায় প্রাণের ভয়ে। এ ব্যাপারটিও আল্লাহ্‌র তওহীদেরই প্রমাণ। সেই সাথে ইসমাঈল (আ)-এর বিরাট ফযীলত ও তাঁর মর্যাদার উচ্চতাও স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক সাহাবী হারাম এলাকায় শিকার করা, তার বৃক্ষ কাটা, সেখানে হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দান ফরয হওয়া বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى -

এবং তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।

এটি একটি আদেশ এবং বাহ্য দৃষ্টিতে তা ফরয। এই যুক্তিও রয়েছে যে, তওয়াফ নামায ফরয করে দেয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, উক্ত

আদেশে তওয়াফের নামাযের কথাই বলা হয়েছে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন নুফাইলী, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত। তাতে নবী করীম (স)-এর হজ্জ আদায়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) রুকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করলেন। পরে তিনবার 'রমল' করলেন। চারবার বললেন। পরে মাকামে ইবরাহীমে এসে উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। অতঃপর মাকামটিকে কাবা এবং তার মাঝখানে রেখে দুই রাকআত নামায পড়লেন। মাকামের পেছনে নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তিনি উক্ত আয়াত পড়লেন। এ থেকে বোঝা গেল, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে তওয়াফের পর কার্যত নামায পড়া। আর আয়াতে তার-ই আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তা ফরয। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) দুই রাক'আত নামায আল্লাহ্র ঘরের নিকটে পড়েছেন। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আল-কাওয়ারিরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, সায়েব, মুহাম্মাদ আল-মাখজুমী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে ধরে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে তৃতীয় ভাগের স্থানে দাঁড় করালেন। এটা সেই রুকনের সাথে মিলিত, যার পাশে রয়েছে হাজরে আসওয়াদ। আর তা হচ্ছে কাবার দরজার সাথে মিলিত। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন ঃ থাম, এখানেই নবী করীম (স) নামায পড়তেন, দাঁড়াতেন এবং তারপর আবার নামায পড়তেন। এ আলোকেও বোঝা গেল, তওয়াফের নামায ফরয। নবী করীম (স)-এর কাজ কখনো মাকামের নিকটে সম্পন্ন হয়েছে, কখনো হয়েছে অন্যত্র। তবে মাকামের নিকটেই পড়তে হবে—এমন কথা নেই।

আবদুর রহমান আল-কারী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ফজরের নামাযের পর তিনি তওয়াফ করেছেন। পরে সওয়াব হয়ে যী-তাওয়াতে উট থামালেন। তখন তিনি তাঁর তওয়াফের নামায পড়লেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি হিত্তীম-এ নামায পড়েছেন। হাসান ও আতা থেকে বর্ণিত—মাকামের পেছনে নামায না পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। 'মাকামে ইবরাহীম' বলে আল্লাহ কোন স্থান বোঝাতে চেয়েছেন, এ বিষয়ে আগের কালের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, তার অর্থ—হজ্জ সবই মাকামে ইবরাহীমে। আতা বলেছেন, আরাফ হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। সেই সাথে মুজদালিফা ও পাথর-নিক্ষেপের স্থানও। মুজাহিদ বলেছেন, হারাম সবই মাকামে ইবরাহীম। সুদ্দী বলেছেন—মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সেই প্রস্তুর খন্ড যা কাবা নির্মাণকালে হযরত ইসমাঈলের স্ত্রী হযরত ইবরাহীমের পায়ের নিচে রেখে দিয়েছিলেন, যখন তাঁর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ইবরাহীম (আ) তার উপর তাঁর পা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন তার উপর আরোহী অবস্থায়। তখন ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী তাঁর পাশ ধুয়ে দিলেন। পরে তিনি তাঁর পায়ের নিচ থেকে তা তুলে নিলেন। তখন পাথরে তাঁর পা ডুবে গিয়েছিল, তখন তিনি (স্ত্রী) অপর পাশের নিচে রেখে দিলেন। আর তাঁর পা ধুয়ে দিলেন। তখনও তাঁর পা ডুবে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ্ এই পাথরখানাকে

তার নিদর্শন (شعار) বানিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে মুসল্লারূপে গ্রহণ কর।

হাসান, কাতাদাহ্‌ ও রুবাই ইবনে আনাস থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। অধিক প্রকাশমান কথা এই যে, মূলত তা-ই এখানে বক্তব্য। কেননা হারাম সাধারণভাবে কেবল মাকামে ইবরাহীমই বোঝায় না। সেই সমস্ত স্থানও বোঝায়, যেখানকার কথা অন্যান্যরা বলেছেন। সেটাই যে ব্যক্তব্য তার প্রমাণ এই হাদীস, যা হুমাইদ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেছেন, আমি বললাম—হে রাসূল! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা হিসেবে গ্রহণ করতেন ? তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। ফলে তিনি সেখানে নামায পড়লেন। বোঝা গেল, মাকামে ইবরাহীম বলে আল্লাহ্‌ সেই পাথরটিকেই বুঝিয়েছেন। আর রাসূলের কার্যত সেখানে নামায পড়ায়ও তা-ই বোঝায়। নামাযের সাথে হরম-এর কোন সম্পর্ক নেই, অন্যান্যরা যেসব স্থানের উল্লেখ করেছেন, সেই স্থানেরও তাই।

এই মাকামটা আল্লাহ্‌র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। হযরত ইবরাহীমের নবুয়তেরও তাই প্রমাণ। কেননা আল্লাহ্‌ পাথরকে মাটির ন্যায় নরম বানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাতে তার পা বসে গিয়েছিল। এই কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আর সেই সাথে তা হযরত ইবরাহীমের একটা মুজিযাও বটে। আর নবুয়ত না হলে মুজিযা হতে পারে না।

মুসাল্লা (مصلى) বলতে কি বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা এসেছে। মুজাহিদ এ বিষয়ে বলেছেন, তার অর্থ দো'আর স্থান এবং সে দো'আ নামাযের মাধ্যমে। 'সালাত' অর্থ তো দো'আই। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তার প্রতি দো'আ কর।

হাসান বলেছেন, মুসাল্লা অর্থ কিবলা। কাতাদাহ, সুদ্দী বলেছেন, তার নিকটে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা তা-ই বোঝায়। কেননা 'সালাম' শব্দ নিঃশর্ত উল্লিখিত হবে, তদ্দারা রুকূ-সিজদা নামায বোঝাবে। مصلى المصر বলতে তো সেই স্থানই বুঝিয়েছেন, যেখানে ঈদের নামায পড়া হয়। নবী করীম (স) উসামা ইবনে যায়দকে বলেছেন ঃ المصلى امامك। তোমার সম্মুখেই নামাযের স্থান। নবী করীম (স)-এর আমল থেকেও তা-ই বোঝায়। কেননা তিনি আয়াতটি পাঠ করে নামাযই পড়েছিলেন। যিনি তার অর্থ কিবলা বলেছেন তা-ও নামাযই বোঝায়। কেননা কাবা ঘর ও তা মাঝখানে তাকেই তো নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করা হয়। ফলে তা-ই কিবলা হয়ে যায়। আর নামাযের মধ্যে যেহেতু দো'আও রয়েছে, তাই মুসাল্লা অর্থ 'দো'আ'র স্থান বলা খুবই উত্তম। তাতে সব অর্থ সমন্বিত হয়, আয়াতের ব্যাখ্যায় যে যে অর্থ বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ الطَّئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ –

আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা দুজন আমার ঘরকে পবিত্র করে রাখ তওয়াফকারী, অবস্থান গ্রহণকারী এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে।

কাতাদাহ, উবায়দ ইবনে উমায়র, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবায়র প্রমুখ বলেছেন—আদেশ হয়েছে শিরক ও মূর্তিপূজার মলিনতা থেকে পবিত্র রাখার। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর হাতে পূনঃনির্মিত হওয়ার পূর্বে সেখানে মুশরিকরা তা-ই তো করত। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা জয় হলে নবী করীম (স) মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন, তার মধ্যে মূর্তি দিয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তখন তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। আর তাঁর হাতে রক্ষিত লাঠি দ্বারা এক-একটিকে ঠোকা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ – اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا –

সত্য সমুপস্থিত। মিথ্য বিলীয়মান। আর বাতিল তো বিলীন হওয়ার জন্যেই।

কারো কারো মতে কাবাকে গোবর ও রক্ত থেকেও পবিত্র করার নির্দেশ এই নির্দেশের মধ্যেই রয়েছে। কেননা মুশরিকরা কাবার নিকটে সেগুলো ফেলে দিয়ে পরিবেশ পূতিগন্ধময় করে রাখত।

সুদ্দী বলেছেন ঃ طهرا بيتى তোমরা দুজন আমার ঘর পবিত্র করে রাখ' এর অর্থ, কাবাকে পবিত্রতার উপর নির্মাণ কর। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ –

যে লোক তার ভিত্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও তার সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করবে, তা কি অতীব উত্তম ও অধিক কল্যাণময় নয়? (সূরা-তওবা ঃ ১০৯)

আবূ বকর বলেছেন, এখানে যে কয়টি অর্থের উল্লেখ হয়েছে, তার সব কয়টিই এক সাথে তার অর্থ হতে পারে, শব্দে তার সম্ভাব্যতা বর্তমান। ফলে আয়াতাংশের অর্থ হবে ঃ তোমরা দুজন আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর তাকে নির্মাণ কর, সেই সাথে তাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ গোবর, রক্ত প্রভৃতি সকল ময়লা আবর্জনা থেকে, মূর্তির কলুষতা থেকে তা যেন তার মধ্যে স্থান পেতে না পারে, তার নিকটেও ঘেষতে না পারে।

طائفين এর অর্থে ও তাৎপর্যেও বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। জুয়াইবির দহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, طائفين বলতে সমাগত হজ্জ যাত্রীদের বোঝানো হয়েছে। العاكفين। অর্থ মক্কাবাসী, তারাই সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আবদুল মালিক আতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ العاكفون। বলতে বিভিন্ন শহর, নগর ও প্রতিবেশী এলাকার লোক বোঝায়।

আবূ বকর আল-হজালী বলেছেন, ব্যক্তি যখন তওয়াফকারী, তখন সে طائفين -এর মধ্যে গণ্য। আর যখন সে উপবিষ্ট, তখন সে العاكفين -এর মধ্যে গণ্য। আর যখন সে নামায পড়ছে, তখন সে রুকূ-সিজদাকারী রূপে অভিহিত।

ইবনে ফুযায়ল ইবনে আতা সাঈদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ –

এর তাৎপর্য হচ্ছে—নামাযের পূর্বে তওয়াফ করা।

আবূ বকর বলেছেন, দহাকের কথা হচ্ছে, হাজীদের যে-ই আসবে, সে তায়েফীন-এর মধ্যে গণ্য। এই কথাটিরও তাৎপর্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করা। কেননা যে লোকই আল্লাহ্ ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্য গ্রহণ করবে, সে তা গ্রহণ করে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করার জন্যে, তবে বিদেশী মুসাফিরদের কথা স্বতন্ত্র। আয়াতে বিশেষভাবে কেবল তাদেরকেই বোঝাবার মত কোন প্রমাণ নেই। কেননা মক্কাবাসী ও বহিরাগতদের তওয়াফ কাজ তো অভিন্ন।

যদি বলা হয়, দহাক তওয়াফকারীকে বুঝিয়েছেন, যে এখন তওয়াফ করছে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ –

রাত্রিবেলা তাদের (নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায়) তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে সেই বাগানের উপর একটি বিপদ আপতিত হল।

অথবা তাঁর কথা ঃ

اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ –

যখন তাদেরকে স্পর্শ করল শয়তান থেকে কোন আবর্তনশীল বিপদ।

বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে আর যা-ই হোক, তওয়াফ করাকেই বোঝাতে চেয়েছেন নিঃসন্দেহে। কেননা বহিরাগত লোক তো কাবার তওয়াফের উদ্দেশ্যেই আগত হয়েছে। এই কারণে অন্যদের পরিবর্তে বিশেষভাবে এদের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। কাজেই তার যদি অর্থ গ্রহণ করা হয় তওয়াফ কাজটি, তাহলে وَالْعَاكِفِيْنَ অর্থ হবে সেখানে ইতিকাফকারী লোকগণ। এর দুটি দিক। একটি—সে ইতিকাফ হচ্ছে তাই, যা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ। এবং তোমরা মসজিদসমূহের মধ্যে ইতিকাফে অবস্থানকারী। এখানে আল্লাহ্র ঘরকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দিক—মক্কায় অবস্থানকারী লোক। যারা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কেননা ইতিকাফ-এর অর্থ হচ্ছে অবস্থান গ্রহণ। عاكفون-এর অর্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদেরও মনে করা হয়েছে। কেউ বলেছেন মক্কাবাসী লোকগণ। এই সব অর্থই কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে। সেই স্থানে অবস্থান ও স্থিতি গ্রহণ।

আবূ বকর বলেছেন, 'তায়েফুন' বলতে যারা বহিরাগতদের বুঝেছেন, তাদের কথাই ঠিক। বোঝা যায় বহিরাগতদের পক্ষে নামাযের তুলনায় তওয়াফই অধিক উত্তম কাজ। আল্লাহ্‌র কথা থেকেই এই তাৎপর্য বোঝা যায় নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে। এ জন্যে যে, তারা কাবা ঘরের তওয়াফ করাকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেই মক্কায় এসেছে। এখানে ইতিকাফ করা জায়েয, তা-ও এ আয়াত থেকে বোঝা যায়। কেননা আল্লাহ্‌ই العاكفون বলে তার উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে সেখানে নামায পড়ার কথার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তবে বহিরাগতদের জন্যে কাবা তওয়াফের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত। অতএব প্রমাণিত হল যে, বহিরাগতদের জন্যে নাময়ের তুলনায় কাবার তওয়াফ-ই অধিক উত্তম। আর শুধু ইতিফাক—যাতে শুধু অবস্থান গ্রহণ করা হয়, তওয়াফ করা হয় না, তার তুলনায়ও সেই তওয়াফ উত্তম।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আতা থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন দেশের লোকদের জন্যে তওয়াফ উত্তম, মক্কার আধিবাসীদের জন্যে নামায উত্তম। তাহলে আয়াতটির অর্থে ও তাৎপর্যে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ শামিল রয়েছে, তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। তওয়াফকারী বিপুল সওয়াব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত। বহিরাগতদের জন্যে নামাযের তুলনায় তা-ই অধিক উত্তম। সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র ঘরে ইতিকাফ করার চাইতেও অধিক ভালো। বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে নামায পড়া যে জায়েয তা-ও এ আয়াত থেকে প্রমাণিত। সে নামায ফরয হোক, কি নফল। কেননা আয়াতে দু'ধরনের নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার কোন দলীল নেই। কিন্তু ইমাম মালিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে কাবাঘরে ফরয নামায পড়া নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন, তা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে অনুরূপভাবে কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়া জায়েয হতে পারে, তা নিঃসন্দেহ। তবে রাসূলে করীম (স)-এর সে নামায ছিল নফল নামায। কেননা তিনি যখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন দিনের প্রথম উজ্জ্বল আলোমন্ডিত সময় ছিল। সেটা ফরয নামাযের কোন সময় ছিল না। অনুরূপভাবে মক্কার প্রতিবেশী হওয়াও জায়েয, তা-ও আয়াত থেকে বোঝা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা والعاكفين -এর অর্থ যেমন অবস্থান গ্রহণ হতে পারে, তেমনি সেই দৃষ্টিতে প্রতিবেশী হওয়াও বোঝায়। এ-ও বোঝায় যে, নামাযের পূর্বে তওয়াফ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, হযরত ইবনে আব্বাস সেই ব্যাখ্যাই করেছেন।

যদি বলা হয়, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ নামাযের পূর্বে তওয়াফ হতে হবে—এই তরতীব-এর কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেকটি কথা 'و' দিয়ে একের পর এক উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তাতে সেকথা প্রমাণিত হয় না।

জবাবে বলা যাবে, শব্দে তওয়াফ ও নামায উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। আর নামাযের সাথে তওয়াফের উল্লেখ হলে দুটি কারণে নামাযের পূর্বেই তওয়াফ হতে হবে। একটি রাসূলে করীম (স)-এর কাজ। তিনি তা-ই করেছিলেন। আর দ্বিতীয়, ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ আগে তওয়াফ করার মতে একত্রিত হয়েছেন।

যা বলেছি সে ব্যাপারে কোন আপত্তিকারী আপত্তি যদি এই তোলেন যে, কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া জায়েয—একথা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বলে তুমি দাবি করেছ। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দে তো সে কাজের কোন প্রমাণ নেই ? কেননা আয়াতে ঘরের মধ্যে রুকূ-সিজাদা করার কথা বলা হয়নি। আর কাবা ঘরের ভেতরে যেমন তওয়াফ জায়েয হওয়ার কথা বোঝায় না, তা ঘরের বাইরে করারই প্রমাণ রয়েছে, তেমনি কাবার দিকে মুখ করেই নামায পড়ার কথা বোঝায়, নামায কেবল সে ভাবেই জায়েয।

এর জবাবে বলা যাবে—আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা দুজন আমার ঘর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে—এতেই কাবাঘরের মধ্যে নামায পড়ার দাবি নিহিত রয়েছে। ঠিক যেমন কাবার মধ্যে ইতিকাফ করা জায়েয বোঝায়। তওয়াফ অবশ্য এর বাইরে করারই বিধান। এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। তা ছাড়া ঘরের তওয়াফ হয় তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করলে। ঘরের বাইরে এই কাজটি হতে হবে। ঘরের পেটের মধ্যে এই কাজ করলে তাতে ঘরের তওয়াফ হতে পারে না। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে ঘরের তওয়াফ করতে বলেছেন, তার মধ্যে তওয়াফ করতে বলেন নি। আল্লাহ্ কথা ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

তারা যেন অবশ্যই এই মহান-প্রাচীন ঘরের চারপাশে তওয়াফ করে।

যে লোক কাবার ভেতরে নামায পড়ল, তার এই নামায আয়াতের মধ্যে পড়ে। কেননা তার মধ্যে তো নামায পড়া হয়েছে। আর ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যদি অর্থ হয়, তা হলে বলা যাবে যে, রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্যে ঘরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলার কোন কারণ ছিল না। কেননা ঘরে উপস্থিত এবং যারা তার বাইরে, তারা ঘরের দিকে মুখ করার জন্যে সমানভাবে আদিষ্ট। আর জানা-ই আছে যে, তাকে পবিত্র করে রাখার আদেশ তো দেয়া হয়েছে যারা সেখানে উপস্থিত, কেবল তাদের জন্যে। বোঝা গেল, সেকথা বলে তার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানোর কথা-ই বলা হয়নি, তাতে নামায পড়ার কাজ ব্যতীত।

লক্ষণীয়, আয়াতে মূল ঘরটিকে রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে তুমি যদি বল যে, নামায ঘরের বাইরে পড়তে হবে, তাহলে ঘরের চারপাশ পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হতো, মূল ঘর নয়। এমতাবস্থায় ব্যবহৃত শব্দ যখন উভয় অর্থের সম্ভাব্যতার ধারক, তখন উভয় অর্থই গ্রহণ করা উচিত। মনের করা উচিত যে, এই উভয় কথাই বলতে চেয়েছেন। তখন নামায ঘরের বাইরে ও ভেতরে—উভয় স্থানেই জায়েয মনে করতে হয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যেমন বলেছেন, 'অবশ্যই তওয়াফ করা কর্তব্য এই প্রাচীনতম ঘরের' তেমনি বলেছেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

অতএব মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, সেখানেই তোমাদের মুখসমূহ সেদিকে ফিরাও।

এ কথার দাবি হচ্ছে, নামায ঘরের বাইরে পড়তে হবে। তবেই-না সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানো সম্ভব।

জবাবে বলা যাবে, শব্দের মূল অর্থের দৃষ্টিতে মসজিদে হারামের মধ্যে নামায জায়েয নয়। কেননা আয়াতে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এক্ষণে নামায যদি মসজিদে হারামের ভেতরে পড়া হয়, তাহলে 'মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো' হয় না। আর মসজিদে হারাম বলতে যদি কাবাঘর বোঝানো হয়েছে বলা হয়, যেহেতু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, মসজিদে হারামের দিকে মুখ করতে বলা হয়েছে বলে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয়নি, তাই নামায বৈধ হয়নি।'

জবাবে বলা হবে, যে লোক কাবাঘরের ভেতরে, সেও কাবাঘরের মুখী। কেননা ঘরের মধ্যে যে ঘরের পার্শ্ব রয়েছে, তা-ও তো ঘরই। তাই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হল। কেননা যে লোক ঘরের বাইরে, সে যখন ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, তখন সে ঘরের একটি পার্শ্বই সম্মুখে রাখতে পারে, সমগ্র ঘরটির দিকে মুখ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে লোক ঘরের ভেতরে, সে নিঃসন্দেহে ঘরের দিকেই মুখ করে আছে। অতএব তার কাজটা উভয় আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। দুটি আয়াত ঃ "আমার ঘর 'তওয়াফকারী-ইতিকাফকারী' রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ" এবং 'এতএব তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে নিবদ্ধ কর'—অনুযায়ী এক সঙ্গে আমল করা হল। কেননা পূর্বেই বলেছি, যে লোক ঘরের ভেতরে, সে ঘরের একটি পার্শ্বের দিকে মুখ করে আছে, তেমনি মসজিদে হারামের দিকেও মুখ করে আছে।

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত আয়াতে যে তওয়াফের কথা বলা হয়েছে, তা সাধারণ ও নির্বিশেষ। ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব—যে তওয়াফই করা হোক না কেন। কেননা এই ধরনের তওয়াফ আমাদের মতে এই তিন প্রকারেরই হতে পারে। ফরয হচ্ছে তওয়াফে যিয়ারত। এরই নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

অবশ্যই তওয়াফ করবে প্রাচীনতম মহান ঘরের।

ওয়াজিব হচ্ছে তওয়াফে সদর। এই তওয়াফ যে ওয়াজিব, তা সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ -

যে লোক আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করেছে, ঘরের সাথে তার শেষ বিদায়ী কর্ম হবে তওয়াফ।

আর মসনুন ও মুস্তাহাব তওয়াফ—যা ওয়াজিব নয়—হচ্ছে তওয়াফে কুদুম। হজ্জের জন্যে গমণ করার ও মক্কায় উপস্থিতির জন্যে এই তওয়াফ। নবী করীম (স) যখনই হাজী

হিসেবে মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন, তখনই এই তওয়াফ করেছেন। আর তওয়াফে যিয়ারত তার কোন বিকল্প নেই। হাজী স্ত্রী থেকে মুহরিম থাকবে ও শেষে এই তওয়াফ করবে। আর তওয়াফে সদর না করলে একটি (জন্তু যবেহ) করতে হবে হাজী যদি তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসে তওয়াফ না করে, তা হলেই এই 'দম' দিতে হবে। তওয়াফে সদর না করলে সেজন্যে কিছুই করতে হবে না।

আল্লাহ্ই তাঁর বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।

তওয়াফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন, তওয়াফের পর সাঈ سعى রয়েছে এবং তাতে 'রমল' করতে হবে প্রথম তিন বারে। যে তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা হয় না, তাতে 'রমল' করতে হবে না। প্রথম যেমন তওয়াফে কুদুমে তওয়াফের পর 'সাঈ' করতে প্রস্তুত হবে, আর তওয়াফে যিরারত তা-ই, যার পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা হয় না। তা করা হয় যখন একজন মক্কায় উপস্থিত হয়। প্রথম উপস্থিত হওয়ার পর যদি সাঈ করে থাকে তওয়াফে কুদুমের পর, তাহলে তাতে 'রমল' করতে হবে না। উমরার তওয়াফে অবশ্য রমল করতে হয়। কেননা এই তওয়াফের পরই তো সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হয়, নবী করীম (স) হাজী হিসেবে যখন মক্কায় এসেছেন, তখন তিনি রমল করেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস এবং একটি বর্ণনায় আতা নবী করীম (স)-এর এই কথার বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তিনবারে হাজ্জরে আস্ওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আস্ওয়াদ পর্যন্ত 'রমল' করেছেন। উমর ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তাতে উক্তরূপ কথাই বলা হয়েছে। আবূত তুফায়ল ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) রুকনে ইয়ামনী থেকে রমল করেছেন। পরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত সহজভাবে চলেছেন। আনাস ইবনে মালিকও নবী করীম (স) সম্পর্কে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, প্রাথমিক বর্ণনাকারিগণ যেমন পূর্বে তাদের মতৈক্যের কথা বর্ণনা করেছেন যে, এই শেষ চারবারের তওয়াফে স্বাভাবিকভাবে বলেছেন, তা-ই যথার্থ মনে হয়। তবে প্রথম তিনবারের তওয়াফে অভিন্নভাবে রমল করতে হবে কা'বার চারপাশেই। কেননা তওয়াফ সংক্রান্ত গোটা বিধানে ঘরের চারপাশেই সহজভাবে চলা ও রমল করার হুকুমে কোন পার্থক্য নেই মূলগতভাবে। তবে রমল করার সুন্নাত এখনও কার্যকর কিনা—এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিকাহবিদগণদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, নবী করীম (স) যখন তা করেছিলেন, সেই সময়ই তা করা সুন্নাত ছিল। 'রমল' করে কাযা উমরায় মুশরিকদের সম্মুখে মুসলমানদের শক্তি, স্বাস্থ্যের প্রাখর্য প্রকাশ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, মদীনায় মুসলমানরা জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে নেহায়েত কাবু ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এই কারণে নবী করীম (স) মুসলমানগণদের শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ করতে বলেছিলেন, যেন তারা তা দেখে তাদের প্রতি কোন হীন

কামনা পোষণ না করে। যায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'এখানে আর রমল এবং কাঁধযোলা রেখে ইহরাম করা কিসের জন্যে ? আল্লাহ্ তো ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। কুফর ও কাফিরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে মিলে আমরা যে যে কাজ করেছি, তার কোনটিই আমরা ত্যাগ করব না।'

আবূত-তুফায়ল ইবনে আব্বাসকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমার লোকজন মনে করে, রাসূল (স) কাবার চারপাশের তওয়াফে 'রমল' করেছেন এবং তা করা সুন্নাত। জবাবে তিনি বললেন, কথাটিতে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে। রাসূলে করীম (স) 'রমল' করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তা করা সুন্নাত নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের হানাফী মাযহাবে তা প্রমাণিত সুন্নাত। তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও নবী করীম (স) তখনকার সময়ে মুশরিকদের সম্মুখে মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য দেখানো ও প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই তা করেছিলেন। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বিদায় হজ্জে রমল করেছেন। তখন তো আর কোন মুশরিক মক্কায় ছিল না। হযরত আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী (রা)ও তা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'রমল' করার হুকুম এখনও বহাল রয়েছে। মূলত যে কারণটির উল্লেখ করা হয় 'রমল' করার জন্যে, তার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে তো হুকুম থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না। জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ ব্যবস্থার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ইবলীশ শয়তান এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানীর কাজে বাধ দেয়ার জন্যে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাকে তাড়ানোর জন্যেই এই প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে প্রস্তর নিক্ষেপ স্থায়ী সুন্নাতরূপে গৃহীত ও চালু হয়ে যায়। যদিও সেই কারণটি এখন আর বহাল নেই। তেমনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, হযরত ইসমাঈলের মা পানির সন্ধানে মারওয়ার উপরে চড়ে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে নেমে আসেন। উপত্যকার গর্ভে তিনি দৌড় দিয়েছিলেন। কেননা বাচ্চা ইসমাঈল তখন তার চোখের আড়ালে পড়ে গিয়েছিলেন। পড়ে যখন উপত্যকা থেকে উপরে এলেন, তখন তিনি বাচ্চাকে দেখতে পেলেন। তাই তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। কেননা তখন বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন। পরে মারওয়ার উপরে উঠেছেন পানির সন্ধানে। এভাবে সাতবার উঠা-নামা করেছেন দুই পাহাড়ের মাঝে। এই কারণে পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সুন্নাত হিসেবে রেওয়াজ পেয়ে যায়। সেই সাথে উপত্যকার গর্ভে দ্রুত চলাও সুন্নাতরূপে গৃহীত। যদিও যে কারণে তিনি তা করেছিলেন, তা এখনে আর অবশিষ্ট নেই। তওয়াফে 'রমল' করার ব্যাপারটিও অনুরূপ।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী চুম্বন করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ কথা ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর কথা 'হাজরে আসওয়াদের কিছুটা অংশ ঘরের মধ্যে শামিল' ইবনে উমরকে জানালে তিনি

বললেন—আমি মনে করি না যে, নবী করীম (স) এই দুটির চুম্বন ত্যাগ করেছেন, তবে সে দুটি ঘরের প্রাচীরের মধ্যে নয়। হাজরে আসওয়াদের বাইরে, লোকেরা এজন্যেই তওয়াফ করে। ইয়ালা ইবনে উমায়া বলেছেন, আমি হযরত উমরের সঙ্গে তওয়াফ করেছি। হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত রুকনের নিকট যখন আমরা পৌঁছলাম তখন আমি সেটি চুম্বন করতে লাগলাম। তখন তিনি বলেছেন, তুমি কি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে মিলে তওয়াফ করেছ? বললাম—হ্যাঁ, বললেন—তুমি কি তাঁকে রুকনে ইয়ামনী চুম্বন করতে দেখেছ? বললাম—না। তখন তিনি বললেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا -

ইবরাহীম (আ) যখন বললেন—হে রব্ব! তুমি এই শহরটিকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানিয়ে দাও।

আয়তটির দুটি দিক হতে পারে। একটি হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। যেমন অন্য প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ 'উত্তম-সন্তুষ্টিপূর্ণ জীবনে' ..... অর্থাৎ 'সন্তুষ্টিপূর্ণ সুখের জীবন।' আর দ্বিতীয়—শহরবাসীদের শান্তি নিরাপত্তা। যেমন আল্লাহ্ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ 'জনপদকে জিজ্ঞাসা কর'-এর অর্থ জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা কর।' এটা পরোক্ষ কথন। কেননা নিরাপত্তা বা ভীতি নগরের সাথে সংশিষ্ট নয়, যারা সেখানে বসবাস করে, তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়।

এ আয়াতে যে শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য কি, সে পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতে দুর্ভিক্ষ ও শুষ্কতা থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রার্থনা করা হয়েছে। কেননা এখানে লোকবসতি হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তথায় না আছে চাষাবাদ—কৃষি ফসল না জন্তুর স্তন ভরা দুগ্ধ। ধ্বস ও ক্ষেপণ থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা নিশ্চয়ই করা হয়নি। কেননা মক্কা নগর এসব থেকে স্বভাবতই নিরাপত্তাপূর্ণ ছিল, সেজন্যে প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। অন্যরা বলেছেন, এ দুটি জিনিস থেকে এক সাথে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে ঃ

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত প্রার্থনাসূচক কথাটি ঠিক এইরূপ, যেমন বলা হয়েছে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا লোকদের আগমন-নির্গমনের কেন্দ্র এবং শান্তি নিরাপত্তাপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে, নিরাপত্তাপূর্ণ হয়ে যাবে। এ পর্যায়েরই হচ্ছে এই প্রার্থনা ঃ 'হে রব্ব, এই শহরটিকে শান্তিপূর্ণ বানাও।' এর তাৎপর্য আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তবে আমরা মনে করি, মারামারি থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ফল ও ফসলের রিযিক দেয়ার প্রার্থনা করেছেন। কেননা পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ –

হে রব্ব! এই শহরটিকে শান্তি-নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দাও।

আর শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনার পর-পরই এই দো'আও করা হয়েছে ঃ

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ –

এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা কর।

মূল কাহিনী বর্ণনা পর্যায়ে একথাও বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ –

হে আমাদের রব্ব! আমি আমার সন্তানের একাংশকে পুনর্বাসিত করেছি তোমার মহাসম্মানিত ঘর সংলগ্ন কৃষি-ফসলহীন উপত্যকায়।

তারপর বলা হয়েছে ঃ

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ –

এবং তাদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দাও।

অর্থাৎ তিনি নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে ফল-ফসলের রিযিক দেয়ারও দো'আ করেছিলেন। কাজেই কাহিনীর শুরুতে যে শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে রিযিক বিষয়েও প্রার্থনা করা হয়েছে, শেষ পর্যায়ের নিরাপত্তার প্রার্থনার একটা নতুন তাৎপর্য হওয়া আবশ্যক।

কেউ যদি বলে, এই শহরের রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র হুকুম হযরত ইবরাহীমের উক্ত দো'আরও বহু পূর্বেই কার্যকর হয়েছে। সেজন্যে নতুন করে দো'আ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে 'হরম' বানিয়েছেন আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত অন্য কারোর জন্যেই হালাল করা হয়নি। আর আমার পরেও কারোর জন্যেই তা হালাল করা হবে না, আমার জন্যেও হালাল করা হয়েছে অল্পক্ষণের জন্যে মাত্র।'

এর জবাবে বলা যাবে, উক্ত কারণে পরবর্তীতে নতুন করে শান্তি নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করার যৌক্তিকতা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। কেননা তথায় রক্তপাত ও যুদ্ধ হারাম হওয়ার হুকুম কখনো মনসুখও হয়ে যেতে পারে, তা অসম্ভব কিছু নয়, নয় কিছুমাত্র অসঙ্গত। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) এই হুকুমেরই স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতারই প্রার্থনা করেছেন মাত্র, পরবর্তী নবী-রাসূলগণের মুখেও সেই একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করানোর জন্যে। তাছাড়া কোন লোকও বলতে পারে যে, এ শহর 'হারাম' ছিল না। নিরাপত্তাপূর্ণও

ছিল না ইবরাহীমের প্রার্থনার পূর্বে। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "ইবরাহীম (আ) মক্কাকে 'হরম' বানিয়েছেন এবং আমি মদীনাকে 'হরম' বানিয়েছি।" নবী করীম (স) থেকে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, মক্কাকে আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই আল্লাহ্ 'হরম' করেছেন। আমার পূর্বে তা কারোর জন্যেই হালাল করা হয়নি, আমার পরও কারোর জন্যেই তা 'হালাল' হবে না। রাসূলের এই কথাটি উক্ত কথার তুলনায় অধিক সহীহ, অধিক শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও তাঁর পূর্বে মক্কা নগর 'হরম' ছিল না—একথার কোন প্রমাণ নেই। কেননা তার পূর্বেই ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র 'হরম' করণের ভিত্তিতে 'হরম' করেছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহ্র অনুসরণ করেছেন মাত্র। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেও তা 'হরম' ছিল না, অন্য কোন দিক দিয়ে, যে দিকের নিরাপত্তার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) দো'আ করেছিলেন—এরও কোন দলীল নেই। প্রথম দিকটি কার্যকর হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের শান্তি-নিরাপত্তার দ্বারা, তাদের নিয়ে ধ্বসনামা ও আসমানী বিপদ নিক্ষিপ্ত না হওয়ার দরুন। অথচ এসব বিপদ অন্যদের উপর এসেছে। তাছাড়া জনমনে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্ভ্রমবোধ ও তার দাপটের ভীতির দ্বারা। আর দ্বিতীয় দিকটি কার্যকর হয়েছে আল্লাহ্র রাসূলগণের মুখে সেখানের নিরাপত্তার হুকুম দ্বারা। আল্লাহ্ এই প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন, তা কবুল করেছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَمَنْ كَفَرَ আর যে কুফর করেছে, (তাকেও রিযিক দেয়া হবে) ইবরাহীম (আ)-এর দো'আর জবাবের মধ্যে এই কথাটুকুও রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ অনুযায়ী কাজ করবেন অধিবাসীদের মধ্যে যারা দুনিয়ায় কুফর অবলম্বন করবে তাদের সাথেও। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ ছিল বিশেষ করে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদের জন্যে। তাঁর এই দো'আ কবুলের অংশ হিসেবে এই কথাটিও উচ্চারিত হয়েছে। এই অগ্রিম সংবাদ দানের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিরদেরও তিনি সামান্য বা স্বল্প পরিমিত রিযিক দেবেন। এখানে 'و' অক্ষরটি ব্যবহৃত না হলে বলা যেত যে, একটি প্রথম কথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কথা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ কবুলের সাথে এই কথার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্র কথা ঃ أُمَتِّعُهُ 'আমি তাদের জীবনোপকরণ দেব' এর অর্থ সেই জীবন-উপকরণ দেব, যা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণভাবে দিয়ে থাকি। অন্যদের মতে সে জীবন-উপকরণ দুনিয়ার স্থায়ী রাখব। হাসান বলেছেন ঃ আমি তাদেরকে রিযিক ও নিরাপত্তার উপকরণাদি দেব মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন পর্যন্ত। তখন যদি তারা কুফরীর উপর অবিচল হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ওদের হত্যা করবেন। অথবা মক্কা থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করে দেবেন। ফলে আয়াতে সেই লোকদের হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, যারা মক্কায় আশ্রয় নিয়েছে। এই কথাটির দুটি দিক। একটি ঃ 'হে রব্ব! তুমি এই নগরটিকে নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও' দো'আ। এই দো'আ আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'আর যে কুফর করবে তাকে আমি স্বল্প পরিমিত জীবন-উপকরণ দেব'। এতে জীবনের শেষ পর্যন্ত জীবন-উপকরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ -

স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম এবং ইসমাঈল আল্লাহ্‌র ঘরের প্রাচীর গড়ে উচ্চে তুলছিলেন ... অর্থ ঘরের ভিত্তি বা প্রাচীরসমূহ।

ইবরাহীম (আ)-এর কাবাঘর নির্মাণের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা রয়েছে। তিনি কি তার প্রাচীন ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করছিলেন কিংবা তিনি নতুন করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তার উপর নির্মাণ করেছিলেন—এই প্রশ্ন প্রকট। মামর আয়ূব, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে উক্ত কথাটির পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এই ভিত্তি ও প্রাচীর তারই উপর নির্মাণ করছিলেন, যা পূর্বে ভিত্তি ও প্রাচীর ছিল। আতা-থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। মনসূর মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْبَيْتَ قَبْلَ الْاَرْضِ بِاَلْفَىْ عَامٍ ثُمَّ دُحِيَتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ -

আল্লাহ পৃথিবীর দুই হাজার বছর পূর্বে কাবাঘর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই ঘরের নিচেই পৃথিবী বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحُجُّ الْبَيْتَ قَبْلَ اٰدَمَ، ثُمَّ حَجَّهُ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

আদম (আ)-এর পূর্বে ফেরেশতাগণ এই ঘরের হজ্জ করতেন। তার পরে আদম (আ) হজ্জ করেছেন।

মুজাহিদ ও আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম (আ) বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র আদেশানুক্রমে এই ঘরকে উদ্ভাবন করেছেন। হাসান বলেছেন ঃ

এই ঘরের সর্বপ্রথম হজ্জ করেছেন ইবরাহীম (আ)। এ দুজনের মধ্যে ঘরের আসল নির্মাতা কে, সে বিষয়ে নানা মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-ই এই ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগাড় করে দিচ্ছিলেন। এই দৃষ্টিতে ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়ই নির্মাণ কাজ করেছেন—বলা সঙ্গত। যদিও একজন অপর জনের সাহায্যকারী ছিলেন এই কাজে। নবী করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে আমি সাহায্য করতাম। (ঠিক গোসল করাতাম নয়)। সুদ্দী ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেছেন, তাঁরা দুজন একত্র হয়েই কাবা ঘরের নির্মাণের কাজ করেছেন। একটি বিরল বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) এককভাবে কা'বার প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। প্রাচীর নির্মাণ সময়ে ইসমাঈল ছিলেন খুব ছোট বয়সের। কিন্তু এ কথাটি ভুল। কেননা আল্লাহ নির্মাণের

কাজটি তাঁদের দুজনের বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথাটি যথার্থ হতে পারে যদি তাঁরা দুজন-ই নির্মাণ কাজে সমানভাবে শরীক হয়ে থাকেন। কিংবা একজন নির্মাণ করবেন, আর অপরজন সে নির্মাণের জন্যে পাথর যোগাড় করে দেবেন। প্রথম উল্লিখিত দুটি দিক-ই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তৃতীয় দিকটি সঙ্গত নয়।

এর আরও একটি কারণ হল, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা দুজন আমার ঘরটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে রাখ।' অপর আয়াতে বলেছেন ঃ 'অবশ্যই তওয়াফ করতে হবে এই প্রাচীন মহিমান্বিত ঘরের।' দুটি আয়াতেরই দাবি হচ্ছে, তওয়াফ করতে হবে সেটা কাবা ঘরের। হিশাম ওরওয়া তাঁর পিতা সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন—রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'জাহিলিয়াতের (ইসলামের পূর্বের) লোকেরা কাবা নির্মাণে সংকীর্ণতার আশ্রয় নিয়েছে। হাজরে আসওয়াদকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। এ কারণে নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ হাজরে আসওয়াদের চারপাশে তওয়াফ করেছেন। যেমন সমগ্র ঘরটির তওয়াফ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করা যায়। ইবনুয যুবায়র-ও ঘর নির্মাণকালে 'হাজর'টিকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই ঘরের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে জ্বালিয়ে দেয়ার পর। কিন্তু পরে হজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এসে সেটি বাইরে স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا 'হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবুল করে নাও।'

অর্থাৎ তাঁরা দুজন-ই এই দো'আ করেছিলেন। এই কথাটি ঠিক সেইরূপ, যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ - (الانعام - ٩٣)

আর ফেরেশতাগণ তাদের হস্তসমূহ প্রসারিত করে করে বলতে থাকে—তোমাদের জান বের করে দাও।

কবুল করা অর্থ, কাজের জন্যে সওয়াব দেয়া। এ থেকে বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণের কাজটি আল্লাহ্র নৈকট্য বিধায়ক। কেননা তারা দুজন কাবা নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্র জন্যে। তাই এই কাজে তাঁরা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এই কথাটিই নবী করীম (স) তাঁর ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى مَسْجِدً وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -

যে লোক কোন মসজিদ নির্মাণ করল তা বালুর স্তুপের মত হলেও আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا 'এবং আমাদের ইবাদতের নিয়মাবলী আমাদেরকে জানিয়ে দাও।' বলা হয়, نُسُك এর মূল আভিধানিক অর্থ الغسل। ধৌত

করা। যেমন বলা হয় نَسَكَ ثَوْبَهُ 'সে তাঁর কাপড় ধৌত করেছে।' আর শরীয়াতের পরিভাষায় نُسُكٌ ইবাদতের নাম। বলা হয় رَجُلٌ نَاسِكٌ 'ইবাদতকারী ব্যক্তি'। বরা ইবনে আজেব বলেছেন, নবী করীম (স) কুরবানীর দিন ঘরের বাইরে এলেন। তখন তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اَوَّلُ نُسُكِنَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ الذَّبْحُ –

আজকের দিনে আমাদের প্রথম ইবাদত হচ্ছে নামায, তার পরে জন্তু যবেহ করা।

এ কথাটিতে নামায ও যবেহ করাকে نسك বলা হয়েছে। তা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ অর্থে, তার নাম দেয়া হয়েছে نسك ; আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ –

তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে রোযা থেকে; কিংবা সাদকা দিয়ে অথবা কোন ইবাদত করে।

অর্থাৎ ছাগল যবেহ এবং হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানই হচ্ছে 'মানাসিক'। এর তাৎপর্য নবী করীম (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন ঃ خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ 'হজ্জের ব্যাপারে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি এবং তার নিয়ম-কানুন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।' পূর্বোক্ত 'আমাদের মানাসিক আমাদেরকে দেখাও' এ কথারই বাস্তব প্রতিধ্বনি। এর মধ্যে হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শামিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুজনকে হজ্জের জন্যেই কাবাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনে আবূ লায়লা ইবনে আবূ মুলায়কা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—জিবরাঈল ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা পর্যন্ত গেলেন, তার পরে 'মিনা'তে উপস্থিত হলেন। তাঁকে জানিয়ে দিলেন হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি, ঠিক সেই ভাবেই, যেভাবে এই কাজসমূহ নবী করীম (স) সম্পন্ন করেছেন তাঁর হজ্জে। পরে আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন। বললেন ঃ

اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا –

তুমি সর্ব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ কর।

অনুরূপভাবে নবী করীম (স) আরাফাতে তাঁর পরে অবস্থানকারী লোকদের নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি মক্কায় অবস্থানকারী ছিলেন। বলিয়েছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাবলী আঞ্জাম দাও। কেননা তোমরা ইবরাহীমের উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ –

ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে বিমুখ ও তার প্রতি অনাগ্রহী যে-ই হবে, সে তো সে-ই, যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছেন।

এ আয়াত ইবরাহীমী শরীয়াতে তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক বানিয়ে দিয়েছে। তবে এখনো যা মনসুখ বা নাকচ হয়ে যায়নি, শুধু তা-ই মানতে হবে। এ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, যে লোক মুহাম্মাদ (স)-এর 'মিল্লাত' থেকে বিমুখ হবে, সে ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত থেকেও বিমুখ এবং তার অনুসারী নয়। কেননা মুহাম্মাদ (স)-এর মিল্লাত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতেরই আধুনিক সংস্করণ এবং তার উপর বাড়তিও।

দাদার মীরাস

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاءِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا -

ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার পুত্রদের বলল ঃ আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ? তারা বলল ঃ আমরা ইবাদত করব তোমার যিনি ইলাহ তাঁর, যিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক-এর এক ও একক ইলাহ, তাঁর।

আয়াতটিতে দাদা ও চাচা সকলকেই 'পিতা' (اب) বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা ব্যাপদেশে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ -

এবং আমি অনুসরণ গ্রহণ করেছি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতের।

ইবনে আব্বাস এই আয়াতদ্বয়কে ভাইদের পরিবর্তে দাদাকে মীরাস দেয়ার নীতির সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাজ্জাজ, আতা, ইবনে আব্বাস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে চায় আমি হাজরে আসওয়াদের নিকট তাকে লা'নত করে বলতে পারি যে, দাদা হচ্ছে পিতা। আল্লাহ্র কসম দাদা ও দাদীকে 'বাপ' (اباء) হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আয়াত-ই তার অকাট্য দলীল। ভাইদের স্থলে দাদাকে উত্তরাধিকারী বানানো এবং তাকে পিতার স্থানে নামিয়ে তাকে মীরাস দেয়া পিতার অবর্তমানে এবং এজন্যে উক্ত আয়াতকে ইবনে আব্বাসের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَوَرِثَهٗٓ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ -

তার পিতা-মাতা ওয়ারিস হলে তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ এই কথার পক্ষে দলীল হওয়া বৈধ।

এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পাবে না, দাদা দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে যাবে।[১] যেমন পিতা থাকলে এদের সকলের পরিবর্তে সে তা পেয়ে যায়। এই কথা প্রমাণ করে যে, 'পিতা' বললে দাদাও শামিল হয়ে যায়। অতএব তার সম্পর্কে হুকুম বা সিদ্ধান্ত পিতার থেকে ভিন্নতর কিছু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্তত মীরাসের ক্ষেত্রে যখন সেই পিতা বর্তমান থাকবে না, তখন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই মত। উসমান (রা) বলেছেন, আবূ বকর (রা) ফায়সালা দিয়েছেন যে, দাদা পিতা। তার উপর পিতৃত্বের নামটি প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, মালিক, শাফেয়ী প্রমুখ দাদার ব্যাপার যায়দ ইবনে সাবিতের মত গ্রহণ করেছেন। সে মতটি হল দাদা ভাইদের স্থলাভিষিক্ত, যতক্ষণ মীরাস বণ্টন এক-তৃতীয়াংশের কম না হয়। তখন তাকে এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। তা থেকে কম হবে না। ইবনে আবূ লায়লা দাদার ব্যাপারে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন—দাদা ভাইদের একজনের পর্যায়ে গণ্য যতক্ষণ মীরাস বিভক্তি এক-ষষ্ঠাংশের কম না হয়। অতএব তাকে এক-ষষ্ঠাংশই দিতে হবে। তা থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবীগণের বিভিন্ন মত আমরা مختصر الطحاوى গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলে দিয়েছি। সাহাবীগণের দলীল উপস্থাপনেও ভিন্নতা রয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপনে দুটি দিক রয়েছে। একটি—আল্লাহ্ আয়াতে দাদাকে প্রকাশ্যভাবে 'বাপ' বলে নাম রেখেছেন। আর দ্বিতীয়—এ আয়াতকে ইবনে আব্বাসের দলীল হিসেবে উপস্থাপক। তিনি সাধারণভাবেই দাদাকে বাপ বলেছেন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাই করেছেন। তাঁরা দুজনই আরবী ভাষাভাষী লোক। অভিধানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নামের তাৎপর্য তাদের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে না। যদিও তারা দুজনই শরীয়াতের দৃষ্টিতেও এই নামকরণকে সমর্থন করেছেন। শরীয়াতের নামসমূহ যখন আল্লাহ্র নিকট থেকে নির্ধারিত توقيق পন্থায় তখন তাদের এই যুক্তি অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু যাঁরা বাহ্যিক দিক দিয়ে এই রূপ দলীল উপস্থাপনকে সমর্থন করেননি, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ আয়াতে চাচাকেও তো 'পিতা' اب নাম দিয়েছেন। কেননা হযরত ইউসুফের কথায় ابائى আমার 'পিতৃকুল' কথাটিতে ইসমাঈল (আ)-এর নাম-ও উল্লিখিত হয়েছে। আর তিনি তো তার চাচা। তিনি তো কোনক্রমেই পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না। অথচ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ ردوا على ابى 'তোমরা আমার বাবাকে নিয়ে আস' এই বলে তিনি হযরত আব্বাসকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথার উপর প্রশ্ন উঠে যে, দাদাকে বাপ বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে, প্রত্যক্ষ ও যথার্থ অর্থে নয়। দাদাকে বাপ না বলা তো সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা দাদাকে যদি তুমি বল, সে বাপ নয়, তা হলে সত্য কথাই বলা হবে। অথচ প্রকৃত অবস্থার নাম কোন অবস্থায়ই সেই নামের ব্যক্তি থেকে সরিয়ে নেয়া যায় না। অপর দিক থেকে

১. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতা ও সন্তানাদি নেই, আছে মা, ভাই ও দাদা। এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পাবে না। মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ পাবে দাদা—অনুবাদক।

দাদাকে বাপ বলা হয়েছে শর্ত সহকারে। নিঃশর্ত বললে সে বাপ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অতএব এই কথাকে যুক্তি ও দলীল হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। আয়াতে যে 'দুই বাপ' শব্দ রয়েছে, তা সাধারণভাবে রয়েছে। আর অপর দিক দিয়ে আল্লাহ্র কথা ঃ তার উত্তরাধিকারী হবে তার দুই বাপ'—এতে নিকটবর্তী পিতাকেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই এ থেকে দাদাকে বোঝানো যেতে পারে না। কেননা দাদা পরোক্ষ বাপ হতে পারে, প্রত্যক্ষ নয়। আর একই শব্দে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুটি দিককে এক সঙ্গে গ্রহণ নিঃশর্ত বক্তব্যে শামিল হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, সাধারণ অর্থবোধক শব্দ পিতাকে দাদা প্রমাণ করতে চাওয়া এ হিসেবে যে, আয়াতে চাচাকে 'বাপ' নাম দেয়া হয়েছে অথচ চাচা পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না এই মতে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে—কোন ক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। কেননা 'পিতা' নামটি সাধারণভাবে অভিধান ও শরীয়াতের দিক দিয়ে দাদা ও চাচাকে শামিল করলেও তা সাধারণ ও নিঃশর্তভাবেই জায়েয হতে পারে বটে; কিন্তু কোন কারণে দাদাকে বাদ দিয়ে শুধু চাচাকে গণ্য করা হলেও দাদার ব্যাপারে এই সাধারণ দিকটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। অর্থেও তারা দুজন ভিন্নি ভিন্ন হয়ে যায় এই দিক দিয়ে যে, বাপকে বাপ নাম রাখা হয়েছে এজন্যে যে, জন্মের দিক দিয়ে সে পিতার পুত্র। দাদার ক্ষেত্রেও এই অর্থ বিদ্যমান। যদিও অন্য দিক দিয়ে বাপ ও দাদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তা হচ্ছে সন্তান ও দাদার মাঝখানে পিতা রয়েছে। পিতা ও পুত্রের মাঝে তৃতীয় কেউ নেই। চাচার এক্ষেত্রে কোন স্থানই নেই। কেননা জন্মের দিক দিয়ে সন্তান ও তার চাচার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। দাদা তাৎপর্যগতভাবে অনেক দূরবর্তী হলও সাধারণ নাম ব্যবহারের দিক দিয়ে নিকটে আছে। অতএব তাকে 'বাপ' বলা অসমীচীন হতে পারে না। কেননা পিতার অবর্তমানে দাদার চাইতে সন্তানের নিকটবর্তী আর কেউ নেই। এভাবে দাদার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, যার মীরাস বন্টন হবে, তার কাছে। কিন্তু চাচার যেহেতু এরূপ কোন বিশেষত্ব নেই, এ কারণে তাকে নিঃশর্ত ও সাধারণ 'বাপ' বলা হয়নি। আর তা থেকে তা বোঝাও যায় না। তবে বিশেষ পরিচিতির বন্ধনে তাকে পিতার পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু দাদা পিতার সমকক্ষ জন্মের দিক দিয়ে। কাজেই 'পিতা' বললে দাদাও বোঝা যেতে পারে। আর পিতার অবর্তমানে দাদা পিতার স্থান পেতে পারে। যাঁরা বলেছেন, দাদাকে পিতা বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষ ও প্রকৃতভাবে নয় এবং আয়াতে নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ পিতাকেই বোঝানো হয়েছে বলে যাঁরা আমাদের দেয়া দলীলের মুকাবিলা করতে চেয়েছেন, তাঁদের এই চেষ্টার জবাবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ দ্বারা দাদাকে বোঝানো সঙ্গত নয়। কেননা একটা নাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থে হওয়া সম্ভব নয়। তা জরুরীও নয় এই হিসেবে যে, যে কারণে পিতার নাম লওয়া হয়েছে জন্মের দিক দিয়ে তার সাথে নিকট সম্পর্ক রয়েছে বলে, তা ঠিক নয়। কেননা তা দাদার ক্ষেত্রেও রয়েছে। আর এদের প্রত্যেকের নাম 'বাপ' রাখা হয়েছে যে কারণে, সেদিক দিয়ে পিতা ও দাদার মধ্যে পার্থক্য নেই। অতএব এই নামে উভয়কে অভিহিত করা সঙ্গত। যদিও তার এক জন অপরজনের অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদা ও কারণের অধিকারী। যেমন ভাই বললে সকল ভাই-ই গণ্য হয়,

সে ভাই একই পিতামাতার সন্তান হিসেবে হোক, কি শুধু একই পিতার সন্তান (মা দুই) হিসেবে হোক। যে ভাই বাপ-মা উভয় দিক দিয়ে সে অন্য ভাইদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর মীরাস পাওয়ার ক্ষেত্রে। কেবল পিতার দিক দিয়ে যে ভাই, তাদের অপেক্ষা ভাই হওয়ার হুকুমে অধিক প্রকৃত। আর কোন নাম প্রকৃত দুই অর্থে হতে পারে, যদিও সাধারণভাবে বললেও একজন অপরজনের অপেক্ষা অগ্রসর গণ্য হবে। লক্ষণীয়, 'তারকা' বললে আকাশমার্গে জ্বলজ্বল করা প্রত্যেকটি তারকাকেই বোঝাবে, এ না প্রকৃত বলে। কিন্তু আরবদের মতে তাতে শুধু কীর্তিকা নক্ষত্রই বোঝায়। যেমন তারা বলত ঃ আমি এই এই কাজ করেছি, তখন তারকা ছিল মাথার উপর। একথা বলে তারা 'সুরাইয়া' তারকাকেই বুঝত। 'নক্ষত্রের উদয় হয়েছে'—এই নিঃশর্ত ও নির্বিশেষ উল্লেখে তারা 'সুরাইয়া' তারকা ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। অথচ আকাশমার্গের সমস্ত তারকাই প্রকৃতপক্ষে এই নামে অভিহিত ও পরিচিত। 'পিতা' নামটিও ঠিক তেমনি। 'পিতা' বললে কোন যুক্তি প্রদর্শনের নিকট পিতা ও দদা উভয়ের জন্যে প্রকৃত ব্যবহার হতে কোন বাধাই নেই। যদিও প্রকৃত পিতাকেই বিশেষভাবে বোঝাবে কোন কোন সময়ে আর পিতা শব্দটি নিকটস্থ প্রকৃত পিতা ও দাদা উভয়কে বোঝালে তাতে একটি শব্দের একই সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার হওয়া—যা হতে পারে না—জরুরী নয়।

যদি বলা হয়, 'পিতা' নামটি যদি শুধু জন্মের দিক দিয়ে বিশেষ নাম হয়ে থাকে, তাহলে মা অবশ্যই এই নামের মধ্যে শামিল হবে। কেননা সন্তান তো মার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে। এরূপ অবস্থায় মাকে 'বাপ' নাম দেয়া উচিত হয়ে পড়ে। আর তখন মা-ই পিতা ও দাদার তুলনায় অধিক অগ্রসর হবে। কেননা সন্তানের জন্ম মার দ্বারাই হয় প্রকৃত।

জবাবে বলা যাবে, না, সেটা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কেননা 'মা'কে তো একটা বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে অন্য কেউ শামিল নেই এবং তা পিতা ও মার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। যদিও সন্তান জন্মের দিক দিয়ে পিতা ও মাতা—উভয়ের সাথে প্রকৃত পক্ষেই সম্পর্কিত। আর আল্লাহ্ তা'আলাও মাকে 'বাপ' এর সাথে একত্র করেছেন যখন বাপ ও মা'র কথা একসাথে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ –

এবং তার মা ও বাপ উভয়ের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ।

হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর মত সমর্থনকারীদের জন্যে এটাই প্রমাণ এই কথার যে, দাদা জন্ম সম্পর্ক ও 'আসাবা' এই উভয় দিক দিয়েই মীরাস পাওয়ার অধিকারী হয়, কেউ যদি একটি কন্যা ও দাদা রেখে মরে যায়, তাহলে সে কন্যা পাবে অর্ধেক, আর দাদা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা-ও দাদা পাবে জন্ম সম্পর্ক ও আসাবা হিসেবে। যেমন কেউ যদি একটি কন্যা ও পিতা রেখে যায়, তাহলে সেই একই অবস্থায় পিতা জন্ম সম্পর্ক ও আসাবা উভয় দিক দিয়েই মীরাস পাবে। তাই পিতার অবর্তমানে দাদা মীরাস পাওয়ার দিক দিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে ভাই ও বোনদের

পরিবর্তে। আরও একটি কারণ রয়েছে। দাদা জন্মের দিক দিয়ে আসাবা হয়ে মীরাসের অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে ভাইদের শরীক না হওয়ার কারণে কেননা ভাইরা আসাবা হয় স্বতন্ত্রভাবে জন্মসূত্র ছাড়া-ই। আর 'মুকাসিমা' দিক দিয়ে দাদা ও ভাইরা মীরাসে শরীক হয় না এভাবে যে, দাদা মৃতের এক পুত্র থাকা অবস্থায়ও এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হয়। যেমন এক পুত্র থাকলে পিতাও তাই পায়। পিতার বর্তমানে ভাইরা যেমন মীরাস পায় না এই কারণে, দাদা থাকলেও ঠিক সেই একই কারণে ভাইরা পাবে না।

যদি বলা হয়, পুত্র থাকলেও মা এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হয় আর তাতে মা থাকা সত্ত্বেও ভাইদের মীরাস না পাওয়ার কারণ ঘটে না।

জবাবে বলা হবে, এ কারণে সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হবে। কেননা 'মুকাসিমা'র দিক দিয়ে দাদা ও ভাইরা সমানভাবে মীরাস পাওয়ায় শরীক হয় না। আর দাদার বর্তমানে মুকাসিমায় ভাইরা ও দাদা শরীক হয় না, যখন তারা এককভাবে থাকে, মীরাস অবশিষ্ট থাকে না। কেননা যারাই দাদার বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয়, তার ও তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন ওয়াজিব হয়ে যায় যখন অন্যরা কেউ বর্তমান থাকে না এক-তৃতীয়াংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ হিসেবে। কিন্তু মা ও ভাইদের মধ্যে কোন অবস্থায়ই 'মুকাসিমা' হয় না। আর বণ্টন না হওয়ার পরিণতি তাদের মীরাস না, পাওয়া হয় না। আর ভাইরা একক হলে দাদার সাথে ভাইদের 'মুকাসিমা' না হওয়ার অর্থ দাদার সাথে ভাইদের মীরাস নষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাদেরকে ওয়ারিস বানানো যায় 'মুকাসিমা' দ্বারা। দাদার সাথে ভাইদের শরীক হওয়ার কারণে। এই 'মুকাসিমা' যখন পরিত্যক্ত হয় বর্ণিত কারণে, তখন দাদার সাথে ভাইদের মীরাসও পরিত্যক্ত হবে। কেননা এ পর্যায়ে দুটি কথা রয়েছে মাত্র। একটি কথা, দাদার সাথে যাদের মীরাস মূলতই থাকে না আর একটি কথা তাদের যাদের মধ্যে মুকাসিমা কর্তব্য হয়। বর্ণিত কারণে মুকাসিমা যখন বাতিল হয়ে যাবে, তখন দাদার সাথে তাদের মীরাস না পাওয়া প্রমাণিত। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, দাদা মৃতের পুত্রের সাথে ঝুলে পড়ে, সে হচ্ছে মৃতের পিতা ঃ আর ভাই ঝুলে পড়ে মৃতের পিতার সাথে। অতএব এই দুজনের মধ্যে শরীকানা জরুরী—যেমন, মৃত রেখে গেল তার পিতা ও পুত্রকে। তাকে বলা যাবে, এ কথা দুটি কারণে ভুল। একটি হচ্ছে, এই হিসেব ও বিবেচনা যদি সহীহ হয়, তাহলে দাদা ও ভাইয়ের মধ্যে 'মুকাসিমা' ওয়াজিব হয়ে পড়বে। বরং ওয়াজিব হচ্ছে, দাদার জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে, আর অবশিষ্ট হবে ভাইয়ের জন্যে। যেমন মৃত যদি পিতা ও পুত্র রেখে যায়, তাহলে পিতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে, আর অবশিষ্ট পাবে পুত্র। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মৃত যদি পিতার দাদা ও চাচা রেখে যায়, তাহলে চাচা 'মুকাসিমা' করবে। কেননা পিতার দাদা নিকটবর্তী দাদার সাথে ঝুলে পড়বে। চাচাও তার সাথে ঝুলে পড়বে। কেননা সে তার পুত্র। পিতার দাদার সাথে চাচা থাকলে তার মীরাস থাকে না কারণ থাকার দরুন এ ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে বোঝা যায় সে কারণ ঠিক নয়। আর এই কারণে ভাইর পুত্র মীরাসে দাদার সাথে শরীক হবে। কেননা সে বলে যে, পিতার পুত্রে পুত্র এবং পিতার পিতা দাদা। যদি পিতা ও

পুত্রের পুত্র রেখে যায়, তাহলে পিতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, আর অবশিষ্ট পুত্রের জন্যে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ - وَلَاتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

এরা ছিল একটি জনসমষ্টি, যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্যেই। আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে, তার ফল তোমরাই পাবে, তারা যা করছিল সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

এ আয়াতটির তিনটি অর্থ হতে পারে। একটি—পিতা, মাতা, দাদার ইবাদত ও নেক আমলের সওয়াব পুত্ররা পাবে না। তাদের গুনাহের আযাবও পুত্ররা—বংশধররা—ভোগ করবে না। যারা এই মত পোষণ করে যে, মুশরিক পিতা, মাতা, দাদার গুনাহের জন্যে সন্তান-বংশধররা আযাব ভোগ করবে, উক্ত আয়াত তাদের উক্ত মতকে খণ্ডন করেছে। যে সব ইয়াহূদী মনে করে যে, তাদের পিতা-মাতা-দাদা পূর্ববংশের লোকদের নেক আমলের দৌলতে তারা ক্ষমা পেয়ে যাবে, তাদের মত-ও বাতিল প্রমাণিত হয়েছে এ আয়াতটির দ্বারা। অনুরূপ বহু কয়টি আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا -

প্রতিটি মানুষ যা অর্জন করবে, তার উপর শুধু তারই দায়িত্ব আসবে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

এবং কোন বোঝা বহনকারীই অপর কারোর বোঝা বহন করবে না।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمْ - (النور : ٥٤)

ওরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে তার উপর চাপবে যা চাপান হয়েছে এবং তোমাদের উপর চাপবে যা তোমাদের উপর চাপান হয়েছে।

নবী করীম (স)-ও এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তিনি আবূ রমসাকে তার পুত্রের সঙ্গে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ও কি তোমার পুত্র ?' বললেন, 'জি, হ্যাঁ।' তখন বললেন ঃ

اَمَّا اَنَّهُ لَايَجْنِىْ عَلَيْكَ وَلَاتَجْنِىْ عَلَيْهِ -

সে তোমার উপর কোন অপরাধ চাপাবে না, তুমিও তার উপর কোন অপরাধ চাপাবে না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হে বনু হাশিমের লোকেরা, তোমরা লোকদের আমল নিয়ে আমার নিকট আস না, আস তাদের বংশীয় গৌরব নিয়ে। আমি বলব, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে একবিন্দু বাঁচাতে পারব না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ بَطَابِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ –

যার আমল বিলম্বিত, তার বংশ গৌরব তাকে দ্রুততা সম্পন্ন বানাতে পারে না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ – (البقره : ١٣٧)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ই তাদের সাথে তোমার পরিবর্তে বোঝাপড়া করতে যথেষ্ট সক্ষম। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাঁর নবীর জন্যে পুরা মাত্রায় যথেষ্ট। তাঁর শত্রুদের মুকাবিলা তিনিই করবেন। তাদের সংখ্যা ও লোভ-লালসা যত বেশিই হোক, তাদের মুকাবিলা করতে আল্লাহ্ পুরা মাত্রায় সক্ষম। নবী তাঁর সংবাদদাতাকেই পেয়েছেন দেয়া সংবাদের জন্যে কাজ করতে। এই কথাটিও এ পর্যায়েরই। বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ – (المائده : ٦٧)

আল্লাহ্‌ই তোমাকে—হে নবী—লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।

বস্তুত আল্লাহ্‌ই তাকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের অত্যাচার জুলুম ও ধোঁকা-প্রতারণা ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়েছেন। আর তাই তাঁর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কেননা সংবাদদাতাকে তার দেয়া সংবাদের উপর সকল অবস্থায় সক্ষম পাওয়া সম্ভব হয় না, হয় কেবলমাত্র তখন, যদি সে সংবাদটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসে থাকে। তিনিই তো অনুপস্থিত-উপস্থিত সর্ববিষয়ে অবহিত। মিথ্যাবাদী ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাকে তার দেয়া সংবাদ অনুযায়ী পাওয়া অসম্ভব, অসঙ্গত। বরং তাদের দেয়া অধিকাংশ খবরই মিথ্যা, ভিত্তিহীন। শ্রোতা শোনা মাত্রই তার বাতুলতাও অন্তসারশূন্যতা বুঝতে পারে। তার সত্যতা যথার্থতা খুব কম-ই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا –

নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলে উঠবে, ওরা যে কিবলামুখী ছিল, সে কিবলা থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল ?

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স) মক্কায় থাকাকালে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। হিজরতের পরও একটা সময়কাল (প্রায় ষোল মাস) পর্যন্তও এই নিয়মই চলেছে, এ ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। ইবনে আব্বাস ও বরা ইবনে আজেব বলেছেন, নবী করীম (স)-এর মদীনায় উপস্থিতির ১৭ মাস পর তিনি কাবাকে

কিবলা বানিয়েছিলেন। কাতাদাহ্ বলেছেন, ছয় মাস পর। আনাস ইবনে মালিক নয় কি দশ মাসের উল্লেখ করেছেন। পরে আল্লাহ্ তাঁকে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াবার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এ পর্যায়ের আয়াতসমূহে তার অকাট্য দলীল উপস্থাপন করেছেন। এতে বলা হয়েছে, নামায কাবা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে পড়া হতো। পরে আল্লাহ কাবার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সেজন্যে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেই পর্যায়ে বলেছেন ঃ ওরা যে কিবলামুখী ছিল, সেদিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিল ? এই বলে যারা প্রশ্ন তুলে, তারা না-বুঝ লোক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

তুমি যে কিবলামুখী ছিলে, তা আমরা কিবলা বানিয়েছিলাম তো শুধু এইজন্যে—যেন আমরা পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারি সেই লোকদেরকে যারা রাসূলের অনুসরণ করে সে লোকদের থেকে যারা ফিরে যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِيْ السَّمَاءِ - فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا -

হে নবী! তোমার মুখমণ্ডলের আসমানে ঘোরাফেরা আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। অতএব আমরা সেই কিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পেয়ে সন্তুষ্ট হবে।

এই সব আয়াতই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) প্রথমে কাবা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়তেন। পরে তাঁকে বর্তমান কিবলা—কাবার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যারা বলে, ইসলামী শরীয়াতে নাসেখ-মনসূখ নেই, উক্ত কথা তা বাতিল প্রমাণ করে। অবশ্য নবী করীম (স)-এর বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়া কি তখন ফরয ছিল, তাছাড়া অন্যথা করা কি জায়েয ছিল না ? কিংবা তাঁকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, সেদিকে মুখ করবে, কি অন্য দিকে—তা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল? এ পর্যায়ে রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারের ব্যাপার ছিল। ইবনে আব্বাস বলেছেন—না, সেদিকে মুখ করা তাঁর জন্যে ফরয ছিল। এতে তাঁর কোন ইখতিয়ার বা ইচ্ছা প্রয়োগের ব্যাপার ছিল না। এর মধ্যে যেটাই হোক, যিনি বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করতেন, তাঁর জন্যে তা ফরয ছিল। কেননা ইখতিয়ার থাকাটাও ফরযহীন ছিল না। যেমন কসমের কাফফারা দেয়া। যা দিয়েই কাফফারা দেয়া হোক-না কেন, কাফফারা দেয়া কিন্তু ফরয ছিল। যেমন সময়ের শুরুতেই নামায ফরয হয়ে যায়, যদিও মধ্যম সময়ে বা শেষ সময়েও পড়া যায়।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ-আল-ইয়ামান আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنُ شَاَنُ الْقِبْلَةِ –

কুরআনে সর্বপ্রথম কিবলার ব্যাপারটি মনসূখ হয়েছে।

আর তা এভাবে সজ্ঘটিত হয়েছিল যে, নবী করীম (স) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে বায়তুল মাকদিসমুখী হওয়ার আদেশ করলেন। এর ফলে ইয়াহুদীরা খুবই উল্লাস বোধ করল। নবী করীম (স) কয়েক মাস পর্যন্ত সেদিকে মুখ করেই নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি নিজে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে খুবই পছন্দ করতেন। তাই তিনি সেজন্যে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করছিলেন এবং ওহী পাওয়ার জন্যে বারবার উর্ধ্ব পানে তাকাতেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন ঃ 'উর্ধ্বপানে তোমার বার বার তাকানোকে আমরা লক্ষ্য করেছি।' অতঃপর পূর্ণ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন, বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা ফরয ছিল। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে কিন্তু যাঁরা বলেন, কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই সেদিকে মুখ করা ফরয ছিল, উক্ত আয়াতে তার কোন প্রমাণ নেই। কেননা ফরয তো ইখতিয়ার সহও হতে পারে। পরে এই ইখতিয়ারই মনসূখ হয়ে গেছে এবং তখন কেবলমাত্র কাবার দিকে মুখ করাই স্থায়ী হয়ে থাকল কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়া। বর্ণিত হয়েছে, মদীনা থেকে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন হিজরতের পূর্বে। তাঁদের মধ্যে বরা ইবনে মারুর-ও ছিলেন, তিনি পথের নামাযে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। অন্যরা তা করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন, নবী (স) তো বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। পরে তারা সকলে মক্কায় উপস্থিত হলে এই বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেই সাথে সব ঘটনার বিবরণ দিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তো বায়তুল মাকদিসের দিকেই কিবলা করেছি। তিনি তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বলেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, তাঁরা কিবলার ব্যাপারে ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

যদি বলা হয়, ইবনে আব্বাস এই কথা দ্বারা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করার আদেশে কুরআনের আয়াত প্রথম মনসূখ হওয়ার কথা বলেছেন।

জবাবে বলা যাবে, পাঠ মনসূখ হওয়াই লক্ষ্য হতে পারে কুরআন মনসূখ হওয়ার কথা বলার মূলে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ নির্বোধ লোকেরা বলবে, ওরা যে কিবলার উপর ছিল সে দিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ফিরাল ? এ পর্যায়েরই হতে পারে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে কিবলা মনসূখ হওয়ার পূর্বে। এ আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা কাবা ছাড়া অন্য কিবলামুখী ছিলেন। এবং কুরআন থেকে তা সর্বপ্রথম মনসূখ হয়েছে, বলা যেতে পারে। তাহলে বক্তব্য হবে কুরআনই মনসূখকারী। এতে কুরআন মনসূখ হয়নি।

ইবনে জুরাইজ, ইবনে আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কুরআন থেকে সর্ব প্রথম কিবলার ব্যাপারটা মনসূখ হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ -

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্যে। তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন।

এর পরে নাযিল করেছেন এ আয়াতটি, যাতে বলা হয়েছে ঃ নির্বোধ লোকেরা অবশ্য বলবে, ওরা যে কিবলার দিকে ছিল সে দিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ফিরিয়ে দিল? শেষ বলা হয়েছে ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অতএব তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও!

এই হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক—তাঁরা যে দিকে ইচ্ছা মুখ করার ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। আর দ্বিতীয়—এ আয়াতে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা মনসূখ করা হয়েছে, 'তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও' কথা দ্বারা এবং 'নির্বোধ লোকেরা বলবে .....' এই কথা দ্বারা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, নির্বোধ লোক বলতে এখানে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। কিবলা পরিবর্তনে তারাই বড় আপত্তি তুলেছিল। এই হাদীসটি ইবনে আব্বাস ও বরা ইবনে আজেব কর্তৃক বর্ণিত। তাঁরা আসলে মনসূখ হওয়াকেই অস্বীকার করেছেন। কেননা অনেক লোকই এতে মনসূখ হওয়ার কোন ব্যাপার দেখতে পান না। এ-ও বলা হয়েছে, যে তারা বলেছে ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যে কিবলামুখী ছিলে সেদিক থেকে তোমাকে ফিরাল কে? তুমি সেই দিকে ফিরে যাও, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করব, তোমার প্রতি ঈমান আনব। আসলে ওরা তাঁকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। মোটকথা, এই দুটি কারণের মধ্যে যে কোন একটি কারণে কিবলা পরিবর্তন—প্রথম অনুসৃত কিবলার দিক থেকে দ্বিতীয় কিবলা—কাবার দিকে মুখ করার উপর কঠোর আপত্তি তুলেছিল। হাসান বলেছেন, রাসূলে করীম (স) যখন বায়তুল মাকদিস থেকে ফিরে কাবাকে কিবলা রূপে গ্রহণ করলেন, তখন আরব মুশরিকরা বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার পূর্বপুরুষের মিল্লাত থেকে বিরাগী হয়ে গিয়েছিলে। এক্ষণে আবার সে দিকেই ফিরে এসেছ। তাই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তুমি অবশ্যই তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের দিকেও ফিরে আসবে। আল্লাহ যে কারণে পূর্বানুসৃত কিবলার দিক থেকে দ্বিতীয় কিবলার দিকে তাঁর নবীকে ফিরিয়েছিলেন তা তিনি বলে দিয়েছেন, এই আয়াতে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

তুমি যে কিবলামুখী ছিলে সেটিকে কিবলা বানিয়েছিলাম এই উদ্দেশ্যে আমরা বাস্তবভাবে জানব রাসূলকে কে অনুসরণ করে সেই লোকদের থেকে আলাদা করে, যারা তাদের পেছনের দিকে ফিরে গেছে।

বলা হয়েছে, এই লোকদেরকে মক্কাতেই বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করতে বলা হয়েছিল। যেন তারা সেখানকার মুশরিকদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা মক্কার সব মুশরিক তো কাবা মুখীই ছিল। হিজরত করার পর মদীনায় প্রতিবেশী ইয়াহূদীরা বায়তুল মাকদিসকেই কিবলা বানিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা কাবার দিকে মুখ ফিরাল, যেন তারা তাদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেন, ঠিক যেমন মক্কায় তাঁরা সেখানকার মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন কিবলার পার্থক্যের ভিত্তিতে। এই পূর্ব কিবলা বায়তুল মাকদিসের দিকে বাতিলকরণকে ইয়াহূদীরা প্রতিবাদ করলে আল্লাহ্ তাদের কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করলেন এই বলে ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

বল, পূর্ব ও পশ্চিম সব-ই তো আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক-নির্ভুল পথে পরিচালিত করেন।

এই যুক্তি ও প্রমাণের তাৎপর্য হল, পূর্ব ও পশ্চিম সব-ই যখন আল্লাহ্‌র, তখন উভয় দিকে মুখ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তা অভিন্ন। আল্লাহ্ এই দিকসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি দিককে নির্দিষ্ট করেছেন দ্বীনি কল্যাণের দৃষ্টিতে এবং সঠিক নির্ভুল পথে হেদায়েত দানের লক্ষ্যে। অন্য দিক দিয়ে, ইয়াহূদীরা মনে করে রেখেছিল যে, বায়তুল মাকদিসই কিবলা হওয়ার দিক দিয়ে অন্য সবকিছুর তুলনায় অধিক উত্তম। কেননা তা পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এবং নবীগণের স্বদেশ। আল্লাহ এই স্থানকে অধিক মর্যাদা ও পবিত্রতা দান করেছেন। অতএব সেদিক থেকে অন্য দিকে ফিরে যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ ওদের ধারণাকে ভিত্তিহিন ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। দিয়েছেন এভাবে যে, পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত সব বাসস্থানই আল্লাহ্‌র অধীন। প্রত্যেক সময়ই তিনি বান্দাগণের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতে যেটিকে চান, ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন। কেননা ভূমি বা স্থান নিজস্ব গুণে স্বতঃই কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। আল্লাহ্ তাকে সম্মানার্হ বানাবার কারণ অনুযায়ী সেখানে আমল করাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

আবূ বকর বলেছেন, যারা মনে করেন, কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হতে পারে, উক্ত আয়াত (এবং গোটা ব্যাপার-ই) তার দলীল। কেননা নবী করীম (স) নিজের ইখতিয়ার ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর সুন্নাত, যদিও আল্লাহ সেটিকে কিবলা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের কোন নির্দেশ ছিল না। ফলে রাসূলের গৃহীত কিবলা এ আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে যায়। প্রমাণিত হল, কুরআন দ্বারা 'সুন্নাত' মনসূখ হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা উক্ত নীতি মানেন না, তারা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন, তা মনসূখ করেছে কুরআনের এই আয়াত, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে দিকেই তোমরা মুখ কর না কেন, তা-ই আল্লাহ্‌র দিক।' ফলে রাসূল যেদিককে কিবলা বানিয়েছিলেন, সেদিকে মুখ করাটা

আয়াতের মধ্যে শামিল ছিল। পরে কাবাকে কিবলা নির্ধারণের আয়াত এই আয়াতকে মনসূখ করেছে। তাতে কুরআন দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়ার নীতি গড়ে উঠেছে, সুন্নাত দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়ার নীতি নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের মতে – فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি। বরং তা কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে কার্যত অনুসরণীয়, যদি সে কাবা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকে। যে ভীত তার জন্যেও এবং চলমান যানবাহনে যে নামায পড়ে, তার জন্যেও। ইবনে উমর ও আমের ইবনে রবী'আতা বলেছেন, এ কথাটি কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে নাযিল হয়েছে। চেষ্টা করে একটি দিককে কিবলা মনে করে নামায পড়ার পর যখন স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, সেদিকটি কাবার দিক ছিল না, তখন এই আয়তটিই তার দলীল এবং আয়াত অনুযায়ী তার নামায সহীহ্, যদিও তা সঠিক কিবলামুখী হয়ে পড়া হয়নি। ইবনে উমরও চলমান যানবাহনের উপরে নামায-পড়া লোক। তিনি বলেছেন—আমরা প্রয়োজনে এ আয়াতের ভিত্তিতে আমল করেছি। আয়াতটিকে অবশ্যই মনসূখ মনে না করেই। সেটিকে মনসূখ মনে করলে তদানুযায়ী আমল করা আমাদের জন্যে জায়েয হতো না। এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি 'উসূলিল ফিকাহ' কিতাবে।

আলোচ্য আয়তটিতে আরও একটি ব্যাপার রয়েছে। তা একটি বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত হবে। হাম্মাদ ইবনে সালমা সাবিত, আনাস, ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখে করে নামায পড়ছিলেন। এই নামাযের মধ্যেই নাযিল হল ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

তুমি তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও।

অতঃপর রাসূলে করীম (স) নিয়োজিত ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ

قَدْ أُمِرْتُمْ أَنْ تُوَجِّهُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

মুসলমানগণ! তোমাদেরকে তোমাদের মুখমণ্ডল মসজিদে হারাম-এর দিকে ফেরাবার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে।

ফলে বহু লোক নামাযের রুকূতে থাকা অবস্থায় উক্ত ঘোষণা শুনতে পেয়ে আল্লাহ্র ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবদুল আজীজ ইবনে মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ কুবার মসজিদের লোকেরা ফজরের নামায পড়ছিল। এই সময় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ "রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে। তাতে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তে আদেশ করা হয়েছে। অতএব তোমরাও কাবার দিকে ঘুরে যাও। শুনামাত্রই তারা সকলে কাবার দিকে ঘুরে গেল, যদিও তারা সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়ছিল।" ইসরাঈল, আবূ ইসহাক, বরা' সূত্রে বর্ণনা

করেছেন, নবী করীম (স) কাবার দিকে মুখ ফিরালেন 'আসমানে তোমার বারবার মুখ ঘোরানকে আমরা লক্ষ্য করেছি'—আল্লাহ্র এ কথাটি নাযিল হওয়ার পর। তখন রাসূলে করীম (স)-এর সাথে নামায পড়েছে এমন এক ব্যক্তি আনসার লোকদের নিকট গেলেন। তখন তাঁরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। তখন সেই লোক বললেন, রাসূলে করীম (স) তো কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। এ কথা শুনার সঙ্গে সেঙ্গ তাঁরা সকলে রুকূ দেয়ার আগেই এবং নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব বর্ণনাই সহীহ্। হাদীসবিদদের নিকট গৃহীত ও দলীল হিসেবে ব্যবহৃত। তারা অন্তর দিয়ে তা কবুল করেছেন। ফলে এই বর্ণনা মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। তা অবশ্যই মানতে হবে। আর কিবলা নির্ধারণে চেষ্টাকারী যখন নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, সেই দিকটিই কিবলা, তখন নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই সেদিকে ফিরে ও ঘুরে যাবে।[১]

অনুরূপভাবে ক্রীতদাসী যদি নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে নামাযের মধ্যে থেকেই সেই তার মুখাবরণ গ্রহণ করবে।

এই ঘটনা 'খবরে ওয়াহিদ' একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস দ্বীনি ব্যাপারে গ্রহণ করার আসল ভিত্তি। উপরোদ্ধৃত হাদীস থেকে জানা গেছে, আনসারগণ একজন সংবাদদাতার দেয়া সংবাদ গ্রহণ করেছেন। আর তা করেই তাঁরা কাবার দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন কিবলা পরিবর্তনের ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে। অপর দিক দিয়ে নবী করীম (স) ঘোষণাকারীকে প্রথম কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা যদি 'খবরে ওয়াহিদ'—একজন ব্যক্তির দেয়া সংবাদ গ্রহণের পক্ষপাতী না হতেন, তাহলে রাসূলে করীম (স) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিতেন না এবং একজনের সে ঘোষণার কোন ফায়দাও হতো না।

যদি প্রশ্ন তোলে যে, তোমাদের মৌল নীতি হচ্ছে, যে পন্থায় ইলম ওয়াজিব হয়, সেই পন্থায় যা প্রমাণিত হয়, সেটিকে রাসূলের কথা মনে করায় একজনের দেয়া খবর গ্রহণ জায়েয নয়। অথচ লোকেরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর নির্ধারণের (توقيف) ভিত্তিতে। পরে তাঁরা সকলেই 'খবরে ওয়াহিদ' পেঁয়ে তার বিপরীত ফিরে গেলেন, আগের কিবলা ত্যাগ করে।

এর জবাবে বলা যাবে, তারা নির্দ্বিধায় খবরে ওয়াহিদ কবুল করেছিলেন এ জন্যে যে, রাসূলের নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর প্রথম নিয়ম অবশিষ্ট থাকার উপর দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন না। কেননা তাঁরা মনসূখ হওয়ার ব্যাপারকে জায়েয মনে করতেন। তখনও প্রথম কিবলার স্থিতির উপর বিজয়ী ধারণার ধারক ছিলেন, যদিও ইয়াকীন—দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না। এ কারণেই তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করে নিয়েছিলেন তা রাসূলের দেয়া ও রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া খবর হিসেবে।

১. তাতে নতুন করে নামায শুরু করতে হবে না।

যদি কেউ কথা তোলে, তায়াম্মুমকারী নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পানি পাওয়া গেলে তার নামাযে স্থিতিশীল থাকাকে তোমরা জায়েয মনে কর না কেন; যেমন তাঁরা কিবলা পরিবর্তনের পরও পূর্ব কিবলার উপর স্থিতিশীল ছিলেন ?

জবাবে বলা যাবে, যা বলেছে, তা এক ভিন্ন কথা, তায়াম্মুমকারীর স্থিতিশীল থাকা জায়েয হওয়ার দরুন তার জন্যে অযূ ওয়াজিব হয়ে যায় না। তায়াম্মুমে নামায শেষ করাই তার জন্যে জায়েয পানি পাওয়া সত্ত্বেও। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে লোকেরা যখন কিবলা পরিবর্তনের খবর পেয়ে গেলেন, তখন-ই তাঁরা সে দিকে ফিরে ও ঘুরে গেলেন। যে দিকে ফিরে তারা নামায পড়ছিলেন, সে দিকে আর মুখ করে থাকলেন না। কিবলার এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুম করে যে নামায পড়ছে, সে পানি পেলে তার অযূ করা উচিত এবং তারই উপর তার ভিত্তি হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, তায়াম্মুমকারী পানি পেলে তাকে অযূ করতে হবে, তায়াম্মুমের উপর স্থিতি গ্রহণ জায়েয হবে না। অপর দিক দিয়ে কথা হচ্ছে ,তায়াম্মুমকারীর জন্যেও আসল ফরয হচ্ছে পানি দ্বারা অযূ করা। মাটি হচ্ছে এই পানির বিকল্প, বদল। ফলে পানি পাওয়া গেলে অযূ করার সেই আসল ফরয ফিরে চাপবে। যেমন 'মোজা'র উপর মসেহ্‌কারীর মসেহ্ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই 'মসেহে'র উপর স্থিতি গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তায়াম্মুমকারীর জন্যেও এই নিয়ম। ঠিক এ রূপই ব্যাপার কিবলার ক্ষেত্রেও। নামাযীদের জন্যে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা ফরয ছিল না, যখন কাবা কিবলা রূপে নির্দেশিত হয়ে গেল। অতঃপর কাবামুখী হওয়াই বাধ্যতামূলক ফরয হয়ে গেল। ক্রীতদাসী নামাযের মধ্যেই যখন স্বাধীনা হয়ে গেল, তার উপর 'সতর' ঢাকা পূর্বে ফরয না থাকলেও এক্ষণে তা-ই তার জন্যে বাধ্যতামূলক ফরয। আনসারগণ যখনই কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে গেলেন, তখন সেই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়াই তাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। অনুরূপভাবে কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে ফরয হল সেই দিকে মুখ করে নামায পড়া, যেদিককে কিবলা রূপে নির্ধারণে তার চেষ্টা সফল হয়েছে। তা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করা তার জন্যে ফরয-ই ছিল না। তার দলীল আল্লাহ্‌র এই কথা : তোমরা যে দিকেই মুখ করে দাঁড়াও, সেটিই আল্লাহ্‌র দিক।' সে এক্ষণে একটি ফরয থেকে অপর একটি ফরযের দিকে ফিরে গেল মাত্র, বিকল্প থেকে আসল ফরযের দিকে ফিরে যায়নি।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি নির্দেশ আছে। তা হল আনসারদের কাজটি —যা বলেছি তাতেই আমল। কেননা আদেশ ও নিষেধে সিদ্ধান্তটি জানার সাথে সংশ্লিষ্ট। যা জানা, তা-ই আসল। এ কারণে আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে লোক দারুল হরব-এ ইসলাম কবুল করলেন, সে জানতে পারল না যে, তার উপর নামায ফরয হয়ে পড়েছে। পরে সে দারুল-ইসলামে চলে এল। এখানে সে যথারীতি ওয়াক্তের নামায-ই পড়বে, তাকে পেছনের না-পড়া নামায কাযা করতে হবে না। কেননা সে নামায ফরয হওয়ার কথা জানতে ও শুনতে পায়নি। আর যে বিষয়ে জানা যাবে না, শুনা হবে না, তা পালন করার কোন দায়িত্ব আসে না। যেমন কিবলা পরিবর্তন করে কাবামুখী হওয়ার

কোন দায়িত্ব আনসার (এবং কুবা'র মুসলমানদের) উপর ছিল না। তা জানা ও শুনার পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন কিবলা-ই তাদের জন্যে কিবলা ছিল। ওকালাত, মুজারিবাত (দায়িত্ব গ্রহণ ও পারস্পরিক ব্যবসায়) এবং অনুরূপ ব্যাপারাদিতেও সেটাই মৌল নীতি। যে তা ভেঙ্গে দিতে পারে সে যদি তা ভেঙ্গেও দেয়, তবুও কোন কিছুই বাতিল ও নাকচ হয়ে যাবে না অপর পক্ষ তা না জানা পর্যন্ত। তেমনি যে পূর্ণ বয়স্ক হয়নি, তার জন্যেও শরীয়াতের কোন আদেশ পালনীয় হয় না। এ কারণে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, উকীলের ওকালতী কাজ-কর্ম করা ও ওকালাত সম্পর্কে জানার পূর্বে জায়েয নয়।

আল্লাহ্-ই তাঁর শরীয়াত ও কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইজমা সত্য ও সহীহ্—এ পর্যায়ের আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ –

আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থার অনুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও .....

অভিধান বিশারদগণ বলেছেন ঃ الوسط। শব্দের অর্থ العدل। 'ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, (সুবিচারক, উন্নত আদর্শ চরিত্রের অধিকারী)। সীমালঙ্ঘনকারী ও সীমার মাত্রার কমকারী—এই দুয়ের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন, উত্তম, অধিক কল্যাণময়। আসলে এই সব অর্থই এক ও অভিন্ন। কেননা العدل। -এর অর্থও الخيار। — অতীব উত্তম ও কল্যাণময়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ –

যেন তোমরা সাক্ষী হও জনগণের উপর।

এর অর্থ, যেন তোমরা হও, যেন হতে পার সাক্ষী। شهداء সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা লোকদের সেসব কার্যাবলীর বিষয়ে সাক্ষী দেবে, যা তারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা এই দুনিয়ায় ও পরকালে করবে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَجِائَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ –

যেন তোমরা সাক্ষী হও জনগণের উপর।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, তারা নবীগণের পক্ষে তাঁদের সত্য অমান্যকারী উম্মতগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা তো দ্বীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর এ সাক্ষ্য তারা দেবে নবী করীম (স) তাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন, এর ভিত্তিতে, বলা হয়েছে, তোমরা হবে অকাট্য দলীল, যে বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দেবে সেই বিষয়ের। যেমন নবী করীম (স) নিজে সাক্ষী অর্থাৎ অকাট্য দলীল হবেন তাদের প্রত্যেকের জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দসমূহ এই সব অর্থ-ই দিতে পারে। আর এসব অর্থই এক সাথে গ্রহণও করা যেতে পারে। এ সবই এখানে আল্লাহ্‌র বক্তব্য। অতএব তারা জনগণের কাজ-কর্মের সাক্ষ্য দেবে ইহকালে ও পরকালে—উভয় ক্ষেত্রেই। তারাই নবীগণের পক্ষে তাদের সত্য দ্বীন অমান্যকারী উম্মতদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা এই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে এই কারণে যে, আল্লাহ্‌ নিজেই এ বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই সব সত্ত্বেও এবং সেই সাথেই তাদের পরবর্তীতে আসা লোকদের জন্যে অকাট্য দলীল—শরীয়াতের উত্তরাধিকার বলার ব্যাপারে, এক বংশ থেকে তার পরবর্তী বংশের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে। তারা নিজেরা যে সব হুকুম জারি করেছে, ফায়সালা গ্রহণ করেছে, বিশ্বাস করেছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান, সেই সব ব্যাপারেও তারা অকাট্য দলীল।

এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মুসলিম উম্মতের 'ইজমা' (اجماع) নিঃসন্দেহে সহীহ্‌ অবশ্য গ্রহণীয় শরীয়াতের ভিত্তি হিসেবে। এর দুটি কারণ। একটি—আল্লাহ্‌ নিজেই মুসলিম উম্মতকে ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, নিরপেক্ষ, বিশ্বাস্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব তারা সর্বোত্তম, সকলের তুলনায় অধিক কল্যাণময়। অতএব তাদেরকে সত্যবাদী মানতে হবে। সুবিচারক—নিরপেক্ষ রায় প্রদানকারী বলে বিশ্বাস করতে হবে। তাদের কথাকেও সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক বলে স্বীকার করতে হবে। তারা সমষ্টিগতভাবে গুমরাহীর মধ্যে পড়তে পারে—এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও নিষেধকারী।

আর দ্বিতীয় কারণ—আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ তারা লোকদের উপর সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ অকাট্য দলীল। অনুরূপ রাসূল (স) তাদের জন্যে অকাট্য দলীল বলে আল্লাহ্‌ তাঁর পরিচিতিতে বলেছেন ঃ তিনি তাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা। আর আল্লাহ্‌ই যখন তাদেরকে অন্য সব লোকের জন্যে 'সাক্ষ্যদাতা' বলেছেন, তখন তিনি এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, তারা সকলে ন্যায়পর, নিরপেক্ষ, সুবিচারক। তাদের কথা অবশ্যই কবুল করা যাবে, কবুল করতে হবে নির্দ্বিধায়। কেননা আল্লাহ্‌ ঘোষিত সাক্ষী তো আর কাফির হতে পারে না, গুমরাহ্‌ বা পথভ্রষ্ট হতে পারে না। অতএব আয়াতটির দাবি হচ্ছে, তারাই পরকালে সাক্ষ্যদাতা হবে সেইসব লোকের জন্যে বা বিরুদ্ধে, যারা প্রত্যেক যুগে তাদের আমল দ্বারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, যারা তাদের সময়ের পূর্বে মরে গেছে তাদের ছাড়া। যেমন নবী করীম (স)-কে সাক্ষী বানানো হয়েছে তাঁর সময়ের লোকদের উপর। এ কথা তখনকার জন্যে যদি তাদের আমলের ব্যাপারে পরকালে সাক্ষ্যদানের কথা মনে করা হয়। কিন্তু এই 'শাহাদাত'-এর অর্থ যদি করা হয় অকাট্য দলীল, তাহলে তা অকাট্য দলীল তাদের উপর, যাদের তিনি দেখেছেন। তারা তাঁর পরবর্তী দ্বিতীয় সময়ের লোকজন এবং তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তাদের জন্যেও। যেমন নবী করীম (স) সমগ্র উম্মতের উপর অকাট্য দলীল—প্রাথমিক পর্যায়ের ও শেষ পর্যায়ের। আর আল্লাহ্‌র অকাট্য দলীল কোন সময় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত, এ থেকে পরকালের লোকদের আমল-এর সাক্ষ্যদান এবং যে সাক্ষ্যদান অকাট্য দলীল—এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا –

তখন কি অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং হে নবী! তোমাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব সেই সকলের উপর?

আল্লাহ্ যখন জনগণের আমলের সাক্ষ্যের কথা বলতে চেয়েছেন, তখন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ের লোকদের কথা এবং যে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর কথার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ – فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ –

আমি যতদিন তাদের মধ্যে বসবাস করেছি, ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর তুমি যখন আমাকে তুলে নিলে, তখনকার লোকদের পাহারাদার তুমিই ছিলে হে আল্লাহ।

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হল যে, আমলের বিষয়ের সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর যে সাক্ষ্য 'হুজ্জাত' বা অকাট্য দলীল, তা শুধু প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ের উম্মতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। এ কারণে নবী করীম (স)-এর তাদের জন্যে অকাট্য দলীল ও 'হুজ্জাত' হওয়া সকল যুগ ও কালের সাথে জড়িত। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা ছিল 'হুজ্জাত'—অকাট্য দলীল হিসেবে। তাই তারা অবশ্যই 'হুজ্জাত' হবে তাদের সময়ের লোকদের জন্যে, যারা তাদের সঙ্গে শামিল এবং তাদের পরবর্তী লোকদের সমস্ত যুগ ও কালের লোকদের জন্যেও। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ের লেকেরা কোন বিষয়ে 'একমত' ও একত্রিত হলে এবং পরে তা থেকে কিছু সংখ্যক লোক তাদের ঐকমত্য থেকে বের হয়ে গেলে তারা পূর্ববর্তী লোকদের ইজমা বা ঐকমত্যকে অকাট্য দলীল হিসেবে উপস্থাপিত করবে। কেননা নবী করীম (স) এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাদের কথা সত্য ও নির্ভুল এবং তিনি তাদের কথার সত্যতাকে হুজ্জাত ও অকাট্য দলীল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পরে যারা সেই ঐকমত্যের বাইরে চলে যাবে, তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করবে, তারা তাদের দলীল ও হুজ্জাতের সিদ্ধান্ত পরিহারকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দলীল পাওয়া গেলে সেই দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত তা না পাওয়া অসম্ভব, অবাঞ্ছনীয়। আর নবী করীম (স)-এর পর তার মনসূখ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব বা কঠিন। তখন তার সিদ্ধান্ত মনসূখ হওয়ার প্রক্রিয়াই পরিত্যক্ত হতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, উম্মতের যে-কোন উপায়ে অর্জিত ইজমা বা ঐকমত্য

আল্লাহ্র নিকটও হুজ্জাত বা অকাট্য দলীল। তা পরিত্যাগ করার কোন উপায় নেই কারোর জন্যেই। তা থেকে বের হয়ে যাওয়া বা তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করার অধিকার থাকতে পারে না কারোরই।

উদ্ধৃত আয়াতটি প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের সাহাবায়ে কিরামের ইজমাকে সহীহ ও নির্ভুল প্রমাণ করে। বিভিন্ন যুগ ও সময়ের লোকদের ইজমাকেও সহীহ্ প্রমাণ করে উদ্ধৃত আয়াতটি।

কেননা সে ঐকমত্য বা ইজমা এমন নয় যে, তা কোন এক বিশেষ যুগের জন্যে সহীহ্ হবে, অন্য যুগ বা কালের জন্যে সহীহ্ হবে না। আয়াত অনুযায়ী যদি কেবল প্রাথমিক যুগের লোকদের ঐকমত্যের যথার্থতা স্বীকৃত হয়, অন্যান্য সকল যুগের জন্যে যথার্থ বিবেচিত না হয়, তাহলে প্রাথমিক যুগের পরিবর্তে অন্যান্য সকল যুগের লোকদের ইজমাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা জায়েয হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

কেউ যদি বলে, আল্লাহ যখন বলেন ঃ এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, তখন এই কথাগুলো কেবল তা নাযিল হওয়ার সময়ে বর্তমান থাকা লোকদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছিল। তাই বুঝতে হবে যে, এই কথাগুলো কেবল মাত্র সেই লোকদের সাথে সম্পর্কিত, অন্যদের জন্যে তা প্রযোজ্য নয়, তাদের ছাড়া অন্যরা এই সম্বোধনের আওতায় পড়ে না। যদি তাদেরকেও গণ্য করতে হয়, তা হলে সেজন্যে স্বতন্ত্র দলীলের প্রয়োজন।

এর জবাবে বলা হবে, এরূপ ধারণা আদৌ ঠিক নয়, কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'এভাবে তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি'—এটা সমগ্র মুসলিম উম্মতকে সম্বোধন করে বলা কথা। প্রাথমিক কালের লোকেরা যেমন এর মধ্যে গণ্য, তেমনি শেষের লোকেরাও এর মধ্যে শামিল। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়ে বর্তমান থাকা লোকদের জন্যে এই কথা যেমন, তেমনি তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব লোক এই উম্মতের মধ্যে শামিল হবে, নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্যেও এই কথা, যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ –

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন করে তা ফরয করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের জন্যেও।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ –

তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে।

এই ধরনের যত সম্বোধনমূলক ঘোষণা কুরআনে রয়েছে, তা সবই সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্যে। তা থেকে কেউ বাদ পড়বে না। যেমন নবী করীম (স) তাঁর সময়ে বর্তমান থাকা সমগ্র লোকদের জন্যে প্রেরিত নবী ও রাসূল, তেমনি যারা তাঁর পরে আসবে, তাদের প্রতিও প্রেরিত। আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا -

আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সাবধানকারী, ভয় প্রদর্শক এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলো বিতরণকারী চেরাগরূপে পাঠিয়েছি।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আমরা আপনাকে সারে জাহানের জন্যে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।

কোন মানুষ একথা মনে করতে পারে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রাথমিক কালের ও শেষ কালের সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হন নি, তিনি তাদের জন্যে হুজ্জাত ও সাক্ষ্যদাতা নন, সমগ্র জাহানের জন্যে রহমত ছিলেন না, কোন মানুষ—কোন মুসলিম এরূপ ধারণা রাখে—এমন কল্পনাও করা যায় না।

যদি কেউ প্রশ্ন তুলে যে, আল্লাহ যখন বলেছিলেন ঃ 'আমরা এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি,' তাতে ব্যবহৃত 'উম্মত' শব্দটি তো নবীর সময়ে বর্তমান থাকা লোকদেরকেই বোঝায়, বোঝায় তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্তকার লোকদেরকে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সমাজকে নিরপেক্ষ সুবিচারক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় বলেছেন। অথচ তাতে কেবলমাত্র একটি যুগের লোকদের ন্যায়বাদী-সুবিচারক (العدل) হওয়ার ও সাক্ষ্য কবুলের কথা নেই। তাহলে তুমি সমস্ত যুগের ও কালের লোকদের 'ন্যায়বাদী সুবিচারক' হওয়ার কথা কেমন করে বলছ? তাদেরকে তাদের পরবর্তী কালের ও যুগের লোকদের জন্যে 'হুজ্জাত' কেমন করে বানাচ্ছ?

এর জবাবে বলা যাবে, যিনি তাদেরকে অন্যদের জন্যে ন্যায়পর সুবিচারক হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাদের দেয়া খবরে এবং আল্লাহ্‌র হুকুম বলে যার প্রতি বিশ্বাস রাখে সেই ব্যাপারে, আর একথা তো জানাই আছে যে, এ এমন একটা গুণ, যা দুনিয়ায় অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন যে, তারা সমগ্র মানুষের জন্যে সাক্ষী। এমতাবস্থায় উম্মতের প্রথম ও শেষের লোকদের তাদের জন্যে 'হুজ্জাত' হওয়ার কথা গণ্য করা হয় তাহলে আমরা এ থেকেই জানতে পারি যে, আসলে লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত যুগ ও কালের লোকেরা, তারা সকলেই এই গুণ ও মর্যাদার অধিকারী।

কেননা প্রত্যেক যুগ ও কালের লোকদেরকেই 'উম্মত' নামে অভিহিত করা সঙ্গত। কেননা 'উম্মত' তো নাম হচ্ছে সেই জনসমষ্টির, যারা একটি মাত্র দিকমুখী একই লক্ষ্যের অভিসারী, আর প্রত্যেক যুগ ও কালের লোকগণ তাদের স্বঅবস্থায়ই এই নামের ধারক। 'উম্মত' শব্দটি তো সাধারণ প্রয়োগীয় নিঃশর্ত। তাই এক যুগের সব লোককেই উক্ত কথা বলা হয়েছে। যেমন, যদি বলি ঃ আল্লাহ্‌ মা ও বোনদের হারাম করে দিয়েছেন, এই

ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত এবং তা যেমন উম্মত বয়ে নিয়ে চলেছে, তেমনি কুরআনও। তাহলে এই কথা নিঃসন্দেহে সহীহ্ হবে। বোঝা গেল ও প্রমাণিত হল যে, উক্ত কথাটি আল্লাহ্ বলেছেন সকল যুগ ও কালের লোকদের জন্যে। তাছাড়া আল্লাহ তো বলেছেন, 'তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী বানিয়েছি, এই গুণ-সম্পন্ন জনসমষ্টি অনির্দিষ্ট ও সাধারণ। আর তাদেরকেই তিনি 'হুজ্জাত' বানিয়েছেন। আর তা সকল কাল ও যুগের লোকেরাই হতে পারে, হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা جعلناكم 'তোমাদেরকে বানিয়েছি' সকল লোকের জন্যে সাধারণ সম্বোধন, বর্ণিত গুণটি সম্বোধিত সব মানুষেরই অর্জনযোগ্য ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ –

মূসার লোকজনদের মধ্য থেকে একটি উম্মত জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা সত্য দ্বীনের হেদায়েত গ্রহণ করে ও মেনে চলে।

মূসা (আ)-এর সময়ের সমস্ত লোক একটা উম্মত। তাদের কতকাংশকে স্বতন্ত্রভাবে 'উম্মত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তাদেরকে একটা ভিন্নতর গুণে ভূষিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক যুগের লোকেরাই 'উম্মত' নামে অভিহিত হতে পারে। যদিও তা একটি উম্মতের প্রাথমিক ও শেষের লোকদের সাথেই তার সম্পর্ক। এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যার কুফরী প্রকাশমান, যেমন, আল্লাহ্‌র সদৃশ নির্মাণকারী আর যে লোক জাহিলিয়াতের মত গ্রহণ করেছে এবং সেই দিক দিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে, সে মুসলিম গণ্য হবে না ইজমার ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে যার ফাসিকীও প্রকাশমান, সে-ও ইজমায় মুসলিম গণ্য হবে না। যেমন খারেজী ও রাফিযী মতের লোকেরা যার ফাসিকী আমল-এর দিক দিয়ে কিংবা যার ফাসিকী আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে, তারা সকলেই সমান। কেননা আল্লাহ 'সাক্ষী' বলে অভিহিত করেছেন কেবল সেই লোকদেরকে, যারা ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা ও কল্যাণ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। আর এই গুণের অধিকারী কাফির ফাসিক লোকেরা হতে পারে না। ব্যাখ্যার দিক দিয়ে যারা কাফির ও ফাসিক তারা একের থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। কেননা নিন্দনীয় 'গুণ'টিতে এরা সকলেই সমানভাবে শামিল, কোন অবস্থায়ই তারা ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা প্রভৃতি গুণ পেতে পারে না।

কিবলা মুখী হওয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا –

তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি। এখন তোমার মুখ আমরা সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর (যে দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়াতে পারলে তুমি সন্তুষ্ট হবে)।

বলা হয়েছে, اَلتَّقَلُّبُ অর্থ اَلتَّحَوُّلُ বারবার ঘুরে যাওয়া। নবী করীম (স) যেহেতু বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলতেন এজন্যে যে; কাবার দিকে কিবলা ঘুরিয়ে দেয়ার

তাঁকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এজন্যে তিনি এ পর্যায়ে ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তারই প্রার্থনাও করছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার-ই অনুমতি দান করলেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চান—প্রার্থনা করেন তাঁর নিকট থেকে পূর্বানুমতি প্রাপ্তির পর। তাঁরা যা চান, তাতে পূর্ণ কল্যাণ হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে নিরাপত্তাবোধ থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাঁদের এই ধরনের প্রার্থনাকেই কবুল করেন। তখন তাঁদের জনগণের জন্যে তা একটি কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলের আকাশপানে বারবার তাকানোর তাৎপর্য এই।

এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে, নবী করীম (স) অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন যে, আল্লাহ কাবাকে তাঁর জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করে দিন। তাহলে ইয়াহূদীদের থেকে তাঁর কিবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হতে পারে। এ পর্যায়ে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, কাবা কিবলা হোক, তা অধিক প্রিয় ছিল এজন্যে যে, তা-ই ছিল হযরত ইবরাহীমের কিবলা। এ-ও বলা হয়েছে যে, তা কিবলা হিসেবে অধিক প্রিয় ছিল এজন্যেও যে, তাতে আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিক সহজ ছিল। 'আমরা তোমাকে তোমার পছন্দনীয় কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি'-এ কথার একটাই তাৎপর্য। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

অতএব তুমি তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।

অভিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, الشَّطْرُ। শব্দটি একটি মিলিত (common) নাম বিশেষ দুটি অর্থে তার প্রয়োগ। একটি অর্থ অর্ধেক। যেমন বলা হয় شَطَرْتُ الشَّيْءَ 'জিনিসটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছি।' সেটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আরবরা বলে اَحْلُبُ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهُ আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার' আর দ্বিতীয় অর্থ দিক। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থই যে লক্ষ্য ও গ্রহণীয়, সে ব্যাপারে কোন মতবৈষম্য নেই। ইবনে আব্বাস, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ ও রুবাই ইবনে আনাস প্রমুখ উক্ত কথাটি বলেছেন। এখানে প্রথম অর্থটি গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা অর্ধেক মসজিদে হারামকে কিবলা বানানোর কোন অর্থই হয় না। সে কথা কেউ বলেওনি।

তবে মুসলিমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, মসজিদে হারামের কোন একটা পার্শ্বের দিকে মুখ করে নামায পড়লে সে নামায হয়ে যাবে। এতে এই দলীলও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ঘরের একটি পার্শ্বের দিকে মুখ করে নামায পড়লে যে নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা সে ঘরের একাংশের দিকে মুখ করেছে। আর আল্লাহ্ যে মসজিদে হারামের কোন একটা পার্শ্বের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন, তাতে সেই আসল ঘরটাই লক্ষ্য। কেননা মক্কার লোক যদি তার নামাযে সোজাসুজি কাবামুখী হয়ে নামায না পড়ে তাহলে তার নামায যে আদায় হবে না—এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ -

তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের মুখমণ্ডল তার (মসজিদে হারাম) দিকেই নিবদ্ধ কর।

এ আয়াতের সম্বোধন সেই লোকের প্রতি, যে কাবা নিজ চক্ষে দেখতে পাচ্ছে। যে লোক সেখানে অনুপস্থিত—দূরে অবস্থিত, তাকেও এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। উক্ত কথাটি বলা হয়েছে তাকে, যে কাবার নিকট উপস্থিত, প্রত্যক্ষ চোখে কাবা দেখতে পাচ্ছে। তাকেও, যে সেখান থেকে দূরে থেকে তার নিকট যে দিকটি কাবার দিক, সে দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। তাকে এই দিক নির্ধারণ করতে হয়। কেননা সেখানে অনুপস্থিত লোককে কাবা প্রত্যক্ষভাবে দেখার দায়িত্ব দেয়া হয় নি। কেননা তার পক্ষে তা সম্ভব নয়, তার কোন উপায়ই তার নেই। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না, যার সামর্থ্য তার নেই।

তিনি বান্দাকে সেই কাজেরই দায়িত্ব দেন, যা করার সামর্থ্য তার আছে। তএব যে লোক চোখের সামনে কাবা দেখতে পারছে না, তাকে তা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আমরা এ থেকে জানতে পারলাম, বান্দার বেশীর ভাগ বলিষ্ঠ ও বিজয়ী ধারণানুযায়ী যে দিকটি কাবার দিক, সে দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্যেই সে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সেখানে অনুপস্থিত, অন্যত্র অবস্থান করছে, আল্লাহ্র নিকট থেকে তাকে কাবা চোখে দেখতে থাকা অবস্থায় নামায পড়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

এ একটি মৌলনীতি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিত্য নব সঙ্ঘটিত ব্যাপারাদিতে শরীয়াতের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ জায়েয। প্রত্যেক ইজতিহাদকারীই তার ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার জন্যে দীয়ত্বশীল। সাধারণ ধারণাকে ভিত্তি করেই তাকে এই কাজ করতে হয়, এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, অস্পষ্ট ঘটনাবলীর মূলে একটি কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্যতা নিহিত আছে। যেমন ইজতিহাদ ও বিজয়ী আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কিবলা জানা একটা কাঙ্ক্ষিত সত্য। এই কারণে সে কিবলার সন্ধানে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্বও সহীহ্ ঠিক যেমন চেষ্টা করে কিবলার প্রকৃত দিকটি জানতে যত্নবান হতে হবে। কেননা তার একটা মহা বাস্তবতা ও সত্যতা রয়েছে। আদপেই যদি কোন কিবলা না হতো, তা হলে তার সন্ধান ও নির্ধারণের জন্যে চেষ্টা করার কোন দায়িত্বই আমাদের থাকত না। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا -

প্রত্যেকের জন্যেই একটা দিক নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সেই দিকটির মুখী হয়।

الوجهة। অর্থ কিবলা। মুজাহিদ এই কথাটি বর্ণনা করেছেন। হাসান তার অর্থ

বলেছেন طريقة পন্থা বা প্রক্রিয়া। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কৃত বিধান ইসলাম। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন ঃ

لِاَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَجْهَةٌ –

ইয়াহূদী-খ্রিস্টান প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যে মুখ ফেরানোর একটা দিক আছে।

হাসান বলেছেন ঃ

لِكُلِّ نَبِيِّ الْوِجْهَةُ وَاحِدَةٌ –

প্রত্যেক নবীরই একটি মাত্র দিক রয়েছে, আর তা হচ্ছে ইসলাম।

শরীয়াতের হুকুম-আহকামে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا –

তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি বিধান ও একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বানিয়ে দিয়েছি।

কাতাদাহ বলেছেন, তা হচ্ছে তাদের নামায বায়তুল মাকদিসের দিকে এবং তাদের নামায কাবার দিকে।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, সমগ্র দিগন্তবাসীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক মুসলিম জনতার জন্যে কাবার দিকসমূহ রয়েছে, তার পেছন বা সম্মুখ, কিংবা তার ডান বা বাম। বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এই দিকগুলোর মধ্যে কোন একটি বিশেষ দিক কিবলা হওয়ার জন্যে অপর দিক অপেক্ষা অধিক উত্তম নয়। বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) মীজাব-এর বিপরীত দিকে বসা ছিলেন। তখন এই আয়াতাংশ পাঠ করলেন ঃ

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا –

তোমাকে এমন একটা কিবলার দিকে ফিরাচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।

বললেন, এটাই হচ্ছে কিবলা। যে লোক মনে করে যে, একথা বলে 'মীজাব'কে বোঝানো হয়েছে, তার এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আয়াতে কাবার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন বিশেষ দিককে—মীজাব-এর দিককে—বোঝানো হয় নি অন্য দিকসমূহ বাদ দিয়ে। তা হতেই বা পারে কি করে, যখন আল্লাহ্‌র এই কথাটি রয়েছে ঃ তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে মুসাল্লা বানাও। এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও। সেই সাথে মুসলিম জনগণের এই ঐকমত্যকেও স্মরণে রাখতে হবে যে, কাবার সবগুলো দিকই কিবলা তার জন্যে, যে সেদিকে ফিরে নামায পড়ে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا –

প্রত্যেকেরই জন্যে একটা দিক আছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়।

এটি প্রমাণ করে যে, কাবার নিকট থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে কিবলার

সেই দিকে মুখ করা, তার বেশির ভাগ ধারণায় যে দিকটি কিবলা মনে হবে। সোজাসুজি ও অব্যাহতভাবে শুধু তারই দিকে মুখ করা এবং তাতে নির্ভুল হওয়া তার দায়িত্ব নয়। কেননা তা করার কোন সাধ্যই তার নেই। কাবার দূরে অবস্থিত সব মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে কাবা দর্শকের ন্যায় তার মুখী হওয়া এক অসঙ্গত ব্যাপারও বটে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ -

তোমরা সকলে কল্যাণসমূহের দিকে এগিয়ে যাও।

এর অর্থ দ্রুত ও অবিলম্বে ইবাদত-বন্দেগীসমূহ পালন কর। এই দলীলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ইবাদত—আনুগত্যের কাজ অবিলম্বে করা উত্তম, তা বিলম্বিত করা অপেক্ষা। বিলম্বিত করার পক্ষে কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন ওয়াক্ত শুরু হতেই নামায পড়া, যাকাত ফরয হতেই তা দিয়ে দেয়া, হজ্জ ফরয হতেই তা আদায় করা—এমনিভাবে অন্যান্য যাবতীয় ফরয তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় হতেই, তার কারণ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা যেমন কাম্য, তেমনি অতীব উত্তম। তার কারণ এসব কাজের আদেশ অবিলম্বে পালনীয়। এ সব কাজ বিলম্বিত করা কেবল কোন দলীলের ভিত্তিতেই জায়েয হতে পারে। যেমন, কোন আদেশ পালনের জন্যে যদি কোন সময় নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও সকলেরই মত হচ্ছে যে আদেশটিই অবিলম্বে পালন করে ফেলা আবশ্যক; তাই কল্যাণময়। তাই আল্লাহ্র উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সব ন্যায় কাজ—ভাল কাজ বা শরীয়াতের নির্দেশ খুব শীগ্‌গীর এবং অবিলম্বে পালন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তার আদেশ তো এজন্যেই দেয়া হয়েছে যে, আদেশ শুনা মাত্রই তা পালিত হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ -

যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা কোন প্রমাণ পেতে না পারে।

তবে যারা জালিম, তাদের মুখ যে কখনই বন্ধ হবে না, তা নিঃসন্দেহ। কোন কোন লোক বলেন, আয়াতে ﻻ। বলে যে (exception) করা হয়েছে তা غير جنسى এর অর্থ সম্পর্কে অভিধান বিজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, এটা واستناء منقطع এর অর্থ বরং তাদের মধ্যে যারা জালিম তারা সব সময়ই শোবাহ-সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকে এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা সন্দেহের সৃষ্টি করতেই থাকে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ -

এ বিষয়ে ওদের কিছুই জানা নেই। আছে শুধু ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমানের অনুসরণ।

অর্থাৎ কিন্তু ধারণা-অনুমানের অনুসরণই ওদের একমাত্র সম্বল, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের حجة শব্দটির অর্থ, পারস্পরিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, বিতর্ক করা। তাই বলেছেন, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন যুক্তি বা প্রমাণ পেয়ে না যায়। তবে জালিম

লোকদের কথা-ই আলাদা। তারা বাতিল যুক্তি প্রমাণ খাড়া করবেই। আবূ উবায়দাতা বলেছেন, এখানে لا অর্থ 'و' যেন বলেছেন, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেয়ে না যায়। ফরা' এবং অন্যান্য অভিধানবিদের এই কথা অস্বীকার করেছেন। ফরা বলেছেন لا কখনই 'و' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে استثناء যদি অগ্রবর্তী হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কবির কথা ঃ

مَا بَالمدينة دارٌ غيرًا واحدةٍ
دارُ الخليفة الأدارُ مَرْوانِ

যেন বলেছেন, মদীনায় মারওয়ানের ভবন খলীফার ভবন ব্যতীত আর কোন ভবনই নেই।

কুতরব বলেছেন, তার অর্থ লোকদের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণের সৃষ্টি যেন না হয়। তবে জালিমদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে কোন দোষ নেই। কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ এই অর্থ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

আল্লাহ্র যিকির ওয়াজিব

আল্লাহ্র কথা ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। এ আয়াতে আল্লাহ্র যিকির করার নির্দেশ রয়েছে। এই বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি দিক দিয়ে আলোচনা করব। এ পর্যায়ে আগের কালের মনীষীদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। একটা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

اَذْكُرُوْنِىْ بِطَاعَتِىْ اَذْكُرْكُمْ بِرَحْمَتِىْ -

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার আনুগত্য ও ইবাদত পালন করে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আমার রহমত নাযিল করে।

এ-ও বলা হয়েছে ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার নিয়ামতের খানা-সিফাত করে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়েছে, এ আয়াতের অর্থ— 'তোমরা শোকর আদায় করে আমার যিকির কর, আমি সওয়াব দিয়ে তোমাদেরকে স্মরণ করব।' বলা হয়েছে—'তোমরা দো'আ করে আমাকে স্মরণ কর, আমি দো'আ কবূল করে তোমাদেরকে স্মরণ করব।' আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এসব অর্থই দিতে পারে। এ সবই এক সাথেই আল্লাহ্র বক্তব্য হতে পারে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসব অর্থই শামিল করে, এসব অর্থ হওয়া সম্ভব।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, একই শব্দ থেকে এতসব বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নয়, আর এ সবই আল্লাহ্র বক্তব্য হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা শব্দ বিভিন্ন অর্থের মিলিত তাৎপর্য দিতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, সে কথা ঠিক নয়। কেননা 'যিকির'-এর যত দিকই রয়েছে, তা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক অভিন্ন তাৎপর্যের লক্ষ্যাভিসারী। তা যে 'মানুষ'-এর মত একটা

নাম। পুরুষ ও নারী সবাই তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'ভাই'। বিভিন্ন ব্যক্তিকেই 'ভাই' বলে অভিহিত করা যায়। শরীকানাও তেমনি একটি ব্যাপার। যদি তার বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে, তাহলে যে কারণে সকলকে একই নাম দেয়া হয়েছে, তা অভিন্ন অর্থের ধারক, আল্লাহ্‌র যিকিরও ঠিক তেমনি। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বন্দেগী হতে পারে। আর এই ইবাদত বা বন্দেগী কখনো মুখের উচ্চারণে হয়, কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তব কাজের মাধ্যমে, কখনো হয় হৃদয়ের আকীদা ও বিশ্বাস দ্বারা, কখনো চিন্তার দ্বারা তাঁর পক্ষের দলীল ও প্রমাণের মাধ্যমে। কখনো তাঁর বিরাটত্ব-মহানত্ব স্বীকারের মাধ্যমে। কখনো তাঁর নিকট দো'আ-প্রার্থনা করে, কখনো তার নিকট কিছু চেয়ে। একই শব্দের দ্বারা এই সবই বোঝানো যেতে পারে। অথবা শুধু 'ইবাদত' শব্দটি। এই শব্দ বলে যাবতীয় ইবাদত বোঝানো যেতে পারে—তা বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক—যদি নিঃশর্ত হুকুম আসে। যেমন ঃ

أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ –

তোমরা ইবাদত আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, অনুসরণ কর রাসূলকে।

অনুরূপভাবে 'গুনাহ' শব্দ বললে সর্ব প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ করাই বোঝায়। ঠিক এই ভাবেই فَاذْكُرُوْنِىْ তোমরা আমার 'যিকির' কর বলে যিকির-এর সকল দিক এর মধ্যে শামিল মনে করা যেতে পারে। সমস্ত ধরনের ইবাদতও এর অন্তর্ভুক্ত ধরা যেতে পারে। এ হল ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ্‌র বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য মুখে প্রকাশ করার দ্বারাও 'যিকির' হতে পারে। তাঁর তারীফ প্রশংসা করেও তাঁর 'যিকির' করা যায়। 'শোকর' করলেও যিকির হয়, তার দেয়া নেয়ামতের স্বীকারোক্তি করলেও 'যিকির' হয়। লোকদেরকে তাঁর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানালেও তাঁর যিকির হয়। তাঁর এক ও এককত্বের অকাট্য দলীল-প্রমাণ পেশ করলেও তাঁর যিকির হয়। সে সব দলীল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও 'যিকির' হয়। তাঁর কুদরত ও মহানত্বের কথা বললেও যিকির হয়, আর এ সব-ই হচ্ছে সর্বোত্তম 'যিকির'। অন্যান্য সকল প্রকারের যিকির এর-ই উপর ভিত্তিশীল—এর অধীন। এভাবেই আয়াতের অর্থ সহীস্‌ ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা দৃঢ় প্রত্যয় ও মনের স্বস্তি-প্রশান্তি এভাবেই লাভ করা যায়। আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –

জেনে রাখো। আল্লাহ্‌র যিকিরে অন্তরসমূহ স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে।

এ হচ্ছে অন্তরের যিকির। আর তার অর্থ, আল্লাহ্‌র দলীল ও অকাট্য প্রমাণাদি সম্পর্কে গভীর-সূক্ষ্ম চিন্তা চালানো। আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সন্ধান ও বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। একালের চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণা যতই বৃদ্ধি পাবে, অন্তরের স্থিতি-স্বস্তি নিশ্চিন্ততা তত বেশী লাভ করা যাবে। আর এজন্যে তা-ই হচ্ছে সর্বোত্তম যিকির। কেননা সকল প্রকারের যিকির তাঁর অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণিত হলেই সহীহ্‌ হতে পারে। নবী করীম (স) বলেছেন বলে বর্ণনা এসেছে, خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ 'গোপন-নিঃশব্দ যিকির-ই হচ্ছে সর্বোত্তম'যিকির'। ইবনে নাফে আবদুল মালিক ইবনে

মুহাম্মাদ মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্‌ইয়া উসামা ইবনে যায়দ, মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান, সা'দ ইবনে মালিক সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَايَكْفِيْ –

গোপন নিঃশব্দ যিকির সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম রিযিক হচ্ছে তাই যা যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ –

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য পেতে চাও।

এই কথাটি এসেছে ঃ 'তোমরা আমার যিকির কর, তা হলে আমিও তোমাদের যিকির করব' এই কথার পর। এতে বোঝা যায়, সবর ও নামায কার্যটি আল্লাহ্‌র যিকির বাধ্যতামূলকভাবে আঁকড়ে ধরায় এক মহাতৃপ্তি ও সুস্বাদ নিহিত রয়েছে। আর এ যিকিরই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দলীল ও প্রমাণ, তাঁর কুদরত, বড়ত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুগভীর চিন্তা। এই কথাটির মতই কথা ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ –

নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এরই পরে বলা হয়েছে ঃ ولذكر الله اكبر 'এবং আল্লাহ্‌র যিকির নিঃসন্দেহে অনেক বড় কাজ।'

হৃদয় দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির হচ্ছে, তাঁর দলীল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং তা নামায কাজের তুলনায়ও বড়। তা হচ্ছে এই যিকির-এর সহায়তাকারী এবং এই যিকির ধারণ করে রাখার আনন্দ-স্বাদ, তাকে চিরস্থায়ী করার উপায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُ وَلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ –

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

মৃত্যুর পরও যারা জীবিত, তারা হচ্ছে শহীদ। এই শহীদের সম্পর্কেই এ আয়াতে কথা বলা হয়েছে। তারা কিয়ামতের দিন জীবিত হবে, তা বলা হয়নি। কেননা তা-ই যদি বক্তব্য হতো তহলে 'কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না' বলা হতো না। মৃত্যুর পর তারা যে জীবিত, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। এ কথাটাই এখানে বলা উদ্দেশ্য। আর কিয়ামতের দিন তাদের জীবন হবে এ-ই যদি বক্তব্য হতো তাহলে মুমিনরা তাদের অনুভব করতে পারবে, চিনতেও পারবে তার পূর্বে। তাহলে প্রমাণিত হল যে, এখানে বক্তব্য হচ্ছে, তাদের মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিনের আগেই তারা নবতর

জীবন লাভ করবে। মুমিনদেরকে যখন তাদের কবরে কিয়ামতের দিনের পূর্বেই জীবিত করা হবে, তারা সেখানে নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, তাহলে কাফিরদেরকে তাদের কবরে কিয়ামতের পূর্বেই জীবিত করে তাদেরকে আযাব দেয়া হয়, এটা কোনক্রমেই অসঙ্গত কথা হতে পারে না। আর যারা কবর আযাব অস্বীকার করে—হবে না বলে, তাদের কথা যে বাতিল ও ভিত্তিহীন, তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, সমস্ত মুমিনই যখন মৃত্যুর পর নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, তখন আল্লাহ্র পথে নিহতদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ও কেবল তারাই নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, বলা কি করে যুক্তি-সঙ্গত হতে পারে ?

জবাবে বলা যেতে পারে, তাদের অবস্থার উল্লেখ করে অগ্রিম সুসংবাদ দেয়ার নিয়মে বিশেষভাবেই তাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এটা তো সম্ভব। অপর আয়াতে তাদেরকে যে বিশেষ নিয়ামত দেয়া হবে, তার কথা বয়ান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ –

তারা জীবিত, তাদের রব্ব-এর নিকট তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হচ্ছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তারা কি করে জীবিত হতে পারে ? আমরা তো তাদেরকে কবরসমূহে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই কালের পর কালের অতিক্রমণের পর ?

জবাবে বলা হয়, এ ব্যাপারে লোকেরা দুটি মতে বিভক্ত। এক ভাগের লোকদের বিশ্বাস, মানুষ মূলত হচ্ছে রূহ্। তা এক সূক্ষ্ম নিয়ামতপ্রাপ্ত অবয়ব। যা কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা তাকেই করতে হয়, দেহকে নয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে এই পর্যবেক্ষিত স্থূল অবয়ব। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিমাণ অংশ ভাগ করে নেন, যার দ্বারা জৈব সংস্থা দাঁড়িয়ে যায়। সমস্ত নিয়ামত তাকেই পৌঁছায়। এই সূক্ষ্ম অংশসমূহকেই আল্লাহ্ যে রূপ চাহেন, আযাব দেন। কিংবা পাওনা অনুপাতে নিয়ামত দেন। পরে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিই বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তা কিয়ামতের আগেই। পরে কিয়ামতের দিন তাকেই জীবিত করা হবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে।

এ পর্যায়ে আবুল কাসেম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইস্হাক আল-মেরওয়াজী হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রায্যাক, মামর, জুহরী, কা'ব ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعَلَّقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهَا إِلَى جَسَدِهِ –

মুসলিমের আত্মা (রূহ) পাখীর ন্যায় জান্নাতের গাছে ঝুলে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ - وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -

এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-মাল, জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা। আর সুসংবাদ দাও সে সব ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে তারা বলবে ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং আমরা তাঁর-ই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।..... এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত পর্যন্ত।

আতা, রুবাই ও আনাস মালিক থেকে বর্ণিত আয়াতে হিজরতের পর নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে, আল্লাহ্‌র পথে এসব বিপদ ও মুসীবতের আগমন বার্তা তাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ আয়াতের মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্যে। একটি যেন তারা নিজেদেরকে ধৈর্যের স্থিত রাখতে সক্ষম হন। এ সবের কোন একটি বিপদ যখন তাদের উপর আসবে, তখন যেন তারা ঘাবড়ে না যান, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে না পড়েন এবং তা সহ্য করা তাঁদের জন্যে সহজতর হয়। আর দ্বিতীয়—সেই কথা জানিয়ে দেয়ার যা মনের পরম ধৈর্য গ্রহণের সওয়াব হিসেবে পাবে।

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ পূর্বে যে সব বিষয়ের বিপদের কথার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বিপদ-সমূহের ধৈর্যধারণের সুফল লাভের সুসংবাদ আগাম জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ তাদের উপর যখন বিপদ আসবে, বলবে ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অর্থাৎ সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মালিকানা স্বীকৃতির মাধ্যমে নিজেদেরকে ধৈর্যশীল করে রাখা। একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ্‌র অধিকার আছে তাদেরকে যে-কোন বিপদে ফেলা এবং ধৈর্যের শুভ প্রতিফল পাওয়ার আশাবাদী বানাবেন এবং তার মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করবেন। কেননা তিনি তো সর্বজ্ঞ, তিনি মহান, কল্যাণ ও মঙ্গলময় কার্যসাধনে তিনি তুলনাহীন। তাঁর সমস্ত কাজেরই একটা যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্যমূলকতা রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে স্থিত রাখা, গোটা ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা, তার ফায়সালায় রাজী হওয়া ও রাজী থাকা, পরীক্ষার কাঠিন্যের মধ্যেও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বান্দার কর্তব্য। কেননা তিনি সত্যের পক্ষে ফায়সালা গ্রহণ করেন। যেমন তিনিই বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَايَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ.

আল্লাহ্ পরম সত্যতা সহকারে ফায়সালা করেন। যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে, তারা কোন ফায়সালাই দেয় না, দিতে পারে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ যে বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ্ দিয়েছেন, সেই বিষয়ে হয়, যদি তা না হতো তাহলে কতই না ভালো হত, এ কথা বলার তুলনায় আকাশ থেকেই তার বিলম্বিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ 'আমরা তো আল্লাহ্রই জন্যে উৎসার্গিত' এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী,' এতে পরকালে, পুনরুত্থান, ও পুনরুজ্জীবনের স্পষ্ট স্বীকৃতি ও ঘোষণা রয়েছে। এ কথার প্রতিও ঈমান প্রকাশিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রাপ্য অনুপাতে শুভ কর্মফল দান করবেন। পরম ইহ্সান সহকারে যারা কাজ করে, তাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র নিকট কখনই বিনষ্ট হবে না, এ সব কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে অবিচল থাকার যে ফলশ্রুতি, সে বিষয়েও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ -

তাদের প্রতি রব্ব-এর নিকট থেকে বিপুল অনুগ্রহ ও অশেষ রহমত বর্ষিত হবে।

এ সব অনুগ্রহ ও রহমতের নিয়ামতের পরিমাণ ও মাত্রা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই জানা নেই। যেমন অপর আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে তাদের সুফল কোনরূপ হিসেব ছাড়াই পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

উদ্ধৃত আয়াতে যে সব বিপদ-মুসীবতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, কাফির-মুশরিকরা তাঁদের উপর যে নিপীড়ন চালায়, তা-ও তার মধ্যে রয়েছে। আর স্বয়ং আল্লাহ্ যেগুলো দেন, তা-ও। মুশরিকদের কৃত আযাবের মূল কথা হচ্ছে গোটা আরব রাসূলে করীম (স) ও মুসলমানদের চরম শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগেছিল। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের উপর যা ঘটেছে, তা তো আলাদা রয়েছেই। তা ছাড়া তাদের সংখ্যার বিপুলতা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কারণে তাদের উপর যে ভীতি ও সন্ত্রাস চাপিয়া দেয়া হয়েছিল, তার কথা না বললেও চলে।

ক্ষুধার কারণ ছিল নিদারুন অর্থাভাব, খাদ্যহীনতা। তাদের উপর চেপে বসা কঠিন দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য কখনো আল্লাহ্র দিক থেকেও আসত। তিনি তাদের ধন-মাল নষ্ট করে দিতেন। ফলে তারা দরিদ্রের গ্রাসে পড়ে যেতেন। তারা এঁদের উপর বিজয়ী হতো। ফলে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ত। ধন-মাল-জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিত। এই দুটি কারণই থাকা সম্ভব। কেননা ধন-মালের ঘাটতির কারণ শত্রুরাও সৃষ্টি করত। ফল-ফসলের ঘাটতির ব্যাপারটিও ঘটতো, বিশেষ করে এজন্যে যে, তাঁরা কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে এতটা মশগুল হয়ে পড়তেন যে, ফল-ফসল জন্মাবার অবসরই পেতেন না। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে। ফলে জমি চাষাবাদের কোন সময়ই পেয়ে উঠতেন না। তা ছাড়া আল্লাহর কাজ

হিসেবে তাদের ধন-মাল ও ফল-ফসলের উপরও নানা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ এসে পড়ত। আর জান-প্রাণের ঘাটতি হতো, যুদ্ধে শত্রুরা তাদেরকে হত্যা করত। এমনি রোগ-ব্যাধিতেও অনেক লোক মরে যেত।

আল্লাহ্র কাজ হিসেবে যে সব বিপদ আসত তাতে ধৈর্য ধারণের অর্থ ছিল আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্র কাজে রাজি থাকা এবং একথা জানা যে, আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন, তা অবশ্যই উত্তম ও কল্যাণময়, আর আল্লাহ্ যদি তাদেরকে কিছু না দিয়ে থাকেন, তা হলে যথাসময়ে তিনি তা দেবেন। আল্লাহ্র না দেয়াটাও মূলত দেয়াই।

আর যা শত্রুদের শত্রুতামূলক কাজের ফলে ঘটতো, সেখানে সবর হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা ও আল্লাহ্র দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে থাকা। সে জিহাদ-যুদ্ধ থেকে বিরত না হওয়া, পিছু না হটা। আর এসব বিপদের মধ্যেও অব্যাহতভাবে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করে যাওয়া। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন চালাত, তা আল্লাহ করাচ্ছেন একথা মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ্ কাউকে কারোর দ্বারা জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে পরীক্ষা করেন না। তিনি তা চানও না। সে জুলুম-নির্যাতনে সন্তুষ্ট বা ধৈর্যশীল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তার মুকাবিলা ও প্রতিরোধ করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ই যদি জুলুম ও কুফর দ্বারা কাউকে পরীক্ষা করতেন, তা হলে তাতে রাজি থাকা, তা সয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় হতো। কিন্তু আল্লাহ্ এ কাজের অনেক উর্ধ্বে।

আয়াতটিতে ধৈর্যশীলদের প্রশংসাও রয়েছে, যারা কঠিন বিপদ ও মুসীবতে পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং এই ধৈর্যের বিনিময়ে যে সওয়াব ও উত্তম প্রশংসা আছে তারও উল্লেখ হয়েছে। তাতে তাদের জন্যে দ্বীন ও দুনিয়ায় বিপুল কল্যাণ ও মুনাফা আছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই যা কিছু তারা পাবেন, তা শুধু আল্লাহ্র আদেশ পালনের মাধ্যমে। আর এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফলে দুশ্চিন্তা থেকে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মনের উদ্বেগ হতাশা দূরীভূত হয়। মানসিক যন্ত্রণা থেকেও অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। এ হচ্ছে সবর-এর বৈষয়িক সুফল। আর পরকালীন সুফল হচ্ছে অসীম অফুরন্ত সওয়াব। এই সওয়াবের পরিমাণ কত, তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই বলার সাধ্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটিতে দুটি হুকুম রয়েছে। একটি ফরয আর অপরটি নফল। ফরয হচ্ছে, আল্লাহ্র আদেশের সম্মুখে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্র ফায়সালায় রাজি থাকা, ফরযসমূহ পালনে ধৈর্যাবলম্বন করা এবং দুনিয়ার কোন বিপদ ও কাঠিন্য-কঠোরতা এই সবর-এর বাঁধ ভাঙ্গতে না পারা। আর নফল হচ্ছে, মুখে উচ্চারণ করা ঃ আমরা তো আল্লাহ্রই, তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।' এ কথার উচ্চারণে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ যা নফল কাজ হিসেবে পেশ করেছেন, তা কার্যত করা। সে কাজে আল্লাহ্র ঘোষিত সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া। তা ছাড়া অন্যদের সে উচ্চারণ শুনে অনুরূপ কথা মুখে উচ্চারণে উৎসাহিত হওয়া। এ উচ্চারণ শুনে

কাফিরদের অন্তর জ্বলে-পুড়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে তাদেরও জানতে পারা। উচ্চারণকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হওয়া, তাঁর আনুগত্য ইবাদতে অবিচল থাকা, শত্রুদের মুকাবিলা করা। দাউদ-আত্তায়ীর এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে ঃ বলেছেন, দুনিয়ায় যে লোক পরহিযগারী অবলম্বন করে, সে লোক এখানে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে রাজি হয় না, পছন্দ করে না। সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। বিপদে অস্থির হয়ে পড়া মুসলিমের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা সে তো জানে যে, প্রতিটি বিপদ-মুসীবতই এমন যে, তাতে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে বিপুল সওয়াব পাওয়ার সম্ভাবনা।

সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে দৌড়ানো

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির মধ্যে গণ্য। অতএব যে লোক হজ্জ করেছে কিংবা উমরা করেছে, তার জন্যে এ পাহাড় দুটির তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।

ইবনে উয়াইনা, জুহরী, উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে এ আয়াতটি পাঠ করলাম। তখন বললাম, আমি যদি তা না করি, তাহলে আমার কি আসে যায়! একথা শুনে তিনি বললেন, হে বোন পুত্র। তুমি খুবই খারাপ কথার উচ্চারণ করেছ। রাসূলে করীম (স) নিজে এই পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করেছেন। মুসলিম জনগণও তওয়াফ করেছেন। ফলে তা 'সুন্নাত' হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌দ্রোহী 'মানাত'-এর পরিবারবর্গ পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করত না। পরে ইসলামী যুগেও লোকেরা এ পাহাড় দুটির তওয়াফ করা পছন্দ করত না। পরে উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর নবী করীম (স) সেখানে তওয়াফ করেছেন। এভাবেই এই তওয়াফ—সাফা-মারওয়ার মাঝের সাঈ شعى সুন্নাত হয়ে যায়। এক সময় এ কথাটি আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমানকে বললে তিনি বললেন ঃ এটা জানার বিষয়। জ্ঞানবান লোকেরা বলতেন; যে সব লোক সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আমি মনে করি, আয়াতটি উভয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইকরামা, ইবনে আব্বাস থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন, সাফা পর্বতের উপর অনেক ছবি ও মূর্তি রক্ষিত ছিল। এই কারণে মুসলিমগণ সেখানকার তওয়াফ করতেন না। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

এ দুটি পর্বতের তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, এখানে মানাত মূর্তির কারণে ইসলাম-পূর্বকালে যারা এ পাহাড়ের তওয়াফ করত না, তারা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের এই জিজ্ঞাসার দরুনই এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস ও আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, যারা সাফা-মারওয়ায় তওয়াফ করত, তাদের জিজ্ঞাসাই ছিল আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ। কেননা এ পাহাড় দুটির উপর মূর্তি রক্ষিত ছিল। ইসলামের যুগে লোকেরা সে দুটির তওয়াফ করতেন না। যারা এ দুটি পাহাড়ের তওয়াফ করতেন ও যারা তা করত না তাদের উভয়ের সওয়ালের কারণেই হয়ত এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

এ পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে, অইয়ূব ইবনে আবূ মুলাইকা থেকে এক সঙ্গে বর্ণনা—হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

مَا اَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرِىءٍ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً مَالَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ -

সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করেনি এমন ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে রাসূলে করীম (স) কখনই স্বীকার করেন নি।

আবুত তুফায়ল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সুন্নাত। নবী করীম (স) নিজে তা করেছেন। আমিরুল আহ্‌ওয়াল আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করাকে অপছন্দ করতাম। শেষ পর্যন্ত এ আয়াতটি নাযিল হল। এ দুটির মাঝে তওয়াফ করা নফল। আতা ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—যার ইচ্ছা না হয় সে সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করবে না। আতা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে তা করবে না, তার কোন গুনাহ নেই। বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদ সওরী ও মালিক মত দিয়েছেন যে, তা করা হজ্জ ও উমরার সময় ওয়াজিব। তা না করলে জন্তু যবেহ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই সাঈ বা তওয়াফ না করলে শুধু জন্তু যবেহ করলে যথেষ্ট হবে না। তার ফিরে গিয়ে তওয়াফ করা কর্তব্য।

আবূ বকর বলেছেন, হানাফী ফকীহগণের মতে তা হজ্জের অনুসঙ্গ। না করা হলে ও ঘরে ফিরে গিয়ে থাকলে জন্তু যবেহ করাই যথেষ্ট। যেমন মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ, প্রস্তর নিক্ষেপণ ও তওয়াফে সদর। তা যে ফরয নয়, তার দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর হাদীস। শাবী উরওয়া ইবনে মদরস আততায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—আমি মুজদালিফায় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, "হে রাসূল! আমি 'তাই' পর্বত থেকে এসেছি। পথের প্রতিটি পাহাড়ের উপরই অবস্থান গ্রহণ করেছি। আমার জন্যে কি হজ্জ করা জরুরী?" জবাবে তিনি বললেন ঃ

مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلٰوةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلاً اَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى نَفَثَهُ -

যে লোক আমাদের সঙ্গে মিলে এই নামায পড়বে এবং এসব অবস্থান স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, সে আরাফা পেয়ে গেছে—তা রাতে হোক বা দিনে। তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তার ময়লা ঝেড়ে ফেলার কাজটি করে ফেলেছে।

নবী করীম (স)-এর এ কথাটি সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ ফরয হওয়ার পরিপন্থী। এর দুটি দিক। একটি—নবী করীম (স) তাঁর হজ্জ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যায়ে জরুরী খবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ শামিল নয়। আর দ্বিতীয়—তা যদি ফরয হতো তা হলে প্রশ্নকারীর জবাবে সে কথা অবশ্যই বলে দেয়া হতো। কেননা প্রশ্নকারী যে জানে না, তা তো তাঁর জানা-ই ছিল।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, তওয়াফে যিয়ারত তো ফরয; কিন্তু উক্ত বিবরণে তারও উল্লেখ করা হয়নি কেন ?

জবাবে বলা যাবে, শব্দের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তা-ই উচিত ছিল। আমরা তো দলীলের ভিত্তিতেই প্রমাণ করেছি যে, তা ফরয।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, তা সুন্নাতও নয়। নফলই হবে সম্ভবত। যেমন আনাস ও ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলা যাবে, হ্যাঁ বাহ্যিক শব্দের দিক দিয়ে তা-ই জরুরী ছিল, সন্দেহ নেই। আমরা অবশ্য দলীলের ভিত্তিতে তাকে হজ্জের অনুসঙ্গ হিসেবে সুন্নাত প্রমাণ করেছি। তার ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে এই দলীল দেয়া হয় যে, আল্লাহ্র কিতাবে হজ্জের ফরয হওয়ার বিষয়টি মোটামুটি অ-বিস্তারিত বলা হয়েছে। কেননা অভিধানে 'হজ্জ' অর্থ, اَلْقَصْدُ। ইচ্ছা করা, সংকল্প গ্রহণ করা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় তার অন্যান্য কয়েকটি অর্থ হতে পারে। অভিধানে তার জন্যে কোন নাম স্থিরকৃত ছিল না। এই কথা অস্পষ্ট—অ-বিস্তারিত। তা বিস্তারিত করে বলা আবশ্যক। নবী করীম (স)-এর কাজ হিসেবে যা যা বর্ণিত হয়েছে তা-ই তার বিস্তারিত বিবরণ। আর তা থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) নিজেই যেহেতু পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেছেন, এ কারণেই তা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তার মুস্তাহাব হওয়ার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা ওয়াজিব-ই থাকবে।

অন্য দিকে দিয়ে দেখা যায়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ -

তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জ কুরবানী সংক্রান্ত কার্যাবলীর নিয়ম-কানুন জেনে নাও।

এ একটি আদেশ। এতে রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণ ওয়াজিব প্রমাণিত হয় হজ্জের যাবতীয় কাজ-কর্মে। অতএব সাঈর ব্যাপারেও তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।

তারিক ইবনে শিহাব আবূ মূসা আল-আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থি হলাম। তিনি তখন বতহায় অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কিভাবে আত্মসমর্পণ করলে? বললাম, যেভাবে নবী করীম (স) করেছেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই করেছি। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভালোই করেছ। তুমি কাবা ঘরের তওয়াফ কর, দৌড়াও সাফা-মারওয়ার মাঝে। তার পরে হালাল হয়ে যাও।

এ হাদীসে রাসূলে করীম (স) সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে আদেশ করেছেন। আর এই আদেশের কারণে তা করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস এসেছে, কিন্তু তার সনদ ও মতন আউলানো مضطر বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। তা মা'মার ওয়াসিল মূসা ইবনে আবূ উবায়দ-সফিয়া বিনতে শাইবা সূত্রে বর্ণিত। তা হচ্ছে, জনৈক মহিলা নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে বলতে শুনেছেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا। 'তোমাদের প্রতি সাঈ ফরয করে দেয়া হয়েছে, অতএব তোমরা সেখানে দৌড়াও।' এ হাদীসে বলা হয়েছে, মহিলা নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে এ কথা বলতে শুনেছেন। কিন্তু সে মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাহ্ইয়াসান আতা ইবনে আবূ রিবাহ সাফিয়া বিনতে শাইবা হাবীবা বিনতে আবূ তাজ যায়াতা নামের জনৈক মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ হুসায়নের নিকট উপস্থিত হলাম। আমার সঙ্গে কুরাই গোত্রে কয়েকজন মহিলা ছিলেন। তখন নবী করীম (স) কা'বা ঘরের তওয়াফ করছিলেন। তখন তাঁর পরিধেয় কাপড় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলছিলেন ঃ

اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ -

তোমরা সকলে সাঈ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সাঈ করাকে লিখে দিয়েছেন (ফরয করেছেন)।

এ হাদীসে নবী করীম (স) এই কথাটি বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তিনি নিজে সেই সাঈর কাজে রত ছিলেন। বাহ্যত মনে হয়, এই সাঈ বলতে কাবার তওয়াফে সাঈ অর্থাৎ 'রমল' ও তওয়াফ—উভয়ই বুঝিয়েছেন। কেননা চলার কাজটিও সাঈ নামে অভিহিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -

তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র যিকির-এর দিকে চলে যাও।

দ্রুত চলা এর বক্তব্য নয়। বরং মসজিদে নামাযের জন্যে পৌছার আদেশ হয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসটিতে নবী করীম (স) সাঈ করতে বলেছেন যখন, তখন তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কাজে লিপ্ত ছিলেন। একথা দ্বারা তিনি যে সাফা-মারওয়ার মাঝের সাঈর কথাই বলেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। কেননা ঐ সময়ও কাবা ঘরের তওয়াফ ও তাতে রমল করার কথা বলতে পারেন। এই 'রমল'ই হল সাঈ—দ্রুত চলা।

বাহ্যত তা যে কোন সাঈ হতে পারে। কাবার তওয়াফকালে যে 'রমল' করা হয়, তা-ও সাঈ। একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব—তার কোন প্রমাণ নেই। অতএব পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ সাঈ করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। কেননা তা এমন সুন্নাত, যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়—আর যদি কেউ তা না করে, তাহলে একটি জন্তু যবেহ করা তার ক্ষতি পূরণকারী হবে না, তারও কোন প্রমাণ নেই। বরং দলীল তো এই পাওয়া গেছে যে, সে সাঈ করা না হলে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পশু যবেহ করতে হবে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসা পর্যন্তকার সময়ের মধ্যে। ইহরাম বাঁধার পরবর্তী যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে 'হালাল' হয়ে যাওয়ার পরও সাঈ করা জায়েয, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। যেমন 'রমি' (পাথর নিক্ষপণ) করা সহীহ্। সফর-তওয়াফ করাও যেতে পারে। অতএব সাঈ না করে থাকলে পশু যবেহ্ করবে তার বিকল্প হিসেবে।

যদি বলা হয়, 'হালাল' হওয়ার পরও যিয়ারত, তওয়াফ করা যায়; কিন্তু পশু যবেহ করা তার বিকল্প হয় না কেন?

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা যিয়ারত তওয়াফ না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকা ওয়াজিব। তওয়াফ করা হয়ে গেলে সবকিছু তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সাঈ না করা হলেও ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায়ই থাকতে হবে—এমন কোন কথা নেই। যেমন 'রমি' ও তওয়াফে সদর।

যদি কেউ বলে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যিয়ারত তওয়াফ করা হলেই স্ত্রী ব্যবহার হালাল হয়ে যায় না। সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা পর্যন্ত তা হারাম থাকবে।

এর জবাবে বলা যাবে, প্রাথমিক যুগের তাবেয়ী এবং তাঁদের পরবর্তী বুযুর্গ ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাবা ঘরের তওয়াফ হয়ে গেলেই স্ত্রী গ্রহণ হালাল হতে পারে। কেননা তারা মস্তক মুণ্ডনের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে তিনটি কথায় বিভক্ত। কিছু লোক বলেছেন, কাবা ঘরের তওয়াফ না হওয়া পর্যন্ত ভালো পোশাক পরা, শিকার করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম থাকবে। উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ ও সুগন্ধির ব্যবহার হারাম থাকবে। ইবনে উমর প্রমুখ বলেছেন, তওয়াফ না করা পর্যন্ত শুধু স্ত্রী ব্যবহার হারাম থাকবে। প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধু কাবা ঘরের তওয়াফ হলেই স্ত্রী হালাল হবে। সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ ছাড়া-ই। কেননা এ সাঈ তো কাবার তওয়াফের আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবেই করা হয়। কেননা যার জন্যে তওয়াফ ফরয নয়, তার সাঈ করাও জরুরী নয়। পাহাড়দ্বয়ের মধ্যকার সাঈ নফল হয় না, যেমন 'রমি' নফল হয় না স্বতন্ত্রভাবে। এতে প্রমাণিত হল যে, এ কাজ হজ্জ ও উমরার আনুসঙ্গিক, স্বতন্ত্রভাবে এর কোন একটা কাজও করা হয় না।

যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, আরাফায় অবস্থান তো ইহঁরাম বাঁধার পরই গ্রহণ করা হয় আর তওয়াফে যিয়ারত করা হয় আরাফায় অবস্থান গ্রহণ শেষ হলে, সেখান থেকে ফিরে আসার পর এ দুটিই হজ্জের মধ্যে শামিল ফরয।

এর জবাবে বলা যাবে, আমরা তো বলেছি, এ সব কাজ হজ্জের অনুসঙ্গ। অতএব তা করা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। আমরা বলেছি এ সব কাজ হজ্জের ও উমরার আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবেই আঞ্জাম দিতে হবে। ওগুলো অনুসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরয নয়। তবে আরাফায় অবস্থান অপর কোন কাজের অধীন হিসেবে করা হয় না। করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অনুষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু সেজন্যে দুটি শর্ত রয়েছে। একটি ইহরাম আর দ্বিতীয়টি সময়। অতএব তা কোন কিছুর অনুসঙ্গ হিসেবে যে করা হয়, তার কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপভাবে তা একটা নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গত, অন্য সময়ে নয়। তাতেও প্রমাণিত হয় না যে, তা অপর কোন ফরয কাজে অনুসঙ্গ বা অধীন হিসেবে করা হয়। যিয়ারত তওয়াফ-এর বৈধতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আরাফায় অবস্থান বৈধ হওয়ার সম্পর্ক ইহরাম ও সময়ের সাথে। কিন্তু তার সহীহ্ হওয়ার অপর কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তবে ইহরামের কথা আলাদা। তবুও তা অপর কোন কাজের অধীন নয়। কিন্তু সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ কাজটি তার সময় উপস্থিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা নির্ভরশীল অপর একটি কাজ হওয়ার উপর, যা তা থেকে ভিন্নতর। আর তা হচ্ছে তওয়াফ। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা হজ্জ ও উমরার অনুসঙ্গ। তা নিজস্বভাবে ফরয নয়। তাই তা তওয়াফে সদর সদৃশ হল। কেননা তার সহীহ্ হওয়া নির্ভর করে যিয়ারত তওয়াফের উপর। যা হজ্জের অনুসঙ্গ, তা না করা হলে পশু যবেহ করাই তার স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প কাজ হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।' বোঝা গেল, এই পর্বতদ্বয়ের মাঝের সাঈ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা شعائ বা شعار হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীর নিদর্শন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এই শব্দটি اَلاشْعَارُ থেকে, এর অর্থ لاعلام। জানিয়ে দেয়া شَعَرْتُ بِكَذَا وَكَذَا বলা হয়। এর অর্থ আমি তা জানতে পেরেছি, তার অনুভূতি লাভ করেছি। তা জানতে পেরেছি। এ থেকেই বলা হয় ঃ اشْعَارُ الْبُدْنَةِ। অর্থাৎ ছাগলকে নৈকট্য লাভের জন্যে যবেহ করা। যুদ্ধের আলামতকেও شعار বলা হয়। তদ্দারা পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়। অতএব شَعَائِر হচ্ছে নৈকট্যের নিদর্শন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ –

যে লোক আল্লাহ্র নিদর্শনাদিকে বড় করে তুললো, তাদের এই হৃদয়সমূহের তাকওয়ার পরিচায়ক।

হজ্জের شعائر হচ্ছে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি। المشعر الحرام। এ থেকেই বানানো হয়েছে। আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, পর্বতদ্বয়ের মাঝের সাঈ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তারপর, তাঁর কথা ঃ 'সে দুটির তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।' হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ বলেছেন, এ কথাটি জবাবের স্থানে এসেছে। একটি জিজ্ঞাসার। তাতে এই পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এই সাঈকে

ওয়াজিব মনে করা ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী নয়। যদিও প্রত্যক্ষভাবে সেই কথাই বলে না। আয়াতটি ছাড়া অন্য দলীল দ্বারা কিন্তু তা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। সে দলীলের উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি।

উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়ানোর ব্যাপারে মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বিভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া গেছে। আমাদের হানাফী মাযহাবে এই 'দ্রুত দৌড়ানো' মসনুন অর্থাৎ সুন্নাত। তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন তওয়াফে 'রমল' করা। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তার পিতা-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যে মুহূর্তে তাঁর দুই পা এই উপত্যকায় রাখলেন, অমনি দৌড়াতে লাগলেন এবং দৌড়ানো অবস্থায়ই তা অতিক্রম করে গেলেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সাদকা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে 'রমল' করতে দেখেছেন ? বললেন, হ্যাঁ, তিনি লোকদের পরিবেষ্টনে ছিলেন। তখন সকলেই 'রমল' করলেন। তাঁদের সকলকে 'রমল' করা ছাড়া আর তো কিছু করতে দেখিনি। নাফে বলেছেন, ইবনে উমর উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়াচ্ছিলেন। মসরুক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়েছেন। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যার ইচ্ছা মক্কার প্রবাহের স্থানে সাঈ করবে আর যার ইচ্ছা হবে না সে সাঈ করবে না। এ কথা বলে তিনি উপত্যকা গর্ভে 'রমল' করাই বুঝিয়েছেন সাঈদ ইবনে যুবায়র বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমরকে সাফা ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে চলতে দেখেছি। বলেছেন, তুমি যদি ধীরে চলতে চাও, তা পার। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-কে ধীরে চলতে দেখেছি। আর যদি দ্রুত দৌড়াতে চাও, তবে তাও পার। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-কে দ্রুত দৌড়াতেও দেখেছি। আমর আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) সাফা-মারওয়ার মাঝে মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি দেখাবার জন্যে দৌড়িয়েছেন। পরে আমি ইবনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম (স) উপত্যকাগর্ভে দৌড়িয়েছেন। যে কারণে তিনি তা করেছিলেন, তারও উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে নিজেদের দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা ও শক্তি মুশরিকদেরকে দেখানো। তাঁর কাজটি এই কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও তা সুন্নাত হতে কোন বাঁধা নেই। যদিও সে কারণ এখন আর অবশিষ্ট নেই। তওয়াফে 'রমল' করা পর্যায়েও আমরা এ কথাই ইতিপূর্বে বলেছি। এরও উল্লেখ করেছি যে, জম্‌রায় প্রস্তর নিক্ষেপের কারণ ছিল—ইবরাহীম (আ) ইবলীসের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন, যনযন মেনাতে ইবলীস তাঁর পথে বাধা দিতে এসেছিল। পরে সেটাই সুন্নাত হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে উপত্যকা গর্ভে 'রমল' করার কারণ ছিল, হাজেরা যখন তাঁর পুত্র ইসমাঈলের জন্যে পানির সন্ধান করেছিলেন এবং সেজন্যে তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে বারবার উঠা-নামা করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকা গর্ভে নেমে আসতেন, তখন বাচ্চাকে তিনি দেখতে পেতেন না বলে খুব দ্রুত দৌড়িয়ে পর্বতের উপরে উঠে যেতেন। আবুত তুফায়ল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

ইবরাহীম (আ) যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি জানতে পেরেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করছিলেন, তখন এই সাঈর স্থানে শয়তান তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে ইবরাহীম (আ) দ্রুত দৌড়িয়ে শয়তানকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এখানে দ্রুত দৌড়ানোর এ-ই ছিল ঐতিহাসিক কারণ। এখানে তা সুন্নাত। এর দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। যেমন আমরা বলেছি, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর ক্ষেত্রে উপত্যকা-গর্ভে 'রমল' করার ব্যাপারটি মুসলিম উম্মতের নিকট একটি ঐতিহ্যের ব্যাপার। মুখের কথা ও বাস্তব কাজের মাধ্যমে তা বংশানুক্রমিকভাবে চলে এসেছে। নবী করীম (স) নিজেও এই কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতের কোন অবকাশ নেই। যা কিছু মতপার্থক্য তা শুধু তার সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে—যা পরবর্তীতে হয়েছে। কার্যত তার এ অব্যাহতভাবে চলে আসা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা এখনও চালু রয়েছে এবং থাকবে, এ পর্যায়ের দলীলাদি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আরোহী অবস্থায় তওয়াফ

আবূ বকর বলেছেন, আরোহী থাকা অবস্থায় তওয়াফ করা পর্যায়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তা জায়েয মনে করেন নি। তবে ওযরের দরুন হলে ভিন্ন কথা। আবুত তুফায়ল বলেছেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ আপনার জনগণ মনে করেন, সাফা-মারওয়ার মধ্যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করা সুন্নাত এবং রাসূলে করীম (স) নিজে তা করেছেন। তখন ইবনে আব্বাস বলেছেন, হ্যাঁ, তাঁরা যা বলেছেন, তা সত্যও যেমন, তেমনি মিথ্যাও। রাসূলে করীম (স) তা করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন এমন যে, তাঁকে কেউ ধরে চালাতে পারত না। কিন্তু তা সুন্নাত নয়। উরওয়া ইবনুয যুবায়র জয়নব বিনতে আবূ সালমা উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমি তো অসুস্থ, তওয়াফ করব কিভাবে? রাসূলে করীম (স) বললেন, লোকদের ছাড়িয়ে জন্তুযানে সওয়ার হয়ে তুমি তওয়াফ করবে। অথচ উরওয়া যখন লোকদেরকে জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করতে দেখতেন,তখন তাদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। তখন লোকেরা রোগাক্রান্ত হওয়ার বাহানা করত। তা শুনে তিনি বলতেন, ওরা ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইবনে আবূ মুলাইকা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—সাফা-মারওয়ায় সাঈ করতে হয়; কিন্তু তা সওয়ার হয়ে করা আমি অপছন্দ করি। হজ্জ ও উমরা করা থেকে এ জিনিসই আমাকে বিরত রেখেছে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ ইকরামার সূত্রে ইবনে আব্বাসের এই কথাটি বর্ণনা করেছেন—নবী করীম (স) অসুস্থ অবস্থায় আসলেন এবং তাঁর উটের উপর সওয়ার হয়েই তওয়াফ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহজন। তিনি যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌছতেন, তাকে চুম্বন করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তওয়াফ শেষ করলেন, তখন উটটিকে বসিয়ে নেমে পড়লেন এবং দু রাক'আত নামায পড়লেন। উপত্যকা-গর্ভে দৌড়ানো সাফা-মারওয়ার তওয়াফের সুন্নাত—যেমন পূর্বে বিস্তারিত বলেছি—একথা যখন প্রমাণিত,

আরোহী ব্যক্তি তো সেই সাঈ নিজে করে না, তখন তার এই কাজ সুন্নাত পরিপন্থী, তবে মাযুর অক্ষম হলে অন্য কথা। রাসূলে করীম (স) থেকে তা-ই প্রমাণিত এবং সাহাবাগণ তা জায়েয মনে করতেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন এই হাদীস, যাতে নবী করীম (স)-এর হজ্জের উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে কাবা ঘরের তওয়াফের কথাও বক্তব্যে এসেছে দুই রাক'আত নামাযের পর। পরে মক্কার দিকে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কাবাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তখন বললেন ঃ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ আল্লাহ্ প্রথমেই যে পর্বতটির উল্লেখ করেছেন, আমরা এই সাঈ সেখান থেকেই শুরু করছি। তবে আয়াতের শব্দে এই পরম্পরা রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা আয়াত থেকে যদি তা-ই বোঝা যেত, তাহলে রাসূলে করীম (স) উক্ত কথা বলতেন না। সাফা থেকে তওয়াফ শুরু করা হয়েছে মারওয়ার পূর্বে। তার মূলে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি রয়েছে ঃ আমরা শুরু করছি সেই পাহাড় থেকে যার কথা বলে আল্লাহ্ কথা শুরু করেছেন। আমরাও রাসূলের অনুসরণে তাই করব। কেননা রাসূলই বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাবলীর কথা আমার কাছ থেকে জেনে নাও।' তবে 'সাফা 'থেকে শুরু করাই যে সুন্নাত, মারওয়া পরে, তাতে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তিনিই যদি সাফার পূর্বে মারওয়া থেকেই শুরু করতেনও, তবু হানাফী মাযহাবের মশহুর বর্ণনায় তা গণ্য হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মারওয়া' থেকে শুরু করা সাঈর সে 'বার' পুনরায় চলতে হবে। যদি তা না করে, তাহলে তার উপর কিছুই দায়িত্ব হবে না। তখন এই কাজটি শুরু এ পর্যায়ে গণ্য হবে যে, অযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার পরম্পরা ভঙ্গ হয়েছে মাত্র।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا 'আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ-উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে,' সাফা-মারওয়ার তওয়াফের উল্লেখের পরপরই এই কথার উল্লেখ। যে লোক উক্ত তওয়াফকে নফল মনে করে, সে এই কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে তা এজন্যে যে, পূর্বে যে পর্বতদ্বয়ের তওয়াফের কথা বলা হয়েছে, এ কথাটি তারই সাথে সম্পর্কিত। সেই সাথে একথাও জানা আছে যে, যারা হজ্জ ও উমরায় পর্বতদ্বয়ের মাঝে তওয়াফ করাকে ওয়াজিব মনে করেন তাদের নিকট তা নফল হিসেবে করা হয় না। আর হজ্জ ও উমরা ছাড়া অন্যত্র যারা তা করা দরকার মনে করে না, তাদের নিকট এই যে ব্যক্তি নিজ-ইচ্ছা-আগ্রহ-উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করে, কথাটিকে সংবাদ দান পর্যায়ে গণ্য করে, মনে করে, হজ্জ ও উমরায় তা 'নফল' হিসেবেই করা হয়। কেননা ও দুটির প্রসঙ্গ ছাড়া সে কাজ না নফল হিসেবে করার কোন সুযোগ আছে, না অন্য কোন ভাবে। কিন্তু এ কথাটুকুতে তাদের এসব কথার কোন দলীল নেই। কেননা এটা সঙ্গত যে, এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে ঃ যে লোক হজ্জ ও উমরা নফল হিসেবে আদায় করবে। কেননা পূর্বের শুরু কথায় তার-ই উল্লেখ হয়েছে ঃ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ আল্লাহ্র এই কথায়।

'ইলম' গোপন রাখা নিষিদ্ধ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى –

যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন-বিধান গোপন করে রাখবে .....

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا –

যারা আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তদ্দ্বারা সামান্য মূল্য ক্রয় করে ......

বলেছেন ঃ

وَاِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ –

স্মরণ কর, আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা তা অবশ্যই বয়ান ও প্রকাশ করবে এবং তা তোমরা গোপন করবে না।...

এই সব কয়টি আয়াতই দ্বীনী ইল্ম প্রকাশ করা—ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ও লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়াকে একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষণা করে এবং তা গোপন করতে প্রবলভাবে নিষেধ করে। আর যেসব বিষয়ের উপর অকাট্য দলীল এসেছে, অকাট্য দলীল যা যা নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে অনিবার্যভাবে, তা-ও অবশ্যই বয়ান ও প্রকাশ করতে হবে, তা গোপন করে রাখা পরিহার করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর নাযিল করা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও হেদায়েতের বিধান গোপন করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তাঁর এই ঘোষণায় সেইসব আইন-বিধানই শামিল, যা স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত এবং যা সেসব দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত। কেননা আয়াতের শব্দ الهدى। এই সবকেই শামিল করে। আল্লাহ্র কথা ঃ

يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ –

গোপন করে আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব।

প্রমাণ করে যে, যা অকাট্য স্পষ্ট দলীল থেকে জানা গেছে এবং যা সেই দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ্র কিতাবে আল্লাহ্র হুকুম-আহকামের দলীল রয়েছে যেমন, তেমনি সেই কিতাবে বলা হয়েছে ঃ 'হে নবী, তুমি তো লোকদের নিকট প্রকাশ করবে, তা গোপন করবে না।' এই উভয় বিষয়

পরিব্যাপ্ত এই নির্দেশ। রাসূলে করীম (স)-এর সংবাদদানের মাধ্যমে যা জানা গেছে, তা-ও এরই মধ্যে গণ্য। নবী করীম (স) থেকে 'খবরে ওয়াহিদ'—এক ব্যক্তির দেয়া খবরও কবুল করার পক্ষের প্রমাণ এ কিতাবেই রয়েছে। অতএব কিতাবের যা দাবি, অকাট্য দলীলভিত্তিক যে কথা, যা তার দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত, উক্ত আয়াত সে সবকেই আওতাধীন করে। এ কারণে আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে এই আয়াতটি না থাকলে আমি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতাম না। এ কথা বলে তিনি উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত করলেন। তিনি জানালেন যে, রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস আল্লাহ্র নাযিল করা 'বাইয়্যেনাত' ও 'আল হুদা'—অতএব তা গোপন করা যায় না। শুবাহ্ কাতাদাহ্ থেকে 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আহ্লি কিতাব লোকদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন'...... এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, এ একটি চুক্তি। আল্লাহ্ আহ্লি ইলমদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছে। তাই যে কোন ইল্ম পাবে, তার উচিত তা অন্যদেরকে জানানো। ইল্ম গোপন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা গোপন করা ধ্বংসাত্মক। 'ইল্ম' বয়ান করার পর্যায়ে এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যাচ্ছে না দ্বীনী ইল্মে পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, যেন তারা তাদের জনগণের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবে ?.... সম্ভবত এর ফলে তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

হাজ্জাজ আতা আবূ হুরায়রা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে এ হাদীটি বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

যে লোক কোন প্রকারের ইলমই—যা সে জানে—গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে আগুনের লাগাম পরা অবস্থায় উঠে আসবে।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইয়াহূদীদের কিতাবে রাসূলে করীম (স)-এর যে পরিচিতি ও গুণ-সিফাত উল্লেখিত রয়েছে, তা তারা গোপন করে রেখেছিল, প্রকাশ করে নি, প্রকাশ হতে দেয়নি।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি যে কারণে নাযিল হয়েছে, তা সাধারণ ব্যাপক ভিত্তিক কারণ এবং সব কিছু তাতে শামিল মনে করার পথে কোন প্রতিবন্ধক নেই। কেননা আমাদের মতে 'হুকুম' শব্দ থেকে পাওয়া যায়, কারণ থেকে নয়। তবে কেবল কারণের উপর ভিত্তিকতার দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। এ আয়াতকেই দলীল হিসেবে পেশ করা হয় দ্বীনি ব্যাপারাদি পর্যায়ে সংবাদদাতার ইল্ম দেয়া ওয়াজিব হওয়া থেকেও কম

মাত্রায় খবর গ্রহণের জন্যে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব গোপন করে এবং আহ্‌লে কিতাব লোকদের নিকট থেকে যখন চুক্তি নেয়া হয়েছিল ..... এ দুটিই ইলম গোপন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে এবং প্রকাশের মাধ্যমে তার বয়ান সজ্ঘটিত করতে আদেশ করে। এমতাবস্থায় শ্রোতাদের পক্ষে তা কবুল করা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে এ বিষয়ের সংবাদদাতা আল্লাহ্‌র হুকুম প্রকাশকারী হতে পারে না। কেননা হুকুম যদি ওয়াজিব না হয় তা হলে তাঁর বয়ান করে প্রকাশ করার হুকুমও থাকে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, গোপন করা থেকে নিষেধপ্রাপ্ত লোকেরা যা গোপন করেছিল তা যখনই প্রকাশ করবে, তখনই সেই সংবাদ অনুযায়ী আমল করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। উক্ত কথার ধারাবাহিকথায় বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا - (البقره : ١٦٠)

তবে যারা তওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিয়েছে ....।

সংবাদ দেয়ার ফলে যে ইল্‌ম লাভ হল তা বাস্তবায়িত করার হুকুম দেয়া হয়েছে এ আয়াতে।

কেউ যদি বলেন, প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী আমল করার বাধ্যবাধকতা প্রমাণের কোন দলীল এ কথাটিতে নেই। এটা সঙ্গত যে, তাদের প্রত্যেকেই গোপন করা থেকে নিষেধ প্রাপ্ত এবং বয়ান ও প্রকাশকরণের আদেশপ্রাপ্ত। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদদাতাদের সংখ্যা যেন বিপুল হয় এবং সংবাদসমূহ যেন নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক-অব্যাহত সূত্রে এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত পৌছে যায়।

এর জবাবে তাকে বলা যাবে, এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা তাদেরকে গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে শুধু এজন্যে যে, তাদের জন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর গোপন করার ব্যাপারে যাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করা সম্ভব তাদেরই পারস্পরিক সহযোগিতা হওয়া সম্ভব তা লোকদের নিকট পৌছানোর ব্যাপারেও। তখন তাদের দেয়া খবর ইলম লাভের কারণ হবে না। এ কারণে ইল্‌ম আবশ্যকীয় বানানোর স্তর থেকে নিম্নমানের খবর কবুল করার পক্ষে সাহাবীগণের বহু কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তুমি যে কথার দাবি তুলছ, তা প্রমাণের অকাট্য কোন দলীল নেই। অতএব আয়াতসমূহের বাহ্য প্রকাশে যে জ্ঞান হয়, তার আদেশটা পালন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুম বয়ান ও প্রকাশ সজ্ঘটিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে অপর একটি হুকুম রয়েছে, এ আয়াত যেমন ইলম প্রকাশ করার ও গোপন না রাখার বাধ্যবাধকতার দলীল, তেমনি ইলম প্রকাশের কাজে মজুরী গ্রহণ জায়েয না হওয়ারও দলীল। কেননা যে কাজ করা একজন লোকের নিজের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত সে কাজ করে কোন মজুরী বা পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার থাকতে পারে না। তা গ্রহণ বৈধও হতে পারে না। ঠিক যেমন দ্বীন-ইসলাম কবুল করার কোন মজুরী কোন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি পেতে পারে না। বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম

(স)-কে বলল ঃ আমি আমার লোকদেরকে একশটি ছাগল দিয়েছি, যেন তারা ইসলাম কবুল করে। একথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, তুমি ছাগলগুলো নিজের নিকট ফিরিয়ে নাও। এরপর তারা যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 'যারা আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে' আল্লাহ্র এই কথাটি অন্য দিক দিয়ে দ্বীন প্রচারের কাজে বা তা গোপন করে মজুরী গ্রহণ উভয়কেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে কথাটি বিনিময় সর্বদিক দিয়েই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অভিধানে ثمن অর্থ, বিনিময়—বদল।

এ থেকে প্রমাণিত হল, কুরআন ও দ্বীনি সব ইল্ম শিক্ষাদানের শ্রমে মজুরী গ্রহণ সম্পূর্ণ বাতিল, নাজায়েয। আর 'তবে যারা তওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে এবং গোপন করা ইলম বয়ান ও প্রকাশ করা শুদ্ধ করেছে' কথাটি প্রমাণ করে যে, গোপন করা থেকে তওবা হবে তা প্রকাশ ও বয়ান করার কাজের মাধ্যমে। গোপন করার অপরাধের জন্যে শুধু লজ্জিত হওয়া বা অনুতপ্ত হওয়া তওবার জন্যে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়।

কাফিরদের উপর অভিসম্পাত

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

যারা কুফ্রী পথে চলেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরে গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ এবং মানুষ—এই সকলেরই অভিশাপ।

আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, যারা কাফির অবস্থায় মরে গেছে, তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ মুসলমানদের কর্তব্য।[১] মরে গেলে দ্বীন পালনের কোন দায়িত্ব থাকে না—একথা সত্য হলেও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ এবং তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়ার ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ সমস্ত মানুষ আমাদের প্রতি এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় যে, কাফিরদের মৃত্যুর পরও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে হবে। এ আয়াত এ কথাও প্রমাণ করে যে, কাফির যদি পাগলও হয়ে যায় তবু দ্বীন পালনের দায়িত্ব তখন না থাকলেও তার এই পাগলামী তার উপর অভিশাপ বর্ষণ থেকে মুক্তি দেবে না। তার সাথে নিঃসম্পর্কতাও নিঃশেষ হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে ঈমানের দিক দিয়ে প্রশংসা, বন্ধুত্ব ও কল্যাণ কামনা ওয়াজিব হওয়ার পথ-ও তাই, অর্থাৎ যে লোক ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে, এগুলো তার জন্যে। কেউ পাগল হয়ে গেলে এই দুর্ঘটনার পূর্বের কাজ কর্মের আলোকেই তার বিচার-বিবেচনা হবে।

---

১. গ্রন্থকারের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, যে লোক কাফির অবস্থায় মরে গেছে বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে, সে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। তার উপর অবশ্যই লা'নত বর্ষণ করতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও বাহ্যত কথা থেকে তাই মনে হয়।—অনুবাদক

যদি বলা হয়, আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, লোকেরা কাফিরদেরকে অভিশাপ দেবে কিয়ামতের দিন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا –

অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোককে অস্বীকার (বা কাফির বলে অভিহিত) করবে এবং তোমাদের কতক লোক অপর কতকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে।

জবাবে বলা যাবে, 'কেবল কিয়ামতের দিন অভিশাপ করা হবে' বলার কোন দলীল নেই। এটা বিনা দলীলের কথা। আয়াত অনুযায়ী কাফিররা এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত, তেমনি জনগণের অভিশাপও। যে লোক ধারণা করে যে, মানুষ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে সে বিষয়ে আল্লাহ খবর দিয়েছেন। এই কারণে তার ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আসলে ব্যাপার তা নয়। বরং এ খবর দানটা হচ্ছে লোকদের অভিশাপ পাওয়ার জন্যে তাদের উপযুক্ত হওয়ার। তারা কার্যত অভিশাপ বর্ষণ করুক আর না-ই করুক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ "اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ" 'তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন ইলাহ'। আল্লাহ নিজেই তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এ আয়াতাংশে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এক ও একক। ব্যবহৃত শব্দ এই তাৎপর্য উপস্থাপিত করছে যে, তিনি এক ও একক, তার দৃষ্টান্ত কিছু নেই। তাঁর সদৃশও কেউ নেই। তাঁর সমান কেউ নেই কোন একটি দিক দিয়েও। এই কারণে তিনি এক ও একক, এই গুণে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। অন্য কারোরই এ গুণ নেই, এ গুণ পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। এই দিক দিয়ে তিনি একাই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। তাঁকে ইলাহ-উলুহিয়াত-এর গুণে ভূষিত করাই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ-ই শরীক হতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি এক ও একক সর্ব দিক দিয়ে, সর্বতোভাবে। উলুহিয়াতকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা যাকে অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত করা যায় বা করা সঙ্গত বিবেচিত হয়, সে প্রকৃত পক্ষেই এক ও একক হতে পারে না।

তিনি সত্তার দিক দিয়েও এক। তিনি-ই সকলের আগে (যখন কেউ বা কিছু ছিল না, তখন তিনি ছিলেন)। তিনি অনাদি অনন্ত, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনাদি হওয়ার দিক দিয়ে। তিনি ছাড়া তার সঙ্গে কেউ ছিল না। আয়াতে তিনি নিজেই নিজের এসব গুণের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত সর্বদিক দিয়েই তিনি ইলাহ্ এক ও একক। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَلْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ....

নিঃসন্দেহে আসমান জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের আবর্তনে .....

এ আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের বহু কয়টি প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সদৃশ, তাঁর দৃষ্টান্ত কেউ নেই, কিছুই নয়। এ আয়াতের দলীলসমূহ পেশ করে আল্লাহ্‌র তওহীদ প্রমাণ করা আমাদের জন্যে কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা আয়াতের

শেষাংশে বলা হয়েছে لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ 'বিবেকবান লোকদের জন্যে বহু ও বিপুল নিদর্শন রয়েছে।' অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে দাঁড় করেছেন, যেন এসবকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচিতি ও তওহীদ স্পষ্ট করে তোলা হয়। আর তাঁর সদৃশ, সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই—একথা প্রচার করা হয়। যারা মনে করে, আল্লাহ্‌কে শুধু সংবাদের মাধ্যমেই চেনা যায়, আল্লাহ্‌কে চিনবার ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের কোন ভূমিকা নেই, তাদের কথার বাতুলতা ও অযৌক্তিকতাও উক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

আসমান-জমিন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তওহীদের অকাট্য প্রমাণ হয় এভাবে যে, আমাদের ঊর্ধ্বদেশে কোনরূপ স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়া আসমানের দাঁড়িয়ে ও টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কুদতে।তা যেমন বিরাট বিশাল, তেমনি বিস্তীর্ণ ও ভারী। অনন্তকাল ধরে তা ঊর্ধ্বে স্থায়ী ও অব্যাহতভাবে রয়েছে। জমিন অর্থাৎ পৃথিবী তো আমাদের পায়ের তলে অনন্তকাল ধরে রয়েছে। অথচ আমরা জানি, এর প্রত্যেকটিরই একটা শেষ আছে। একই সময় তা বর্তমান আছে বটে তবে তা বাড়তি কমতির সম্ভাব্যতাময়। আমরা এ-ও জানি যে, সমগ্র সৃষ্টিকুলও যদি একত্র হয়ে একটি প্রস্তর মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কোন স্তম্ভ ছাড়াই, তাহলে তা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঊর্ধ্বলোকে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটিকে ঊর্ধ্বে রক্ষাকারী একজন আছেন। তিনিই কোন স্তম্ভ ছাড়াই আসমান ঊর্ধ্বে রেখেছেন, তিনিই জমিনকেও রেখেছেন কোন ভিত্তি ছাড়া। আর এই যুক্তি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দ্বিতীয়—এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তিনি দেহ সদৃশ নন। তিনি মহাশক্তিমান, কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম বা পরাভূত করতে পারে না। কোন শরীরী জিনিসই তা করতে পারে না। এ যখন সত্য, তখন প্রমাণিত হল যে, তিনি দেহ উদ্ভাবন ও নবসৃষ্টির ক্ষমতাবান। কেননা দেহ ও অবয়বসমূহের সৃষ্টি ও উদ্ভাবন তার বিরাটত্ব সত্ত্বেও তাকে কায়েম রাখা অক্ষেপা অধিক দূরবর্তী কাজ নয়। তার ঘনত্ব কোন পাত্র বা ভিত্তি ছাড়াই গড়ে তোলা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। অপর দিক দিয়ে তা প্রমাণ করে, এই সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটিই নবতর সৃষ্টি। সে গুলোর পরস্পর বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার বৈধতা নিষিদ্ধ নয়। আর এসব জিনিসই নবতর সৃষ্টি। এক সময়ে এগুলো ছিল না, পরে অস্তিত্বমান হয়েছে। আর যা পূর্বে ছিল না এখন আছে, তা-ই নব সৃষ্টি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই সমগ্র বিশ্বলোক নবোদ্ভাবিত, নতুন সৃষ্টি। আর সে জন্যে স্রষ্টা অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন নির্মাণ কাজের জন্যে নির্মাতার প্রয়োজন। কোন লেখার জন্যে লেখকের প্রয়োজন। কোন প্রতিক্রিয়ার জন্যে ক্রিয়ার প্রয়োজন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই আসমান-জমিন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র (অস্তিত্ব ও তওহীদের) নিদর্শন। তার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

রাত্র ও দিনের আবর্তন—একটির পর অপরটির আগমন-নির্গমনও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও এককত্ব প্রমাণ করে। একটি যখন চোখের সম্মুখে অস্তিত্বমান, অপরটি তখন অপসৃত অনুপস্থিত। পূর্বটির অবসানে দ্বিতীয়টির বিস্তৃতি। এ কাজ একজন পরিচালকের প্রয়োজন

প্রমাণ করে। অতএব রাত্র-দিনের স্রষ্টা যিনি, তিনিই আল্লাহ কেননা আল্লাহ ছাড়া কেউ রাত্র আনতে পারে না, পারে না তার অবসান ঘটাতে। দিনের ব্যাপারও তাই। এই রাত্র দিন আল্লাহ্ সদৃশ নয়। এ দুটি তো আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনই স্রষ্টা সদৃশ হয় না। নির্মাতা হয় না নির্মিতের সদৃশ, লেখক হয় না তার লেখার সদৃশ। অপর দিক দিয়ে সৃষ্টি যদি স্রষ্টা সদৃশ হয়, তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির মতই নব-অস্তিত্বমান হয়ে পড়ে। তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির তুলনায় উত্তম হতে পারে না। তাহলে অবয়ব ও রাত্র দিনের স্রষ্টা যে সকলের পূর্ববর্তী, তা সত্যনিষ্ঠ হয় না। তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির মত নয়, একথাই সত্য। এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের উদ্ভাবক ও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এগুলোর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা ও উদ্ভাবন চিরঞ্জীব। কেননা চিরঞ্জীব স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা সৃষ্টিকর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা ও উদ্ভাবক সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। কেননা সুদৃঢ়, সুষ্ঠু, সুনিপুণ, সুসংবদ্ধ কোন কাজ তার দ্বারাই কার্যকর হতে পারে, যে সে বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানবান এবং জ্ঞানবান ছিলেন এ সবের অস্তিত্ব দানের পূর্বেই। অন্যথায় রাত্র-দিনের আবর্তন অব্যাহতভাবে ও একই নিয়মে কার্যকর হতে পারত না। বছর কালের পুরো সময় ধরে রাত্র দিন দৈর্ঘ্যে ও স্বল্পতায় বাড়তি ও কমতিতে একই অব্যাহত ধারায় হচ্ছে, তাতে কোনরূপ পার্থক্য কখনই হয় না। এ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, রাত্র-দিনের উদ্ভাবক বা স্রষ্টা তা করতে সক্ষম, সেই সাথে প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও পূর্ণ অধিকারী। অন্যথায় তাঁর দ্বারা এর কোন একটি কাজও সম্পন্ন হতে পারত না। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার কাজ সুষ্ঠু সুনিপূণ হতে পারত না।

নদী-সমুদ্রে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজও আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ। কেননা এটা জানা কথা যে, মৌল উপাদান পরস্পর মিলিত হলেই পানির ন্যায় তরল প্রবহমান জিনিস—যা নৌকা-জাহাজকে নিজের বুকের উপর ভাসিয়ে রাখতে পারে—অস্তিত্বশীল হতে পারে না। বাতাসের প্রবাহও অনুকূল হতে পারে না নৌকা-জাহাজের জন্যে। বাতাস প্রবহমান না হলে নৌকা-জাহাজ পানির উপর ভাসমান-স্থির অচল হয়ে পড়ে থাকত।[১] কোন একটা সৃষ্টির পক্ষেও চলাচল করা ও স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভবপর হতো না। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ.(الشورى : ٣٣)

আল্লাহ্ চাইলে তিনি বাতাসকে স্তব্ধ-নিশ্চল করে দেবেন। তখন তা তার পৃষ্ঠের উপর স্থির দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলাই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন নৌকা-জাহাজ বুকে ধারণের জন্যে, তিনিই সেই বাতাসকে তাঁর নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে চলমান করেন। এ ঘটনা আল্লাহ্র তওহীদ প্রমাণের অত্যন্ত বড় দলীল। তা প্রমাণ করে, তিনি যেমন অনাদি সর্বক্ষমতা সম্পন্ন, সর্ব

১. এটা যন্ত্রযুগের পূর্বে কথা। বোঝা যায়, তখনও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। যন্ত্রযুগে এ আয়াতের ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে দেয়া প্রয়োজন—অনুবাদক।

বিষয়ে জ্ঞানবান, চিরঞ্জীব, তেমনি এর কোন একটি দিক দিয়েও তাঁর সাথে কারোরই সাদৃশ্য নেই, সমকক্ষতা নেই। কেননা অবয়বসমূহ স্বতঃই এই কাজ করতে সক্ষম নয়। এজন্যেই আল্লাহ নিজে পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন তার বুকে নৌকা-জাহাজ বহন ও চলাচল করার জন্যে। বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাকে প্রবহমান বানাবার জন্যে, সৃষ্টিকুলের প্রতি সার্বিক কল্যাণ বহন করে নেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্যে, তাঁর নিয়ামতের বিরাটত্ব ও বিপুলতা প্রদর্শনের জন্যে। সৃষ্টিকুলকে এ বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা জানতে পারে যে, তাদের স্রষ্টা তাদের জন্যে এই তুলনাহীন নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন, যেন তারা তাঁর শোকর করে তাঁর এই নিয়ামত পেয়ে এবং শেষে মহাশান্তির ঘরে চিরন্তন সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র পানি বর্ষণ ব্যবস্থাও আল্লাহ্‌র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি জানে যে, পানির প্রকৃতিই হচ্ছে অবতরণ ও স্রোত প্রবাহ সৃষ্টি। পানি নিম্নদেশ থেকে উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হচ্ছে। তা সম্ভব হচ্ছে একজন কর্তার কীর্তি হিসেবে। কাজেই মেঘে পানির পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার অর্থ হয় তা নতুন সৃষ্টি, মেঘের মধ্যে নতুন করে পানি একত্র হয়েছে অথবা তা পানির পাত্র পৃথিবী ও তার সমুদ্রসমূহ থেকে উত্থিত হয়েছে। এর যেটাই হোক, একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্বেরই প্রমাণ করে। সে স্রষ্টা কোন কাজেই অক্ষম নন। পানি (বাষ্পাকারে) উর্ধ্বে তোলা এবং মেঘের মধ্যে তা অপ্রবাহিত অবস্থায় ধরে রাখা এবং যে সব স্থানে তার বর্ষণ ঘটানোর ইচ্ছা সেসব স্থানে বাতাসের সাহায্যে তা পৌঁছানো আল্লাহ্‌র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। এই কুদরত কেবল তাঁরই আছে। তিনিই মেঘকে পানি সম্বলিত এবং বাতাসকে পানির চালক বানিয়েছেন। তার ফলেই তা এক স্থান থেকে ভিন্নতর স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারছে। তার কল্যাণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া ও ব্যাপক করাই তার উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ -(السجده : ٢٧)

ওরা কি লক্ষ্য করে না, আমরাই পানি বন্ধ্যা জমিনের দিকে চালিয়ে নিই। পরে তার দ্বারা আমরা কৃষি ফসল উৎপাদন করি। তা-ই খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা নিজেরা।

মেঘ থেকে পানি বিন্দু বিন্দু করে বর্ষিত হয়। শূন্যলোকে একটি বিন্দু অপর বিন্দুর সাথে মিলেমিশে একত্রিত হয়ে যায় না। তা-ও এই বাতাসের গতিশীলতার কারণে। ফলে প্রত্যেকটি ফোঁটা তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পতিত হতে পারে। এই গোটা ব্যাপার যদি এক মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞানী মহা ব্যবস্থাপক দ্বারা ব্যবস্থিত ও পরিচালিত না হতো, তাহলে এ কাজটি এত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হতে পারত না। পানির বিপুলতা কি করে মেঘের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারত? এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতেই বড় বড় প্রবাহ

প্রবাহিত করা হচ্ছে, তার মধ্যে এই বিন্যাস ও শৃঙ্খলা কি করে আসত ? বিন্দুগুলো মহাশূন্যে একত্রিত হয়েও বরবাদ হয়ে যেত, কোন কাজে আসত না। হয়ত তা পৃথিবীর উপর পড়ে এমন বন্যাপ্রবাহের সৃষ্টি করত, যার মুখে সবকিছু ভেসে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত সব বাড়ি-ঘর, ফসল, বাগান। পৃথিবীর বুকে গাছ-পালা-পশু ইত্যাদি কোন কিছুই টিকে থাকতে পারত না। তখন আকাশের পানির পতনে সেই অবস্থারই সৃষ্টি হতো, যা আল্লাহ বলেছেন এ ভাষায় ঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ - (القمر : ١١)

অতঃপর আমরা আকাশমণ্ডলের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিলাম প্রচণ্ড বহমান পানির জন্যে।

তখন পানির প্রচণ্ড বর্ষণ হতো আকাশ থেকে, যেমন নদী সমুদ্র প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয় পৃথিবীর বুকে। তাই শূন্যে মেঘের সঞ্চার হওয়া, সেখানে পানিকে পুঞ্জীভূত করা ও তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র তওহীদের ও কুদরতেরই অকাট্য দলীল। তিনি দেহধারী নন, নন দেহ সদৃশ। কোন দেহ বা দেহধারীর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব নয়।

জমিনের মরে যাওয়ার পর তার পুনরুজ্জীবিত হওয়াও তওহীদেরই প্রমাণ। কেননা সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্রিত হয় এর কোন একটি জিনিসকে জীবিতকরণে, তবুও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। সম্ভব হবে না তাদের দ্বারা কোন বৃক্ষলতা উৎপাদন করা। আল্লাহ পানি দ্বারা মৃত জমিন পুনরুজ্জীবিত করেন, উৎপাদন করেন নানা প্রকারের গাছপালা গুলমলতা। অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এর কোন একটিও পূর্বে ছিল না। আমাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণও তাই যে, শূন্য ধূলি-ধুসরিত মাঠে ঘাস, উদ্ভিদ, গাছপালা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, তা এক মহাশিল্পীরই শৈল্পিক অবদান, চাকচিক্যময় কারুকার্য এক মহান কারিগরের। যিনি মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞানী, তিনি অংশসমূহের পারস্পরিক সংযোজন এবং চূড়ান্ত মাত্রার সুসংবদ্ধতা সম্পন্নকরণ এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, যিনি সবকিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি এক ও একক। এটা প্রকৃতির নিজস্ব কোন কীর্তি নয়। নাস্তিকদের ধারণা বিশ্বাস একেবারেই ভিত্তিহীন। আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অভিন্ন প্রকৃতির। জমি ও বাতাসের মধ্যেও সেই অভিন্নতা অথচ তার দরুন জমিনে উদ্ভূত গাছপালা, ফুল-ফল ও ফসল, বৃক্ষলতা বিচিত্র রঙে, বর্ণে, আকারে, স্বাদে। তা প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মের ফলশ্রুতি হলে তাতে এই বৈচিত্র্য দেখা দেয়া অসম্ভব হতো। কেননা সেজন্যে কারণও এক ও অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কেননা এক ও অভিন্ন কারণ বিভিন্ন জিনিসের উদ্ভাবক হতে পারে না। প্রমাণিত হল যে, এই সবকিছু এক মহাবিজ্ঞানী কারিগরের কীর্তি। তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরিমিত করেছেন, যদিও তা বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের এবং এ সবকিছুই আল্লাহ্‌র বান্দাগণের রিযিক এবং সেই সাথে এ সবই তাঁর শিল্পনৈপূণ্য ও নিয়ামতের নিদর্শন।

পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা জীব-জন্তু প্রাণীও আল্লাহ্রই তওহীদের প্রমাণ। প্রকার-বৈচিত্র্যও আল্লাহ্র এককত্বের প্রমাণ। জীব-জন্তু স্বতঃই সৃষ্ট হতে পারে না, নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা সে নিজেই নব সৃষ্ট, তা হয় এখন বর্তমান আছে না হয় তা নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন, অস্তিত্বহীন। যে নিজে অস্তিত্বহীন, তার পক্ষে অন্য কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল বানানো অসম্ভব। আর তা যদি এখন বর্তমান, অস্তিত্বমান, তাহলে তা বর্তমান আছে বলে এক্ষণে তার অস্তিত্বদানকারীর কোন প্রয়োজন নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা জানি, একটি জিনিস কারোর দ্বারা অস্তিত্বমান হয়ে সে অন্য কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল বানাতে পারে না। আর তার অস্তিত্বহীন অবস্থায় সেকাজ করতে সক্ষম হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন জীব বা প্রাণী নিজের অংশসমূহে বাড়তির সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা গোটাটার উদ্ভাবনের শক্তি-সামর্থ্য না থাকা অংশ বৃদ্ধিতে অক্ষম হওয়ারই প্রমাণ করে। অতএব বোঝা গেল, যিনি নবসৃষ্টিকারী, তিনিই সক্ষম, মহাবিজ্ঞানী। তাঁর সদৃশ কেউ নেই, হতে পারে না। এসব জীব-জন্তু-প্রাণীর উদ্ভাবক বা স্রষ্টা যদি এ সবের সদৃশ হয় কোন একটি দিক দিয়েও, তাহলে দেহ সৃষ্টির ঘটনা সঙ্ঘটিত না হওয়ার সিদ্ধান্তই হবে তার সিদ্ধান্ত।

বাতাসের আবর্তন আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ এভাবে যে, সমগ্র সৃষ্টিও যদি বাতাস প্রবাহিত করতে চেষ্টা চালায়, তবুও তা করতে সক্ষম হবে না। আর জানা-ই আছে, তা কখনো প্রবাহিত হয় দক্ষিণ দিক থেকে, কখনো উত্তর দিক থেকে। কখনো প্রচণ্ডভাবে, ঝড় সৃষ্টিতে, কখনো মৃদুমন্দ বেগে। এসব-ই স্রষ্টার সৃষ্টি। জানা গেল, যিনি বাতাসের এই বৈচিত্র্যময় প্রবাহের সৃষ্টি করেন, তিনি মহাশক্তির অধিকারী। তিনি বাতাস সদৃশ নন। কেননা সৃষ্ট কোন জিনিস করতে বা উদ্ভাবন করতে পারে না।

এসব দলীল-প্রমাণ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকদেরকে এবং তিনি এসব বা অনুরূপ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও এককত্ব প্রমাণ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তো গাছপালা-বৃক্ষলতা পানি ছাড়াই উদ্ভাবন করতে পারতেন। সেজন্যে চাষাবাদেরও কোন প্রয়োজন হতো না, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি কোনরূপ যৌন সংযোজন ব্যতীতই করতে পাতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই নিয়মই চালু ও কার্যকর করেছেন যে, এ সবের মাধ্যমেই তা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য, কেবল উপাদান-উপকরণ ও মাধ্যম হলেই কোন জিনিস উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট হতে পারে না। সেজন্যে উদ্ভাবক ও স্রষ্টা থাকা অবশ্যম্ভাবী।

তবু এই পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও জানার আওতার মধ্যে। যেন মানুষ তাঁর বিরাটত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে। মানুষ যখনই তাঁর ব্যাপারে গাফিল অসতর্ক হয়ে যাবে, তখনই যেন তার ভেতর তীব্র চেতনা জাগিয়ে দেয়, যা উপেক্ষা করে চলেছে সে বিষয়ে যেন চিন্তার একটা আলোড়ন জাগিয়ে দেয়। আল্লাহ্ আসমান-জমিনকে দুই স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে থাকা জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যে অবস্থায় সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি আসছে না। সৃষ্টি করেছেন

এ দুটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এ দুটির ধ্বংস হওয়াও অবধারিত করে দিয়েছেন, অতঃপর জীব-জন্তু ও মানুষ প্রভৃতি এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। পরে এই সবের জন্যে রিযিক সৃষ্টি করেছেন, ক্ষুধা নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করেছেন, যেন ওরা জীবনে বেঁচে থাকতে পারে। এই রিযিক সারা জীবনের জন্যে এক সাথে দেন নি। যদি এক সাথে সারা জীবনের রিযিক পেয়ে যেত, তা হলে তারা সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যেত। কারোরই ধার ধারতে হতো না, কারোরই রিযিক দানের অপেক্ষায় থাকতে হতো না, বরং প্রতি বছর হিসেবে খাদ্য ও রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যা সেই সময়ের জন্যে যথেষ্ট। যেন তারা অহংকারী হয়ে না উঠে। বরং তারা প্রতি মুহূর্তই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে সর্বাবস্থায়। কতিপয় উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে সঁপে দিয়েছেন, এগুলোর দ্বারা তারা সাম্বাৎসরিক রিযিক উৎপাদন করতে পারে। যেন ক্ষেতে জমি চাষ ও ফসল উৎপাদন। এ থেকে যেন তারা এই চেতনা লাভ করতে পারে যে, শ্রম ও কাজের ফল আছে, তা যেমন ভালো হতে পারে, তেমনি মন্দও হতে পারে। এই জিনিসই তাদেরকে ভালো ও কল্যাণময় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যেন তার ভালো ও কল্যাণময় ফল তারা লাভ করতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে যেন তারা বিরত থাকে, যেন তারা খারাপ ফল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। পরে আল্লাহ্ তাদের জন্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যা করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এজন্যেই ঊর্ধ্বলোকে মেঘের সঞ্চার করেন, পানির সংগ্রহ হয় এবং পরে তা জমিনের উপর বর্ষিত হয় প্রয়োজন অনুপাতে। এরই সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে সমস্ত খোরাক-পোশাকের ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসের ব্যবস্থা করেছেন। পানির ব্যাপারে শুধু বৃষ্টিপাতের একটা ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত হয়নি। তিনি পৃথিবীর বুকে অসংখ্য বিরাট গভীর পানি সঞ্চিত করা পাত্রও বানিয়েছেন। সংখ্যাতীত ঝর্ণা, স্রোতধারার সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকে দূরে দূরে অবস্থিত জনবসতি ও ক্ষেত খামারে পানি পৌছাবার ব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ - (الزمر : ٢١)

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ ঊর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষিয়েছেন। পরে সে পানি পৃথিবীর ধারা ও উৎসসমূহের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুত আসমান থেকে বর্ষিত পানি যদি পৃথিবীতে ধরে রাখার ব্যবস্থা না হতো, তাহলে প্রয়োজনের সময় তাৎক্ষণিকভাবে যেমন তা পাওয়া যেত না, তেমনি তা চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর বুকে অবস্থিত জান-মাল প্রবাহিত হয়ে যেত এবং প্রয়োজনের সময় পানি না পেয়েও ধ্বংস হয়ে যেত অনেক কিছু।

এ প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, রাব্বুল আলামীন অতীব বরকতওয়ালা, মহামহিম। তিনি পৃথিবীকে একটি বসতবাটির মতো বানিয়েছেন। মানুষ এখানে সর্বাবস্থায় আশ্রয় পায়।

আর আসমানকে বানিয়েছেন ছাদের মত। আর বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু প্রভৃতিকে বানিয়েছেন সে সব জিনিসের মত, যা মানুষ নিজের কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্যে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। তা ছাড়া তিনি এই পৃথিবীটাকে আমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, এটিকে নরম ও মসৃণ করে বানিয়েছেন আমাদের চলাচলের জন্যে, পথ ঘাট বানিয়েছেন দুর্লজ্ঘ্যকে লংঘন করার জন্যে। ঘর-বাড়ি নির্মাণের জন্যে এখানকার জিনিসপত্র, মাটি ও গাছপালা ব্যবহার করা সম্ভব করে দিয়েছেন আমাদের পক্ষে। এই ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেই তো আমরা বৃষ্টির পানি ও রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচতে পারছি, বাঁচতে পারছি ঠাণ্ডা ও গরম থেকে। রক্ষা পাচ্ছি শত্রুর ক্ষতিকর আচরণ ও আক্রমণ থেকে। আমরা তো যে কোন স্থানে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেই এই কল্যাণ অর্জন করতে পারছি। প্রস্তর, চুনা, মাটি, গাছপালা কাষ্ঠ আমরা আমাদের নানাবিধ কাজে অবাধে ব্যবহার করছি, খনির গর্ভে স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি বহু রকমের মহামূল্য পদার্থ আমাদের উত্তোলনের অপেক্ষায় পুঞ্জীভূত করে রেখে দিয়েছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا – (حم السجدة : ١٠)

এবং পরিমিত করে রেখেছেন সেখানে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এগুলো ছাড়াও আরও কত বিপুল পরিমাণ ও সংখ্যার জিনিস রয়েছে, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও পূর্ণ হয়নি। যে সবের অশেষ কল্যাণ ভাষায় অবর্ণনীয়। এছাড়া আমাদের ও জীবজন্তুর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও অনিবার্য। এ জন্যে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্যেও এই পৃথিবীই আশ্রয়, যেমন আশ্রয় জীবনে বেঁচে থাকা সময়ের জন্যে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا – اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا – (المرسلت : ٢٥-٢٦)

আমরা কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদের সামলাতে ও আয় করে নিতে সক্ষম বানাইনি?

বলেছেনঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا –
وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا – (الكهف ٧-٨)

পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে আমরা সেই সবকে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও অলংকার বানিয়েছি, যেন লোকদের মধ্যে অধিক উত্তম কাজ কে করে তার যাচাই করতে পারি। এবং পৃথিবীর উপরে যা আছে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই সব কিছুকে একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব।

তিনি উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই স্বাদ দানকারী বানিয়েছেন, পীড়াদানকারী নয়। খাদ্যকে বিষ মিশ্রিত করে দেন নি, মিষ্টকে তিক্ত বানান নি। যেন তা

আমাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে দিতে পারে যে, আমরা কেবল স্বাদ আস্বাদনেই নিমগ্ন হয়ে থাকি, তা তিনি চান না। সেগুলো পেয়েই যেন আমরা নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত-শিষ্ট, নিবৃত্ত হয়ে না থাকি। তাহলে তো আমরা পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ব। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে সেই পরকালের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে ফায়দা ও সুবিধা পাওয়া যাবে পীড়াদায়ক কষ্টদায়ক জিনিসে। আমাদের মধ্যে এই চেতনাও জাগাতে চান যে, এই দুনিয়ায় কষ্টদায়ক অবস্থা রয়েছে, তদ্দ্বারা পরকালের দুর্ভোগ সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন আমরা সেই বীভৎস ও খারাপ কাজ ও জিনিস থেকে দূরে থাকি, যার ফলে আমরা পরকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রাপ্ত হতে পারব। যে নিয়ামতে মলিনতা নেই। বস্তুত আল্লাহ্ এই একটি আয়াতে তাঁর তওহীদের যে সব দলীলের উল্লেখ বা তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকেরা যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালায়, তা-ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট হবে। বিভিন্ন প্রকৃতি ও ধরনের নাস্তিকদের কথাবার্তা যে বাতিল ও ভিত্তিহীন, তা-ও বুঝতে পারবে। যারা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী কিংবা আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে বিশ্বাসী, তারাও নিজেদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। আয়াতটির অর্থ ও তাৎপর্য যতই বিস্তারিত করা হবে, আলোচনা ততই দীর্ঘ হবে। যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা এ স্থানে যথেষ্ট হতে পারে। মূলত আয়াতটিতে যে তওহীদের দলীলসমূহ রয়েছে, সে বিষয়ে খানিকটা আভাস দান-ই আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য। সব কথা এখানেই বলতে হবে, এমন কোন তাগিদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই উপস্থাপিত দলীল প্রমাণসমূহের গভীর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জানবার, বুঝবার এবং প্রকাশ করার তওফীক দিন, এই প্রার্থনাই তাঁর নিকট জানাচ্ছি।

সমুদ্রে চলাচল বৈধ ও দোষমুক্ত

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِيْ فِيْ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ –

আর নৌকা-জাহাজ, যা নদী সমুদ্রে জনকল্যাণমূলক পণ্যাদিসহ চলাচল করে.....

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নদী সমুদ্রে চলাচল করায় কোন দোষ নেই। তা সম্পূর্ণ মুবাহ কাজ। সে চলাচল যোদ্ধা হিসেবে হোক কি ব্যবসায়ী হিসেবে হোক, বৈষয়িক কল্যাণ সংগ্রহের লক্ষ্যেই হোক না কেন। কেননা আয়াতে মুনাফাদায়ক ও কল্যাণকর জিনিসের কথা বলা হয়েছে। তাতে কোন এক প্রকারকে অন্যান্য প্রকার সফর থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – (يونس : ٢٢)

সেই আল্লাহ-ই তোমাদেরকে স্থলভাগে ও নদীসমুখে পরিভ্রমণ করিয়েছেন।

বলেছেন ঃ

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ –

তোমাদের রব্ব-ই তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে নদী-সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ চালান, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে পার।

এসব আয়াতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন আর একটি আয়াত ঃ

فَاِذَ قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

যখন নামায পড়া শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান কর।

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ -

তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

বহু কয়জন সাহাবীর মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, নদী-সমুদ্রে চলাচলের মাধ্যমে ব্যায়সা-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ জায়েয। অবশ্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নদী সমুদ্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাতে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নদী-সমুদ্রে তোমাদের কেউ যেন জলযানে আরোহণ করে চলাচল না করে। যদি তা করতেই হয়, তাহলে যেন যোদ্ধা হিসেবে কিংবা হাজী হিসেবে বা উমরাকারী হিসেবে করে। সম্ভবত এটা তাঁর একটা পরামর্শ কিংবা জলযানে আরোহী সম্পর্কে তার মনে একটা ভীতি ছিল, সেই কারণে এ কথা বলেছেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাঊদ সাঈদ ইবনে মনসূর, ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া, মুতরফ বশর, আবূ উবায়দুল্লাহ, বুশায়র ইবনে মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَيَرْكَبِ الْبَحْرَ اِلاَّ حَاجٌّ اَوْمُعْتَمِرٌ اَوْ غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا -

হজ্জযাত্রী, উমরাকারী কিংবা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারী ছাড়া অন্য কেউ যেন সমুদ্রপথে চলাচল না করে।[১] কেননা সমুদ্রের নিচে আগুন রয়েছে এবং সে আগুনের নিচেও সমুদ্র রয়েছে।

---

১. নবী করীম (স)-এর কথার শেষাংশ হচ্ছে ঃ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا اَوْ تَحْتَ النَّارِ بَحْرًا — কেননা সমুদ্রের নিচে আগুন আছে কিংবা আগুনের নিচে সমুদ্র রয়েছে। যারা বলেন, পৃথিবীর গর্ভ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন দ্বারা বেষ্টিত, উক্ত কথাটি তাদের দলীল। ভু-মণ্ডলের বিরাট অংশ সর্বদিক দিয়েই সমুদ্রের পানিতে ডুবন্ত।

রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি সম্ভবত পছন্দ-অপছন্দ পর্যায়ের। অর্থাৎ তিনি দ্বীনি অপরিহার্য কাজ ছাড়া সমুদ্রপথে চলাচল করা পছন্দ করেননি। কেননা মানুষ বৈষয়িক আনন্দ-স্ফূর্তির জন্যে আত্মপ্রতারিত হয়ে পড়তে পারে। তা যাতে না হয়, সেজন্যেই এ কথা। যুদ্ধ, হজ্জ ও উমরা প্রভৃতির জন্যে সমুদ্রপথে চলাচলে কোন নিষেধ নেই। কেননা এসব কাজের জন্যে সমুদ্র সফরে কোনরূপ ধোঁকা-প্রতারণার অবকাশ নেই। এই কাজে সমুদ্রপথে চলতে গিয়ে যদি কেউ ডুবে মরে, তাহলে সে শহীদ হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আল আতকী, হাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাব্বান, আনাস ইবনে মালিক, উম্মে হারাম বিনতে মিলহা উম্মে সুলায়মের বোন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) তাদের নিকট ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরে জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! আপনি হাসছেন কোন্ কারণে ? বললেন, আমি কিছু সংখ্যক লোক[১] কে—যারা সমুদ্রে চলাচল করে—দেখতে পেয়েছি। তারা এই সমুদ্রে চলাচল করছে পরিবার বা গোত্রের বাদশাহর ন্যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! আপনি দো'আ করুন, আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যের একজন বানান। বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের একজন। পরে রাসূল আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার জেগে উঠলেন ও হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! কোন্ কারণে আপনি হাসছেন ? জবাবে তিনি পূর্বানুরূপ কথা বললেন। বললাম, হে রাসূল! আপনি দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যের একজন বানান। বললেন ঃ তুমি প্রথম দিকের একজন।

বিনতে মিলহানকে পরে হযরত উবাদাত ইবনে সামিত বিবাহ করেন। এ সময় সমুদ্র পথে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ফিরে এলে পরে একটি গাধার পিঠে সওয়ার হতে চাইলেন। কিন্তু গাধাটি তাঁকে ফেলে দিল। তাতে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং মরে গেলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল ওহাব ইবনে আবদুর রহীম আল-জুয়ায়রী, আদদে মাশকী, মারওয়ান, হিলাল ইবনে মায়মুন রমলী, ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ, উম্মে হারাম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيْبُهُ الْقَىْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ -

সমুদ্রপথের যাত্রী যদি বমি করে, তাহলে সে এক শহীদের সওয়াব পাবে, আর যে ডুবে মরবে, সে দুই শহীদের সওয়াব পাবে।

---

১. সমুদ্রগামীদের মধ্য থেকে—অপর বর্ণনায়—আমার উম্মত থেকে যারা সমুদ্র পথে চলাচল করে।

মৃত জীব খাওয়া হারাম

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

এ ব্যাপারে আল্লাহ শুধু হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং এমন জিনিস যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নাম লওয়া হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন الميتة। বলতে শরীয়াতের দৃষ্টিতে মৃত জীব-জন্তু বুঝিয়েছেন, যা যবেহ্ করা হয়নি। জীব-জন্তু অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন মরে যায়, যার মৃত্যুর কোন কারণ মানুষ ঘটায়নি। অনেক সময় আবার মানব সৃষ্ট কারণের দরুনও হয়ে থাকে। যখন মানুষ মুবাহ নিয়মে যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যুর কোন কারণের সৃষ্টি করেনি।

পরে জন্তু যবেহ্ করার শর্তাবলীর উল্লেখ যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌। জন্তুর মৃত্যু যদি আল্লাহ্‌র করা কোন কাজের দরুন হয়ে থাকে, তা-ও হারাম হবে। যদিও আমরা জানি যে, হারাম-হালাল নিষেধ ও মুবাহ্‌ ইত্যাদি আমাদের কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের ছাড়া অন্য কারোর কাজের সাথে শরীয়াতের এসব বিধান সম্পর্কিত হয় না। কেননা মানুষকে অপরের কাজ থেকে বিরত রাখা সঙ্গত নয়। কোন কাজের জন্যে আদেশও করতে পারে না। কেননা তার অর্থ কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না শ্রোতাদের নিকট। তাতে হারাম-হালালকরণ শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও তা প্রকৃত নয়। বরং তা হারামকরণের হুকুমের তাগিদের দলীল হয়ে যায়। তা মুনাফা বা ফায়দা লাভের সব দিকই পরিব্যাপ্ত হয়। এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন—মৃত জন্তু দ্বারা কোনরূপ ফায়দা লাভ জায়েয নয়। নিজেদের পালিত কুকুর ও যখমকারীকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। কেননা তা-ও এক প্রকারের ফায়দা লাভ। অথচ আল্লাহ মৃত জীবকে নিঃশর্তভাবে হারাম করেছেন। মূল মৃতটাই হারাম। এই নিষেধের হুকুমের উপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। ফলে তার একবিন্দু জিনিস থেকেও কোনরূপ ফায়দা গ্রহণ জায়েয নয়। তবে মানবার যোগ্য কোন দলীল দ্বারা কোন জিনিস বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হলে ভিন্ন কথা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস মৃত মাছকে এই সাধারণ হারামকরণ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। পঙ্গপাল (Rocusts)-ও এ পর্যায়ে গণ্য বলে তা মুবাহ্‌।

আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالسَّمَكُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ -

আমাদের জন্যে দুপ্রকারের মৃত জীব ও দুপ্রকারের রক্ত হালাল করে দেয়া হয়েছে। মৃত দুই প্রকারের জীবের মধ্যে পঙ্গপাল ও মাছ রয়েছে এবং দুই প্রকারের রক্তের মধ্যে তিল্লী ও কলিজা।

আমর ইবনে দীনার জাবির থেকে 'জায়শুল খাবৃত' ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সমুদ্র তাদের দিকে একটি মাছ নিক্ষেপ করল, তারা তা থেকে অর্ধমাসকাল ধরে আহার করে। পরে তাঁরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তার সমস্ত বিবরণ নবী করীম (স)-কে জানালেন। তখন তিনি বললেন ঃ

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُطْعِمُوْنِيْ –

তোমাদের নিকট সে মাছের কোন অংশ অবশিষ্ট থেকে থাকলে তোমরা তা আমাকে খাওয়াও।

নদী-সমুদ্রে মরে ভেসে উঠেনি এমন সব মাছ খাওয়া মুবাহ, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। পঙ্গপালও এ পর্যায়ের।

কারো কারো মতে মৃত হারামকরণের আয়াতের সাধারণ ভাবধারা থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্যে অপর এক আয়াতকে দলীল হিসেবে অনেকে পেশ করেছেন। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ –

সমুদ্রের শিকার এবং তার থেকে পাওয়া খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে তোমাদের জন্যে জীবনোপকরণ হিসেবে।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসও রয়েছে। হাদীসটি সফওয়ান ইবনে সূলায়ম জরকী, সাঈদ ইবনে সালমা, মুগীরা ইবনে আবূ বুরদাতার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

فِيْ الْبَحْرِ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত জীব হালাল।

কিন্তু এ হাদীসের সনদের সাঈদ ইবনে সালমা অজ্ঞাত-অপরিচিত ব্যক্তি। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণিত নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদুল আনসারী সনদে তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি হাদীসটি মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বরদাতা তাঁর পিতা থেকে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে এই পার্থক্য মূল হাদীসটিকে 'মুজতারাব' বানিয়ে দেয়। আর তার বলে কোন 'মুহ্কাম' আয়াতকে বিশেষ কোন অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

ইবনে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বুকারী সুলায়মান আল-আমাশ তাঁর ওস্তাদগণের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فِى الْبَحْرِ ذَكِىٌّ صَيْدُهُ طَهُوْرٌ مَاؤُهُ –

সমুদ্রের শিকার যবেহকৃত, তার পানি পবিত্র।

হাদীস বর্ণনাকারীদের মতে এ হাদীসটি প্রথম থেকেই আরও অধিক যয়ীফ। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইয়াহইয়া ইবনে আয়ূব জাফর ইবনে রবী'আতা ও আমার ইবনুল হারিস, বকর ইবনে সওয়াদাতা, আবূ মুআবিয়া আল-আলাভী, মুসলিম ইবনে মখশী, আল-মুদলেজী, ফরাসেবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فِى الْبَحْرِ هُوَ طَهُوْرٌ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত জীব হালাল।

এ হাদীসটিও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রেওয়াতটি অজ্ঞাত। কুরআনের বাহ্যিক সাধারণত্বকে এর ভিত্তিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে ক্ষুণ্ন করা যায় না।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবুল কাসিম ইবনে আবুয যিনাদ, ইসহাক ইবনে হাযিম, আব্দুল্লাহ ইবনে মাকসাম, আতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে সমুদ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তাতে মৃত জীব হালাল

আবূ বকর বলেছেন ঃ মরে ভেসে উঠা মাছ জায়েয কি জায়েয নয়—এ নিয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে। হাদীসের শব্দ الطافى। 'পানিতে মরা জীব' বোঝায়, যা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। হানাফী ফিকাহ্বিদগণ তা 'মাকরূহ' মনে করেন। হাসান ইবনে হাই'র তা-ই মত। তবে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে কোন দোষ নেই। আগের কালের ফিকাহ্বিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে এ ব্যাপারে। আতা ইবনে মায়িব মায়সারা থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا طَفَا مِنْ مَيْتَتُهُ الْبَحْرِ فَلَاتَأْكُلْهُ –

সমুদ্রের যে মরা ভেসে উঠে তা খাবে না।

আমর ইবনে দীনার জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আকল হুযায়ল, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা দুজনই পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন। সাহাবীদের মধ্যে এ তিনজন সে মাছ খাওয়া মাকরূহ বলে মত দিয়েছেন।

জাবির ইবনে যায়দ, আতা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান, ইবনে সিরীন ও ইবরাহীম নখয়ী প্রমুখ ফিকাহ্বিদ তাবেয়ীও তা মাক্রূহ মনে করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও আবূ আইয়ূব আনসারী পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া মুবাহ মনে

করতেন। অথচ আল্লাহ্‌র কথা الميتة। শব্দটি সব মরা সম্পর্কে নিষেধ বোঝায় বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে।

তবে মুসলিম সমাজ মরে ভেসে উঠা মাছ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে এই আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। তাই আমরাও সেই মতকে গ্রহণ করেছি। মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে বিভিন্ন মত হওয়ার সাধারণ হুকুম গ্রহণ করাই কর্তব্য। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে আবাদাতা, ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়ম, তায়েফী, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাতা, আবূ যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَـا اَلْـقَـعِـى الْـبَـحْـرُ اَوْجَـزَرَ عَـنْـهُ فَـكُـلُـوْهُ، وَمَـا مَـاتَ فِـيْـهِ وَطَـفَا فَـلا تَـاكُـلُـوْهُ –

নদী-সমুদ্র যা নিক্ষেপ করে কিংবা ভাটার টানে বা স্রোতে উঠে আসে, তোমরা তা খেতে পার। আর যা তাতে মরে যায় ও ভেসে উঠে, তা তোমরা খাবে না।

ইসমাঈল ইবনে আয়াশ, আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ, অহব ইবনে কায়সান ও নয়ীম ইবনে আবদুল্লাহ, আল মুজমার, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন[১] ঃ

مَـاجَـزَرَ عَنْهُ الْبَـحْـرُ فَـلَا تَـأْكُلْ وَمَـا اَلْقَى فَكُلْ، وَمَـا وَجَدْتَـهُ مَـيِّـتًـا طَـافِـيًـا فَلَاتَـأْكُلْهُ –

নদী-সমুদ্র থেকে যা স্রোতে উঠে এসেছে, আর যা উপরে নিক্ষেপ করেছে তা খাও। আর যা তুমি মরা ভেসে উঠা পাবে, তা খাবে না।

ইবনে আবূ যিব আবুয যুবায়র, জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল বাকী ইবনে নাফে, মূসা ইবনে যাকারিয়া, সহল ইবনে উসমান, হিফ্‌স ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনাইসাতা আবুয যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِذَا وَجَدْ تُـمُـوْهُ حَـيًـا فَكُلُوْهُ،وَمَـا اَلْقَى الْبَـحْـرُحَـيًّـا فَـمَـاتَ فَكُلُوْهُ، وَمَـا وَجَدْتُـمُـوْهُ مَـيْـتًـا طَـافِـيًـا فَلَا تَـأْ كُلُوْهُ –

তোমরা যখন তা জীবিত পারে, তা খাও। আর সমুদ্র যা জীবিতাবস্থায় উপরে নিক্ষেপ

---

১. রাসূলের কথা مَـاجَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَلا تَأكُلْ 'যা সমুদ্র স্রোত তুলে দিয়েছে, খাবে না' আমাদের নিকট রক্ষিত এই গ্রন্থের সব কয়টি সংস্করণে এ রূপ বর্ণনাই রয়েছে। কিন্তু ইবনুল অমীর কৃত জামে উল-উসূলে এই বর্ণনা আমরা পাইনি। সূয়ূতীর جمع الجوامع গ্রন্থেও নেই। এ বর্ণনাটি এ পর্যায়ের অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী। সে সব বর্ণনায় রয়েছে ঃ যা সমুদ্র স্রোত তুলে দিয়েছে তা সেই রকমই যা সমুদ্র উপরে নিক্ষেপ করেছে।

করবে এবং পারে মরে যাবে, তাও খেত পার। কিন্তু যা মরা ভেসে উঠা অবস্থায় তোমরা পাবে, তা খাবে না।

ইবনে নাফে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে আবূ উসমান আদ-দহবান, হুসায়ন ইবনে ইয়াযীদ, আত-তহান, হিফস ইবনে গিয়াস ইবনে আবূ যিব আবুয যুবায়র জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاصِدْتُمُوْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوْهُ، وَمَا اَلْقَى الْبَحْرُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ –

তোমরা যে মাছ শিকার করে জীবিতাবস্থায় পাবে, প'রে মরে যাবে, তা তোমরা খেতে পার। আর নদী-সমুদ্র যা মৃতাবস্থায় ভাসিয়ে উঠাবে, তা তোমরা খাবে না।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, এ হাদীসটি সুফিয়ান সওরী, আইয়ূব ও হাম্মাদ আবুয যুবায়র জাবির-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তা রাসূলের কথা নয় ?

জবাবে বলা যাবে, এ কারণে তা আমাদের নিকট খারাপ হয়ে যায়নি। কেননা হাদীস কখনো সরাসরি রাসূলের নাম নিয়ে বর্ণনা করা হয়, কখনো তাঁর নাম ছাড়াই 'মুরসাল' হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। তাই তার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া যেতে পারে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া অসমীচীন নয়। বরং সে ফতোয়া তাগিদ করে যে, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাতা আবুয্ যুবায়র থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা যেমন বলেছি, তা ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপভাবে ইবনে আবূ যিব হাদীসটিকে রাসূলের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তা-ও গ্রহণীয়।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) থেকে এই হাদীসও বর্ণিত হয়েছে ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجُرَادُ –

আমাদের জন্যে দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দুটি হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল।

এ তো সব বিষয়ে সাধারণ অর্থজ্ঞাপক।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং মরে ভেসে উঠা জীব খাওয়া নিষেধ পর্যায়ে যে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা সে দুটিকে বিশেষভাবে হালাল রূপে চিহ্নিত করে। আমাদের থেকে বিরোধী মত পোষণকারীদের কর্তব্য তার আসল ও মূলের উপর স্থিত হওয়া হাদীসের পরম্পরা রক্ষায়। যা সাধারণ তাকে যা বিশেষ, তার উপরে রাখতে হবে। এভাবেই দুটিকে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ হুকুম দ্বারা বিশেষ হুকুমকে নাকচ করা যাবে না। তাছাড়া হাদীসটি মরফূ'—সরাসরি রাসূলের কথা—হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। মরহুম আল-আত্তার আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার নিকট থেকে ইবনে উমর থেকে 'মওকূফ' (সাহাবীর কথা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া আল-হুমানী আবদুর রহমান ইবনে যায়দ থেকে মরফূ—রাসূলের

কথা—হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতএব তা তোমাকে মানতে হবে, যেমন করে আমাদেরকে মানতে হবে যা মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম (স) এর 'সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত হালাল' এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা হলে, যাতে মরে ভেসে উঠা মাছকে আলাদা করা হয়নি, তাহলে ?

বলা যাবে, আমরা দুটি বর্ণনাকেই একসাথে কাজে লাগাব। দুটি একসাথে এসেছে মনে করব। মরে ভেসে উঠা মাছ সংক্রান্ত হাদীসকে নিষেধ পর্যায়ে গণ্য করব এবং মুবাহ্ প্রমাণকারী হাদীসটিকে আমরা ব্যবহার করব মরে ভেসে উঠা মাছ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফার মূলত বিশেষ (خَاص) ও সাধারণ (عام) পর্যায়ে নীতি হচ্ছে, দুটি হাদীসের কোন একটিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে ফিকাহ্বিদগণ যদি একমত হন এবং অপরটির ব্যবহারে মতপার্থক্যে পড়ে যান, তাহলে যে হাদীস সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছে, তার ফায়সালাকারী হবে মতপার্থক্যের হাদীসটির ব্যাপারে। নবী করীম (স)-এর কথা 'সমুদ্রের মৃত হালাল' এবং 'আমাদের জন্যে দুটি মৃত হালাল করা হয়েছে' দুটিকে ব্যবহার করতে সকলে একমত হয়েছেন। আর 'মরে ভেসে উঠা মাছ'—এ হাদীসটিতে মতপার্থক্য হয়েছে। এমতাবস্থায় শেষোক্ত হাদীসদ্বয়ের উপর তার ফায়সালা কার্যকর হবে (তাতে হানাফী মত টিকে না)।

এর জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এটা তাঁর মাযহাবরূপে পরিচিত। আর তাঁর যে কথাটি কুরআনের অকাট্য দলীল সমর্থন করে না সে পর্যায়ে কথা হচ্ছে, কুরআনের যে সাধারণ হুকুম ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন মত সম্পন্ন হাদীসের সমর্থন, সে ব্যাপারে তাঁর কোন কথা আমাদের জানা নেই। তাই একথা বলা সঙ্গত যে, কুরআনের সাধারণ হুকুম যখন তা সমর্থন করে তখন সে হাদীস ব্যবহারে মতপার্থক্য গণ্য করার যোগ্য নয়। অতএব তা ব্যবহার করা হবে যে হাদীস ব্যবহারে সকলে একমত ও সাধারণ হুকুমের, তার সাথে একত্র করে। আর তা হবে তা থেকে বিশেষভাবে আলাদ করা।

জায়শুল খাবত প্রসঙ্গ বর্ণনার জাবির বর্ণিত হাদীসকে যদি দলীল হিসেবে পেশ করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় যে, নবী করীম (স) সমুদ্র নিক্ষিপ্ত মাছ খাওয়া মুবাহ্ ঘোষণা করেছেন, তাহলে আমরা বলব, তা طافى অর্থাৎ মরে ভেসে উঠা সম্পর্কে বলা হয়নি। কেননা طافى হচ্চে সেই মাছ যা ঘটিত কোন কারণ ছাড়াই পানির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মরেছে। কিছু লোক মনে করে, পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ পানির মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল বলেই তা মাকরূহ। তার ফলেই তা উপরে ভেসে উঠেছে। যবেহ করা জীব যদি পানিতে নিক্ষিপ্ত হয়, পরে তা ভেসে উঠে তা হলে তা খাওয়া আমাদের জন্যে হালাল হওয়া বাধ্যতামূলক।

তাদের এই কথা মূর্খতার পরিচায়ক। কথা এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তা অর্থহীন, কেননা মাছ যদি মরে ও পরে পানির উপর ভেসে উঠে, তাহলে তা খাওয়া যাবে, যদিও তা স্বাভাবিকভাবেই মরেছে; কিন্তু পানির উপর ভেসে উঠেনি, তা হলে তা খাওয়া যাবে না। আমাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, মাছের মৃত্যুটা পানির মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে হয়েছে, অন্য কোন ভাবে নয়।

আবদুল বাকী আমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সে হাদীসটি منكر —গ্রহণ অযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন, উবায়দ ইবনে শরীক আল-বাজ্জার আবুল জামাহীর সাঈদ ইবনে বুশায়র আবানা ইবনে আয়াশ, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلْ مَا طَفَا عَلَى الْبَحْرِ -

যে মাছ মরে সমুদ্রের উপরে ভেসে উঠেছে, তা খাও।

কিন্তু আবান ইবনে আয়াশ তাঁর বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণ করেন না। শুবা বলেছেন ঃ

لَانْ اَزْنِى سَبْعِيْنَ زَنْيَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَرْوِىْ عَنْ اَبَان بن عياش -

আবান ইবনে আইয়াশের নিকট থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার তুলনায় সত্তরবার যিনা করাও উত্তম ও অধিক শ্রেয়।

কেউ যদি আল্লাহ্‌র এই কথাটি দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ -

সমুদ্রের শিকার ও তার নিকট থেকে পাওয়া খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

এবং বলে যে, এ আয়াতে মরে ভেসে উঠা ও অন্যান্য সবই তো হালাল করে দেয়া হয়েছে। জবাবে বলা হবে দুটি কথা। একটি—এটা একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয়। মৃত জীব হারাম হওয়া থেকে এটা আলাদা। মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া নিষিদ্ধকারী হাদীসসমূহ থেকেও তা স্বতন্ত্র। আর দ্বিতীয়— وطعامه 'এবং তার খাদ্য' আল্লাহ্‌র এ কথাটির তাফসীরে বলা হয়েছে ঃ যা সমুদ্র ছুঁড়ে ফেলেছে এবং পরে মরে গেছে, (তা-ই হচ্ছে সমুদ্রের দেয়া খাদ্য)। আর وصيده বলতে যা লোকেরা শিকার করে তা বুঝিয়েছে। তা জীবিত মরে ভেসে উঠা জিনিস এ দুটির বাইরে। কেননা তা সমুদ্র ছুঁড়ে ফেলে নি। তা শিকার করেও পাওয়া যায়নি। কোন মরা মাছ কেউ শিকার করেছে—একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন কোন মরা জীব শিকার করা হয়েছে—বলা যায় না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, উক্ত আয়াতটি মরে ভেসে উঠা মাছকে জায়েয খাদ্যের মধ্যে শামিল করে নি।

পঙ্গপাল খাওয়া

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পঙ্গপাল খাওয়ার কোন দোষ নেই। যা তুমি ধরতে পার এবং যা মরা অবস্থায় তুমি পাবে, তা খাও। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তা জীবিত ধরে মাথা কেটে ফেলতেন, তার শুরুয়া তৈয়ার করতেন ও খেতেন। আর যা জীবিত ধরেছে, পরে সে বিষয়ে বেখেয়াল

হয়েছে এবং মরে গেছে, তা খাওয়া যাবে না। তা তো সেই রকমের যা শিকার করার পূর্বেই মরে গেছে—অতএব তা খাওয়া যাবে না। ইমাম জুহুরী ও রবী'আরও এই মত। মালিক বলেছেন, অগ্নিপূজক যা হত্যা করেছে, তাও খাওয়া যাবে না। লাইস ইবনে সায়াদ বলেছেন ঃ মরা পঙ্গপাল খাওয়া আমি মাকরূহ মনে করি। আর যা জীবিত ধরা যাবে তা খেতে দোষ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ –

আমাদের জন্যে দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। মাছ ও পঙ্গপাল।

এ হাদীস তো সর্বপ্রকারের পঙ্গপাল হালাল করে দিয়েছে। অতএব হাদীসটিকে তার সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করা, তার উপর ধারকের তা হত্যা করার শর্ত-আরোপ না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (স) নিজে এ বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করেন নি।

আবদুল বাকী হাসান ইবনুল মুসান্না, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারাতাল, আনসারী, ফায়েদ আবুল আওয়াম, আবূ উসমান, নহদী সালমান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে পঙ্গপাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ

اَكْسَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ، لَا اٰكُلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ –

এগুলোর অধিকাংশই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। আমি নিজে তা খাই না, আর তা খাওয়া হারামও করি না।

নবী করীম (স) নিজেই যা খাওয়া হারাম করেন নি তা খাওয়া মুবাহ্। তাঁর নিজের তা না খাওয়া থেকে কোন নিষেধ প্রমাণিত হয় না। কেননা মুবাহ জিনিস না খাওয়া—খাওয়া ত্যাগ করাও মুবাহ, দোষহীন। পক্ষান্তরে যা হারাম, নিষিদ্ধ, তাকে হারাম না বলা সঙ্গত হতে পারে না। যা মরে গেছে কিংবা ধারক বা শিকারী যা ধরেছে তার হত্যা করা—এ দুয়ের মাঝে তিনি কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। আতা জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَصَبْنَا جَرَادً فَاَكَلْنَاهُ –

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছি। সেখানে আমরা পঙ্গপাল পেয়ে গেলাম। সেগুলো আমরা খেয়ে ফেললাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা বলেছেন ঃ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ وَلَا تَأْكُلُ غَيْرَهَ –

আমি রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছি। এ সময় আমরা পঙ্গপাল ছাড়া আর কিছুই খাইনি।

আবূ বকর বলেছেন, মৃত কি নিহত, এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আবদুল বাকী মূসা ইবনে যাকারিয়া, আত-তস্তুরী, আবুল খাত্তাব, আবূ উনাব, নুমান, উবায়দাতা, ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ, আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) পঙ্গপাল খেতেন এবং বলতেন যে, নবী করীম (স) তা খেতেন।

আবূ বকর বলেছে, পঙ্গপাল পর্যায়ে, সাহাবীগণের এই কথাসমূহে তা মৃত কি জীবিত, কি নিহত—এর মধ্যে কোনই পার্থক্য করা হয়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে' এর বাহ্যিক অর্থ সর্বপ্রকারের মৃত জীব নিষিদ্ধ হওয়ারই দাবি করে। অতএব যে বিষয়ে সকলেই একমত সেগুলো ছাড়া অন্য কোনটিকে এর আওতা থেকে বের করা যেতে পারে না। যা তার ধারক হত্যা করবে, আর যা তার বাইরে, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতেই হারাম গণ্য করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, যেসব হাদীস সব কিছু মুবাহ বলে নির্ধারিত করে, তাই সেগুলোতে সাধারণ থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। আয়াতের অর্থ সীমিতকরণে সকলের নিকটই এসব হাদীস ব্যবহৃত হয়েছে। আর এসব হাদীস তার কোন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেনি। অতএব তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না, আয়াতের ভিত্তিতে তার উপর আপত্তিও তোলা যেতে পারে না। কেননা সেসব হাদীস এ আয়াতের উপর ফায়সালাকারী এবং তার সাধারণত্বকে খতম করে বিশেষ অর্থে গ্রহণের নির্দেশ দানকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পানিতে মরে ভেসে উঠা জীবকে অন্য সবের অপেক্ষা বেশী খারাপ মনে করি। তাই এ দিক দিয়ে পঙ্গপাল আমাদের মতে মাছের মত নয়। কেননা সমস্ত মৃত জীব থেকে মাছকে আলাদা করে নেয়ার ব্যাপারে যে সব হাদীস এসেছে, তার মুকাবিলায় অন্য বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যা তন্মধ্যে থেকে মরে ভেসে উঠা মাছকে আলাদা করে দিয়েছে। তাই আমরা এসব হাদীসকেই কাজে লাগিয়েছি এবং সাধারণ হুকুমের উপর বিশেষ হুকুম বানিয়ে দিয়েছি। যদিও আয়াতটি নিষেধ প্রকাশক হাদীসসমূহেরই সমর্থক। উপরন্তু আমরা ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের আনুকূল্য ও সমর্থন পেয়েছি তন্মধ্য থেকে যা হত্যা করা হবে তার মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হত্যা না হলে তার ও মৃতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা হত্যা যবেহ নয়। যবেহ তো দুভাবে হয়। হয় তা থেকে প্রবহমান রক্ত বের হয়ে যাবে গলা ও রগগুলো সাধ্যমত কেটে দেয়ার ফলে । আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যবেহ সম্ভব না হলে যেভাবেই হোক, রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। যেমন শিকার করা জীব। আঘাত পৌঁছলেই তা স্বতঃই যবেহ হয়ে যায় না। সেজন্যে সেটিকে যখম ও আহত করা ও তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত করে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু পঙ্গপালের দেহে প্রবহমান রক্ত নেই। তাকে হত্যা করা ও স্বাভাবিক

মৃত্যুবরণ অভিন্ন। যেমন যে জীবের প্রবহমান রক্ত রয়েছে তার রক্ত প্রবাহিত না করা ও তার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ—উভয় অবস্থাই তার অ-যবেহকৃত হওয়ার দিক দিয়ে অভিন্ন। তেমনি পঙ্গপালের হত্যা ও তার স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারও অভিন্ন। কেননা তার রক্ত-ই নেই, যা প্রবাহিত করা যেতে পারে।

যদি বলা হয়, মরে ভেসে উঠা মাছ এবং তার ধারকের দ্বারা তার হত্যা হওয়া কিংবা কোন দুর্ঘটনায় পড়ে তার মরে যাওয়া—এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তাহলে যে পঙ্গপাল মরে গেছে বা হত্যা করা হয়েছে এ দুটির মাঝে আমরা যে পার্থক্য করি, তা অস্বীকার করছ কেন? এর জবাব দেয়া যাবে দুভাবে। একটি—মাছ সম্পর্কে এটা একটা 'কিয়াস' মাত্র, যা তার যবেহটা সহীহ্ হওয়াটা রক্ত প্রবাহিতকরণের ব্যাপারে কেউ যুক্তি হিসেবে পেশ করেনি, তবে আমরা এখানে 'কিয়াস' তরক করেছি। তার কারণ হচ্ছে সাহাবীগণের বর্ণিত মতামত। আর আমাদের মূলনীতি হল, সাহাবীগণের মতামত দ্বারা 'কিয়াস'কে বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করা। কিন্তু পঙ্গপালের কোনটিকে মুবাহ বলা অন্য কোনটিকে বাদ দিয়ে, এ পর্যায়ে তোমার নিকট সাহাবীর কোন উক্তি নেই। এ কারণে সবকিছুর ব্যাপারে মুবাহ্ প্রমাণকারী হাদীসসমূহকেই কাজে লাগানো কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, মাছের প্রবাহশীল রক্ত আছে। তাই তা যবেহ্ করা এক ধরনের হত্যা। কিন্তু যবেহের শর্তে তার রক্ত প্রবাহিত করার যুক্তি কেউই পেশ করেনি। কেননা মাছের রক্ত পবিত্র। মাছ তার রক্ত সহই (রান্না করে) খাওয়া যেতে পারে। এর কারণে তার এমন ঘটনায় মরে যাওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যা তাকে যবেহ করার বিকল্প হবে সেই সব ব্যাপারে যার যার প্রবহমান রক্ত রয়েছে। কিন্তু পঙ্গপালের এই দিকটি অনুপস্থিত। এ কারণে ও দুটি আলাদা আলাদা চিহ্নিত ও আলোচিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: الجراد كله ذكى। পঙ্গপাল সবই যবেহ করা। উমর সুহায়ব ও মিকদা (রা) থেকে পঙ্গপাল খাওয়া মুবাহ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে কোন দিক দিয়ে পার্থক্য করেন নি।

ভ্রূণের যবেহ

আবূ বকর বলেছেন—উট, গাভী ইত্যাদি যবেহ করার পর তার গর্ভ থেকে মৃত ভ্রূণ বের হয়ে আসে, এই ভ্রূন খাওয়া জায়েয, কি জায়ে নয়—এ নিয়ে ইসলামী মনীষীদের বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, মৃত পাওয়া গেলে খাওয়া যাবে না। আর জীবিত পাওয়া গেলে সেটিকেও যবেহ্ করতে হবে। তবে খাওয়া হালাল হবে। হাম্মাদও তা-ই বলেছেন। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন, ভ্রূণটি খাওয়া যাবে তা সচেতন থাক কি না-ই থাক। ইমাম সওরীর মতও তাই। হযরত আলী ও ইবনে উমর বলেছেন: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'মার যবেহ তার ভ্রূণের যবেহ।' (অর্থাৎ মাকে যখন যবেহ করা হয়েছে, তখন তার গর্ভের বাছুরেরও যবেহ হয়েছে—মনে করতে হবে। ভিন্নভাবে তাকে যবেহ করার প্রয়োজন হবে না)। ইমাম মালিক বলেছেন, গর্ভের বাচ্চাটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তার গায়ে পশম গজিয়ে থাকে,

তাহলে তা খাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এই মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, ভ্রূণের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হলে তার মার যবেহই তার যবেহর জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 'তোমাদের প্রতি মৃত প্রাণী ও রক্ত হারাম করা হয়েছে'; আর শেষে বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ। 'তবে যা তোমরা যবেহ করেছ, তা হারাম করা হয়নি, বরং তা হালাল', যেহেতু মৃত হারাম করার কথাটি নিঃশর্ত তা থেকেই আলাদা করা হয়েছে যা যবেহ্ করা হয়েছে তা, আর নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلذَّكَاةُ فِيْ الْمَقْدُوْرِ عَلَى ذَكَاتِهِ فِيْ النَّحْرِ وَاللَّبَّةِ وَفِيْ غَيْرِ الْمَقْدُوْرِ عَلَى ذَكَاتِهِ بِسَفْحِ دَمِهِ –

যেটিকে যবেহ্ করা সাধ্যায়ত্ত, তার যবেহ হচ্ছে গলায় ও মজ্জায়। আর যাকে যবেহ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, তার রক্ত প্রবাহিতকরণই যবেহ।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ 'রক্ত প্রবাহিত কর যার দ্বারাই তুমি চাও।' যে জন্তু খাদে পড়ে গেছে, তাকে বর্শা বা সূচ চালিয়ে রক্তপাত করা গেলে, তা খাবে অন্যথায় খাবে না। দেখা যাচ্ছে, যবেহর কাজটি এ দুটি পন্থায় বিভক্ত। আর আল্লাহ্র সাধারণ হুকুম হচ্ছে মৃত জীব হারাম হওয়ার। তা থেকে আলাদ করে নেয়া হয়েছে, যা যবেহ করা হয়েছে তা। সে যবেহ অবশ্য বর্ণিত পদ্ধতিতে হতে হবে। নবীর হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত। যে ভ্রূণের এরূপ অবস্থা নয়, তা মার যবেহতেই হালাল হবে না, হারাম থাকবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা-ই বোঝা যায়।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী, আবুদ্‌দারদা, আবূ ইমামাতা, কাব ইবনে মালিক, ইবনে উমর, আবূ আইয়ূব ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহতেই সম্পন্ন হয়েছে।' কিন্তু এসব সূত্রে যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তা হাদীসবিদদের নিকট নেহায়েত বাজে সনদ। সনদসমূহ পূর্ণভাবে উল্লেখ করা দীর্ঘতার ব্যাপার বলে তা করা পছন্দ করিনি। এ সব সনদের যেমন দুর্বলতা প্রকট, তেমনি হাদীসও 'মুজতরাব'— 'আউলানো-ঝাউলানো। কেননা মতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে এসব হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা হদীসের কথা ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহ। সম্ভবত বলতে চাওয়া হয়েছে, ভ্রূণের মা'র যবেহটাই তার নিজের যবেহ। এ-ও সম্ভাবনা আছে যে, তার মাকে যেমন যবেহ করা হয়েছে তাকেও তেমনি যবেহ করতে হবে। কাজেই ভ্রূণ যবেহ না করে খাওয়া যাবে না, এটাই সিদ্ধান্ত।

যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ –

এবং এমন জান্নাত যার দৈর্ঘ্য আসমান-জমিন।

এর অর্থ, আসমান-জমিন যত বড়, জান্নাতও তত বড়। যেমন একজন বলে ঃ 'আমার কথা তোমার কথা, আমার মত তোমার মত।' এর অর্থ হয়ত এই যে, আমার কথা

তোমার কথার মতই, আমার মত তোমার মতের মতই। আর ব্যবহৃত শব্দ যখন একাধিক অর্থ দেয়, তখন দুটি অর্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এরূপ করা নিষিদ্ধ। কেননা উক্ত হাদীসের একটি অর্থে ভ্রূণকে যবেহ করা কর্তব্য প্রমাণিত হয়। কেননা যবেহ না করে কোন জীব খাওয়াই যেতে পারে না। আর তার অপর অর্থে মার যবেহর দ্বারাই তা খাওয়া মুবাহ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মতে মার যবেহটাকে তার যবেহর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না বলে আয়াতটিকে আমরা সেই বিশেষ অর্থে নিতে পারি না। আমাদেরকে আয়াত অনুযায়ীই কথা বলতে হবে। কেননা 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আয়াতের সাধারণত্বকে ক্ষুণ্ন করে তা থেকে কিছু আলাদা করে তার জন্যে বিপরীত হুকুম প্রমাণ করা যায় না। বরং হাদীসটি থেকে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁর কথা হচ্ছে, ভ্রূণটিকেও যবেহ্ করতে হবে, যেমন যবেহ করা হয়েছে তার মাকে। এটাই সর্বসম্মত মত। কেননা জীবিত পাওয়া গেলে ভ্রূণটিকে যবেহ করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। মাকে যবেহ করা হয়েছে বলে তাকে যবেহ করতে হবে না—একথা ঠিক নয়। হাদীস থেকেও এই বক্তব্যই পাওয়া যায়। কাজেই মাকে যবেহ করা হয়েছে বলে তার ভ্রূণের যবেহ তাতেই সম্পন্ন হয়েছে, একথা হতে পারে না। কেননা এ ব্যাপারটি পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসটির একটি অর্থে ভ্রূণকে যবেহ করতে হবে আর অপর অর্থে যবেহ করতে হবে না—এ পরস্পর বিরোধী কথা।

কেউ যদি বলে, আমরা দুই অবস্থায় দুটি হুকুম আলাদা আলাদাভাবে গ্রহণ করব, তাতে তোমার আপত্তি কেন ? আর তা এ ভাবে যে, ভ্রূণ জীবিত পাওয়া গেলে তা যবেহ করা ওয়াজিব হবে। আর মৃত পাওয়া গেলে তার মার যবেহকেই যথেষ্ট মনে করা হবে, তাতে দোষ কি ?

জবাবে বলা হবে, বর্ণিত হাদীসে তো দুটি অবস্থার উল্লেখ নেই। এখানে শব্দ একটাই আর একটি শব্দের দুটি অর্থ এক সঙ্গে গ্রহণ করা সঙ্গত হতে পারে না। দুটির কোন একটি অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা হলে একটি অক্ষর ك বাড়াতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে একটি অক্ষর বৃদ্ধি করার কোন অবকাশ নেই। আর একটি শব্দে কখনো একটি অক্ষর বাড়িয়ে ধরা হবে, আবার কখনো তা দূরে রাখা হবে, এটাই সঙ্গত হতে পারে কি রূপে ? কাজেই যারা একটি শব্দের দুটি অর্থ দুই অবস্থায় গ্রহণে ইচ্ছুক, তাদের মত বাতিল প্রমাণিত হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, দুটি অর্থের একটি গ্রহণের ইচ্ছা হলে ك অক্ষর বাড়াতে হয়; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে তা বাড়াতে হয় না। অতএব যে অর্থে অক্ষর বাড়াতে হয় না, সেই অর্থ গ্রহণই উত্তম। কেননা বাড়তি অক্ষরটি যখন বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি তা বাদ দেয়া না হয়, তা হলে তা হবে প্রকৃত। আর শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ তার পরোক্ষ অর্থ গ্রহণের তুলনায় অনেক ভালো।

তাকে জবাব দেয়া হবে দুভাবে। একটি এই—ভ্রূণটির তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও সেটিকে 'ভ্রূণ' বলা এদিক দিয়ে সঙ্গত হতে পারে যে, সেটি কিছুক্ষণ পূর্বেও তার

মার গর্ভে ভ্রূণ হয়েই ছিল। তার ভ্রূণ শেষ হয়েছে, খুব বেশি সময় হয়নি। কাজেই কেউ যদি বলে যে, ভ্রূণ যদি জীবিত বের হয়, তা হলে সেটিকে তার মা'র মতই যবেহ করা হবে, তা হলে তাকে এরূপ নামকরণ থেকে বিরত রাখা যায় না। এরূপ অবস্থায় মা'র গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও যবেহ হওয়ার পরও 'ভ্রূণ' নামেই অভিহিত হবে। হামল ইবনে মালিক বলেছেন, আমি আমার দুটি ক্রীতদাসীর মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলাম। তার একটি অপরটিকে মারধোর করল তাঁবুর খুঁটি দিয়ে। তখন সেটি একটি মৃত ভ্রূণ প্রসব করল। তখন নবী করীম (স) দাস বা দাসীর অসাবধানতার ফায়সালা দিলেন। এ কথাটিতেও গর্ভ থেকে বাইরে পতিত হওয়ার পরও 'ভ্রূণ' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আর তা যখন হয়, তখন নবী করীম (স)-এর ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّه কথাটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, ভ্রূণের যবেহ তার মাকে যবেহ করার মতই করণীয়, যদি সেটি জীবিত নিক্ষিপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, তাঁর কথার তাৎপর্য যদি এই হয় যে, ভ্রূণটির যবেহ কাজ যথারীতি হয়ে গেছে তার মা'র যবেহ দ্বারা, তাহলে মার যবেহকেই ভ্রূণের যবেহ মনে করতে হয়। তা যদি জীবিত বের হয় এবং তার মৃত্যু হয় বের হওয়ার পর, তা হলে তার উপর মৃতের হুকুম বহাল করা যাবে না, তার মার গর্ভে হওয়া মৃত্যুর মত হবে। ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় মার গর্ভ থেকে বের হলে তার মার যবে হতে তার যবেহ সম্পন্ন হয়েছে, একথা মনে না করায় সকল ফিকাহ্বিদই সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে প্রমাণিত হল মা'র যবেহটা ভ্রূণের যবেহরূপে গণ্য হতে পারে না মার সাথে তার মিলিত থাকা সত্ত্বেও।

যদি কেউ বলে, মার যবেহটা ভ্রূণের যবেহ ধরা হবে সেটি যদি মৃত অবস্থায় বের হয়। জবাবে বলা যাবে—এ কথা নবী করীম (স) উল্লেখ করেন নি। তাই তার ভ্রূণ অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়া যদি শর্ত ধরা হয়, যদিও নবী করীম (স) তার উল্লেখ করেন নি, তা হলে সেটি জীবিত বের হোক, কি মৃত—উভয় অবস্থায়ই সেটি হালাল হওয়ার জন্যে তার যবেহ হওয়াটাকে শর্ত ধরতে পারি। তাই তার নিজের যবেহ না হওয়া পর্যন্ত তা খাওয়া জায়েয হবে না। আর আমরা যদি মূল ভ্রূণটির যবেহ শর্ত করি, তাহলে সে যবেহ তার মার ব্যাপারে গণ্য হবে না, বলিব তা হলে হাদীসটিকে সাধারণ ও নিঃশর্তভাবেই গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় সেটি খাওয়া মুবাহ্ হবে তার ভ্রূণ অবস্থায় মার গর্ভ থেকে বের হওয়ার পর যবেহ কাজ সম্পন্ন হলে, আর হাদীসটিকে এই অর্থে গ্রহণ সর্বনামটা করা অতীব উত্তম সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণের পরিবর্তে যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তার জন্যে প্রমাণ করা হাদীসে উল্লিখিত হয়নি, তার কোন প্রমাণও নেই।'

কেউ যদি বলে, হাদীসটিকে ভ্রূণের বের হওয়ার পর তার যবেহ জরুরী প্রমাণে ব্যবহার করলে তার সমস্ত ফায়দাই শেষ হয়ে যায়। কেননা সে কথা তো আগেই জানা ছিল।

জবাবে বলা যাবে, ভ্রূণটি জীবিতাবস্থায় বের হলে তার যবেহ কর্তব্য, সেটি যবেহ করা যখন সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থায় মরে গিয়ে থাকুক, কি বেঁচে থাকুক, উভয় অবস্থাই

সমান। এ থেকে তার কথা বাতিল হয়ে গেল, যে বলে যে, সেটি যবেহ্ করা সম্ভব ছিল না। এমন অবস্থায় মরে গিয়ে থাকলে তার মার যবেহ্কেই তার জন্যে যবেহ্ গণ্য করা হবে। বরং উক্ত কথায় সেটিকে যবেহ্ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সেটি মৃত বের হলে খাওয়া যাবে না। কেননা সেটি যবেহ্ করা হয় নি। আর জীবিত বের হলে যবেহ্ করা হবে। বোঝা গেল, সেটি মৃত, খাওয়া যাবে না। সে ব্যক্তির কথাও বাতিল হয়ে গেল, যে বলে যে, সেটি মৃত বের হলে তখন সেটিকে যবেহ্ করার কোন প্রয়োজন নেই।

যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আস্-সাজী বেনদার-ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আত-তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজন বলেছেন—ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, মুজালিদ, আবুল ওদাক, আবূ সাঈদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে ভ্রূণ সম্পর্কে—যা মৃত বের হয়েছে—সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ

اِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوْهُ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ –

তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা সেটির যবেহ্ তার মার যবেহ্।

এর ভিত্তিতে যদি কেউ যুক্তি দেয়, তা হলে জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটি সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের একটি জামা'আত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাতে সেটির মৃতাবস্থায় বের হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। অপর কতিপয় বর্ণনাকারী মুজালিদ থেকে হুশায়ম, আবূ উসামা ও ঈসা ইবনে ইউনুস প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বলেন নি যে, ভ্রূণটি মৃতাবস্থায় বের হয়েছে (তখন এই করা হবে)। তাঁরা বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে গাভী বা ছাগী বা উষ্ট্রীর গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খাও। কেননা তার যবেহ্ তার মা'র যবেহ্।

এই হাদীসটি আবূ লায়লা ও আতীয়াতা, আবূ সাঈদ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) থেকে যারাই হাদীস বর্ণনা করেছেন—যেমন উদ্ধৃত হয়েছে—সকলেই একই কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের একজনও একথার উল্লেখ করেননি যে, ভ্রূণটি মৃতাবস্থায় বের হলে তার এই হুকুম। এ কথাটি কেবলমাত্র সাজীর বর্ণনায় এসেছে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় যে, এ শব্দটি তাঁরই বানানো। কেননা তা সংরক্ষিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ্র কথা ঃ

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامْ –

তোমাদের জন্যে ঘরে পালা চতুষ্পদ জন্তু খাওয়া হালাল করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ভ্রূণসমূহ। অর্থাৎ ভ্রূণ হালাল হওয়ার কথা এতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে যদি কেউ সকল প্রকারের ভ্রূণই হালাল বলতে চায় ? আমরা জবাবে বলব, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কিত কথা। আর আল্লাহ্র কথা ঃ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ। 'সেই সব বাদে যা একটু পরেই

তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে' বলে শূকর-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, গৃহপালিত পশু হচ্ছে ছাগল, উট-গাভী—এ কথা সব জন্তু প্রসঙ্গে হওয়াই উত্তম। তা কেবল ভ্রূণ বোঝায়, অন্য কিছু নয়, তা বলা ঠিক নয়। কেননা এই বিশেষীকরণের কোন দলীল নেই। উপরন্তু তার অর্থ যদি ভ্রূণসমূহ হয়, তাহলে তা মুবাহ হবে কেবল যবেহর মাধ্যমে, যেমন করে সব জন্তুই যবেহর দ্বারা মুবাহ্ হয়ে থাকে। আর যেমন করে জীবিত ভ্রূণ মুবাহ হয় যাবেহ করা হলে। আরও বিবেচনার বিষয়, আল্লাহ্র কথা ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَايُتْلَى عَلَيْكُمْ –

তোমাদের জন্যে গৃহপালিত ধরনের পশু হালাল করা হয়েছে, তবে তা নয়, যার কথা পরে তোমাদেরকে বলা হবে।

এর অর্থ যদি হয় শীগ্গীরই তোমাদেরকে ভবিষ্যতে জানানো হবে, যা বর্তমানে তোমাদের জন্যে হারাম। এ এক অস্পষ্ট কথা। একে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। এ কথাটি এই রকম ঃ কতক জন্তু হালাল, কতক জন্তু হারাম—নিষিদ্ধ। কিন্তু সে জন্তুগুলো কি, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে এই সাধারণ ঘোষণাকে কোন বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা সঠিক হতে পারে না।

কেউ যদি বলেন, ভ্রূণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যদি তা-ই হয়, যা মা'র সম্পর্কে, তাহলে যদি কেউ কোন মেয়েলোকের পেটের উপর আঘাত হানে, তাতে যদি সে মরে যায় এবং একটি মৃত ভ্রূণ প্রসব হয়ে যায়, তাহলে তার জন্যে স্বতন্ত্র কোন হুকুম তো হবে না। অনুরূপভাবে ভ্রূণ যদি মাতৃগর্ভে মরে যায়, মার মৃত্যুর কারণে, তা হলে সেই একই হুকুম হবে। আর সন্তান যদি জীবিতাবস্থায় বের হয় এবং তার পরে মরে যায়, তবে তার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে হুকুম হবে। তার মা'র হুকুম তার উপর বর্তিবে না। পশুর ভ্রূণও সেই রকম। মা'র মৃত্যুর কারণে তার গর্ভস্থ ভ্রূণও যদি মরে যায় এবং মৃত অবস্থায় বের হয়ে আসে, তবে খাওয়া যাবে। আর জীবিতাবস্থায় বের হলে তা যবেহ না করা পর্যন্ত খাওয়া যাবে না।

জবাব দেয়া হবে, এ একটা অমূলক ধারণা। কেননা অপর একটা হুকুমের উপর ভিত্তি করে একটা বিষয়ের হুকুমের ধারণা করা হচ্ছে। দুটি বিষয়কে একই হুকুমে একত্রিত করে কিয়াস করা হলে তা সহীহ্ হবে, যদি এমন 'ইল্লাত' বা কারণকে ভিত্তি করা হয়, যা একটিকে অপরটির উপর স্থাপন করবে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন হুকুমে একটি বিষয়কে অপর একটি বিষয়ের উপর কিয়াস করা হয়, তাহলে তা কিয়াস হবে না। আমরা জেনেছি, যে বিষয়টি দেখা হয়েছে, তার হুকুম হল—ভ্রূণটি যদি মা থেকে তার মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মার যবেহকে ভ্রূণের যবেহ প্রমাণ করা এক অবস্থায় এবং অপর এক অবস্থায় তা না করা। তাহলে এরূপ অবস্থায় এটিকে অপরটির উপর রেখে কিয়াস করা যাবে কেমন করে ? তা সত্ত্বেও ছাগী বা অন্য কিছুর পেটে যদি আঘাত করা হয়, ফলে মৃত ভ্রূণ

প্রসব করে তাহলে ভ্রাণের জন্যে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, আঘাতকারী তার মূল্য দিতেও বাধ্য হয় না। তাকে মা'র ক্ষতিপূরণই দিতে হয়, যদি তার কোন ক্ষতি সাধিত হয়। পালিত পশুর ভ্রূণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কোন হুকুম মা'র জীবনের ক্ষেত্রে ধার্য হয় না। আর তা মেয়ে লোকটির ভ্রূণের জন্যেও প্রমাণিত হয়, তাহলে পশুকে কি করে মানুষের উপর রেখে ধারণা করা যেতে পারে! যা উল্লেখ করেছি, সেই মূল বিষয়েই দুটির হুকুমে মতপার্থক্য রয়েছে।

যদি বলা হয়, ভ্রূণটি মার সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায় যদি মা'র একটি অঙ্গ ধরা হয়, তাহলে মা'র যবেহকে সেই অঙ্গেরও যবেহ মনে করতে হবে (কোন অঙ্গের আলাদা যবেহর কোন প্রশ্ন হয় না,) তাহলে মা'র যবেহতেই ভ্রূণটির হালাল হওয়া উচিত।

জবাবে বলা হবে, ভ্রূণ তার মার একটি অঙ্গ—একথা মনে করা সঙ্গত নয়, কেননা সেটির মা'র জীবনেই জীবিত বের হওয়া সম্ভব, আবার কখনো তার মৃত্যুর পরও বের হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন অঙ্গই তার আসল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা জীবিত—এ হুকুম প্রমাণ করা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ভ্রূণ তা জীবিতাবস্থায়ও মা'র অধীন নয়, তার মৃত্যুর পরও নয়।

যদি বলা হয়, যবেহর ব্যাপারে ভ্রূণ তার মার অনুসারী হবে, এটাই স্বাভাবিক। যেমন গোলামী থেকে আযাদকরণে সন্তান মা'র অধীন ও অনুসারী বিবেচিত হয়। মুক্তির জন্যে সন্তান হওয়া বা অন্য কোন চুক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাই।

জবাবে বলা হবে, একথা সেই দিক দিয়ে ভুল, যেখানে আমরা আগেই বলেছি যে, একটির হুকুমের উপর অপর একটি হুকুমকে কিয়াস করা যায় না—তা নিষিদ্ধ। অপর দিক দিয়ে তা অসঙ্গত যে, দাসীকে আযাদ করে দেয়া হবে, আর তারই সন্তানকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দাস বানিয়ে রাখা হবে। কেননা ওসব হুকুমে সন্তান মা'র অধীনই হয়ে থাকে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু মাকে যবেহ করা হলে তার সন্তান জীবিত বের হতে পারে, তাহলে মার যবেহতে তার যবেহ হয়ে যাবে না। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ভ্রূণ যবেহর দিক দিয়ে মা'র অধীন হবে না। কেননা ভ্রূণ যদি মা'র অনুসারী ও অধীন হয় যবেহর দিক দিয়ে, তাহলে মার যবেহ হওয়ার পর তার নিজের যবেহ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না।

তবে ইমাম মালিক এ ক্ষেত্রে সেই মতই গ্রহণ করেছেন, যা সুলায়মান, আবূ ইমরান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হল, নবী করীম (স) ফায়সালা দিয়েছেন যে, পশুর ভ্রূণের যবেহ তার মার মত যবেহ হবে যদি তা চেতনাসম্পন্ন অবস্থায় বের হয়। জুহরী ইবনে কাব ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণ বলতেন, ভ্রূণ সচেতন বা গায়ে পশম সম্পন্ন হলে তার মার যবেহই তারও যবেহ গণ্য হবে। আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকেও এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে বলা যাবে যে, এ হাদীসটিতে চেতনা বা পশমের উল্লেখ আছে। কিন্তু অপরাপর হাদীসে—যা অধিক সহীহ্—একথাটি অস্পষ্ট। তা জাবির, আবূ সাঈদ, আবুদ

দারদা, আবূ ইমামাতা প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত। তাতে চেতনা বা পশম হওয়ার কোন শর্তের উল্লেখ নেই। তাহলে এসব হাদীস অভিন্ন ধরা হবে না কেন? কেননা এসব হাদীস তো সেসব হাদীসকে অস্বীকার করে না, যাতে এই পশম বা চেতনার উল্লেখ আছে। আসলে এই উভয় ধরনের হাদীসই একটি হুকুমকেই অপরিহার্য করে তোলে। একটিতে সেই হুকুমের বিশেষীকরণ রয়েছে অন্যান্য হাদীসকে অস্বীকার না করেও। আর অপরাপর হাদীসে কথাটি অস্পষ্ট এবং সাধারণ, ব্যাপকভিত্তিক। আর আমরা যখন সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, পশম বা চেতনা না হলে মার যবেহটা ভ্রূণের যবেহরূপে গণ্য হবে না, সেটির যবেহ স্বতন্ত্রভাবে হতে হবে, এই অবস্থায় তা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার অঙ্গের মতই হওয়ার অতি নিকটবর্তী। চেতনা বা পশম হলে তার হুকুম নিজস্বভাবে হওয়া আবশ্যক। তখন হাদীসটির অর্থ হবে এই ঃ মা'র যবেহটা হলে তাকেও যবেহ করতে হবে, যেমন করে তার মাকে যবেহ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গী-সাথীদেরকে বলা যাবে, ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে ঃ চেতনা বা পশম হলে মার যবেহ তার যবেহ হয়ে যাবে—এ কথাটি মা'র যবেহকে নাস্তি করে দেয় যখন তা চেতনা সম্পন্ন হবে না। তাহলে অস্পষ্ট হাদীসসমূহকে কেন বিশেষীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হবে না? এই ধরনের দলীল কি আপনাদের মতে সাধারণকে বিশেষী করণের জন্যে যথেষ্ট? না, তার চাইতেও উত্তম?

ইমাম শাফেয়ীর মতের বিপরীত দলীল হল নবী করীম (স)-এর এ কথাটি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ আমাদের জন্যে দুটি মৃত ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। এই হাদীসের দলীল তাঁর নিকট দাবি করে সমস্ত মৃত জীবকেই হারাম গণ্য করা ওদুটি ছাড়া। তাই রাসূলের কথা ঃ ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহটির অর্থ এ হাদীস অনুযায়ী গ্রহণ করাই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

মৃতের চামড়া পাকা করার পর তা ব্যবহার করা

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ -

তোমাদের জন্যে মৃত ও রক্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْدَمًا -

বল, আমার নিকট যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে কিছু খাওয়া হারাম করা হয়নি শুধু মৃত বা রক্ত ব্যতীত।

আয়াতদ্বয়ের দাবি হচ্ছে সর্বপ্রকারের মৃতকে হারাম মনে করতে হবে, তার দেহের

অংশ তার চামড়াও এই হারামের আওতাভুক্ত। 'কেননা তার মধ্যে যে জীবন ছিল তার পরিবর্তে এখন মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।' 'কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাওয়া' কথাটি প্রমাণ করে যে, এ হারামকরণ কথাটি শুধু খাওয়ার দিক দিয়ে মাত্র খাওয়া হারাম। খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে লাগানো হারাম নয়। পাকাকরণ (Tanning)-এর পর মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) এই কথাই বলেছেন। তাঁর কথা হল ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ اَكْلُهَا وَاِنَّمَا حَرَمَ لَحْمُهَا –

তা খাওয়া হারাম, হারাম মৃত জন্তুর গোশ্ত।

পাকাকরণের পর মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে হুকুম কি, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীগণ, হাসান ইবনে সালিহ, সুফিয়ান সওরী, আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান আল-আকবরী, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, সে চামড়া পাকা করণের পর বিক্রয় করা জায়েয, তা কোন-না-কোন কাজে লাগিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কুকুর ও শূকরের চামড়া এ পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ কুকুর ইত্যাদি চামড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। বলেছেন, বিশেষভাবে শূকরের চামড়া ছাড়া আর সব জন্তুর চামড়াই পাকাকরণের দ্বারা পবিত্র করা যায়। ইমাম মালিক বলেছেন—মৃত জন্তুর চামড়ার উপর বসে ফায়দা পাওয়া অন্য কথায় এভাবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় ফুটাওয়ালা লম্বা চালনি বানানো ও সেভাবে তা ব্যবহার করা যায়। তবে তা বিক্রয় করা যায় না, তার উপর নামাযও পড়া যায় না।

ইমাম লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, মৃত জন্তুর চামড়া পাকাকরণের আগেও বিক্রয় করা যায়, যদি বলে দেয়া হয় যে, এটা মৃত জন্তুর চামড়া । যারা এই চামড়াকে পবিত্র বলেন, বলেন তা পরিচ্ছন্ন, তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলে করীম (স) থেকে বিভিন্ন শব্দে ও বিভিন্ন সূত্রের মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হাদীস, যার প্রত্যেকটি দ্বারা তার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হয়। একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাসের। বলেছেন ঃ

اَيُّمَا اَهَابَ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –

পাকাকরণ দ্বারা প্রস্তুত করা হলে যে কোন চামড়াই পবিত্র হবে।

হাসান উনজুন ইবনে কাতাদা, সালমা ইবনুল মুহবিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধে নবী করীম (স) একটি ঘরে উপস্থিত হল। তার আঙ্গিনার নিকটে ঝুলানো একটি মশক ছিল। তাঁকে বলা হল, এটা মরা জন্তুর চামড়া। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

ذَكَاةُ الْاَدِيْمِ دِبَاغَتُهُ –

চামড়ার পবিত্রতা হচ্ছে তাকে পাকাকরণ (Tanning)।

সাঈদ ইবনুল মুয়াইয়্যিব যায়দ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا -

মৃত জন্তুর চামড়ার পাকাকরণই তার পবিত্রতা।

সামাক ইকরামা সওদা বিনতে জাম'আতার এই কথাটি বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেছেন—আমাদের একটি ছাগী ছিল। পরে সেটি মরে যায়। আমরা সেটি দূরে ফেলে দিলাম। তখন নবী করীম (স) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের ছাগীটিকে কি করলে? বললাম, দূরে ফেলে দিয়েছি। তখন নবী করীম (স) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ -

বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর পক্ষে খাওয়া হারাম কিছুই পাইনি মৃত ও রক্ত ছাড়া।

তোমরা তো সেটির চামড়া প্রস্তুত ও পাকা করে উপকৃত হতে পারতে। তখন আমরা সেটির জন্যে লোক পাঠালাম ও তার ছামড়া চাড়ালাম, সেটিকে পাকা করলাম, সেটিকে পানি বহনের পাত্র বানালাম, তাতে রেখে পানি পান করলাম। শেষ পর্যন্ত সেটি কুশ্রী হয়ে গেল। উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, নবী করীম (স) পড়ে থাকা একটি মৃত ছাগী দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, এর মালিকের কি হয়েছে? তারা তো এর চামড়া পাকা করে উপকৃত হতে পারত। জুহরী, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, মায়মুনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—রাসূলে করীম (স) তাদের একটি মৃত ছাগী দেখতে পেলেন। বললেন ঃ তারা কেন এর চামড়া পরিপক্ক করল না? তাহলে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারত। তখন তারা বলল, হে রাসূল! ওটা তো মরা। বললেন, মরা জীব খাওয়াই শুধু হারাম (তার অন্যান্য অংশ কাজে ব্যবহার করা হারাম নয়)। এই ধরনের বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তার সব কয়টিতেই মৃত জন্তুর চামড়া পাকিয়ে পাক করে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। সেই সব হাদীস দীর্ঘতার ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

এসব হাদীসের সব কয়টিই 'মুতাওয়াতির' নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞান দেয় এবং তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে এটা সিদ্ধান্ত দেয় দুভাবে। একটি—এ হাদীসসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই তা কোন ভুল ধারণা বা মিথ্যার উপর এই ঐক্যবদ্ধতা কল্পনাতীত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ফিকাহবিদগণ তা সমানভাবে ও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মত গ্রহণে তাকে ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেছেন। সেসব হাদীস গৃহীত ও ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণিত, মৃত জীব হারাম ঘোষণাকারী আয়াত সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও । তাই আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, মরা জন্তুর চামড়া পরিপক্ক করার পূর্ব পর্যন্তই তা হারাম। তাছাড়া শুধু খাওয়াই যে হারাম তার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করেছি। عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ আয়াতাংশের ভিত্তিতে শুধু-খাওয়াই হারাম, চামড়া পরিপক্ক করার পর তো তা খাওয়ার আওতার বাইরে চলে যায়। অতএব তা হারামের আওতায় পড়ে না।

এতদসত্ত্বেও এসব হাদীসের উৎপত্তিই হয়েছে আয়াতে মৃত জন্তু হারাম ঘোষিত হওয়ার পর। তা যদি না হতো, তাহলে মৃত ছাগীর ব্যাপারে লোকেরা সংশয়ে পড়ে যেত। তাহলে তারা বলত না যে, ওটা মৃত। নবী করীম (স)-কেও বলতে হতো না যে, হারাম হচ্ছে শুধু খাওয়া। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মৃত জন্তুর হারাম ঘোষণা এসব হাদীসের উৎপত্তিরও আগের ব্যাপার। এসব হাদীস ব্যাখ্যাকারী আয়াতটির এ দিক দিয়ে যে, পরিপক্ককরণের পর চামড়া সম্পর্কে উদ্ধৃত আয়াতে কিছু বলা হয়নি।

ইমাম মালিক আমাদের সাথে একমত এ ব্যাপারে যে, চামড়া পরিপক্ক করার পর তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যায়। উদ্ধৃত হাদীসসমূহে পবিত্রকরণের পর তা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তা বিছানা হিসেবে বিছানো, তার উপর নামায পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তা বিক্রয় করা যাবে, তা বিছিয়ে নামায পড়া যাবে। বরং সব হাসীসেরই বক্তব্য হচ্ছে, তাকে পরিপক্ককরণই তার পবিত্রতা। আর তা যখন পবিত্র, তখন তার উপর নামায পড়ায় কোন মতদ্বৈততার অবকাশ থাকতে পারে না। সমস্ত চামড়া সম্পর্কেই একই কথা। লক্ষণীয়, চামড়া পরিপক্ককরণের পূর্ব পর্যন্ত তা হারামের আওতায় থাকে। তখন তার কোনরূপ ব্যবহার-ই হালাল নয়। যেমন তার গোশত কোন কাজে লাগানো যেতে পারে না। পরিপক্ককরণের পর তা মৃত জীবের হারাম হওয়ার আওতা-বহির্ভূত হওয়ার ব্যাপারে আমরা সকলেই যখন একমত, তখন প্রমাণিত হল যে, তা পবিত্র ও পাক মৌলিকভাবে, এ-ও প্রমাণিত যে, তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করাই শুধু হারাম। আর তা যখন খাওয়ার সীমার বাইরে পড়ে গেল, তখন তা কাপড় বা কাষ্ঠের মত দোষমুক্ত হয়ে গেল। ইমাম মালিকের আমাদের সাথে এই ঐকমত্য প্রমাণ করে যে, মৃত জন্তু পশম ও চুল ব্যবহার করাও জায়েয। কেননা তা শুধু খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। চামড়া পরিপক্ক করার পরও পশম বা চুল চামড়ার সাথে থাকে। অতএব চামড়া যখন ব্যবহার করা যাচ্ছে, তখন তার পশমও ব্যবহার করা যাবে।

যদি কেউ বলেন, চুল ও পশম ব্যবহার করাই শুধু জায়েয। কেননা তা জীবিত থাকা অবস্থায়ও গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জবাবে বলা যাবে, তার মুবাহ হওয়ার 'ইল্লাত' পশম ও চুল ব্যবহার নিষেধ করে না। অর্থাৎ যে কারণে চামড়া ব্যবহার জায়েয, সেই কারণে চুল ও পশম ব্যবহারও জায়েয। তা হলে মুবাহ্ হওয়ার দুটি 'ইল্লাত' হয়। একটি যার কারণে তা খাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়টি, তার জীবিত থাকা অবস্থায় তা গ্রহণ করা হলে তবে তা ব্যবহার করে ফায়দা পাওয়া। এ দুটি কর্তব্যের নিয়ামক একই এবং অভিন্ন। আর এই 'ইল্লাত' যখন আমরা নির্দিষ্ট করলাম, তখন চামড়াকে তার উপর কিয়াস করা কর্তব্য। আর যদি অন্য কোন 'ইল্লাত' নির্ধারিত হয়, তা হলে হুকুমটা ভিন্ন হবে।

আল-হাকাম আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) লিখে পাঠানো এক পত্র আমাদেরকে পড়ে শোনান হয়েছে। তাতে লেখা ছিল ঃ 'তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া প্রস্তুতকরণ এবং তার

হাড় দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।' এ দলীলের ভিত্তিতে কেউ কেউ মৃত জন্তুর চামড়া পরিপক্ককরণের পরও নিষিদ্ধ হওয়ার মত প্রমাণ করতে চেয়েছে। অথচ তা মুবাহ প্রমাণকারী হাদীসমূহের এই হাদীসটি দ্বারা বিরোধিতা বা মুকাবিলা করা সঙ্গত হতে পারে না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে, আমরা ইতিপূর্বে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের, তা নিশ্চিত ইল্‌ম দেয়। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইম বর্ণিত হাদীসটি 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আসিম ইবনে আলী কায়স ইবনে রুবাই, হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের নিকট লিখে পাঠিয়েছেন, তোমরা মৃতু জন্তু থেকে কোনভাবেই উপকৃত হবে না, তাকে প্রস্তুত করে কিংবা কোন অস্থি দ্বারা। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, উমর উবনুল খাত্তাব তাদের প্রতি এই কথা লিখে পাঠিয়েছেন। অতএব এই ধরনের হাদীস দ্বারা আমাদের পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহের মুকাবিলা করা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। অন্য একটি দিক দিয়ে বলা যায়, এই উভয় হাদীস যদি সমান মানে বর্ণিত হয়ে থাকত, তবুও মুবাহ প্রমাণকারী হাদীস অতীব উত্তম বিবেচিত হতো। কেননা মানুষ তা ব্যবহার করছে। আর ফিকাহবিদগণ তা কবুলও করেছেন। আর একটি কারণ হচ্ছে—আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম বর্ণিত হাদীস যদি আমাদের উপরোদ্ধৃত হাদীস সমূহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তা হলে তাতে পরিপক্ককরণের পর চামড়ার ব্যবহার হারাম হওয়ার কোন কারণই আর অবশিষ্ট থাকে না। কেননা তাতে বলা হয়েছে, মৃত জন্তুর চামড়া প্রস্তুত করে এবং অস্থি কোন উপকারী কাজে ব্যবহার করবে না। এটা পরিপক্ককরণ পূর্বের অবস্থা সম্পর্কিত কথা। যা পরিপক্ক করা হয়েছে তাকে اهَاب বলা হয় না। তখন বলা হয় 'আকিম' Leather বা চামড়া। তা হলে এ হাদীসে পরিপক্ক চামড়া হারাম হওয়ার কিছুই নেই। লাইস ইবনে সাদ মৃত জন্তুর চামড়া পরিপক্ক করার পূর্বে বিক্রয় করা পর্যায়ে যা বলেছেন, তা ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার। কেউই সে কথার সমর্থন করেন নি। তা সত্ত্বেও তা রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির পরিপন্থী ঃ

لَاتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلَاعَصَبٍ -

কেননা এই কথাটি পরিপক্ককরণের পূর্বাবস্থার সাথে—চামড়া যখন কাচা থাকে—সংশ্লিষ্ট। সেই অবস্থায়ই اهَاب বলা হয়। আর বিক্রয় করা চামড়া থেকে ফায়দা লাভের একটা বিরাট দিক। তাও নিষিদ্ধ মনে করতে হয় রাসূলের এই কথাটির কারণে।

আবূ বকর বলেছেন, কেউ যদি বলে যে, রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ

اِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ اَكْلُهَا -

মৃত জীব শুধু খাওয়াই হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, চামড়া শুধু খাওয়াই হারাম, বিক্রয় করা নয়। তা হলে তো তার গোশত বিক্রয় করা হালাল হয়ে যায়। কেননা হাদীসের কথা শুধু খাওয়া হারাম,

খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা হারাম নয়। তা সত্ত্বেও 'মৃত জীবের গোশত খাওয়া হারাম' এই কথা সত্ত্বেও গোশত বিক্রয় করা যদি হারাম হয়ে থাকে, তা হলে পরিপক্ক করার পূর্বে চামড়া সম্পর্কেও সেই সিদ্ধান্তই হবে। যদি কেউ বলে, গোশত বিক্রয় করাও হারাম হয়েছে খাওয়া হারাম হওয়ার দরুন। জবাবে বলা যাবে, আমরা চামড়া বিক্রয় নিষিদ্ধ করব রাসূলের এই কথার ভিত্তিতে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -

তোমাদের উপর মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

এই হাদীসে চামড়া ও গোশতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। এই সমস্তটা থেকে বিশেষীকরণের আওতায় আসে শুধু পরিপক্ক করার মাধ্যমে। অন্য কোনভাবে নয়। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُرْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا -

আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছিল।

আর চামড়াও যখন পরিপক্ককরণের পূর্বাবস্থায় খাওয়া হারাম, যেমন গোশত হারাম, তখন তা বিক্রয় করা জায়েয না হওয়াই আবশ্যক, যেমন গোশত বিক্রয় করা হারাম। যেমন অন্যান্য সমস্ত হারাম জিনিস বিক্রয় করা—যেমন মদ্য, রক্ত প্রভৃতি হারাম। আর কুকুরের চামড়া যদি পরিপক্ক করা হয়, তা হলে তা পবিত্র হতে পারে মৃত কুকুরের চামড়া হলেও কেননা নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اِيَّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ -

যে কোন কাঁচা চামড়া পাকা করা হলে তা পাক ও পবিত্র হয়ে যায়।

বলেছেন ঃ

دِبَاغُ الْاَدِيْمِ ذَكَاتُهُ -

চামড়া পরিপক্ককরণ-ই তার পবিত্রতা।

এ সব কথায় কুকুরের চামড়া ও অন্যান্য জন্তুর চামড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর এজন্যে যে, তা যবেহ করে তার চামড়া পরিপক্ক করা হলে আমাদের মতে তা পবিত্র হয়ে যায়।

যদি বলা হয়, জীবদ্দশায় যদি নাপাক হয়, তাহলে শুধু পরিপক্ককরণের দ্বারা তা পাক ও পবিত্র হবে কি করে ? জবাবে বলা যাবে, তা পবিত্র হবে, যেমন করে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র হয়, যদিও তা নাপাক। কেননা পরিপক্ককরণই তার পবিত্রতা। যেমন যবেহ্। অবশ্য শূকর কোন অবস্থায়ই পবিত্র হতে পারে না। কেননা তার মূল ও সবটাই

হারাম। ঠিক মদ্য যেমন, রক্ত যেমন, তাতে পবিত্রকরণের কোন কাজ হতে পারে না। তার জীবদ্দশায়ও তা থেকে কোনরূপ উপকৃত হওয়া বা ফায়দা লাভ করা জায়েয হয় না। কুকুর দ্বারা তার জীবদ্দশায়ও ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা তা মৌলিকভাবে হারাম নয়।

মরা জন্তুর চর্বি ব্যবহার হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَلَدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ –

নিশ্চিতভাবে তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত জন্তু রক্ত ও শূকরের গোশত।

বলেছেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً –

বল, আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাওয়া হারাম এমন কিছুই পাই না। তবে যদি মৃত হয় ....

এ দুটি আয়াত এক সাথে মৃত জীবের চর্বি বা তেল নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন করে এ সবের গোশত ও অন্যান্য সমস্ত অংশ নিষিদ্ধ।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আতা জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—রাসূলে করীম (স) যখন মদীনা উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর নিকট ক্রুশধারী-(গোশত থেকে চর্বি নিষ্কাশনকারী) লোকেরা উপস্থিত হল। তারা বলল ঃ হে রাসূল! আমরা তো এ সব চর্বি একত্র করি মৃত জন্তুর গোশত থেকে, তার কর্দমাক্ততা থেকে। তা চামড়ায় ও নৌকায় ব্যবহৃত হয়। জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا –

আল্লাহ তো ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছিল।

অতঃপর নবী করীম (স) তাদেরকে সে কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ ভাবে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র চর্বি হারামকরণ সাধারণ ও নিঃশর্তভাবে হয়েছে। ফলে তা বিক্রয় করাও হারাম হয়ে গেছে। যেমন তা খাওয়া হারাম ঘোষিত। ইবনে জুরাইজ আতা সূত্রে বর্ণনা এসেছে যে, মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা নৌকার পিঠ মর্দন করা হয়। এই কথাটি বিরল। তার হারাম হওয়া পর্যায়ে সাহাবীর কথাও এসেছে। আর উদ্ধৃত আয়াত দ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়।

চর্বি-মাখনের মধ্যে ইঁদুর মরলে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

এসব আয়াতে তরল প্রবহমান জিনিসের মধ্যে পড়ে যা মরে, তা হারাম হওয়ার কোন দাবি দেখা যায় না। শুধু মূল মৃত জীবটাই হারাম হওয়ার দাবি প্রকট। আর যা মৃতের পারিপার্শ্বিক, তা-ও হারাম। তাকে মৃত বলা যায় না। তাই তা হারামের আওতার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খাওয়া হারাম নবী করীম (স)-এর সুন্নাতের ভিত্তিতে। সুন্নাত বা হাদীসটি জুহরী বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আবূ হুরায়রা সূত্রে। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স)-কে চর্বি বা তেলের মধ্যে পড়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, যদি তা জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে, গলে গিয়ে না থাকে, তা হলে তা এবং তার আশ-পাশের জমাট বাঁধা চর্বি বা তেল ফেলে দাও। আর যদি তা তরল ও প্রবহমান হয়, তাহলে তার কাছেও যাবে না।

আবূ সাঈদ খুদরী নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। জুহরী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-মায়মুনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি ইঁদুর চর্বির মধ্যে পড়েছিল ও মরে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন, সেটি এবং সেটির আশ-পাশ ফেলে দাও। তার পরে যা থাকবে তা খাও।

আবদুল জব্বার ইবনে উমর ইবনে শিহাব—সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁকে তৈলে পড়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাস করল। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তা জমাট বাঁধা কিনা? বলল, হ্যাঁ। তখন বললেন, 'ইদুর ও তার আশ-পাশ থেকে তৈল বাইরে ফেলে দাও। তার পরে যা থাকে তাই খাও।' তারা বলল, হে রাসূল, চর্বি তো তরল ও প্রবহমান। তখন তিনি বললেন, তাহলে তা অন্যভাবে ব্যবহার কর; কিন্তু খাবে না।

নবী করীম (স) সে চর্বি খাওয়া ছাড়া অন্যভাবে তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে তা বিক্রয় করা জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা তা দিয়ে উপকৃত হওয়ার অনেকগুলো দিকের মধ্যে বিক্রয় করাও একটি দিক। তার মধ্যে কোন একটি দিককে রাসূলে করীম (স) নির্দিষ্ট করে দেননি।

ইবনে উমর, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও হাসান—প্রাচীন ফিকাহবিদদের মধ্যে এই কয়জন তা খাওয়া ছাড়া অন্য যে-কোন ভাবে ব্যবহার ও তা

থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। আবূ মূসা বলেছেন ঃ 'তোমরা তা বিক্রয় করে দাও। তা লোকদের খাওয়াবে না'। কোন একজন ফিকাহ্‌বিদও তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ মনে করেন বলে আমাদের জানা নেই। তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা প্রদীপে জ্বালিয়ে আলো লাভ করে এবং তদ্দ্বারা চামড়া পরিপক্ক করে। আমাদের ফিকাহবিদদের মতে তা বিক্রয় করা জায়েয। তবে বিক্রয়ের সময় তার দোষটা বলে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ীর মত হিসেবে বলা হয়েছে, তা বিক্রয় করা জায়েয নয়, তবে তা জ্বালিয়ে আলো গ্রহণ জায়েয। ইবনে উমর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে কোনরূপ বিশেষীকরণ ব্যতীতই তা থেকে ফায়দা গ্রহণ সাধারণভাবেই জায়েয। কোন দিক দিয়ে জায়েয ও কোন দিক দিয়ে জায়েয নয়—এমনটা নয়। তা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শুধু খাওয়াই হারাম, অন্যভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম নয়। তা বিক্রয় করাও জায়েয। যেমন করে ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয এমন সমস্ত জিনিসই বিক্রয় করা জায়েয। যেমন গাধা ও খচ্চর। কেননা এসব জন্তু বিক্রয় নিষিদ্ধ করার কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। কেননা এগুলো মৌলিকভাবে হারাম নয়।

যদি বলা হয়, উম্মে ওয়ালাদ—যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান হয়েছে এবং যে ক্রীতদাসীর সাথে কাজের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার চুক্তি হয়েছে—এ দুজন থেকেও উপকৃত হওয়া জায়েয; কিন্তু অদের বিক্রয় করা জায়েয নয়, তাহলে ?

জবাবে বলা যাবে, এখানে আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করছি, তোমার এ প্রশ্ন সে বিষয়ের আওতায় পড়ে না। কেননা আমরা তো একটা অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। প্রমাণ করেছি, যা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয, তা বিক্রয় করা নিষেধ করার কারো অধিকার নেই। তা খাওয়া হারাম বলে তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা খাওয়া ছাড়া অন্যভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তার বিক্রয় নিষিদ্ধ করা অধিকার কারো নেই। কিন্তু মুদাব্বির ও উম্মে ওয়ালাদ—যে দুই ধরনের ক্রীতদাস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ওদের ন্যায্য হক হচ্ছে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া, আযাদ হওয়া। তাদের বিক্রয় করা জায়েয হলে তাদের এই মানবিক অধিকার অপহৃত হয়ে যায়। এই কারণে তাদের বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, যদিও তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সব পথই উন্মুক্ত। কিন্তু এটা মৃত জন্তুর তেল-এর মত নয় ফিকাহবিদদের মতে। কেননা এটা তো মৌলিকভাবেই হারাম। যেমন তার গোশত থেকে যে কোনভাবে উপকৃত হওয়াও হারাম। ইঁদুর যে তরল জিনিসের মধ্যে পড়ে মরেছে, তা নিজস্ব ও মূলগতভাবে হারাম নয়, তা খাওয়া হারাম এজন্যে যে, তা একটা মৃত জীবের পাশে ছিল। খাওয়া ছাড়া তা থেকে উপকৃত হওয়ার যত দিক রয়েছে, তা সবই হালাল নিঃশর্তভাবে। তবে খাওয়া যাবে না। তাই তা বিক্রয় করা গাধা খচ্চর কুকুর বিক্রয়ের মতই ব্যাপার। এ সবের দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয, যদিও তা খাওয়া জায়েয নয়। যেমন ক্রীতাদাসদের বিক্রয় করা জায়েয, যেমন তাদের থেকে সর্বতভাবে উপকৃত হওয়াও জায়েয। নবী করীম (স) ইঁদুরটা ফেলে দিতে বলেছেন, আর তার চারপাশে জমাট বাঁধা চর্বি ও তেলও ফেলে দিতে বলেছেন। তার দুটি অর্থ, একটি—যা মূলতই নাপাক, তা তার চতুষ্পার্শ্ব-প্রতিবেশও নাপাক করে দেয়। তাই মরা

ইঁদুরের চারপাশও নাপাক, মনে করতে হবে। আর যা তার প্রতিবেশকে নাপাক করে, তার প্রতিবেশ কিন্তু তার চারপাশকে নাপাক করে না। এ কারণে মরা ইঁদুরের চারপাশ না-পাক বলা হলেও সেই চারপাশের প্রতিবেশকে না-পাক বলা হয়নি। তা না হলে পাত্রের সমস্ত চর্বি ও তেলকেই নাপাক বলতে হয়। কেননা তার প্রতিটি অংশই তার প্রতিবেশী। একটি মৌলনীতি। তা সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। আর তার প্রতিটিই প্রমাণ করে যে, নাজাসাত বা নাপাকির কয়েকটা স্তর রয়েছে, তা হচ্ছে নাজাসাতে বালীশাহ্—কঠিনভাবে নাপাক আর নাজাসাতে খলীফা—হালকা নাপাক। তা মর্যাদার দিক দিয়ে সমান নয়। এ কারণে খলীফা ও গলীনার দলীল অনুযায়ী কোনটিতে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি ও কোনটিতে অনেক বেশি পরিমাণ গণ্য করতে হবে।

যে পাত্রে পাখী পড়ে মরে যায়

আবূ জাফর আত-তাহাভী বলেছেন, আমি আবূ হাযিম আল-কাযীকে সুয়ায়দ ইবনে সাঈদ আলী ইবনে মশহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি (আবূ হাযিম) বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার নিকট বসা ছিলাম। সেখানে ইবনুল মুবারক একজন খুরাসানীর সুরত-শিকল সহ উপস্থি হল। পরে তিনি ইমামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে একটি বড় ডেগ চুলার আগুনের উপর বসাল, তাতে গোশত রাখা ছিল। একটি পাখী উড়ে তাতে পতিত হল ও মরে গেল। এরূপ অবস্থায় শরীয়াতের নির্দেশ কি ? ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কি মনে কর ? তাঁরা তাঁকে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি মত শোনালেন। তাহলে সে গোশত ধুয়ে খাওয়া যাবে। শুরুয়া ঢেলে ফেলতে হবে। তখন ইমাম আবূ হানীফাও এ কথাই সমর্থন করলেন। কিন্তু আমাদের মতে তাতে একটি শর্ত আছে—পাখীটি যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন ডেগের গোশত শান্ত হয়ে পড়ে আছে—যেমন উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে—তবে উক্ত হুকুম। কিন্তু পাখি যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন তা ওলট-পালট খাচ্ছিল, তাহলে সে গোশত ও শুরুয়া কিছুই খাওয়া যাবে না। ইবনুল মুবারক তাঁকে বললেন ঃ তা কেন ? বললেন, কেননা গোশতের ওলট-পালট খাওয়া অবস্থায় যদি পাখিটি পড়ে ও মরে যায়, তাহলে একটা মরা জীব হালাল গোশতের সাথে মিশে গেল। আর যদি ডেগের গোশত শান্ত থাকা অবস্থায় পড়ে ও মরে যায়, তাহলে একটা মৃত জীব হালাল গোশতকে ময়লাযুক্ত করে দিল মাত্র। তখন ইবনুল মুবারক বললেন, এটা স্বর্ণখচিত কথা।

ইবনুল মুবারক উবাদ ইবনে রাশেদ, হাসান সূত্রে ও ইমাম আবূ হানীফার জবাবের মতই বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন, ডেগের গোশত ওলট-পালট খাওয়া অবস্থায় পড়া ও তার শান্ত থাকা অবস্থায় পড়ার মধ্যে পার্থক্যের 'ইল্লাত' হচ্ছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন গোশত ভরা ডেগের মুরগী পড়া সম্পর্কে। তা পাকানর কারণে যদি ডেগের মধ্যে পড়ে মরে যায়, তাহলে সে ডেগের গোশত খাওয়া যায় বলে মনে করি না। কেননা তাতে একটি মৃত জীব পড়ে

মিশে একাকার হয়ে গেছে। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, ডেগের গোশত ধুয়ে ফেলতে হবে, তার পর খাওয়া যাবে। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, সে গোশত খাওয়া যাবে না। তবে বারবার ধুতে ও আগুনের তাপে উত্তপ্ত করতে হবে, যেন তাতে যতটা মিশেছে, তা সব দূর হয়ে যায়, তার পরই খাওয়া যাবে।

ইবনুল মুবারক উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-বাহিলী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে এমন একটা পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যা ডেগের মধ্যে পড়েছে ও মরে গেছে। বলা হল সব শুরুয়া ফেলে দিতে হবে এবং তার গোশত খাওয়া যাবে। এ বর্ণনায় গোশতের ওলট-পালট অবস্থার উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনে সওবান সায়েব ইবনে খাব্বার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার একটা ডেগ চুলার উপর বসান ছিল। হঠাৎ করে তার উপর একটি মুরগী পড়ল, মরে গেল এবং গোশতের সঙ্গে রান্না হয়ে গেল। তখন আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা যাবে ? বললেন ঃ মৃত মুরগীটা বাইরে নিক্ষেপ কর, তার শুরুয়া বাইরে ফেলে দাও এবং গোশত খাও। আর যদি তোমার খেতে ঘৃণা হয়, তাহলে তার থেকে এটা বা দুটা অংশ আমার নিকট পাঠিয়ে দিও। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ডেগের গোশতের ওলট-পালট খেতে থাকা অবস্থার কোন বিশেষত্ব নেই। কেননা হতে পারে তা ওলট-পালট খাওয়া থেমে যাওয়ার পর তাতে মুরগীটি পড়েছে, আর শুরুয়া তখন উত্তপ্ত হওয়ার কারণে মুরগীটিও রান্না হয়ে গেছে।

মৃত জন্তুর দম্বল ও দুগ্ধ

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ মৃত জীবের দুগ্ধ ও ঘ্রাণ পাক, সে দুটিকে নাপাক বলা যায় না। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও সওরী বলেছেন, মৃত জন্তুর দুগ্ধ মাকরূহ। কেননা তা নাপাক পাত্রে রয়েছে। তার দম্বল যদি তরল প্রবহমান হয় এবং হয় জমাটবাঁধা, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তাঁরা সকলেই মৃত মুরগীর আন্ডা সম্পর্কে বলেছেন—তাতেও কোন দোষ নেই। মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, মৃতের স্তনে থাকা দুধ হালাল নয়। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, মৃত মুরগীর পেট থেকে যে ডিম বের হয়, তা খাওয়া যাবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান বলেছেন, এ ব্যাপারে কোন সুবিধাদান আমি অপছন্দ করি।

আবূ বকর বলেছেন, মৃতের দুগ্ধকে মৃত্যু হুকুমের অধীন বানানো ঠিক হবে না। কেননা দুগ্ধের জীবন বা মৃত্যুর কোন প্রশ্ন উঠে না। বোঝা যায়, মৃত জীবিত থাকা অবস্থায় তা তার থেকে নিয়ে নিতে হবে, তাহলে তা খাওয়া যাবে। যদি তার মৃত্যু ঘটে থাকে, তা হলে তা খাওয়া হালাল হবে না মূলকে যবেহ করা ব্যতীত। যেমন ছাগীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উপরন্তু আল্লাহ্র কথা ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ -

চতুষ্পদ জন্তুর পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে আমরা একটি জিনিস তোমাদেরকে পান করাই, তা হল খাঁটি দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্যে খুবই উপাদেয় ও পিপাসা নিবারক।

আল্লাহ্র এই কথা সর্ব প্রকারের দুগ্ধে প্রযোজ্য। সর্ব প্রকারের দুগ্ধ সম্পর্কেই একথা সত্য। ফলে দুই জিনিস আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে—দুগ্ধ কখনই মরে না। ছাগীর মৃত্যুতে তার স্তনের দুগ্ধ হারাম হয়ে যায় না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—ছাগীর মৃত্যুতে সে দুগ্ধ নাপাক হয়ে যায় না। কোন মৃতের পাত্রে রক্ষিত দুগ্ধের মতও হয়ে যায় না তা।

যদি বলা হয়, এই দুধ ও জীবিত ছাগীর স্তন থেকে দোহন করে নাপাক পাত্রে রাখা দুগ্ধের, আর যে দুগ্ধ স্তনে রয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য কি ?

জবাবে বলা যাবে, এ দুগ্ধসমূহের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সৃষ্টির স্থান নাপাক করে না, যা তার চারপাশে রয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। এর প্রমাণ, রগ-রিশ রক্তের প্রতিবেশি হওয়া সত্ত্বেও গোশত খাওয়া পর্যায়ে সব মুসলমানের ঐকমত্য। তাকে পাক করা হয়নি, ধৌতও করা হয়নি। তা থেকে প্রমাণিত হল—সৃষ্টির স্থানে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নাপাক হয়ে যায় না। আর দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'গোবর ও রক্তের মাঝ দিয়ে খাঁটি দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্যে পিপাসা নিবৃত্তকারী,' এ কথাটি দুদিক দিয়ে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। একটি —আলোচনার শুরুতে আমরা আগেই যা বলেছি, জীবন্তু জীবের দুধ ও মৃত জীবের দুধ প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয়, আল্লাহ এই খবর দিয়েছেন যে, তা গোবর ও রক্তের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসে। আর এই গোবর ও রক্ত নাপাক। অথচ দুধ পরম পবিত্র। তা গোবর রক্তের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তার নাপাক হওয়ার কারণ ঘটেনি। কেননা দুধ তো সেখানেই সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মৃতের স্তনে ছিল বলেই তার নাপাক হওয়ার কারণ দেখা দেয়নি। তা একথাও প্রমাণ করে, যা শরীক জাবির-ই করাম ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) তায়েফ যুদ্ধে পনির নিয়ে এলেন। তা লাঠি দিয়ে কুড়িয়ে তুলতেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ জিনিস কোথায় বানানো হয় ? লোকেরা বলল, পারস্য দেশে। বললেন, তোমরা বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে তারপর খাও। অথচ এটা জানা কথা যে, পারসিক অগ্নিপূজকদের যবেহকৃত জন্তু মৃত জন্তুবৎ। রাসূলে করীম (স) তা খাওয়া মুবাহ করেছেন, একথা জানা সত্ত্বেও যে, তা পারসিকদের তৈরী করা জিনিস। সেকালে তারা অগ্নিপূজক ছিল। তারা পনির বানাত দম্বল দিয়ে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মৃত জীবের দম্বল পবিত্র। কাসিম ইবনুল হাকিম, তালিব ইবনে আবদুল্লাহ, আতা ইবনে আবূ বিরাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মায়মূনা—রাসূলে করীম (স)-এর বেগম—বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-কে পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, চাকু চালাও, বিসমিল্লাহ্ বল এবং খাও। এ হাদীসেও রাসূলে করীম (স) এসব খাওয়া মুবাহ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কোন্‌টা মৃত জীবের দম্বল থেকে বানানো হয়েছে ও কোন্‌টা অন্য কিছু থেকে, এ ধরনের কোন পার্থক্য তার মধ্যে করেননি। হযরত আলী, উমর, সালমান, আয়েশা, ইবনে উমর, তালহা ইবনে

উবায়দুল্লাহ, উম্মে সালমা, হাসান ইবনে আলী (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম (রা) মৃত জীবের দম্বল দিয়ে বানানো পনির খাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দম্বল পবিত্র, তা মৃত জীব থেকে নেয়া হলেও। তা যদি পবিত্র হয়, তা হলে তা থেকে মৃতের দুধ ও দম্বল সবই পবিত্র বলে প্রমাণিত হল। এই দৃষ্টিতে মৃত মুরগীর পেট থেকে বের হওয়া ডিমও পবিত্র ও খাওয়া যেতে পারে বলে প্রমাণিত হয়। কেননা তা জীবিত মুরগীর পেট থেকে বের হওয়া ডিমের মতই পবিত্র, তা খাওয়া জায়েয যেমন, মৃত্যুর পরও তেমন। তাকে যদি ভিন্নভাবে পবিত্রকরণের প্রয়োজন হতো, তা হলে তা খাওয়া মুবাহ ঘোষিত হতো না। তার মূল পবিত্র, যেমন পবিত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কেননা তাকে পবিত্রকরণ শর্ত হলে, তার মূল পবিত্রকরণ ছাড়া সম্ভব হতো না।

মৃত জীবের চুল, পশম, হিংস্র জন্তুর চামড়া ও লোম

ইমাম আবূ হানীফা,আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ্ উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, মৃত জন্তুর হাড় ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া জায়েয। আর মৃত জন্তুর চুল, পশম বা লোম ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তা মৃত নয়। কেননা তা জীবের জীবিতকালেও আলাদা করে নেয়া হয়। লাইস বলেছেন, মৃত জন্তুর নার্ভ-শিরা ও স্নায়ু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যাবে না। তার পায়ের গোড়ালিও ব্যবহার করা যাবে না। তবে তার শিং, পায়ের ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার করে উকৃত হওয়া কোন দোষ দেখতে পাই না। মৃত জন্তুর হাড়, চুল, পশম ও লোমেরও কোন দোষ নেই।

আদুল বাকী ইবনে কানে, ইসমাইল ইবনুল ফজল, সুলায়মান ইবনে আবদুর রহমান দামিশকী, ইউসুফ ইবনুশ শাকর, আওজায়ী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, আবূ সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি উম্মে সালমা (রা)-কে বলতে শুনেছি; আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, মৃত জন্তুর নাভি পরিপক্ক করা হলে এবং তার পশম, লোম, চুল ও শিং পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে তা ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইসমাইল ইবনুল ফজল, হাসান ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে সালামাতা, ইবনে আবূ লায়লা, সাবিতুল বানানী, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবূ লায়লা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ লায়লা নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি পশুচর্মের উপর ও পশুচর্মে নির্মিত বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। জবাবে বললেন, তোমরা যদি তা পরিপক্ক করে নাও, তাহলে কোন দোষ থাকবে না।

ইয়াহইয়া আল হুমানী, সায়ফ ইবনে হারুন, আল বরজমী, সুলায়মান, তীমী, আবূ উসমান নহদী, সালমান আল ফারিসী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে পশুচর্ম, পনির ও মাখন চর্বি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—হালাল তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হালাল বলেছেন এবং হারাম তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হারাম বলেছেন। আর যে বিষয়ে কুরআনে কিছুই বলা হয় নি, মনে করতে হবে যে, সে জিনিসের গুনাহ তিনি মাফ করেছেন (অর্থাৎ তাতে গুনাহ নেই)।

আবূ বকর বলেছেন, এসব হাদীস অনুযায়ী চুল, পশম, পশুচর্ম ও পনির ইত্যাদি মুবাহ। তার দুটি দিক। একটি, যা উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আমরা বলেছি যে, মৃত জন্তুর চুল, পশম ইত্যাদি মুবাহ। আর ইবনে আবূ লায়লা বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী পশুচর্ম, পশুচর্ম নির্মিত সংকীর্ণ হাতার জামা ইত্যাদি মুবাহ। আর দ্বিতীয় তাই, যা সালমান বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। আর তা থেকে এ সব মুবাহ প্রমাণিত হয় দুটি দিক দিয়ে। একটি—যদি তা হারাম হতো, নবী করীম (স) অবশ্যই তা হারাম হওয়ার জবাব দিতেন। আর দ্বিতীয়—যা হারাম বা হালাল কোন পর্যায়ে উল্লিখিত হয়নি, তা মুবাহ। রাসূলে করীম (স) তাই বলেছেন যে, যে বিষয়ে চুপ থাকা হয়েছে, কিছুই বলা হয়নি, তা ক্ষমা। কিন্তু কুরআনে চুল, পশম, লোম ইত্যাদি হারাম বলা হয়নি; বরং কুরআন থেকেই তা মুবাহ প্রমাণিত হয়। সে প্রমাণকারী আয়াত হচ্ছে ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ - (النحل : ٥)

তিনি জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্যে পোশাকও রয়েছে। আরও নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও ...

دِفْءٌ পশুর পশম, লোম, চুল ইত্যাদি দিয়ে যে পোশাক বানানো হয়। এ থেকে মৃত ও জীবিত পশুর সব কিছু থেকে ফায়দা গ্রহণ মুবাহ প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ - (النحل : ٨٠)

তিনি জন্তু-জানোয়ারের পশম, চুল ও লোম দ্বারা তোমাদের জন্যে পরবার ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্যে।

এ আয়াতে যবেহ কৃত ও মৃত জন্তুর মধ্যে মুবাহ্ হওয়ার দিক দিয়ে কোনরূপ পার্থক্য বা তারমত্য করা হয়নি। মৃত জন্তুর এসব জিনিসকে যারা নিষিদ্ধ বলেন, তাদের দলীল হচ্ছে ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব-জন্তু হারাম করা হয়েছে।' এতে মৃত জীব-জন্তুর সব অঙ্গ ও অংশই শামিল রয়েছে। পশম, লোম, চুল, অস্থি ইত্যাদি মৃত জন্তুর অংশ বলে আয়াতে সেই সবকেও হারাম করেছে।

এর জবাবে বলা যাবে, এ আয়াতে মৃত জন্তু এবং তার সমস্ত অংশ ও অঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। অপর আয়াতও তাই প্রমাণ করে ঃ

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ -

বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে খাওয়া নিষিদ্ধ হারাম আমি পাচ্ছি না ....

এ আয়াত স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে—মৃত জীব শুধু খাওয়া—খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করাই হারাম, অন্যভাবে ব্যবহার করা হারাম নয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا -

মৃতের গোশত খাওয়াই শুধু হারাম।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا। মৃত জীব শুধু খাওয়াই হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ যে মৃত জীব হারাম করেছেন, তাতে নিহিত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য রাসূলে করীম (স)-ই স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করেছেন। আর পশম, লোম, অস্থি প্রভৃতি তো খাদ্য বস্তু নয়। অতএব তা নিষেধ ও হারামকরণের আওতায় পড়ে না। আর এই কারণে আমরা পরিপক্ককৃত চামড়াকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে মুবাহরূপে চিহ্নিত করেছি এই পর্যায়ে আসা হাদীসসমূহের ভিত্তিতে। কেননা এসব হাদীস থেকে বিশেষভাবে চুল, পশম ও লোম, আর যা খাদ্যবস্তু হিসেবে গণ্য নয়, তা হারামকৃত দ্রব্য সমষ্টি থেকে আলাদা করে মুবাহ সাব্যস্ত করেছি। সে হাদীসসমূহ আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। অপর দিক দিয়েও তা-ই প্রমাণিত হয়। তা হল মৃত জীবের চামড়া পরিপক্ককরনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর আওতার বাইরে পড়েছে ও মুবাহ্ প্রমাণিত হয়েছে, তখন চুল, পশম, লোম ইত্যাদি যা খাদ্যবস্তুর তালিকায় পড়ে না, তার সমস্তই মুবাহ্ হয়ে যাবে। তা ছাড়া যেসব হাদীসে মৃত জীবের চামড়া মুবাহ্ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে চুল, পশম, লোম ইত্যাদি উল্লিখিত হয়নি। বরং সাধারণভাবে তা সবই মুবাহ্ গণ্য হয়। অতএব সেসব জিনিস ব্যবহার করে ফায়দা গ্রহণ অবশ্যই মুবাহ্ হবে। চুল ও পশম এর মধ্যে গণ্য। এই চুল ও পশম যদি হারামই হতো তাহলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন। কেননা এটা তাঁর অজানা ছিল না যে, চামড়া জীব-জন্তুর দেহের অংশ এবং ওর নিজস্ব কোন জীবন নেই। আর যার বা যে জিনিসের নিজস্ব কোন জীবন নেই, তার মৃত্যুরও কোন প্রশ্ন উঠে না।

চুল, পশম, লোম ইত্যাদি নিজস্ব কোন জীবন নেই—এর বড় প্রমাণ হল, জীবন্ত পশুর গাত্র থেকে এগুলো কাটা হলে পশুটি কোন ব্যথা পায় না। যদি ওগুলোর নিজস্ব জীবন থাকত, তাহলে তা কাটার সময় জন্তুটি অবশ্যই ব্যথা অনুভব করত। যেমন অন্যান্য যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কাটলে ব্যথা পায়। প্রমাণিত হল যে, চুল, পশম, লোম, অস্থি, শিং, ক্ষুর ও পাগাড় ইত্যাদির কোন জীবন নেই। আর জীবন না থাকলে তার মৃত্যু হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, তাতে বৃদ্ধি পাওয়ার—বাড়ার ও বড় হওয়ার (growth) যে ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়, তা সেগুলোর নিজস্ব জীবনের প্রমাণ করে না। কেননা বৃক্ষ ও উদ্ভিদও বাড়ে, অথচ ওদেরও তো জীবন (জীবের জীবন) নেই। ওদের মৃত্যু হয় বলা যায় না।[১] জীব-জন্তুর পশম, লোম ও চুলের ব্যাপারও তাই। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

مَا بَانَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ -

চতুষ্পদ জন্তুর থেকে জীবন্ত থাকা অবস্থায় যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার ফলে তা মৃত অবস্থায় হয়ে যায়, তা-ই জীবন।

১. আধুনি জ্ঞানের আলোকে এ যুক্তি অগ্রহণীয়। আধুনিক বিজ্ঞান বৃক্ষ-গুল্মেরও জীবন আছে বলে প্রমাণ করেছে এবং ওদের ব্যথা বা আনন্দেরও অনুভূতি আছে—অনুবাদক।

চুল ও পশম জীবন্ত জীব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এগুলোতে মৃত্যু এলো বলা যায় না। যদি তাতে মৃত্যু আসে বলা যায়, তা হলে তার মূল্যটা যাবেহ না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারে না। যেমন জীবের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাতে মৃত্যু সংঘটিত হয় না। তার যবেহ করার প্রয়োজন হয় না।

হাসান, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও ইবরাহীম নখয়ী থেকে মৃত জন্তুর চুল ও পশম ব্যবহার মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আতা থেকে মৃত জন্তুর এসব জিনিস ব্যবহার মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা এসেছে। সেই সাথে হাতীর অস্থিও। তায়ূস থেকেও হাতীর অস্থির মকরূহ হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, তিনি একটি লোকের গায়ে পশুচর্মের জামা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, ওটি পবিত্র, তাহলে ওর একটা কাপড় আমার হওয়া আমার জন্যে খুবই আনন্দের কারণ হতো। আনাস উল্লেখ করেছেন, হযরত উমর একজন লোকের মাথায় অজগরের চামড়া নির্মিত একটি উচুঁ টুপী দেখলেন। পরে তিনি সেটি টেনে খুলে নিলেন, বললেন, তুমি কি জান, সম্ভবত এটা এমন চামড়ায় তৈরী যা পরিচ্ছন্ন—পবিত্র করা হয়নি।

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেক লোক তা মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মনীষিগণ তা মুবাহ বলেছেন। সাহাবা ও তাবেয়ীনের বিষয়ে মতামত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আতা ইবনে আব্বাস থেকে আবুয যুবায়র জাবির থেকে এবং মুতরফ আম্মার থেকে হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে হুসায়ন, হাসান, ইবরাহীম, দহাক ও ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, একজন বর্ণনাকারী বলেছেন, কাতাদাহ আবুল মুলাইহ থেকে, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ আবূ শায়খ-আল-হানায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া নবী করীম (স)-এর কয়েকজন সাহাবীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, নবী করীম (স)-চিতাবাঘের জ্বিন ধরে তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ, জানি।

এ দুটি হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে বিষয়ে জ্ঞানবানদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধ অর্থ হারাম করা। অর্থাৎ তা পরিধান করা সর্বাবস্থায়ই হারাম। অন্যরা বলেছেন, তা বড় জোর মাকরূহ। অবশ্য তা অনারবদের সাথে সাদৃশ্য। যেমন আবূ ইসহাক হুবাইরাতা ইবনে মরিয়ম হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, নিষেধ করেছেন রেশম মিশ্রিত কাতানের কাপড়[১] পরতে ও লাল বর্ণের কাপড় পরতে। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও হিংস্র জন্তুর পোশাক পরা ও তা ব্যবহার করা মুবাহ হওয়ার বর্ণনা এসেছে। বোঝা যায়, যে নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু মাকরূহ হওয়া বোঝায়, তাতে অনারবদের

১. আরবী ভাষায় القسى। বলতে বোঝায় রেশম মিশ্রিত কাতানের কাপড়। তা মিসর থেকে আমদানী করা হতো। মিসরের যে গ্রামে তা তৈরী হতো তার নাম القس।

সাথে সাদৃশ্য দেখায়। পূর্বেই আমরা সালমান প্রমুখ বর্ণিত পশুচর্মের পোশাক পরা ও তা ব্যবহার করা সম্পর্কিত নবী করীম (স)-এর হাদীস উদ্ধৃত করেছি। তাঁর কথা ঃ

اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –

যে কোন কাঁচা চামড়া পরিপক্ক করা হলেই তা পাক হয়ে যায়।

তাঁর কথা ঃ

دِبَاغُ الْاَدِيْمِ ذَكَاتُهُ –

চামড়া পরিপক্ক (tanning)-ই তার পবিত্রতা।

এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, হিংস্র জন্তুর চামড়া কোন ক্রমেই অপবিত্র নয়। বরং তার ব্যবহার বড়জোর মাকরূহ এবং অনারবদের সাথে সাদৃশ্য মাত্র।

রক্ত খাওয়া হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ –

তোমাদের প্রতি শুধু মৃত জন্তু ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।

বলেছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ –

তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।

রক্ত হারাম হওয়া পর্যায়ে এ দুটি আয়াত ছাড়া আর যদি কিছু না পাওয়া যেত; তাহলে সমস্ত প্রকারের রক্ত—তার পরিমাণ কম বা বেশী—অবশ্যই হারাম হয়ে যেত। পরে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّآاَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا –

বলে দাও, আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাদ্য হিসেবে কিছুই হারাম পাই না। তবে যদি মৃত বা প্রবাহিত রক্ত হয় (তাহলে তা হারাম)।

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রক্ত শুধু প্রবাহিত হলেই হারাম। যা প্রবাহিত হয় না, তা হারাম নয়।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কথা ঃ اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا 'অথবা প্রবাহিত রক্ত'। বিশেষীকৃত হয়ে শুধু তা-ই বোঝায় তা প্রবাহিত হওয়ার গুণে বিশেষিত আর শেষোক্ত দুই আয়াতের কথা সর্বপ্রকারের রক্ত শামিল করে। কাজেই তা সাধারণ ও ব্যাপকভিত্তিকই রাখতে হবে। কেননা আয়াতে বিশেষী করে চিহ্নিত করার কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্র এ কথাটিতে সর্ব প্রকারের রক্ত হারাম নয়—এর প্রমাণ রয়েছে। হারাম শুধু তা যা 'প্রবাহিত' বলে পরিচিত। কেননা তিনি বলে দিয়েছেন ঃ 'মৃত জীব ও প্রবাহিত রক্ত ছাড়া আল্লাহ্র নাযিল করা ওহীতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর পক্ষে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ হারাম আর কিছুই পাওয়া যায় নাই, যদি রক্ত প্রবাহিত হয়, তা হলে দুটি অবস্থার একটি হবে। হয় 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে' কথাটি 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' কথাটির পেছনে হবে। অথবা এ দুটিই একই সাথে নাযিল হয়ে থাকবে। কিন্তু কথা দুটির নাযিল হওয়ার তারিখ আমাদের জানা নেই। তাই আমরা ধরে নেব, দুটি আয়াত একসাথে নাযিল হয়েছে। তাই এক্ষণে রক্ত হারাম শুধু তাই যার এই পরিচিতি—প্রবাহিত হওয়ার পরিচিতি রয়েছে।

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মেরওয়াজী, হুসায়ন ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাজ্জাক ইবনে উয়াইনাতা, আমর ইবনে দীনার-ইকরামা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' এই আয়াতাংশ যদি নাযিল না হতো, তা হলে মুসলমানরাও ঠিক ইয়াহূদীদের পথ অনুসরণ করত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, হাসান, আবদুর রাজ্জাক, মামার, কাতাদা সূত্রে أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا এই আয়াতাংশ পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রক্তের প্রবাহিত যা, শুধু তা-ই হারাম। গোশতের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে, তা হারাম নয়।

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে গোশতের সাথে মিলে-মিশে থাকা রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং যবেহর স্থানে পড়ে থাকা যে রক্ত সে সম্পর্কে। জবাবে তিনি বললেন ঃ

إِنَّمَا نَهَى اللّٰهُ عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوْحِ –

কেবলমাত্র প্রবাহিত রক্তকেই আল্লাহ্ খেতে নিষেধ করেছেন।

রগে-রিশায় রক্তের অংশ থাকা সত্ত্বেও গোশত রান্না করে খাওয়া ফিকাহবিদদের মতে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা তা প্রবাহিত নয়। তার উপর পানি নিক্ষিপ্ত হলেই সে সব অংশ স্পষ্ট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তা কিন্তু হারাম নয়। কেননা তা তো مَسْفُوْحٌ 'প্রবাহিত' নয়। আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পক্ষহীন নীল মাছি, লম্ফ দিয়ে সবেগে চলা পোকা ও মাছির রক্ত নাপাক নয়। তাঁরা এও বলেছেন, মাছের রক্ত নাপাক নয়। তা রক্ত সহই খাওয়া যেতে পারে। পক্ষহীন নীল মাছির রক্ত সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন, তার পরিমাণ বেশী হলে তা দুয়ে নেবে। মাছির রক্তও ধুয়ে নেবে। মাছের রক্তও তাই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অযূ নষ্ট হয় যদি অঙ্গে রক্ত, মূত্র প্রভৃতির নাপাকি লাগে। সব রক্তই তার মধ্যে গণ্য। কেউ যদি বলেন, 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে' এবং 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' কথা দুটি মাছের রক্তকেও হারাম করে। কেননা তা প্রবাহিত। জবাবে বলা যাবে, তা হারামের সাধারণ হুকুম থেকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেছে রাসূল করীম (স)-এর এই কথার বলে ঃ

'আমার জন্যে মৃত মাছ ও পঙ্গপাল এই দুটির রক্ত হালাল করা হয়েছে' মাছের রক্ত প্রবাহিত ও দূরীভূত করা হয়নি, তা সত্ত্বেও তা মুবাহ বলা হয়েছে, মুসলিম জনতা এই হাদীসকে কবুল করে। দূর করা হয় নি মাছের এমন রক্ত মুবাহ্ প্রমাণ করেছেন। তখন আয়াতের সাধারণত্ব ও ব্যাপকত্বকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে মাছের রক্ত মুবাহ্ গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা তা যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে রক্ত প্রবাহিত না করা অবস্থায়ও তা হালাল হয়ে যেত—যেমন ছাগী, বকরী ও রক্তশীল অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু।

শূকর হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম করেছেন।

বলেছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃতজীব, রক্ত ও শূকরের গোশত।

বলেছেন ঃ

قُلْ لَّآاَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ -

বলে দিন, আমার নিকট যা পাঠানো হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে খাওয়া হারাম কিছুই পাইনি মৃত জীব বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত ছাড়া।

এই সব কয়টি আয়াতেই শূকরের গোশত হারাম ঘোষিত হয়েছে। গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এই তাৎপর্যই বুঝেছে ও গ্রহণ করেছে। এ আয়াতসমূহে বিশেষ করে ও স্পষ্টভাবে শূকরের গোশতের কথাই বলা হয়েছে নিষিদ্ধ বা হারাম হিসেবে, কিন্তু মূলত শুধু গোশতই নয়, তার সমস্ত অংশ ও অঙ্গই হারাম ও নিষিদ্ধ। তাহলে বিশেষভাবে গোশতের উল্লেখ কেন ? তার কারণ, মূলত গোশত-ই প্রধান, মানুষ গোশত থেকেই বেশী ফায়দা গ্রহণ করে। গোশতটাই লক্ষ্য। যেমন মুহরিমের জন্যে শিকার হত্যা করা হারাম। আসলে বক্তব্য হচ্ছে—শিকার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপই নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও তা হত্যা না করতে বিশেষভাবে বলার কারণ হচ্ছে, শিকার কাজের আসল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাণীটিকে হত্যা করা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির-এর দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর।

এ আয়াতে শুধু ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করতে বলা হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা সেটাই অধিক লাভজনক ব্যস্ততা। মানুষ বেশীর ভাগ তাতেই মশগুল হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু শুধু ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করতে বলাই মূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায থেকে বিরত ও বিমুখ রাখার সকল প্রকারের ব্যস্ততা পরিহার করতে বলা। নামায থেকে বিরত রাখা ও বিমুখ করার এই প্রধান ব্যস্ততার কথাটি সবকিছু পরিহার করার উপর তাগিদ ও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই সেটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ শূকরের গোশতের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে শুধু এই পরিপ্রেক্ষিতে। গোটা শূকর হারাম হওয়ার উপর অধিক তাগিদ আরোপের উদ্দেশ্যে, তার সবকিছু পরিহার করতে বলার তাগিদস্বরূপ।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, শূকরের শুধু গোশতই নয়, তার সবকিছু হারাম ও নিষিদ্ধ যদিও দলীলে বিশেষভাবে গোশতের উল্লেখ করা হয়েছে।

শূকরের চুল বা পশম ব্যবহার করা ও উপকার লাভ করা জায়েয কিনা, এ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ তা পশমী বস্ত্র বা টুপী হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, পশমী বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা আমি অপছন্দ বা ঘৃণা করি। তবে অন্য বর্ণনায় তা মুবাহ বলা হয়েছে। আওজায়ী বলেছেন, শূকরের পশমের সাথে সংমিশ্রণ করে ব্যবহার করা জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনে যখন বিশেষভাবে শূকরের গোশতের কথা বলা হয়েছে এবং তা সমগ্র শূকরের দেহ হারাম হওয়ার তাগিদস্বরূপ বিশেষভাবে গোশতের কথা বলা হয়েছে, তখন বলা সঙ্গত যে, তা তার পশম ও অন্য সব সহই হারাম এবং একথাও বলা সঙ্গত যে, যে যে জিনিসের জীবন নির্ভর তার উপর নির্ভরশীল, যা কেটে নিলে কষ্ট পেতে হয় না, সেগুলোও হারাম। কিন্তু পশমের যেহেতু জীবন নেই, তাই তা জীবদেহের অংশের মধ্যে গণ্য নয়, অতএব তা হারাম—এই হুকুম লাগানো যায় না। যেমন ইতিপূর্বে আমরা মৃত জীবের চুল ও পশম সম্পর্কে বলে এসেছি। যবেহকৃত জীব এবং মৃত জীবের চুল-পশম-লোম অভিন্ন। তবে আমাদের ফিকাহবিদগণ তা ব্যবহার করে ফায়দা গ্রহণ মুবাহ বলেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তারা তা ভাল মনে করেই জায়েয বলে মনে করেন। তা প্রমাণ করে যে, তাদের মতে চুল পশমসহ শূকরের সবকিছুই হারাম। তা পশমী কাপড়ে সংমিশ্রণ করে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন ভালো মনে করেই। তবে তা বিক্রয় করা বা ক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা মুসলিম জনগণ ও আলিমগণ জুতা নির্মাণকারীদেরকে কোনরূপ আপত্তি ছাড়া তা ব্যবহারের উপর বহাল রাখতে দেখেছেন। তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হওয়া পর্যায়ে আগের কালের লোকদের ইজমা হয়েছে, বলা চলে। আর সাধারণের কোন কাজ চলতে থাকা ও আগের লোকদের তাদেরকে সে কাজে বহাল রাখা এবং তার প্রতিবাদ না করা প্রমাণ করে যে, একাজ তাঁদের নিকট মুবাহরূপে গণ্য হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোন জ্ঞান পরিমাণের জ্ঞাত মজুরীর শর্ত ছাড়াই হাম্মামে (সাধারণ গোসল খানায়) প্রবেশ করা পর্যায়ে তাঁরা যা বলেছেন, তা। তাতে পানির ব্যবহার ও সেখানে অবস্থানের সময় মেয়াদ অনির্দিষ্ট থাকে। এটা আগের কালে

প্রকাশ্যভাবেই প্রচলিত ছিল। সে কাজ যারা করত, তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখার কোন চেষ্টাই হতো না। ফলে তা-ও তাদের ইজমায় পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যাদের নিকট শিল্পকর্মের অর্ডার দেয়ার ব্যাপারে। সাধারণ মানুষ এই কাজ করত বলে তারা এর অনুমতি দিয়েছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল সব পূর্বকালীন মনীষীদের রায়কে বহাল রাখা এবং তা ব্যবহার করার কোন প্রতিবাদ না করা, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তা মূলতই জায়েয। এর দৃষ্টান্ত অনেক।

মনীষিগণ পানির শূকর পর্যায়ে ভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, তা খাওয়া যাবে না। মালিক ইবনে আবূ লায়লা, শাফেয়ী ও আওজায়ী বলেছেন নদী-সমুদ্রে যতকিছু আছে তার কোন একটি খাওয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পানির মধ্যে বসবাসকারী শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। অনেকে সেটির নাম রেখেছেন পানির গাধা। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, পানির মধ্যের 'মানুষ' খাওয়া যাব না, পানির শূকরও নয়।'[১]

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ কথা : وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ এবং শূকরের গোশত হারাম হওয়ার কথাটি স্থলভাগ ও জলভাগের সব শূকরকে শামিল করে। কেননা সবটার নাম তো শূকরই। যদি বলা হয়, কথাটি মূলত স্থলভাগের শূকরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, কেননা এ নামটি সাধারণভাবেই ব্যবহার করা হয় স্থলভাগের শূকরের জন্যে। এ নাম পানির মধ্যে থাকা শূকরের জন্যে ব্যবহার করা হয় না। তা বোঝাতে হলে শর্তসহ নামটি বলতে হবে যেমন পানির মধ্যে শূকর। আর শুধু শূকর বললে স্থলভাগের শূকরই বোঝাবে, পানির শূকর নয়। এজন্যে পানির শূকরকে সাধারণত পানির গাধা বলা হয়।

জবাবে বলা যাবে, পানির শূকর হয় স্থলভাগের শূকরের আকার-আকৃতি হয়ে থাকবে। তার গুণ-পরিচিতও তা-ই হবে অথবা তা থেকে ভিন্নভাবে ও ভিন্ন গুণ-পরিচিতিতে। যদি তা স্থলভাগের শূকরের আকার-আকৃতির তাহলে নাম ব্যবহারের দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। আর কোনটির পানিতে থাকায় তার সম্পর্কিত শরীয়াতের হুকুমের কোন পরিবর্তন হবে না। কেননা এ উভয়টিই অভিন্ন আকার-আকৃতির। যদিও বিশেষভাবে স্থলভাগের শূকরই বোঝাবে। আর যদি ভিন্নতর আকার-আকৃতিতে সৃষ্ট হয়ে থাকে, আর এই কারণেই সেটিকে 'পানির গাধা' নাম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে—যা শূকর নয় সেটিকেই শূকর বলা হচ্ছে। আর একথা জানাই আছে যে, এগুলোর নামকরণে কেউ ভুল করে না। তাই বলতে হবে, পানির মধ্যের শূকরও আসলে শূকরই। 'শূকর' নামটাও তা শামিল করে। সেটিকে কথা-বার্তায় 'পানির গাধা' বললে সেটির শূকর হওয়া তো আর বদলে যায় না। হতে পারে দুটির মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্যে পানি শূকরকে 'পানির গাধা' বলতে শুরু করা হয়েছে। স্থল-কুকুর ও জল-কুকুরও তো এই রূপ পার্থক্যহীন। কেননা 'কুকুর' নামটাই উভয়কেই পরিব্যাপ্ত করে। যদিও গুণ-পরিচিতির কোন কোন দিক দিয়ে দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

১. বলা বাহুল্য এই কথা এ ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, পানির উপরে স্থলভাগে যত প্রকারের প্রাণী আছে, পানিতেও ঠিক তত প্রকারের প্রাণী রয়েছে—অনুবাদক।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে যবেহ করা জীব হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা হবে তা হারাম করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করা হবে, তা হারাম। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

অনেকের মনে করেছেন—এ আয়াতের শেষ কথাটি মূর্তি পূজারীদের বলিদানকৃত জীব-জন্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওরা তো আল্লাহ্‌র নামে নয়, ওদের মূর্তি ও দেব-দেবীর নামে পশু বলিদান করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -

এবং যা কোন আস্তানায়[১] যবেহ করা হয়েছে।

তাঁরা ঈসা-মসীহ্‌র নাম উচ্চারণ করে খৃস্টানরা যে পশু যবেহ করে তা মুসলমানদেরকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আতা, মকহুল, হাসান, শবী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যির প্রমুখ তাবেয়ী ফিকাহবিদ এই মত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন একথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা তাদের যবেহকৃত পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম নয়, ঈসা মসীহ্‌র নাম উচ্চারন করে।

ইমাম আওজায়ী লাইস ইবনে সাদেরও এই মত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক ও শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন—না, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেননা তারা যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, উচ্চারণ করে ঈসা-মসীহর নাম।

আল্লাহ্ কথা وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয় যে সব যবেহ কালে। এর বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে এরূপ পশু খাওয়া হারাম হওয়া অনিবার্য ও নিশ্চিত। কেননা তা যবেহ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করেনি, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করেছেন। أُهِلَّ শব্দটির মূল وَاهْلال আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম উচ্চারণ করা। পশু যবেহ কালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারোর নাম উচ্চারণ—সে ঈসা মসীহ্‌র নাম হোক, কি অপর কারো নাম—এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি উক্ত আয়াতে। কেননা তা আল্লাহর নাম তো হবে না, হবে তিনি ছাড়া অপর কারো নাম। আর সেই অপর যার নামই হোক না কেন, তা-ই উক্ত আয়াতের আওতায় পড়ে হারাম হয়ে যাবে।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানকে কুরআনে نصب বলা হয়েছে।

অপর আয়াতাংশ 'যা কোন আস্তানায় যবেহ্ করা হবে' আরবদের তাদের মূর্তি দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ্ করার যে প্রচলন ছিল, তার কথাই বলা হয়েছে এবং এই কথাটি ব্যাপাক ও সাধারণ। নির্দিষ্টভাবে কেবল তাই বোঝায় না। অতএব আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আর যারই নাম উচ্চারণ করা হোক, তা-ই এই আয়াতাংশের মধ্যে পড়ে হারাম হয়ে যাবে।

আতা ইবনে সায়েব জাদান ও মায়মারাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী বলেছেন ঃ তোমরা যখন শুনবে যে ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা পশু যবেহ্‌কালে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নাম উচ্চারণ করছে, তখন তোমরা তা খাবে না। আর তোমরা নিজেদের কানে যদি তা শুনতে না পাও, তাহলে তা খেতে পার। কেননা আল্লাহ্ ওদের যবেহ্‌কৃত পশু মুসলমানদের জন্যে হালাল করেছেন। অথচ যবেহ্‌কালে ওরা কি বলে তা আল্লাহ্‌র খুব ভালো করেই জানা আছে। যারা তাদের যবেহ্‌কৃত পশু খাওয়া মুবাহ্ বলেছেন, তাঁরা এই দলীলও দিয়েছেন যে, আহ্‌লি কিতাব লোকদের খাবার তো আল্লাহ্ মুবাহ্ করে দিয়েছেন, তারা যবেহ্‌কালে কি বলে তা জানা থাকা সত্ত্বেও । কিন্তু এটা তাদের পক্ষের কোন দলীল হতে পারে না। কেননা আহ্‌লি কিতাবের খাদ্য মুবাহ্ করা হয়েছে শর্তের ভিত্তিতে। আর সে শর্ত হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ্ আড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করবে না। কেননা আমরা তো উদ্ধৃত উভয় আয়াত অনুযায়ী একসাথে আমল করতে বাধ্য। তাই অনুমতির অর্থ হবে. আহ্‌লি কিতাবের খাবার (পশু) হালাল হবে যদি তারা যবেহ্‌কালে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নাম উচ্চারণ না করে।

যদি কেউ বলে, খৃস্টানরা যদি আল্লাহ্‌র নামও বলে, তাহলেও তা ঈসা-মসীহ্‌কেই মনে করে ও বোঝায়। প্রকৃত পক্ষে তা-ই যখন তাদের ইচ্ছা এবং তাদের যবেহ্‌কার্য সহীহ্ হওয়াটা নিষিদ্ধ হয় না, যদিও তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে। তেমনি তাদের আল্লাহ্‌র নাম লওয়াকালে তাদের মনের কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসা-মসীহ্‌র নাম লওয়া, তখন তো সেই অনুযায়ীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

জবাবে বলা হবে, না, তা জরুরী নয়। কেননা বাইরে যা হতে দেখা যায় বা কানে শুনা যায়, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব। কেননা কথা উচ্চারণের ব্যাপার। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর নাম উচ্চারিত হলে তাদের যবেহ্‌কৃত পশু হালাল হবে না وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ। অনুযায়ী। আর আল্লাহ্‌র নামই যখন শব্দে উচারিত হবে, তখন তা বলে তারা ঈসা-মসীহকে বুঝিয়েছেন বা মনে করেছেন, তা আমাদের ভাবনার কারণ নেই। নাম যখন উচ্চারিত হয়, তখন সেই নামের বাস্তব সত্তাকেই মনে করা বাঞ্ছনীয়। উচ্চারিত না আমলে যা বোঝায় না, তার উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। এটাই আমাদের মত। তা সত্ত্বেও নাম প্রকাশ করাকেই আমরা গণ্য করব, তা বলে তারা কি মনে করেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমাদের প্রয়োজন নেই। যে লোক প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র তওহীদের প্রতি ঈমান ও রাসূলের সত্যতা বিশ্বাস ঘোষণা করে, তখন তো সে একজন মুসলিম বলেই গণ্য হয়, যদিও তওহীদ বিরোধী

নানা খুচরা বিশ্বাস তার মনের মধ্যে থেকে যেতে পারে। নবী করীম (স)-এর একথাটি এই অর্থে গ্রহণীয় ঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ –

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। তারা যদি তা বলে, তাহলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মালকে আমার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। তবে এই কালেমার দাবিতে কিছু করা হলে ভিন্ন কথা। তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ তো আল্লাহ্‌র নিকট অর্পিত।

আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণের মধ্যে অনেক মুনাফিকও রয়েছে। তারা আসলে যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতটাই তারা প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও তাদেরকে সব মুশরিকদের মত মনে করা হয় নি এবং তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করা হয়নি যা মুশরিক কাফিরদের প্রতি অবলম্বিত হয়েছিল, বরং তাদের প্রকাশ্য ব্যাপারাদির প্রেক্ষিতে মুসলমান মনে করা হয়েছে এবং মুসলিমরূপেই তাদের সাথে যাবতীয় বৈষয়িক আচরণ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মনের মধ্যে তারা কি গোপন করে রেখেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করা হয়নি। অনুরূপভাবে খৃস্টানদের যবেহকে সহীহ্ মনে করা সঙ্গত। কেননা তারা আল্লাহ্‌র নাম প্রকাশ করে। তবে তারা যদি ঈসা-মসীহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তাদের যবেহ সহীহ ধরা যাবে না। যেমন মুশরিকদের যবেহ্ সহীহ্ নয়। কেননা তারা তো যবেহকালে তাদের মূর্তি ও দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করে।

মৃত জন্তু খাওয়া মুবাহ হয় কঠিন প্রয়োজনকালে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ –

যে লোক কঠিন ঠেকায় পড়ে যাবে—বিদ্রোহী হয়ে নয়, সীমা লঙ্ঘনকারী হয়েও নয়; তার উপর কোন গুনাহ্ চাপবে না।

বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে তার মধ্য থেকে কোন জিনিস খাবে গুনা করার প্রবণতা ছাড়াই তা হলে আল্লাহ নিশ্চয়ই গুনাহ মাফকারী ও দয়াবানা।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ –

আল্লাহ নিশ্চয়ই বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। তবে যা খাওয়ার জন্যে তোমরা নেহায়েত ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়ে যাও .....।

এসব আয়াতে সেই কঠিন প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে, যখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ খাবার খায়। কঠিন প্রয়োজনে পড়ে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই তা খাওয়া মুবাহ বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। এতে সর্বাবস্থায় প্রয়োজন হলে তা খাওয়া মুবাহ হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। শুধু একটি শর্ত', তা হচ্ছে কঠিন প্রয়োজন হওয়া।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ –

যে লোক কঠিন ঠেকায় পড়ে বাধ্য হবে, বিদ্রোহী হয়েও নয়, সীমালঙ্ঘনকারী হয়েও নয়।

এর বিভিন্ন অর্থ বলেছেন মনীষিগণ। ইবনে আব্বাস, হাসান ও মস্রূক বলেছেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ فِى الْمَيْتَةِ এর অর্থ মৃতের গোশতের ব্যাপারে বিদ্রোহী নয়; আর وَّلَا عَادٍ অর্থ খাওয়ার পরিমাণে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। হানীফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ ও মালিক ইবনে আনাস প্রমুখও তা-ই বলেছেন। মুসলমানদের উপর বিদ্রোহী ব্যক্তিদের জন্যে যেমন মৃত জন্তু খাওয়া মুবাহ প্রয়োজনের কারণে, তেমনি ন্যায়পন্থী লোকদের জন্যেও তাঁরা তা মুবাহ বলেছেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, মুসলমানদের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না হলে এবং তার বিদেশ গমণ কোনরূপ নাফরমানীর কাজের জন্যে না হলে ঠেকায় পড়ে মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল হবে। কিন্তু কারোর বিদেশ গমন আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজের জন্যে হলে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে তার জন্যে তা খাওয়া হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ী এই মত দিয়েছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ। তবে যা খাওয়ার জন্যে তোমরা নিতান্তই ঠেকায় পড়ে যাও। আয়াতাংশ অনুগত বিদ্রোহী সব মুসলমানের জন্যেই মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া মুবাহ করে দেয়। আল্লাহ্র অপর কথটি غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ 'বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘকারী নয়' এবং غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ 'কোন গুনাহের প্রবণতা ব্যতীতই;' এ দুটি আয়াতাংশে খাওয়ায় বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন অর্থ শামিল রয়েছে। তেমনি মুসললিম রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রভৃতি অর্থও হতে পারে। তাই শুধু সম্ভাব্যতা দেখে আয়াতের সাধারণত্বকে বিশেষীকরণ আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। বরং কোনরূপ বিশেষীকরণ ছাড়াই সাধারণত্বের তাৎপর্য রক্ষা করাই কর্তব্য। অধিকন্তু ফিকাহ্বিদদের মতের ঐক্য হয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদেশ গমন যদি আল্লাহ্র নাফরমানীর কোন কাজে না হয়, বরং সফর হয় হজ্জ বা জিহাদ অথবা ব্যবসায়ের জন্যে, তা সত্ত্বেও সে তার মাল গ্রহণের কারণে কোন ব্যক্তির উপর বিদ্রোহী হয়; কিংবা নামায তরক করে,

যাকাত না দিয়ে সীমালঙ্ঘনকারী হতে পারে, তা সত্ত্বেও তার এই বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন প্রয়োজনে মৃত জীব ভক্ষণ মুবাহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র কথা غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ 'বিদ্রোহীও নয়, সীমালঙ্ঘনকারীও নয়' সর্বপ্রকারের বিদ্রোহ-সীমালঙ্ঘন বন্ধ করার ইচ্ছা করা হয়নি। আয়াতে তেমন কোন বিশেষ জিনিসের উল্লেখও নেই। তাহলে বলতে হবে আয়াতটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অতএব প্রথমোক্ত আয়াতটি বিশেষ অর্থে বিশেষীকৃত করা সঙ্গত হবে না। কেননা তা তার প্রকৃত অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা কঠিন। খাওয়ায় সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ অর্থে তা ধারণ করা হলেই তাকে তার আসল ও সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করা হবে। যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা-ই গ্রহণ করা হবে। অতএব সে অর্থে ধারণ করা দুটি কারণে উত্তম। একটি, আয়াতটি তার সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে গৃহীত হবে, আর দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ। 'তবে যা করতে তোমরা চূড়ান্তভাবে বাধ্য হয়েছ, কথাটিকে বিশেষীকরণ করাকে কর্তব্য করে দেব না। আল্লাহ্র কথা : غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ 'কোন গুনাহের প্রবণতা ব্যতিরেকেই'-এর দুটি অর্থ হতে পারে। হয়, সমস্ত গুনাহ্ করার প্রবণতা হবে শেষ পর্যন্ত ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মুবাহ্ হওয়ার শর্ত হবে যে, সে খাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলতই কোন গুনাহ্ প্রবণ হবে না। এমন কি এক দিরহাম পরিমাণের জুলুম প্রতিহত করার দায়িত্ব ত্যাগ করা বা নামায, কিংবা রোযা তরক করার কাজে লিপ্ত হলেও, তা থেকে তওবা না করলে তার পক্ষে মৃত খাওয়া হালাল হবে না। অথবা তার পক্ষে খাওয়া জায়েয হবে কোন প্রকারের গুনাহ্ কাজে ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি তার বিদেশ সফর কোন গুনাহের জন্যে হবে না, রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীও হবে না। সকলের নিকটই একথা প্রমাণিত যে, কোন কোন গুনাহে লিপ্ত হলেই তার জন্যে প্রয়োজন কালে মৃত খাওয়া মুবাহ্ হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বোঝা গেল—তা বলা লক্ষ্য নয়। তার পরেও প্রয়োজন হচ্ছে সেই গুনাহ্ প্রমাণ করা উক্ত আয়াত ছাড়া আলাদা কোন দলীলের ভিত্তিতে যে, সে অবস্থায় মৃত খাওয়া মুবাহ্ হবে না। এমতাবস্থায় শব্দটি অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তাহলে আয়াতটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপর কোন দলীলের উপর নির্ভরশীল হবে। আয়াতের হুকুমটি কাজে লাগাতে সমর্থ হলেই তা খাওয়ায় বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন অর্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে কেবলমাত্র সেই পরিমাণ খাওয়াই জায়েয হবে, যে পরিমাণ খেলে প্রাণটা বাঁচানো যাবে, মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়টা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেন : وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না'। যে লোক 'মুবাহ' খাওয়া থেকে বিরত থেকে মরবে, সে তো নিজেকে ধ্বংস করল, নিজেকে নিজেই হত্যা করল। এটাই সকল ইল্মওয়ালা লোকদের মত। এ ব্যাপারে গুনাহ্গার কিংবা অনুগত, এর মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। বরং সেই অবস্থায় না খাওয়াই নাফরমানীর কারণ হয়ে পড়বে। অতএব প্রয়োজনের সময় মৃত খাওয়া মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপারে অনুগত ও নাফরমান অভিন্ন হবে। মুবাহ্ খাওয়া থেকে বিরত থাকলে ও তার ফলে মরে গেলেই বরং সে আল্লাহ্র নাফরমান হয়ে যাবে। যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হয় এবং নাফরমানীর কাজের জন্যে সফরে বের

হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনের সময় সম্ভাবনা ও প্রশস্ততাকালে যে যবেহ করা হয়, ঠেকার সময় মৃতটার সেই অবস্থায় গণ্য হবে।

যদি বলা হয়, তওবা করার মাধ্যমে মৃত খাওয়া মুবাহ হওয়া সম্ভব। আর যদি তওবা না করে, তা হলে সে নিজের উপরই অপরাধী।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, সে অপরাধী বটে; কিন্তু মৃত না খাওয়ার দরুন সে নিজের উপর যে অপরাধ করেছেন, তা তার জন্যে মুবাহ নয় যদি সে তওবা না-ও করে। কেননা তওবা না করলেও তার আত্মহত্যা মুবাহ হবে না। আর এই নাফরমান-গুনাহগার ব্যক্তি প্রয়োজনকালে যদি না খায় এবং তদ্দরুন মরে যায় তাহলে সে এক সঙ্গে দু'ধরনের গুনাহ করল। একটি হল সে গুনাহের কাজে ঘর থেকে বাইরে গিয়েছে। আর দ্বিতীয়, সে মৃত না খেয়ে নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে অনুগত ও নাফরমান খাদ্য হালাল কিংবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নয়, অভিন্ন। কেননা যেসব খাদ্য অনুগত বান্দাদের জন্যে হালাল, তা নাফরমান বান্দাদের জন্যেও হালাল। যা হারাম, তা উভয়ের জন্যেই হারাম। তাই প্রয়োজনে যে মৃত জন্তু খাওয়া অনুগত বান্দার জন্যে হালাল, তা নাফরমান বান্দাদের জন্যেও মুবাহ।

যদি বলা হয়, মৃত জীব খাওয়া কঠিন ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে রুখসাত নাফরমান—গুনাহগারের জন্যে তা রুখসাত নয়।

জবাবে বলা যাবে, এ কথাটি দুটি কারণে ভুল। একটি তোমার কথা ঃ ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে মৃত খাওয়া মুবাহ হওয়াটা একটা রুখসত। কেননা ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে মৃত খেয়ে জান বাঁচানো ফরয। ঠেকায় পড়াটা নিষেধকে দূর করে দিয়েছে। ঠেকায় পড়া ব্যক্তি যখনই মৃত খাওয়া থেকে বিরত থেকে মরে যাবে, তখনই সে আত্মহত্যাকারী হবে। সাধারণ অবস্থায় রুটি-ভাত খাওয়া, পানি পান করা থেকে মরে গেলে যেমন হয়। তখন সে আল্লাহ্র নাফরমান হয়ে যাবে, নিজের উপর অপরাধকারী হবে। আর ঠেকায় পড়া অ-বিদ্রোহী ব্যক্তির জন্যে এই মৃত খাওয়ার হুকুমে কোন মত-পার্থক্যই নেই। কাজেই ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মৃত খাওয়া মুবাহ। 'একটি রুখসাত' বলা ঠিক এই রকমেরই একটি কথা যে, ঠেকায় না পড়া ব্যক্তির জন্যে রুটি-ভাত খাওয়া ও পানি পান করা মুবাহ। কোন বুদ্ধিমান মানুষেই এরূপ কথা বলে না; বরং সকল মানুষই বলে ঃ ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মৃত জন্তু খেয়ে প্রাণ বাঁচানো ফরয। অতএব এ দুটি কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর রুটি-ভাত খাওয়া ও পানি পান করায় অনুগত বান্দা ও নাফরমান বান্দা যেমন অভিন্ন, তেমনি প্রয়োজন কালে মৃত জীব খাওয়ার ব্যাপারেও তারা অভিন্ন। আর দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, তোমার এই কথা যে, নাফরমান গুনাহগারের জন্যে কোন রুখসাত নেই। মুসলিম জনগণের ঐকমত্যের কারণে এ একটা বাজে কথা। কেননা তারা রমযান মাসে রোযা না রাখা বাড়িতে অবস্থানকারী গুনাহগার ব্যক্তির জন্যেও রুখসাত আছে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পানি না পেলে তায়াম্মুম করাও জায়েয তার জন্যে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্যে একদিন-একরাত ও মুসাফিরের জন্যে তিন দিন-তিন রাত্র পর্যন্ত মোজাহ পরা পায়ে অযূতে না ধুয়ে মসেহ করার রুখসাত দিয়েছেন। এ রুখসাতে অনুগত ও নাফরমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। কাজেই উক্ত কথার অর্থহীনতা স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

যে লোক ঠেকায় পড়বে, বিদ্রোহী না হয়ে, সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তার কোন গুনাহ হবে না (মৃত জীব খেয়ে প্রাণ বাঁচালে)।

আর তাঁর কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

যে লোক ঠেকায় পড়বে অভাব-অনটনকালে, কোন গুনাহের প্রবণতাকারী না হয়ে, (সে মৃত জীব খেলে) আল্লাহ বড়ই গুনাহ্ মাফকারী, দয়াবান।

এ দুটি আয়াতেই সর্বনাম هو সম্পর্কে কথা বলা আবশ্যক। কেননা ঠেকায় পড়ার ব্যাপারটি ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তির নিজস্ব কাজ নয়। তাই 'তার গুনাহ হল' এবং 'আল্লাহ্ বড় গুনাহ মাফকারী দয়াবান'—কথা দুটি তার জন্যে সুসংবাদ পর্যায়ের। 'আর যে লোক ঠেকায় পড়ল' তার পরিণতি সম্পর্কে একটা সংবাদ অবশ্যই থাকতে হবে। তা ছাড়া হুকুমটা যদি মূল প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, আর তার পরিণতির খবর যদ্দারা কথাটি পূর্ণ হয় তা হল খাওয়া। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায় ঃ যে ব্যক্তি ঠেকায় পড়ল, অতঃপর মৃত জীব খেল, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘনকারী নয়' পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ বিদ্রোহী নয় মৃত জীবের ক্ষেত্রে এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয় খাওয়ার। ফলে এই বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা খাওয়ার ব্যাপারে। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায়; সে বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘনকারী নয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। অতএব যে লোক মুসলমানদের বিদ্রোহী সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া অবস্থায় নিতান্ত ঠেকায় পড়ে মৃত জন্তু খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। এ অর্থের দিক দিয়ে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন তার প্রয়োজনকালীন অবস্থার চিত্র মৃত জন্তু খাওয়ার পূর্বে। তাই তো খাওয়া সংক্রান্ত পরিচিতি হবে না। অথচ পূর্বকালীন ফিকাহবিদদের মতে তা মৃত খাওয়া সংক্রান্ত অবস্থার চিত্র। তাই এখানে একটি শব্দ উহ্য ধরতে হবে, যেমন আল্লাহ্র এই কথায় উহ্য রয়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَا –

তোমাদের মধ্যে যারা রোগী বা প্রবাসী হবে, (সে রোযা ভাঙ্গবে) তার রোযা থাকার সময় হবে অন্যান্য দিনসমূহ।

এখানে সে রোযা ভাঙ্গবে فَاَفْطَرَ কথাটি উহ্য রয়েছে। এই কথাটিতেও উহ্য রয়েছে ঃ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ –
তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে কিংবা তার মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যথা হবে, সে রোযার ফিদিয়া (বিনিময়) দেবে।

এ আয়াতে فَحَلَقَ 'সে মাথামুণ্ডন করল' শব্দটি উহ্য রয়েছে। এই উহ্য কথা বা থাকা বৈধ হয় যাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের জানা-শুনা অবস্থায় এবং মূল কথাটিতে এমন প্রমাণ থাকতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন শব্দদ্বয় খাওয়ার প্রসঙ্গে ধরা 'মুসলিমদের' তুলনায় অধিক উত্তম। অর্থাৎ এই বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়; বরং খাওয়ার ব্যাপারে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন। বিশেষত এ জন্যে যে, মুসলিমদের কোন উল্লেখ এ আয়াতে উহ্য বা উল্লেখ্য কোন ভাবেই নেই—কথাটি তাদের প্রসঙ্গেও নয়। এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে খাওয়ার—মৃত জীব খাওয়ার। তাই আয়াতের দাবি হল, এখানে খাওয়ার অবস্থা ধরতে হবে। তা ধরা অন্য যে কোন অবস্থা ধরার তুলনায় অধিক উত্তম।

আল্লাহ্র কথা ঃ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ। 'তবে যে অবস্থায় পড়ে তোমরা ঠেকে গেছ। এখানে সর্বনাম বা উহ্য কিছুরই প্রশ্ন নেই। এখানে ব্যবহৃত শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থদায়ক। এখানে ﻻ। বলে যে আলাদাকরণ (Exemption) করা হয়েছে, তা পূর্বে উল্লেখিত حَرَّمَ শব্দ থেকে। অর্থাৎ ঠেকায় পড়ে খাওয়া হারাম নয়। তখন হারাম হুকুমের আওতার বাইরে পড়ে তা। তখন তা মুবাহ হয়ে যায় তোমাদের সকলের জন্যে। এই শব্দটির সর্বনাম-এর কোন প্রয়োজন পড়ে না। 'প্রয়োজন'-এর অর্থ এখানে নিজের প্রাণের উপর বা তার কোন কোন অঙ্গের উপর ক্ষতির আশংকা—এই খাওয়া পরিহার করার কারণে। এতে দুটি অর্থ নিহিত রয়েছে। একটি, এমন এক স্থানে আসে, যেখানে মৃত ছাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়—মৃত জীব ছাড়া অন্য কিছু আছে বটে কিন্তু তা খাওয়া অপছন্দ করে এজন্যে যে, তা খেলে তার প্রাণ যাবে; কিংবা তার কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধিত হবে। আমাদের মতে আয়াতের এ দুটি অর্থই গ্রহণীয়, কেননা এ দুটি অর্থই গ্রহণ করা যায়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আয়াতটির তাৎপর্য বলেছেন বাধ্যতার প্রয়োজন। কেননা অর্থ যদি মৃত জীবের প্রয়োজনে নিহিত থাকে, তাহলে তা না খেলে নিজের প্রাণের উপর কোন ভয় থাকবে না। প্রাণের উপর ভয় থাকে শুধু বাধ্যতার প্রয়োজনে (ضرورةالاكراه), তা হতে তার হুকুমটাই তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, একই কারণে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত জীব খেতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খায়নি বলে সে মরে গেছে। তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ্র নাফরমান হবে। যেমন যে ব্যক্তি মৃত জীব খেতে বাধ্য হয়, কেননা তাছাড়া খাদ্য পর্যায়ের কোন কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও যদি না খায়, আর তার ফলে সে মরে যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে, ঠিক যেমন খাদ্য-পানীয় পাওয়া সত্ত্বেও যদি না খাওয়ার দরুন মরে যায়, তা হলে তার এই মৃত্যুই না খাওয়ার কারণে আল্লাহ্র অবাধ্য ও

নাফরমান হিসেবে হবে। কেননা প্রয়োজনের সময় মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্, ঠেকায় না পড়া অবস্থায় খাদ্য না খাওয়ার কারণে যেমন হয়।

মদ্যপানে বাধ্য হওয়া

আবূ বকর বলেছেন, মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, শরীয়াতের অনুগত ব্যক্তি যদি কোন সময় ঠেকে যায়, মদ্যপান করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে তা পান করবে। আমাদের হানাফী মাযহাবের সকল মনীষীর মতও তাই। তখন সে পান করবে ঠিক ততটা পরিমাণ, যতটা পরিমাণ পান করলে তৃষ্ণার জ্বালায় মরে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

হারিসুল আকী ও মকহুল বলেছেন—না, মদ্য পান করবে না। কেননা তাতে তৃষ্ণা কমাবে না, আরও তীব্র করে তুলবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, পান করবে না, কেননা তাতে তৃষ্ণা যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি ক্ষুধাও। ইমাম শাফেয়ী এ-ও বলেছেন যে, মদ্যপানে বিবেক-বুদ্ধি রহিত হয়ে যায়। ইমাম মালিক বলেছেন, মৃত জীব খাওয়ার কথা কুরআনে বলা হয়েছে, মদ্যপানের কথা বলা হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, যাঁরা বলেছেন, মদ্যপান পিপাসা ও ক্ষুধার প্রয়োজন দূর করে না, তাঁদের কথা দুটি কারণে অর্থহীন। একটি হল, একথা তো জানাই আছে যে, কঠিন প্রয়োজনের সময় মদ্যপানও প্রাণটা বাঁচাতে পারে। পিসাসা দূর করে। অমুসলিম যিম্মীদের মধ্যে যারা যুগ যুগ ধরে পানি পান করে না, শুধু মদ্যপান করেই পিপাসা নিবৃত্ত করে, তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি (যে, মদ্যপান পিপাসা ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে)। কাজেই মধ্যপায়ীদের এই অবস্থা জানার পর উল্লিখিত ব্যক্তিদের কথা যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায় না। আর দ্বিতীয় কারণ, যদি ব্যাপার বাস্তবিকই তাই হয় তাহলে কথাটি ফিরিয়ে আমাদের বলা উচিত যে, মাদ্যপানের কোন প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধি রহিত হওয়ার যে যুক্তি ইমাম শাফেয়ী দেখিয়েছেন, তা আমাদের আলোচ্য নয় কোন দিক দিয়েই। কেননা প্রশ্ন তো ঠেকায় পড়ে অতি সামান্য পরিমাণ খাওয়ার। আর ইমাম মালিক যে বলেছেন, মৃত জীব খাওয়ার প্রয়োজনের কথাই কুরআনে বলা হয়েছে, মদ্যপানের প্রয়োজনের কথা কুরআনে বলা হয়নি, এ বিষয়ে বক্তব্য হল ঃ মৃত জীব খাওয়া ও তার সঙ্গে আর যে যে জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কিছুটা বলা হয়েছে। আর কিছুটা বলা হয়েছে সর্বপ্রকারের হারাম বিষয়ে বলা কথায়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّامَا اضْطُرِرْ تُمْ اِلَيْهِ –

তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, তা সবই আলাদা ও বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন। তবে যে জিনিসের দিকে তোমরা ঠেকে যাও তা বাদে।

কুরআনের বহু কয়টি আয়াতে মদ্যপান হারাম করার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি-আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ –

লোকেরা তোমার নিকট মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও ঃ এ দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে।

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ –

আমার রব্ব যাবতীয় নির্লজ্জ কার্যাবলী হারাম করে দিয়েছেন, যা প্রকাশমান তাও এবং যা গোপন থাকে তাও এবং গুনাহ.......।

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

নিশ্চয়ই মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান এবং ভাগ্য জানার উপকরণ শয়তানের কাজের মলিনতা। অতএব তোমরা তা পরিষ্কার কর ....

এসব আয়াতে মদ্য হারাম করার কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যে প্রয়োজনের কথা আলোচনাধীন আয়াতে বলা হয়েছে তা এই সব হারাম মৃত জিনিসসমূহের সাথেই জড়িত হতে পারে। আলোচনাধীন আয়াতে তার উল্লেখ আর তার সঙ্গে যুক্ত করে আর যে যে জিনিসের উল্লেখ হয়েছে, সমগ্র হারাম জিনিসের যে উল্লেখ অন্যান্য আয়াতের রয়েছে, সে সবের সাধারণত্বে তা গণ্য করার প্রতিবন্ধক কিছুই নেই। অপর দিক দিয়ে মৃত জীব খাওয়া যদি মুবাহ হয়ে থাকে তা খেয়ে নিজেকে জীবিত রাখার জন্যে, আর না খেলে জীবন ধ্বংস হওয়ার যদিও ভয় হয়, তা হলে তা সকল প্রকারের হারাম জিনিস সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে। তখন সেই নিতান্ত প্রয়োজনে ও ঠেকায় পড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই তা খাওয়া হয়েছে, মনে করতে হবে।

ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করবে

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, শাফেয়ী (মুজানী সূত্রের বর্ণনায়) বলেছেন ঃ ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তি মৃত জীবের শুধু প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ খাবে, তার বেশি নয়। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে পরিমাণ খেলে পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তত পরিমাণ খাবে। শুধু তাই নয়, তা থেকে পাথেয়ও বানিয়ে নেবে। পরে যদি তা খাওয়া প্রয়োজন না হয়, তা হলে ফেলে দেবে। আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান, আল-আম্বরী বলেছেন, যে পরিমাণ খেলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, সেই পরিমাণ খাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ –

তবে যে জিনিসের প্রতি তোমরা ঠেকায় পরে যাবে (যা খেতে তোমরা নিরুপায় হয়ে বাধ্য হবে) তা হারামের মধ্যে নয়।

বলেছেন, যে লোক বাধ্য হবে, বিদ্রোহীও নয়, সীমালঙ্ঘনকারীও নয়। এ কথাতে মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্ হয় শুধু প্রয়োজনের কারণে। আর প্রয়োজন হচ্ছে, না খেলে খাওয়া থেকে বিরত থাকলে ক্ষতির ভয় হওয়া—হয় প্রাণের ক্ষতি, অর্থাৎ মৃত্যু, না হয় দেহের কোন একটি অঙ্গের ক্ষতি। তাই যে পরিমাণ খেলে এই ক্ষতির ভাটা দূর হয়ে যাবে অন্ততঃ উপস্থিতভাবে সে পরিমাণ খেলেই তো সেই প্রয়োজনটা পূর্ণ হয়ে যায়। তাতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া প্রশ্ন নেই। কেননা ক্ষুধা প্রাথমিক পর্যায়েই মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্ করে দেয় না। কেননা তখন না খেলে ক্ষতির আশংকা হতে পারে না। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথাঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ -

যে লোক ঠেকায় পড়বে, বিদ্রোহীও হবে না, সীমালঙ্ঘনকারীও নয়।

আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি যে, এই বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া খাওয়ার ব্যাপারে। আর একথা জানাই আছে যে, খাওয়ার পরিতৃপ্তির উপরে কখনো উঠে না। কেননা মৃত জীব ও অন্যান্য মুবাহ্ জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে পরিতৃপ্তিরও বেশি খাওয়া তো নিষিদ্ধ। তাই প্রমাণিত হল যে, সে বিদ্রোহী হবে না, সীমালঙ্ঘনকারী হবে না পরিতৃপ্তির পরিমাণের বেশি খেয়ে। তা করলেই সে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যাবে। কেননা সে খাওয়ার ব্যাপারে তা-ই করেছে। বিশেষ করে মৃত জীব খাওয়ার ব্যাপারে এই জিনিসটি অবশ্যই অনুসরণীয়। মৃত জীব খাওয়ার অনুমতিটাই এই শর্তের অধীন এবং তাতে যথেষ্ট ফায়দা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, প্রয়োজন দূর হওয়া পরিমাণই খাবে। তার অন্য একটি যুক্তি হচ্ছে, এই ঠেকার সময়ে তার নিকট যদি এমন পরিমাণ হালাল খাদ্য থাকত, যা খেয়ে সে জীবন বাঁচাতে পারত, তা হলে তার পক্ষে মৃত জীব কখনই জায়েয হতো না। তাই সে যদি সেই খাবার খেত ও ক্ষতি বা মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যেত, তা হলে তো তার জন্যে মৃত জীব খাওয়া জায়েয হতো না। অনুরূপভাবে মৃত জীব থেকে যতটা খেলে ক্ষতির ভয় দূর হয়ে যায়, ততটা খাওয়ার পরও তা খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা মৃত জীব খাওয়া মূলতই মুবাহ্ খাবার খাওয়ার পর প্রয়োজন দূর হয়ে গেলে তার পরও খাওয়া মুবাহ্ থাকে না।

আওজায়ী হাসসান ইবনে আতীয়া লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এমন স্থানে থাকি, যেখানে না খাওয়ার অবস্থা দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় ঠিক কখন মৃত জীব খাওয়া আমাদের জন্যে হালাল হবে? জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

مَتَى مَالَمْ تَصْطَبِحُوْا اَوْتَغْتَبِقُوْا اَوْتَجِدُوْا بِهَابَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا -

যখন তোমরা সকালে খাদ্য-পানীয় পাবে না, রাত্রে খাদ্য পানীয় পাবে না, শাক-সবজিও পাবে না, ঠিক তখন তোমরা মৃত জীব খেতে পার।

এ হাদীসে মৃত জীব খাওয়া মুবাহ বলা হয়েছে শুধু তখন, যখন সকালে কিংবা বিকালে রাত্রেও খাবার পাবে না, খাওয়ার জন্যে শাক-সব্জিও পাওয়া যাবে না। কেননা যে লোক সকালে বা কিবালে কিংবা শাক-সব্জি খেতে পারবে, সে তো مضطر 'খাবার না পেয়ে 'ঠেকায় পড়া'' ব্যক্তি নয়। এই কথার দুটি অর্থ। একটি—প্রয়োজন মৃত জীব খাওয়া মুবাহ করে দেয়। তা তার অনুগত কি নাফরমান বান্দা হওয়ার অবস্থা থেকে ভিন্নতর। সে مضطر এটাই বড় কথা। কেননা নবী করীম (স) প্রশ্নকারীর জবাবে মৃত খাওয়া মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে অনুগত কি নাফরমান—এর মধ্যে কোন পার্থক্য দাঁড় করেন নি। বরং দুজনই যে এ ব্যাপারে অভিন্ন, তা স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় অর্থ, মৃত জীব খাওয়া মুবাহ শুধুমাত্র ক্ষতির ভয় হওয়া অবস্থায়। অন্য অবস্থায় নয়।

ধন-মালের যাকাত দেয়ার পরও কি কোন হক থাকে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبْ الاية –

তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে, এটাই কোন পূর্ণমাত্রার পূণ্যশীলতা নয় .....

বলা হয়েছে, আল্লাহ এই আয়াতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের লক্ষ্য করে কথা বলেছেন, তারা যখন কিবলা পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারল না, অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করল, তখন আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, পূর্ণ মাত্রায় পূণ্যশীলতা হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর আদেশ পালন ও অনুসরণ। পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই কোন পূর্ণশীলতা নয়, যদি তা আল্লাহ্র আদেশ পালন ভিত্তিক না হয়। আর এক্ষণে আল্লাহ্র আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশানুক্রমে কাবার দিকে মুখ করা। কেননা কাবা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মনসূখ হয়ে গেছে। অন্য কোন দিকে মুখ করলে আল্লাহ্র আনুগত্য লঙ্ঘন করা হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

বরং পূর্ণ মাত্রায় পূণ্যশীলতা হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যথার্থ ঈমান আনা।

বলা হয়েছে, এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। সঠিক অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত পূর্ণশীলতা হচ্ছে তার পূণ্যশীলতা, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃত পূণ্যশীল হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّه অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণশীল সেই ব্যক্তি, যে তাঁর (আল্লাহ্র) ভলোবাসার কারণে মাল, ধন, সম্পদ দান করবে। عَلٰى حُبِّه অংশের দুটি

অর্থ। একটি, ধন-মালের মুহব্বত। অর্থাৎ ধন-মালের মায়া-মুহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা দান করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

তোমরা কখনই পূর্ণমাত্রার পূণ্যশীলতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা সেই জিনিস থেকে ব্যয় করবে, যা তোমরা ভালোবাস।

দ্বিতীয় অর্থ বলা হয়েছে দান করার ভালোবাসা। অর্থাৎ দান করার সময় ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আরও একটা অর্থ হতে পারে, আর তা হল আল্লাহ্র মুহব্বত। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ -

বল তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর।

আর এক সাথে এই সব কটি অর্থ ও বক্তব্য হতে পারে।

নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে মনে হয়, এখানে ধন-মালের মুহব্বতের কথাটাই মূল বক্তব্য। হাদীসটি জরীর ইবনে আবদুল হামীদ উমরাতা ইবনুল কাকা আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বলছেন—এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, হে রাসূল! কোন দান-সাদকা অতীব উত্তম ? জবাবে বললেন ঃ

اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

তুমি সাদকা করবে এ অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ-সবল, তুমি দারিদ্র্যকে ভয় পাও, ধন-ঐশ্বর্যের আশা পোষণ করছ। আর তুমি অপেক্ষা করবে না সেই মুহূর্তের, যখন প্রাণটা কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে এসেছে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে। আর তখন তুমি বলতে থাক ঃ অমুককে এত, অমুককে এত আর অমুকের পাওনা ছিল ইত্যাদি।

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মেরওয়াজী, হাসান ইবনে রুবাই আল জুরজানী, আবদুর রাজ্জাক, সওরী, জুবায়দ, মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে 'এবং দিল ধন-মাল তার ভালোবাসা সত্ত্বেও' প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ এর অর্থ, তুমি ধন-মাল দান করবে এ অবস্থায় যখন তুমি সুস্থ-সবল জীবনে বেঁচে থাকার আশা পোষণ কর, দারিদ্র্যকে ভয় পাও। আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى -

এবং মাল দেয় তার মায়া থাকা সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়কে।

এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, ফরয সাদকা—অর্থাৎ যাকাত দেয়—হতে পারে নফল দান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে এ আয়াতে ফরয সাদকা অর্থাৎ যাকাত দানের কথা বলা হয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই। এতে দান কাজে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং সেজন্যে বিপুল সওয়াবের ওয়াদাও রয়েছে। কেননা এটা অধিক মাত্রার পূণ্যশীলতার ব্যাপার। এ শব্দটি ফরয দান ও নফল দান—উভয়কেই বোঝায়। তবে আয়াতটির পূর্বাপর প্রসঙ্গ ও পাঠের বিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফরয যাকাতের কথা বলতে চাওয়া হয়নি। কেননা এ আয়াতেই রয়েছে ঃ

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ –

এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে।

'যাকাত' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ প্রমাণ করে যে, وَاٰتَى الْمَالَ বলে ফরয যাকাতের কথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি।

কোন কোন লোক মনে করেন, وَاٰتَى الْمَالَ 'এবং মাল দিয়েছে' বলে যাকাত ছাড়া ধন-মালে আরও যে সব হক্-হকুক অবশ্যই আদায় করতে হয়, তার কথা বলা হয়েছে। যেমন সেলায়ে রেহমী হক—যখন কঠিন প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই আদায় করতে হয়। এ-ও হতে পারে যে, কোন নিকটাত্মীয়ের কঠিন ক্ষুধা নিকটাত্মীয়কে অত্যন্ত কাতর করে তুলেছে, যাতে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার পরিমাণ দেয়া একান্তই কর্তব্য।

শরীক আবূ হাসানাহ, আমের, ফাতিমা বিনতে কায়স সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ –

ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক ধার্য রয়েছে।

অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সুফিয়ান আবুয-যুবায়র জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উটের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাতেও হক রয়েছে। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ

اطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ ذَلُوْلِهَا وَمِنْحَةُ سَمِيْنِهَا –

তার পুরুষ উটগুলোকে ঠাণ্ডা করা, তার পিঠে আরোহণকে ধার দেয়া এবং তার চর্বি দান করা।

বলেছেন, এ দুটি হাদীসের বক্তব্য হল ধন-মালে ফরয যাকাত ছাড়াও হক্ রয়েছে, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা— لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ اِلَيْهَ এর ব্যাখ্যা। ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক রয়েছে—একথার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, দরিদ্র মুহররম লোকদের জন্যে অর্থ খরচ করে 'সেলায়ে রেহমী' রক্ষা করতে হবে। পিতা-মাতা ও রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়রা দরিদ্র, কামাই-রোজগারে

অক্ষম হলে সন্তানকে সরকার বাধ্য করবে তাদের জরুরী প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে। এ ছাড়া সাধারণ ক্ষুধাকাতর বিপদগ্রস্ত লোকদের খাবার দেয়ার কথাও বলা হতে পারে এ আয়াতে। মুস্তাহাব—ওয়াজিব—ফরয নয়, এমন হক আদায়ের কথাও হয়ত এ আয়াতের বক্তব্য। কেননা ধন-মালের উপর হক ধার্য আছে—এ কথা থেকে ওয়াজিব ফরয প্রমাণ হয় না। কেননা মুস্তাহাব হকও তো রয়েছে। অবশ্য ফরয হকও যে আছে, তা-ও স্বীকার্য।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান কাসীর ইবনে উবায়দ, বাকীয়াতা বনু তমীম গোত্রের এক ব্যক্তি—উপনাম আবূ আবদুল্লাহ—জবিশাবী মসরূক হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نَسَخَتِ الزَّكٰوةُ كُلَّ صَدَقَةٍ -

যাকাত ফরয হয়ে সর্ব প্রকারের সাদকা নাকচ করে দিয়েছে।

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক তসতরী, আলী ইবনে সাঈদ, মুসাইয়্যিব ইবনে শরীক, উবায়দ-আল-মাকতব, আমের মসরূক হযরত আলী (রা) সূত্রে 'যাকাত সব দানকে মনসূখ করেছে' এই মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি যদি নবী করীম (স) থেকে সহীহও প্রমাণিত হয়ে থাকে, তা হলে বুঝাতে হবে, সব ওয়াজিব সাদ্‌কা ফরয যাকাত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। আর তা যদি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর কথা (মরফূ) না হয়ে থাকে বর্ণনাকারীকে তা না জানার কারণে, তবু হযরত আলীর কথা হিসেবে তা উত্তম সনদে حسن বর্ণিত। তা-ও পূর্বে ওয়াজিব থাকা সব দান-সাদকা ফরয যাকাত দ্বারা মনসূখ হওয়া পুরামাত্রায় প্রমাণিত মনে করতে হবে, বুঝতে হবে, তা توقيف 'আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত' পন্থায়ই জানা গেছে। আর এ-ও জানা গেল যে, হযরত আলী (রা) যা বলেছেন, তা নবী করীম (স) বিশেষভাবে তাঁকে জানিয়েছিলেন বলেই তিনি তা বলেছেন। এখন যে সব দান-সাদকা মনসূখ হয়ে গেছে, তা পূর্বে ওয়াজিব ছিল। প্রথম দিক দিয়ে তা আদায় করা একান্তই কর্তব্য ছিল। পরে তা নাকচ হয়ে যায় ফরয যাকাত দ্বারা। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ -

মীরাস বণ্টনকালে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন যদি উপস্থিত থাকে, তা হলে সে মীরাস থেকে তাদের রিযিক দানের ব্যবস্থা কর।

আল্লাহ্র আদেশ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ এবং ফসল কাটার দিন ফসলের (বা আল্লাহ্র) হক দিয়ে দাও। পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন লোক মনে করেন, ওশর ও অর্ধ ওশর ফরয হওয়ার কারণে এ আদেশ মনসূখ হয়ে গেছে।[১] মনসূখ হয়েছে যাকাত

১. এ আয়াত দ্বারাই বরং ওশর ও অর্ধ-ওশর ফরয হয়েছে। তা হলেও আয়াত মনসূখ হয়েছে, এ কথা কি করে সহীহ হতে পারে ?—অনুবাদক

ফরয দ্বারা, যেমন ধন-মালে বিনা প্রয়োজনে এসব ওয়াজিব হক মনসূখ হয়েছে। আমরা যে হক-এর কথা উল্লেখ করেছি, তা কামাই-রোজগারে অক্ষম রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করার আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং ক্ষুধার্ত ঠেকায় পড়া লোককে খাবার খাওয়ানো জরুরী হয়ে পড়ে। এই ফরযগুলো নিতান্তই বাধ্যতামূলক, তা যাকাত দ্বারা কখনই মনসূখ হয়ে যায় নি। সাদকায়ে ফিতরও ওয়াজিব হয়ে রয়েছে সব ফিকাহবিদদের মতে, তা-ও যাকাত দ্বারা মনসূখ হয়ে যায় নি। যদিও শুরুতে তা আল্লাহ্‌র দিক থেকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিল, বান্দার দিক থেকে কোন কারণ ছিল না তার ওয়াজিব হওয়ার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত 'সাদকায়ে ফিতর' বাতিল করেনি। ওয়াকিদী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সাদকায়ে ফিতর দেয়ার আদেশ করেছিলেন। পরে যখন যাকাত ফরয হল, তখন তিনি নতুন করে সে বিষয়ে কোন আদেশও দেন নি, তা দিতে নিষেধও করেননি, লোকেরা তা যথারীতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ যদি সত্য—বিশ্বাস্য হয়, তা হলে এক্ষণে তা যাকাত ফরয হওয়ার দরুন মনসূখ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সাদকায়ে ফিতর যথারীতি ওয়াজিব থাকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। আর অধিক উত্তম কথা এই যে, যাকাত ফরয হয়েছে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ারও পূর্বে। কেননা হা-মীম আস্‌সিজদা সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। আর তাতেই রয়েছে এ আয়াত ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ -

সেসব মুশরিকদের জন্যে দুঃখময় পরিণতি, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালের প্রতিও তারা অবিশ্বাসী।[১]

আর সাদকায়ে ফিতর দেয়ার আদেশ হয়েছে মদীনায়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আগে ফরয হয়েছে, সাদকায়ে ফিতর দেয়ার হুকুম হয়েছে পরে। ইবনে উমর ও মুজাহিদ থেকে 'এবং দাও তার হক ফসল কাটার দিন' এ আদেশ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে; তা জনগণের উপর ধার্য একটি ওয়াজিব হক এবং যাকাতের বাইরে। বান্দাদের সৃষ্ট কারণে যেসব হক-হুকুক ওয়াজিব হয়েছে, তা হচ্ছে কাফ্‌ফারা ও মানতসমূহ। যাকাত যে এসব হক বাতিল করেনি, সে বিষয়ে সকলেই একমত। আর ইয়াতীম বলতে আয়াতে যেসব অল্প বয়স্ক দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বোঝানো হয়েছে, যাদের পিতা মরে গেছে। আর 'মিসকীন' কারা এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। পরে সূরা 'বরায়াত' পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। 'ইবনুস সাবীল'—'পথের পুত্র', মুজাহিদ থেকে বর্ণিত সে হচ্ছে পথিক, প্রবাসী (যার পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেছে), কাতাদাহ্‌র মতে সে হচ্ছে

১. এ আয়াত দ্বারা যাকাত ফরয হয়ে যায়নি। বস্তুত মক্কী আয়াতসমূহে যাকাত দেয়া মুসলিমদের বিশেষ গুণ ও না দেয়া কাফির মুশরিকদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'যাকাত দাও' এই ধরনের কোন হুকুম মক্কী আয়াতে নাযিল হয়নি। তা হয়েছে মাদানী সূরায়—অনুবাদক।

মেহমান। প্রথম অর্থটিই অধিক ঠিক। কেননা নাম-ই রাখা হয়েছে 'ইব্‌নুস সাবীল—পথের পুত্র। সে তো মুসাফির বা প্রবাসীই হতে পারে। কেনা সে পথিক, পথ অতিক্রম করে যাওয়াই তার কাজ। যেমন পাখিকে বলা হয়েছে ابن ماء الاوز। কেননা তা সব সময় পানিতেই অবস্থান করে।

السائلين। প্রার্থনাকারী, সাদকা বা দান চাওয়া লোকেরা; যারা দান বা সাহায্য চেয়ে বেড়ায়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ –

তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য হক রয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে নাফে মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, মুসয়িব ইবনে মুহাম্মাদ, ইয়ালা ইবনে আবূ ইয়াহ্ইয়া, ফাতিমা বিনতে হুসায়ন ইবনে আলী (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ –

প্রার্থনাকারী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এলেও তার 'হক' (প্রাপ্য) রয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে উবায়দ ইবনে শরীক, আবুল জামাহির, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, তাঁর পিতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَعْطُوْالسَّائِلَ وَاِنْ اَتَى عَلَى فَرَسٍ –

প্রার্থনাকারীকে তোমরা দাও, যদিও সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে।

কিসাস

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِىْ الْقَتْلٰى –

হত্যাকাণ্ডে তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে।

এ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কথা। এর পরে যা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজন পড়ে না, তা বলা না হলেও পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়ায় কোন অসুবিধা হতো না। এতটুকু বলে শেষ করলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে তার তাৎপর্য সহজেই বোঝা যেত। এর বাহ্যিক অর্থই এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, সমস্ত নরহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা মুমিনদের কর্তব্য। আর 'কিসাস' হচ্ছে একজনের সাথে যে আচরণ কেউ করেছেন, তার সাথে সেইরূপ আচরণ করা। এটা 'কিসাস'-এর শব্দার্থ। আরবী ভাষায় বলা হয়, অমুকে যেমন করেছে তার সাথে সমান সমান তেমনই কর। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا – (الكهف : ٦٤)

অতঃপর তারা দুজনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পুনরায় ফিরে গেল।

এ আয়াতের قَصَصًا অর্থ পায়ের চিহ্নের উপর পা রাখা।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ – (القصص : ١١)

এবং তার বোনকে বলল ঃ তার পেছনে পেছনে যাও। তার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ও অনুসন্ধান কর।

মূল আলোচ্য আয়াতে كُتِبَ عَلَيْكُمْ অর্থ তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। যেমন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।' এবং

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ –

তোমাদের কারোর মৃত্যু নিকটে উপস্থিত হলে যদি সে ধন-মাল রেখে যেয়ে থাকে, পিতা-মাতার জন্যে অসয়িত করা ফরয করা হয়েছে।

বস্তুত মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার জন্যে অসিয়ত করা ফরয ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও এমনিভাবে ফরয করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের উপর কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে, যখন তারা হত্যাকার্য করবে। এই কিসাস সকল নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর উপর কার্যকর হবে। কেননা 'নিহত' কথাটি সাধারণ ও ব্যাপক। বিশেষভাবে লক্ষ্য হচ্ছে হত্যাকারীরা। কেননা হত্যাকাণ্ড ঘটলে সে কাণ্ডের কর্তা হবে হত্যাকারী। তাই প্রত্যেক হত্যাকারীর উপরই 'কিসাস' কার্যকর হতে হবে। তা অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপরই জারী হবে, সব হত্যাকারীই সমান ও নির্বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। নিহত ব্যক্তি যে-ই হোক, ক্রীতদাস হোক, যিম্মী হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক। কেননা মূল আয়াতে ব্যবহৃত اَلْقَتْلَى 'নিহত' শব্দটি এই সবকেই শামিল করে। আয়াতে সম্বোধন যদিও মুমিনদের প্রতি, নিহতের জন্যে 'কিসাস' কার্যকর করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক কর্তব্য। তার অর্থ এ নয় যে, মুমিন ব্যক্তি নিহত হলেই 'কিসাস' করতে হবে, অন্য কেউ নিহত হলে 'কিসাস' করতে হবে না। না, সে অর্থ নয়। ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ ও নির্বিশেষ তাৎপর্য অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য বিশেষীকরণের দলীল না পাওয়া পর্যন্ত। আর এ আয়াত কোন কোন নিহতের কিসাস করতে হবে, অন্য কোন কোন নিহতের 'কিসাস' করতে হবে না, এমন কথা নেই।

যদি কেউ বলেন, القتلى। শব্দটিতেই হুকুমটি বিশেষীকরণ করা হয়েছে। তা দুটি দিক দিয়ে বোঝা যায়। একটি, আয়াতটির বিন্যাস ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ –

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

কাফির ব্যক্তি তো মুসলমানদের ভাই হতে পারে না। তাহলে আয়াতটিই প্রমাণ করল যে, এই কিসাস কেবলমাত্র মুমিন নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى -

স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে, মেয়ে লোক নিহতের বদলে মেয়েলোক...

এ কথায় 'কিসাস' যথার্থ হয় না।

জবাবে বলা যাবে, এই গোটা কথাই সম্পূর্ণ ভুল দুটি দিক দিয়ে। একটি হচ্ছে সম্বোধনের প্রাথমিক শব্দগুলো নির্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে শামিল করেছে। পরে তার উপর বিশেষের শব্দে যুক্ত করে যা বলা হয়েছে, তা শব্দের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষীকরণ করা কর্তব্য বানিয়ে দেয় না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা নিজেদেরকে তিন হায়য সময়কাল পর্যন্ত (পুনর্বিবাহ) থেকে বিরত রাখবে।

তিন তালাকপ্রাপ্তা সব মেয়েই এ হুকুমে সাধারণভাবেই শামিল রয়েছে। যারা তিন তালাক পায়নি, সময় পেয়েছে তারাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। পরে এরই সাথে যোগ করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَرِّقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ-

যখন তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলবে, তখন হয় তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে বেঁধে রাখ অথবা প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী তাদেরকে ছেড়ে দাও।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ -

এ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন।

এ হুকুমটি বিশেষভাবে সেই স্ত্রীর জন্যে, যাকে তিন তালাকের কম দেয়া হয়েছে। তাদের সকলের জন্যে তিন 'কুরু' ইদ্দত পালন ওয়াজিব করে দেয়নি সাধারণ অর্থবোধক শব্দকে এই বিশেষীকরণের দরুন। কুরআনে এর বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, উপরের আয়াতে তাই বলা হয়েছে বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়ে, দ্বীন-এর দিক দিয়ে নয়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدً 'এবং আদ গোত্রের লোকদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল তাদের ভাই হূদকে।'

আল্লাহ্র কথা ঃ 'স্বাধীন স্বাধীনের বদলে, দাস দাসের বদলে'—'নিহত ব্যক্তি' বলে সাধারণ অর্থের কথা বলা হয়েছে। উক্ত কথাটি দ্বারা শব্দের সাধারণত্বে বিশেষীকরণ জরুরী হয় না। কেননা প্রথম সম্বোধনে যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরবর্তী কথার মুখাপেক্ষী নয়,

তখন তাতে সীমাবদ্ধ করা আমাদের জন্যে সঙ্গত হতে পারে না। اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আল্লাহ্‌র এই কথা পূর্বে বলা কথার ব্যাখ্যা তাগিদ স্বরূপ বলা হয়েছে। তাতে কথাটি যে অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা, তারই উল্লেখ হয়েছে। শাবী ও কাতাদাহ বলেছেন, দুটি আরব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধে চলছিল। তাদের একটি অপর গোত্রের উপর প্রাধান্য সম্পন্ন ছিল। তখন তারা বলল ঃ 'আমরা থামব না, থামব তখন, যখন আমাদের একটি গোলামের বদলে প্রতিপক্ষের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে, আমাদের একজন মেয়ে লোকের বদলে প্রতিপক্ষে একজন পুরুষকে হত্যা করতে পারব। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

তোমাদের প্রতি তো 'কিসাস' (সমান সমান দণ্ড) ফরয করা হয়েছে। একজন স্বাধীন ব্যক্তির বদলে অনুরূপ একজন স্বাধীন ব্যক্তি, একজন গোলামের বদলে অনুরূপ একজন গোলাম মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এ কথার দ্বারা ওদের কথাটিকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং হত্যাকারীর উপর কিসাস যে ফরয তা তাগিদ করে বলা হয়েছে। এর কমে কিসাস হয় না। কেননা ওরা হত্যা করত যে আসল হত্যাকারী নয় তাকে। এই কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের অর্থও তাই। তিনি বলেছেন ঃ

مِنْ اَعْتَىْ النَّاسَ عَلَىْ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِيْ الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ اَخَذَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ –

কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে অধিক দুষ্ট প্রকৃতির প্রমাণিত হবে তিন ব্যক্তি। একজন—যে হত্যা করল যে হত্যা করেনি তাকে, আর এক ব্যক্তি যে হারাম শরীফে হত্যাকাণ্ড করেছে, আর এক ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিহিংসার কারণে পাকড়াও করেছে।

উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ – وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ তাফসীর হচ্ছে শব্দের সাধারণ অর্থ যত কিছু শামিল করে তার। তাতে শব্দটিকে বিশেষীকরণের আওতায় আনা জরুরী হয় না। বিবেচ্য রাসূলের এই কথাটি ঃ – اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ 'গম গমের বদলে, সমান সমান' এ পর্যায়ে ছয় প্রকারের ফসলের উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সূদ সংক্রান্ত হুকুম মাত্র এই ছয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা জরুরী নয়। এছাড়া অন্যান্য শস্য দানায় সূদ হয় না। তা বলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ্‌র স্বাধীন স্বাধীনের বদলে, দাস-দাসের বদলে কথাটিও এ পর্যায়েই। শুরুতে বলল 'তোমাদের নিহতের কিসাস লওয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে' কথাটিতে যে সাধারণত্ব রয়েছে, তা গণ্য ঐ কথাটি নিষেধ করে না। 'কিসাস'-এর সাধারণ আদেশকে ঐ কথার বিশেষীকরণের মধ্যে সীমিত করে দেয়া কোনক্রমেই জরুরী হয় না। তাতে যাদের উল্লেখ নেই তাদের কিসাস করতে কোন বাঁধা নেই। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে গোলাম হত্যা করা এবং পুরুষের বদলে মেয়েলোক হত্যা করা নিষিদ্ধ নয়; বরং ইতবাচকভাবে তাতে সকলেই একমত।

তাই 'স্বাধীনের বদলে স্বাধীন' কথাটি সকল ধরনের নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করার পথে কিছু মাত্র প্রতিবন্ধক নয়।

কেউ যদি বলেন, নিহতের অভিভাবক যখন ক্ষমা করে দেয়া ও কিসাস লওয়া এ দুটির যে কোন একটি করার অধিকারী, তখন 'কিসাস' কার্যকর হবে কি করে?

জবাবে বলা যাবে—না, ক্ষমা করে দেয়ার (বা রক্তমূল্য গ্রহণের) ইখতিয়ার অভিভাবকের আছে বটে; কিন্তু তা তার উপর ফরয রূপে ধার্য করা হয়নি। বরং হত্যাকারীর উপর ফরয, সে অভিভাবকের নিকট থেকে যে কোন ভাবে ক্ষমা নিতে চেষ্টা করতে পারে। 'তোমাদের উপর নিহতের জন্যে কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে' এই কথার ভিত্তিতে। 'কিসাস' অভিভাবকের উপর নয়; বরং এটা তার হক। অতএব তা হত্যাকারীর উপর কিসাস ফরয হওয়ার পরিপন্থী নয়। যার জন্যে এই কিসাস, যদিও তার ইখতিয়ার আছে যা কিছু করার। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দাসের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তি, যিম্মীর পরিবর্তে মুসলিম ব্যক্তি এবং মেয়েলোকের পরিবর্তে পুরুষ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কেননা সম্বোধনের শুরুতে সমস্ত হত্যাকাণ্ডে সাধারণভাবে কিসাসের হুকুম দেয়া হয়েছে। স্বাধীনকে স্বাধীনের পরিবর্তে ও অন্য যার যার উল্লেখ হয়েছে, তার বিশেষীকরণে 'কিসাস' কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কথা জরুরী নয়। কিসাস ফরয হওয়ার প্রাথমিক সম্বোধন সাধরণ ও ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন। তা অগ্রাহ্য করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এরই দৃষ্টান্ত—যে সব আয়াতে কিসাসকে সাধারণ রাখা হয়েছে—এই আয়াতটি ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا –

যে লোক মজলুম হিসেবে—অকারণ নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি।

জুলুম হিসেবে—আকারণে ও অন্যায়ভাবে—যত লোকই নিহত হবে, তাদের সকল লোকই এই সাধারণ সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত। তাদের অভিভাবকগণের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা হল প্রতিশোধ গ্রহণ। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, سُلْطَانٌ অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার। কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তি নিহত হলে তার অভিভাবকের অধিকার রয়েছে সেই প্রতিশোধ গ্রহণের। কেননা আয়াতের এই তাৎপর্যই সর্বসম্মত। তাই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। سُلْطَانٌ শব্দটি অস্পষ্ট হলেও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তাৎপর্য দ্বারা তা জ্ঞাত ও পরিচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا এক সাধারণ ও ব্যাপক ভিত্তিক কথা। তার বাহ্যিক অর্থের এই দিকটিকেই সামনে রাখতে হবে। শব্দের দাবিও তাই।

আরও একটি আয়াতে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য। তা হচ্ছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ –

কিসাসে তাদের উপর ফরয করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ .....

এই আইন বনী ইসরাঈলীদের উপর জারী করা হয়েছিল। সব ধরনের নিহত ব্যক্তির জন্যে কিসাস ফরয হওয়ার ব্যাপারে এ এক সাধারণ বিধান। ইমাম আবূ ইউসূফ এই আয়াতকে দলীল রূপে ভিত্তি করেই ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার রায় দিয়েছিলেন। এ থেকে তাঁর এই মতটিও জানা যায় যে ঃ

اِنَّ شَرِيْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ثَابِتَةٌ عَلَيْنَا مَالَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهَا عَلَى لِسَانِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

আমাদের পূর্বগামী নবীগণের শরীয়াত যদি রাসূলে করীম (স) দ্বারা মনসূখ প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে তা আমাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

আর কুরআন ও সুন্নাতে এমন কিছুই আমরা পাই নি, যদ্দারা বলা যেতে বলা যে, এই আইনটি মনসূখ হয়ে গেছে। এতএব এ আইনটি তার শব্দের বাহ্যিক দাবি অনুযায়ী আমাদের উপর অবশ্যই কার্যকর হবে। আর তা হচ্ছে, সকল মানব প্রাণীকে হত্যার কিসাস অবশ্যই হতে হবে। তার দৃষ্টান্ত আরও একটি আয়াত ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ –

অতএব যে লোক তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরাও তার উপর বাড়াবাড়ি কর যতটা বাড়াবাড়ি সে তোমাদের উপর করেছে।

কেননা যে লোক তার অভিভাবককে হত্যা করেছে, সে তো তার উপর একজন বাড়াবাড়িকারী, সীমালঙ্ঘনকারী। সব নিহতের ব্যাপারে এ-ও একটি সাধারণ ব্যাপক ভিত্তিক কথা।

এ আয়াতটিও অনুরূপ ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ –

তোমরা যদি প্রতিশোধ লও-ই তাহলে যতটা তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতও স্বাধীন গোলাম, পুরুষ-নারীর ও মুসলিম-যিম্মী—সকলের ক্ষেত্রেই কিসসা সাধারণভাবে ফরয করেছে।

স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসের বিনিময়ে হত্যা করার সমস্যা

আবূ বকর বলেছেন, স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাসের পারস্পরিক বদলে কিসাস কার্যকর করার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর প্রমুখ বলেছেন, স্বাধীন মানুষ ও গোলাম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 'কিসাস' কার্যকর হবে শুধু নরহত্যার ক্ষেত্রে। তাই গোলামের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। অনুরূপভাবে গোলাম ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে স্বাধীন ব্যক্তির বদলে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, তাদের পারস্পরিকভাবে কিসাস কার্যকর হবে সকল

যখমের ক্ষেত্রেও, যেখানে 'কিসাস' কার্যকর করা সম্ভব। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, যখম করার অপরাধের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও গোলামের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ নেই। বরং স্বাধীন মানুষের বদলে গোলাম হত্যা হবে, কিন্তু গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা যাবে না।

লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, গোলাম যদি অপরাধী হয়, তাহলে তার কিসাস করতে হবে। কিন্তু গোলামের জন্যে স্বাধীন মানুষের উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। বলেছেন, গোলাম যদি স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে নিহতের অভিভাবক হত্যাকারী গোলামের প্রাণ হরণের অধিকারী হবে। গোলাম যদি প্রাণ হরণের কম মাত্রার অপরাধ করে, তাহলে আহত ব্যক্তি চাইলে অপরাধীর উপর কিসাস কার্যকর করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যার উপর প্রাণ হরণ অপরাধের কিসাস কার্যকর করা যাবে, তার উপর অহতকরণ অপরাধের কিসাসও কার্যকর করা যাবে। কিন্তু গোলামের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না এবং প্রাণ হরণ অপরাধের কর্মে গোলামের জন্যে স্বাধীন মানুষের কিসাস করা যাবে না। আয়াতটি স্বাধীন মানুষ ও গোলামদের পরস্পরের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণ হরণ অপরাধের ক্ষেত্রেই কিসাস ফরয হওয়ার দলীল এই দিক দিয়ে যে, আয়াতটিতে নিহতের প্রসঙ্গে হুকুম এনেছে মাত্র। তার তুলনায় কম মাত্রার অপরাধে—আঘাতে যখমে—কসাস লওয়ার বিষয় কিছুই বলা হয়নি। প্রতিশোধ গ্রহণ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও কিসাসের আয়াত নীরব। কুরআনের আয়াতের এই সাধারণত্ব গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করার দাবি রাখে। আর যেহেতু স্বাধীন মানুষের বদলে গোলাম হত্যা করার ব্যাপারে সকলেই একমত; তাই গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষ হত্যা করা অবশ্যই কর্তব্য হবে। প্রমাণিত হল যে, আয়াতটির এটাই মূল বক্তব্য। আয়াতটির ভাবধারা দাস নিহত হোক, কি হত্যাকারী হোক, তার মধ্যে কিসাস লওয়ার ব্যাপারে পার্থক্যের সৃষ্টি করে নি। তা এই উভয় অবস্থার প্রেক্ষিতেই সাধারণ ও ব্যাপক। একথা এই আয়াতটিও সমর্থন করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ -

হে বুদ্ধিমান লোকেরা। কিসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত।

আল্লাহ এ আয়াতটির দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিসাস অবশ্যই কার্যকর হতে হবে, তা কার্যকর করা ওয়াজিব। কেননা আমাদের জীবন তাতেই নিহিত এ আয়াতের সম্বোধনে স্বাধীন ও গোলাম সর্বশ্রেণীর মানুষই শামিল। আয়াতটির শেষে 'হে বুদ্ধিমান লোকেরা' বলে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তা ব্যাপক অর্থবোধক, কোন মানুষই তার বাইরে নয়। সকলের মধ্যেই যখন সেই একই 'ইল্লাত' রয়েছে, তখন লোকদের মধ্য থেকে কতককে তার মধ্যে শামিল মনে করা ও অন্যদেরকে তার বাইরে মনে করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না।

আর সুন্নাতের দৃষ্টিতেও সকলকেই তার মধ্যে সমানভাবে গণ্য মনে করতে হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَا فَأُ دِمَاؤُهُمْ –

মুসলমানদের রক্ত সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার।

এই কথাটি স্বাধীন গোলামসহ মুসলিমকে পরিব্যাপ্ত করে। কোন দলীল ছাড়া এর মধ্য থেকে কাউকে বিশেষীকরণের আওতায় আনা যেতে পারে না।

উক্ত কথাটি অপর একটি দিক দিয়েই প্রমাণিত। তা হল, গোলাম যদি হত্যাকারী হয়, তাহলে যেমন তার কিসাস হবে, তেমনি সে নিহত তলেও তার হত্যাকারীর কিসাস হবে—এ ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত। এক্ষেত্রে হত্যাকারী হওয়া বা নিহত হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্যই করা হয়নি।

যদি বলা হয়, হাদীসের শুরুতে যখন বলা হয়েছে وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ 'তাদের সাধারণ হীন-নীচ ব্যক্তি সেই লোকদের যিম্মায় চেষ্টা করবে' এতে সেই গোলামের কথাই বলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, সম্বোধন সূচনায় গোলামকে লক্ষ্য করা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল এদিক দিয়ে যে, গোলাম হত্যাকারী হলে তার কিসাস হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত নেই। তাই উক্ত কথাটিও বক্তব্য হতে পারে, যখন সে হত্যাকারী হবে। তখন সে নিহত হলে তখনও যে সেই একই লক্ষ্য সামনে থাকতে পারে, তার প্রতিবন্ধক কিছু নেই। তাছাড়া 'তাদের যিম্মায় নিকৃষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা করবে' কথায় গোলামকে অপর লোক থেকে বিশেষীকরণ করার কোন ভাব নেই। কেননা اَدْنَاهُمْ অর্থ সংখ্যায় কম হওয়া। যেমন বলা হয়, তাদের মধ্য থেকে একজন। অতএব সম্বোধনের সূচনায় কেবল স্বাধীন মানুষের কথা বলা হয়েছে, গোলামের কথা বলা হয়নি, এই সংকীর্ণতা আবশ্যিক হওয়ার সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যদি বলা হতোঃ 'তাদের যিম্মায় তাদের গোলাম চেষ্টা করবে' তবুও স্বাধীন ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের তার হুকুমটি বিশেষীকরণ কর্তব্য হতো না। কেননা ওটা একটা স্বতন্ত্র হুকুম, নতুন করে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিশেষভাবে গোলামের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন বোঝা যায় যে, গোলাম নয় এমন ব্যক্তির তাদের যিম্মায় চেষ্টা করা অধিক উত্তম। তাই ওই হুকুমে গোলামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলেও তারই সাথে তা বিশেষীকৃত হবে, অন্যদেরকে শামিল করা হবে না, তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা কিসাসের সাধারণ হুকুমকে বিশেষীকরণ উত্তম হবে, তা জরুরী নয়।

যদি বলা হয়, রাসূলের কথা ঃ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ 'মুসলমানদের রক্ত সমান মর্যাদার অধিকারী' কথাটির দাবি হচ্ছে রক্তের সমমূল্যতা, সমান মর্যাদা ও অধিকার। অথচ গোলাম স্বাধীনের সমান নয়।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স) রক্তের ব্যাপারে উভয়কেই সমান ও পার্থক্যহীন বানিয়েছেন। কেননা এই সমতা ও অভিন্নতাকে ভিত্তি করা হয়েছে ইসলামের উপর। যে বলেছেন যে, স্বাধীনের রক্ত গোলামের রক্তের সমান নয়, সে রাসূলের ঘোষণার বিদ্রোহী এবং দলীল প্রমাণহীন বিরোধী।

এই কথা প্রমাণ করে আবদুল বাকী ইবনে নাফে বর্ণিত হাদীস। তিনি মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, ফিয়ান, আল-আমাশ, আবদুল্লাহ ইবনে মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰه اِلَّا فِىْ اِحْدَى ثَلَاثٍ : اَلتَّارِكُ لِلاِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ –

যে মুসলিম ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমার সাক্ষ্য দেয়, তার রক্তপাত হালাল হবে না তিনটি অবস্থার কোন একটি ছাড়া। প্রথম—ইসলাম ত্যাগকারী, ইসলামী সমাজ বিচ্ছিন্নকারী ব্যক্তি, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারী হওয়া এবং প্রাণের বদলে প্রাণ লওয়া অবশ্যম্ভাবী হওয়া।

এ হাদীসে স্বাধীন ও গোলামের মাঝে পার্থক্যের কোন কথা বলা হয়নি। বরং প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নির্বিশেষে, আর এই ভাবধারা বনী ইসরাইলের উপর লিখে দেয়া বিধানের আল্লাহ কথিত ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এই হাদীসের তাৎপর্য দুটি। একটি—বনী ইসরাঈলীদের উপর যে আইন জারী হয়েছিল, তা আমাদের উপর কার্যকর হবে, আর দ্বিতীয়—কিসাস ফরয হওয়ার ব্যাপারে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান, সকল মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে তা সাধারণ ও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

সুন্নাতের দিক দিয়েও তা প্রমাণিত। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে মূসা ইবনে যাকারিয়া তসতরী, সলহ ইবনে উসমান, আল আসকারী, আবূ মুআবিয়া, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম, আমর ইবনে দীনার-তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَمْدُ قَوَدٌ اِلَّاَنْ يَعْفُوَ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ –

ইচ্ছাপূর্বক হত্যা অবশ্যই বিচার্য, প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য। তবে নিহতের অভিভাবক ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা।

এই হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। একটি নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের ইচ্ছামূলক হত্যার বিচার অবশ্য কর্তব্য। এই বিচার গোলামের হত্যাকারীর উপরও অবশ্যই কার্যকর হবে।

আর দ্বিতীয় অর্থ, এই সিদ্ধান্ত মাল দিয়ে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা দণ্ড দান ও মাল গ্রহণের মধ্যে যে কোন একটি করার ইখতিয়ার থাকলে শুধু বিচার বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথাই বলা হতো না। অন্যটা—অর্থাৎ মাল গ্রহণের কথা না বলে ছেড়ে দেয়া হতো না।

যুক্তির দিক দিয়েও আমাদের কথাটি অনস্বীকার্য। গোলাম তো রক্ত প্রবাহ কেন্দ্র। সময়ের অতিবাহনে তা উঠানো যায় না। হত্যাকারীর সন্তানও সে নয়। তার উপর তার মালিকানাও নেই। ফলে অনাত্মীয় স্বাধীনতা সদৃশ হল। অতএব এ দুজনের মধ্যে কিসাস অবশ্যম্ভাবী। যেমন করে গোলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার উপর অবশ্য কিসাস কার্যকর হয়। তার মূলে সেই একই 'ইল্লাত' নিহিত। অনুরূপভাবে স্বাধীন ব্যক্তি যদি গোলামকে হত্যা করে, তা হলেও তার কিসাস অবশ্যই হতে হবে। কেননা এখানেও সেই একই 'ইল্লাত' বর্তমান।

অতএব যে ব্যক্তি গোলামের হত্যার কারণে স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ও কিসাসে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে, তার এই নিষেধকরণ তো গোলামের অপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার কারণে মাত্র। সেখানে মানবীয় সাম্য পরিত্যক্ত। হত্যার কম মানের অপরাধে তা গণ্য হয় বটে। তার দলীল এই যে, দশজন লোক মিলে যদি একজনকে হত্যা করে তা হলে সেই একজনের জন্যে হত্যাকারী দশজনকেই হত্যা করতে হবে। এখানে সংখ্যা সমতার কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ মুসলিম ব্যক্তি কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী অঙ্গ কাটা ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে তাকে হত্যার কিসাসস্বরূপ সেই সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে হত্যা করা হবে। সেইরূপে নারীর বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হবে, যদিও দ্বীনের দৃষ্টিতে বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দিক দিয়ে খাটো ও পেছনে। তার দীয়তও পুরুষের দীয়তের অর্ধেক। এ থেকে প্রমাণিত হল, প্রাণ হরণের ক্ষেত্রে নিহতের ব্যাপারে সমতার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। 'খোটা' বা কম-এর জন্যে 'পূর্ণ' কে দণ্ডিত করতে হবে কিসাস। তবে প্রাণ-সংহার ছাড়া তার কম মাত্রার অপরাধের ব্যাপারে হুকুমটা এর কমের নয়। কেননা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের বদলে সুস্থ সবল হাত দণ্ড পাবে না বা রোগী ব্যক্তিকে হত্যার ফলে সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রাণ নাশ হবে না—এটা কোন কথাই হতে পারে না। লাইস হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدًا عَمَدًا فَهُوَ قَوَدٌ –

যে (স্বাধীন) ব্যক্তি একটি গোলামকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে, তার উপর তার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

দাসের বদলে মনিব হত্যা

মনিব তার দাসকে হত্যা করলে কি কিসাসস্বরূপ সেই মনিবকে হত্যা করা হবে কিনা এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। খুব বিরল সংখ্যক লোক বলেছেন, হ্যাঁ অবশ্যই হত্যা করা হবে। সর্বসাধারণ ফিকাহবিদগণের মত হচ্ছে, হত্যা করা যাবে না। যারা মনিবকে দাস হত্যার দায়ে দায়ী করে তাকে হত্যা করার পক্ষপাতী, তাঁরা কিসাসের আয়াতের বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে ভিত্তি করেছেন। কেননা আল্লাহ কথা ঃ নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন স্বাধীনের বদলে...

কথা থেকে তা-ই প্রকাশিত হয়। আর এই দলীলের ভিত্তিতেই স্বাধীনকে স্বাধীনের বদলে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাদের দলীল আল্লাহ্র এই কথাও ঃ প্রাণ প্রাণের বদলে। এই কথাও ঃ 'যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, অনুরূপ প্রতিশোধ তোমরা তার উপরও গ্রহণ করবে। নবী করীম (স)-এর এই কথাও 'মুসলমানদের রক্ত পারস্পরিক অভিন্ন '। সামুরাতা ইবনে জুনদবও নবী করীম (স) থেকে তাঁর এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ -

যে লোক তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরাও দণ্ডস্বরূপ তাকে হত্যা কর। যে লোক তার গোলামের অঙ্গ কাটবে, আমরাও কিসাস স্বরূপ তার অঙ্গ কাটব।

তবে উপরোক্ত কিসাসের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাদের পক্ষের দলীল হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ এ পর্যায়ের মনিব-মালিকের কিসাস করার দলীল বানিয়েছেন এ আয়াতটিকে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا -

যে লোক মজলুম অবস্থায় নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি।

গোলামের অভিভাবক তার মনিব-মালিক—তার জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরও। কেননা গোলাম তো কোন জিনিসেরই মালিক হয় না। সে যা কিছুর মালিক হয়, তা তো তার মনিব-মালিকের মালিকানা স্বত্ব। মীরাসের দিকে দিয়েও সে কিছু পায় না। কাজেই সে-ই যখন অভিভাবক, তখন তার নিজের কিসাস কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু সে নিজের উত্তরাধিকারী—যে হত্যা করে তার অবস্থায়ও হয় না। ফলে এদিক দিয়েও তার উপর কিসাস ফরয হয় না। গোলাম মনিবের উত্তরাধিকারীও হয় না। কেননা উত্তরাধিকারী যা পায়, তা যার উত্তরাধিকারী হয় مورث তার মালিকানা না থেকেই হস্তান্তরিত হয়। আর হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না। অতএব এই অপরের জন্যে কিসাস ওয়াজিব হবে। গোলাম যেহেতু কোন জিনিসের হয় না, মালিক তাই তার কোন মালিকানা মনিব মালিকের দিকে হস্তান্তরিতও হয় না। গোলামের পুত্র যদি হত্যা করে, তাহলে তার হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে না। কেননা সে কোন কিছুর মালিক নয়। এমনিভাবে অন্যের উপরও কিসাস কার্যকর হবে না। তার হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ আবশ্যিক হল, তা পাওয়ার যোগ্য হবে তার মনিব, সে হবে না। অতএব এই কারণেই গোলামের মনিবের উপর তাকে হত্যা করার দরুন কিসাস আবশ্যিক হওয়া অবধারিত। গোলামের জন্যে তা প্রমাণিত নয়, এ কথার দলীল এই আয়াত ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ -

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দাঁড় করেছেন একজন গোলাম মনিবের মালিকানাধীন। সে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না।

এ আয়াতে গোলামের মালিকানা অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে এবং সাধারণভাবে সকল জিনিসকেই এই নিষেধের আওতার মধ্যে এনেছে। এ কারণে কারোর উপর কোন জিনিস প্রমাণিত হতে পারে না। গোলাম নিজেই অন্য কারোর মালিকানাভুক্ত বলে তার জন্যে কোন জিনিসই প্রমাণিত হবে না। তার মনিব-মালিক যদি কোন কিছু পাওয়ার অধিকারী সাব্যস্ত্ হয়, তা হলে তার নিজের উপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হতে পারে না। এ ব্যাপারে গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মত নয়। কেননা স্বাধীন ব্যক্তির জন্যে কিসাস কার্যকর হবে। পরে তার থেকে তার উত্তরাধিকারীদের দিকে হস্তান্তরিত হবে। তারা তাদের মীরাসী অংশ হিসাবে তা থেকে হিসসা পেয়ে যাবে। তাই হত্যার কারণে যার মীমাস-ই হারাম হয়ে গেছে, তার প্রতিশোধ বর্খিত প্রাপ্তির উপর মীরাস কার্যকর হবে না। যে উত্তরাধিকারী হবে, প্রতিশোধ (নিহতের বদলে হত্যাকারীকে হত্যা) হবে তার জন্যে।

যদি বলা হয়, এ দিক দিয়ে গোলামের রক্ত তার অর্জিত ধন-মালের মত নয়। কেননা মালিক-মনিব তাকে হত্যা করার অধিকারী নয়। হত্যার সাহায্যে তাকে গোলামীকে প্রতিষ্ঠিত রাখারও কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সে একজন অনাত্মীয়, সম্পর্কহীন ব্যক্তি মাত্র।

জবাবে বলা যাবে, মালিক-মনিব যদি তার গোলামকে হত্যা করার অধিকারী ও মালিক না হয়ে থাকে এবং গোলামীতে তাকে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী করারও অধিকারী না হয়ে থাকে তাহলেও সে-ই তো তার অভিভাবক। তার হত্যার উপর কিসাস লওয়ার সে-ই অধিকারী যদি হত্যাকারী ভিন্ন কোন ব্যক্তি হয়। তার এ অধিকার গোলামের মালিক হিসেবে, মীরাসী সূত্রে নয়। গোলামের আত্মীয়-স্বজনদের মুকাবিলায়ও সে-ই প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী তার হত্যাকারীর উপর। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তার মালিক-মনিবই তার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী, যেমন সে-ই তার গর্দানেরও মালিক। তা সত্ত্বেও সে নিজেই যদি তার গোলামের হত্যকারী হয়, তা হলে অন্য কেউ তো এমন নেই যে তার উপর প্রতিশোধ আরোপ করতে পারে এবং তার অধিকারী হতে পারে। সে নিজে কি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবে? না, তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আল্লাহ্র কথা ঃ 'যে তোমাদের উপর সীমালজ্ঘন করবে তোমরাও তার উপর ততটা সীমালজ্ঘনমূলক আচরণ কর' এই সম্বোধন গোলামের মালিকের প্রতি হতে পারে না, যদি সে নিজেই তার গোলামকে হত্যা করে তার উপর সীমালজ্ঘনকারী হয়। কেননা সে যদি নিজের উপর সীমালজ্ঘনকারী হয়ে তার নিজের গোলামকে হত্যা করে তার নিজের মালিকানাকে ধ্বংস করে, তা হলে সে তার নিজের কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায় করার জন্যে আদিষ্ট হতে পারে না। আর অন্য কেউও তার কাছ থেকে প্রতিশোধ দেয়ার জন্যে আদিষ্ট হতে পারে না। কেননা সে তো তার উপর সীমালজ্ঘনকারী নয়। আল্লাহ সে অধিকার দিয়েছেন তাকে, যে তার উপর সীমালজ্ঘনকারী হবে অন্যদের ছাড়া।

কেউ যদি বলেন, তার উপর রাষ্ট্র সরকার প্রতিশোধ কার্যকর করবে, যেমন উত্তরাধিকারী নেই এমন ব্যক্তি নিহত হলে সরকারই বাদি হয়ে তার প্রতিশোধ আদায় করে।

তার জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র সরকার (ইমাম) সমগ্র মুসলমানের জন্যে প্রতিশোধ কার্যকর করার জন্যে দাঁড়াবে যখন তারা নিহতের মীরাস পাওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু গোলামের তো কোন উত্তরাধিকারী নেই, হতে পারে না। তা যদি হতো তা হলে হত্যাকারী থেকে সমগ্র মুসলমানের জন্যে কিসাস লওয়ার অধিকার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতো। তা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যেও প্রমাণিত হয় না। কেননা গোলাম যদি ভুলক্রমে নিহত হয় তা হলে তার হত্যাকারীর নিকট থেকে রক্তমূল্য পাওয়ার অধিকারী হবে তো মনিব-মালিক। মুসলিম জনগণ নয়। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের ইমামও নয়। আর যে স্বাধীন ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই ভুলবশত নিহত হলে তার রক্তমূল্য বায়তুলমালে জমা হবে। অনুরূপভাবে মনিবের উপর প্রতিশোধ কার্যকর হলে রাষ্ট্র প্রধান তা পাবে না, তার মনিব মালিক-ই তা পাবে। সে জিনিসটি তার নিজের উপর কার্যকর করা কঠিন, তাই তা বাতিল। এই পর্যায়ে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা এর পরিপন্থী। হাদীসটি ইবনে কানে মুকবেরী, খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে সফওয়ান-নওফলী জমরাতা ইবনে রবী'আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আওযায়ী আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেই তার গোলামকে হত্যা করেছে। নবী করীম (স) তাকে দোররা মেরেছেন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন এক বছরের মেয়াদের জন্যে। আর মুসলমানদের থেকে তার অংশ মুছে ফেলেছিলেন। সে জন্যে অন্য কোনরূপ প্রতিশোধ নেননি। অপর দিকে সামুরাতা ইবনে জুনদুব বর্ণিত হাদীস যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে এই কথার আনুকূল্য করেছেন যে, বাহ্যত ও তৎপর্যগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মনিবের জন্যে প্রতিশোধ ওয়াজিব করে দিয়েছেন, গোলামের মালিকের জন্যে তা নিষেধ করেছেন এ জন্যে যে, কুরআনের কথা ঃ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ 'গোলাম কোন কিছুর উপর ক্ষমতাবান হয় না'। এ হাদীসের বহ্যিক অর্থ পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত। সামুরা বর্ণিত হাদীস যদি পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের সাথে বৈপরীত্য থেকে আলাদা হয়ে যায় তবু তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হতো না। কেননা তার বাহ্যিক অর্থের বাইরে আর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, এটা সম্ভব, মালিক-মনিব তার গোলামকে মুক্ত ও আদায় করে দিল, পরে তাকে হত্যা করল অথবা তার অঙ্গ কর্তন করল কিংবা তাকে অঙ্গ কর্তনের হুমকি দিল। পরে এই সংবাদ নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন বললেন ঃ 'যে লোক তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরাও তাকে হত্যা করব।' অর্থাৎ সে মনিবের আযাদ করা গোলামকে হত্যা করেছে, অতএব তাকে এর শাস্তিস্বরূপ আমরা হত্যা করব। আরবী ভাষায় এই কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। লোকদের অভ্যাস-ও আছে এরূপ বলার। হযরত বিলাল (রা) ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দিলে নবী করীম (স) তাঁকে বললেন ঃ

اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ وَقَدْ كَانَ حَرًّا فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ -

জেনে রাখো ঃ বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ সেই সময় সে মুক্ত ও আযাদ ছিল।

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ এই গোলামকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস। অর্থাৎ শুরাইহ্‌কে, যখন সে চাচার দুই পুত্রের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন, তাদের দুজনের একজন মায়ের দিক দিয়ে ভাই। ফায়সালা দিয়েছিলেন, মায়ের দিক দিয়ে (বৈপিত্রেয়) ভাই মীরাস পাবে। কেননা জাহিলিয়াতের যমানায় তার উপর গোলামী চেপেছিল। তাকে গোলাম বা বান্দা নাম দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ -

ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল বুঝিয়ে দাও।

অথচ মাল ফিরিয়ে দেয়ার সময় তারা আর 'ইয়াতীম' নামে অভিহিত হওয়ার অধিকারী থাকেনি। পূর্বে অবশ্য তারা ইয়াতীম ছিল। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا -

ইয়াতীম মেয়েকে তাঁর নিজের বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা ও তার নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করা হবে।

অর্থাৎ সে পূর্বে ইয়াতীম ছিল, যদিও এই মুহূর্তে তাকে 'ইয়াতীম' বলে অভিহিত করা যায় না। এভাবে নবী করীম (স) যখন বললেন সে তার 'গোলাম'কে হত্যা করেছে,, তখন তার বক্তব্য ছিল পূর্বে যে তার গোলাম ছিল, তাকে যদি হত্যা করে। গোলাম ছিল, পরে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এ আলোচনার দ্বারা সেই সংশয় দূর হতে পারে যে, পিতাকে যেমন তার পুত্রের প্রতিশোধের জন্যে দায়ী করা যায় না, তেমনি মনিবকেও তার গোলামের জন্যে প্রতিশোধের সম্মুখীন করা যায় না।

কারো কারো ধারণা এই দিকেও যেতে পারে যে, রাসূলে করীম (স) মনিবকে প্রতিশোধের সম্মুখীন করতে পারতেন না। কেননা তিনি নিজেই মনিবের হক ও কর্তৃত্ব তার গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেমন সন্তানের উপর তার পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তার দলীল হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি ঃ

لَنْ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَّالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقَهُ -

সন্তান পিতাকে দায়ী করতে পারে না। তবে পিতা যদি তাকে ক্রীতদাস হিসেবে পায় তাহলে সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে।

এই গোলাম পুত্রকে মুক্ত করাকে তার পিতার জন্যে তার অধিকারের সাথে সামস্যশীল বানিয়েছেন। তার হাতের সমান বানিয়েছেন এবং তার নিকট যে নিয়ামত রয়েছে তারও।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কিসাস

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى -

তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে।

বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا -

যে লোক নিতান্তই অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি।

এ আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ, দাস ও স্বাধীন মানুষের পরস্পরের মধ্যে যেমন কিসাস ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনি পুরুষ ও নারীর মাঝেও সেই কিসাসকে অবশ্য কার্যকর বানিয়েছে।

অবশ্য এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে শুধু প্রাণ সংহারের ক্ষেত্রে।

ইবনে শাবরামাতা থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে প্রাণ সংহার ছাড়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে। ইবনে আবূ লায়লা, মালিক, সওরী, লাইস, আওযায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, পুরুষ ও নারীর মাঝে প্রাণ সংহার ও তার কম যে কোন অপরাধেই কিসাস কার্যকর হবে। তবে লাইস বলেছেন, পুরুষ যদি তার স্ত্রীর উপর কোন অপরাধ করে, তা হলে তাকে বন্দী করা হবে, তার কিসাস করা হবে না। উসমান-আলবত্তী বলেছেন, স্ত্রী যদি পুরুষকে হত্যা করে, তা হলে দণ্ডস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে এবং সেই সাথে তার (স্ত্রীর) ধন-মাল থেকে অর্ধেক দীয়ত আদায় করা হবে। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি স্ত্রীর দ্বারা আহত হয়, তাহলেও অনুরূপ কিসাস হবে। বলেছেন, পুরুষ যদি স্ত্রীকে হত্যা করে কিংবা তাকে আহত করে, তাহলে তার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে। তাকে কোন জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হয়েছে। কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) সানয়াবাসীদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন একজন মেয়েলোকের বদলে, তার জন্যে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। আতা শাবী ও মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নারীর কারণে পুরুষকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) থেকে ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। লাইস হিকাম-আলী আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজন বলেছেন, পুরুষ যদি স্ত্রীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহলে সে স্ত্রীর জন্যে পুরুষটির উপর প্রতিশোধ লওয়া হবে। আতা, শাবী ও হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা) বলেছেন, তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে ও অর্ধেক দীয়ত দিয়ে দেবে। আর চাইলে

পুরুষের অর্ধেক দীয়ত গ্রহণ করবে। আশয়াস হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি মেয়েলোক ইচ্ছামূলকভাবে একজন পুরুষকে হত্যা করল। এ পর্যায়ে তিনি বলেছেন, তাকে হত্যা করা হবে এবং অর্ধেক দীয়ত ফেরত দেয়া হবে।

আবূ বকর বলেছেন, হযরত আলী থেকে যে দুটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা 'মুরসাল'; তা মূল বর্ণনাকারীর নামে বর্ণনা করা হয়নি। তার একজন বর্ণনাকারী হযরত আলী থেকে হাদীসটি শুনেন নি। দুটি হাদীসই যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তার পরিণতি হবে ঃ দুটি পরস্পর বিপরীত, অতএব প্রত্যাহৃত যেন, তাঁর নিকট থেকে কিছুই বর্ণনা করেনি তারা। হিকামের বর্ণনায় প্রতিশোধ গ্রহণের কথা আছে, ধন-মাল গ্রহণের কথা নেই, তাই তা উত্তম। কেননা তা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে।' এ ছাড়া অন্যান্য যে সব আয়াত প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করে, তার কোন একটিতেও দীয়তের কথার উল্লেখ নেই। কাজেই মূল দলীলে তা বাড়িয়ে দেয়া—অনুরূপ কোন অকাট্য দলীল ছাড়াই—সঙ্গত হতে পারে না। কেননা মূল অকাট্য দলীলে বৃদ্ধি সাধনে দলীলটিই মনসূখ হয়ে যায়।

ইবনে নাফে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী হুমাইদ আনাস ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নজর কন্যা রুবাই একটি ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত করল। তাতে তার দাঁত ভেঙ্গে গেল। পরে তারা তার রক্তমূল্য দিয়ে দেয়। কিন্তু তা গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করে। পরে তারা নবী করীম (স)-এর নিকট ব্যাপারটি পেশ করে। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। পরে তাদের ভাই আনাস ইবনে নাসর এসে বলল ঃ হে রাসূল আপনি রুবাইর দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন! না, যিনি আপনাকে পরম সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছেন। তখন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্ তো কিসাস-ই ফরয করেছেন। অতঃপর জনগণ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বললেন ঃ

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ –

আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই আছে, যে আল্লাহ্র নামে কসম করলে তিনি অবশ্যই তাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

এতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র কিতাবে কিসাস-ই বিধিবদ্ধ। ধন-মাল গ্রহণ নয়। অতএব কিসাস ও ধন-মাল এক সাথে গ্রহণ জায়েয নয়। অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, মূল হত্যার দরুন যদি কিসাস-ই কার্যকর না হল তা হলে মাল দেয়ার সঙ্গে তা কার্যকর করা নিশ্চিয়ই জায়েয হবে না। কেননা তখন মাল-ই তো প্রাণের বিনিময় হয়ে দাঁড়াবে। আর নরহত্যার প্রতিশোধ মাল দ্বারা করা জায়েয নয়। বিবেচ্য, যে ব্যক্তি হত্যা করতে রাযী হল সেই সঙ্গে মালও দিল যা তার ওয়ারিশরা পেল, এটা সহীহ্ কাজ হবে না। প্রাণ সংহারের যোগ্য হবে মালের বিনিময়ে—এটা জায়েয্ হতে পারে না। অতএব মাল দেয়ার ভিত্তিতে কিসাস মওকুফ করা বাতিল হয়ে গেল।

হাসান-এর মত উসমান-আল-বত্তীরই কথা। তা হচ্ছে, স্ত্রী যদি হত্যাকারী হয়, তা হলে বদলে তাকে হত্যা করা হবে, সেই সাথে তার মাল থেকে অর্ধ দীয়তও আদায় করা হবে। এ এমন একটি কথা, যা কিসাস অনিবার্য প্রমাণকারী আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাখান করে এবং যার হুকুম আয়াতে নেই, তা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

কাতাদাহ্ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন ইয়াহূদী একটি দাসীকে হত্যা করল। তার উপর তার লক্ষণসমূহ প্রকট ছিল। ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি সেই দাসীকে হত্যার দণ্ডস্বরূপ ইয়াহূদীটিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। জুহরী, আবূ বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তাঁর পিতা—তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ পুরুষ স্ত্রীলোকের হত্যার বদলে হত্যা করা হবে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক একজন স্ত্রীলোক হত্যার বিনিময়ে কয়েকজন পুরুষ হত্যা করা প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। তার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্য থেকে একজন একথা প্রকাশ করেছেন জিজ্ঞাসার জবাবে। সেই সাথে এই ঘটনার বিবরণ প্রসিদ্ধিলাভও করেছে। আর এ ভাবেই একটি মতের উপর ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিহত স্ত্রীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা, তার বদলে টাকা-পয়সা গ্রহণ না করা প্রমাণিত হয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায়। আমরা দেখিয়েছি সুস্থ দেহী ও রোগীর মধ্যে সমতার প্রশ্ন গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য নয়, পাগলের বদলে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির লোক, বালকের বদলে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা শরীয়াত ভিত্তিক কাজ। এ থেকে প্রাণের ব্যাপারে সমতার প্রশ্ন অবান্তর। প্রাণ সংহারের কমে অবশ্য সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। তার দলীল হচ্ছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত ভাঙ্গার বদলে সুস্থ সবল হাতের উপর প্রতিশোধ নেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। অনুরূপভাবে প্রাণ সংহার ছাড়া তার তুলনায় কম মানের অপরাধে পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর করা হানাফীর ফিকাহবিদদের মতে ওয়াজিব নয়। দাস ও স্বাধীন মানুষদের পারস্পরিক ব্যাপারেও তাই। কেননা প্রাণ সংহারের কম মানের অপরাধে সকলের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমতাপূর্ণ নয়।

যদি কেউ বলেন, একজন পুরুষের হাত ভেঙ্গে দেয়া বা কেটে ফেলার বদলে ক্রীতদাস বা স্ত্রী হাত কেন কাটা যাবে না? যেমন সুস্থ সবল হাতের বদলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত কেটে দেয়া হয়?

জবাবে বলা যাবে—এ ধরনের ক্ষেত্রে কিসাস নেই। কেননা এ পর্যায়ের বিধানে বিভিন্নতা রয়েছে। কমতির দিক দিয়েই নয়। ফলে ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াল যে, ডান হাতের বদলে বাম হাত নেয়া যাবে না। আমাদের ফিকাহবিদগণ প্রাণ-সংহারের—অন্য কথায় হত্যা-কর্মের অপরাধে নারীদের পরস্পরের মধ্যে কিসাস অবশ্যই কার্যকর করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সে দুজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রয়েছে। অবশ্য সেই সংক্রান্ত আইনে কোনরূপ পার্থক্য নেই। প্রাণ-সংহারের কম মানের অপরাধে দাসদের মধ্যে কিসাস ওয়াজিব করেন নি। কেননা সে দুটির মধ্যকার সমতা মূল্যায়ন

পন্থায়ই জানা যেতে পারে। আন্দাজ-অনুমানের অধিক জোরের সাহায্যেও জানা যায়, যেমন হাত অর্ধ বাহুর স্থানে কাটা যাবে না। কেননা এই কাটার ব্যাপারটি ইজতিহাদের মাধ্যমে জানা ও পাওয়া গেছে। তাঁদের মতে দাসের অঙ্গের হুকুম সর্বদিক দিয়েই ধন-মালের মাধ্যমে হুকুমের মত। তাই তা থেকে 'আকিলা' গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে না। তবে তার মালে যে অপরাধ করেছে, তার জন্যে তা বাধ্যতামূলক হবে। প্রাণ-হরণ সে রকমের ব্যাপার নয়। কেননা ভুলবশত হত্যা হলে তাতে 'আকিলা' বাধ্যতামূলক। তাতে কাফফারা দেয়াও ওয়াজিব। ফলে ধন-মালের ক্ষেত্রে কৃত অপরাধ ভিন্নতর হয়ে গেল।

কাফির ব্যক্তির বদলে মুমিন হত্যা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফুর, ইবনে আবূ লায়লা ও উসমানুলবত্তী বলেছেন, যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওযারী ও শাফেয়ী বলেছেন, হত্যা করা যাবে না।

ইমাম মালিক ও লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, যদি প্রতারণাপূর্ণভাবে হত্যা করে থাকে, তাহলে তার বদলে মুসলিমকে হত্যা করতে হবে। অন্যথায় নয়।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে আমরা যত আয়াত উদ্ধৃত করেছি, তার বাহ্যিক অর্থ যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করার কথাই প্রমাণ করে, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করে বলেছি। কেননা এ ব্যাপারে মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى -

নিহতের বদলে কিসাস তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে।

সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ হুকুম। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও তাই; স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী।' আয়াতের শেষে বলা হয়েছে; 'যার' জন্যে তার ভাইর দিক দিয়ে কিছু, ক্ষমা করা হল। কিন্তু তা কাফিরদের ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে আয়াতের প্রথম অংশে বিশেষীকরণের কোন দলীল নেই। কেননা এই ভাই বংশের দিক দিয়ে ভাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া সাধারণ অর্থের শব্দের পরে বিশেষ হুকুম যুক্ত করা হলে গোটা হুকুমটিকে বিশেষীকরণ প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়ে পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে আমরা আয়াতের হুকুম নিয়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও অনুরূপ ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ -

তাতে তাদের উপর ফরয করে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (নিতে হবে)।

এ কথাটিও কাফিরের বদলে মুমিন হত্যার সাধারণ বিধানই উপস্থাপিত করে। কেননা আমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়াত আমাদের উপর কার্যকর, যদি তা আমাদের

নবীর যবানীতে মনসূখ করে দিয়ে না থাকেন। এরূপ অবস্থায় তা আমাদের নবীরও শরীয়াত হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -

সেসব লোককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন। অতএব তাদের হেদায়েতকে তোমরা অনুসরণ কর।

এ আয়াতে যে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' নেয়ার কথা আছে, তা আমাদের নবীর শরীয়াত হয়ে আছে। তিনি দাঁত যখম করার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব করেছেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে। তাতে আনাস ইবনে নসর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে লিখিত কিসাসে রুবাইর দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। আল্লাহ্‌র কিতাবে 'দাতের বদলে দাঁত লওয়ার কথা লেখা নেই। যা কিছু আছে, তা এই আয়াতে।' ফলে নবী করীম (স) এই আয়াতটি আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় বানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়াত যদিও আমাদের জন্যে সে হুকুম নিয়ে না-ও আসত, তা হলেও এই আয়াতটি আমাদের জন্যে পালনীয় প্রমাণিত হওয়ার জন্যে রাসূলে করীম (স)-এর কথাই যথেষ্ট হতো। এই আয়াতটির হুকুম আমাদের জন্যেও পালনীয়, যেমন তা পালনীয় ছিল বনী ইসরাঈলীদের জন্যে।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটি দুটি অর্থ। একটি—আয়াতটির হুকুম আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। তা আমাদের উপরও কার্যকর। আর দ্বিতীয়—তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিতাবের বাহ্যিক হুকুম আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে আছে। এ সম্পর্কে রাসূলে করীমের জানানোরও পূর্বে। এ থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ অন্যান্য নবীর শরীয়াতের যে উল্লেখ, তাঁর বর্তমান কিতাব—কুরআনে করেছেন, তার হুকুমটা কার্যকর ও প্রমাণিত, কেননা তা মনসূখ হয়ে যায়নি। আমরা যা বললাম তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যাবে, আয়াতে মুসলিম ও কাফির-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অতএব তার হুকুমটি উভয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তাই প্রমাণ করে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا -

যে লোক অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

এ কথাও সর্ববাদীসম্মত হিসেবে প্রমাণিত যে, আয়াতে এ পর্যায়ে যে سلطان এর উল্লেখ হয়েছে, তা প্রতিশোধ গ্রহণকে শামিল করেছে। তাতে মুসলিমকে কাফির থেকে বিশেষীকরণের চিহ্ন মাত্রও নেই। অতএব তা দুজনের উপর সমানভাবেই কার্যকর হবে।

সুন্নাতের দিক দিয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে আওযায়ীর ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সালমাতা আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন।

اَلَاوَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَوَلِيُّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ اَنْ يَّقْتَصَّ اَوْيَاْخُذَ الدِّيَةَ –

জেনে রাখ, যে লোক কোন হত্যাকাণ্ড ঘটালো, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে দুটির যে-কোন একটি গ্রহণের। হয় সে 'কিসাস' করাবে, না হয় 'দীয়ত' গ্রহণ করবে।

আবূ সাঈদ আল মুকবেরী আবূ শুরাইহ্ আল-কাবী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। উসমান, ইবনে মাসউদ ও আয়েশা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ اَمْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّابِاِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ وَكُفْرٍ بَعْدَ اِيْمَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ –

তিনটি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ হলে মুসলিম ব্যক্তিরও রক্তপাত হালাল ঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করা, ঈমানের পর কাফির হয়ে যাওয়া এবং প্রাণদণ্ড ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা।

আর ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ اَلْعَمْدُ قَوَدٌ 'ইচ্ছাপূর্বক হত্যা অবশ্যই প্রতিশোধযোগ্য'।

এ সব হাদীস খুবই সাধারণ আইন, নির্বিশেষে সকলের উপর ও সর্বাবস্থায় কার্যকর হওয়ার আইন উপস্থাপিত করেছে। মুসলিম ও অমুসলিম যিম্মীর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

রবী'আতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান আবদুর রহমান আস-সালমানী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) অমুসলিম যিম্মী হত্যায় মুসলিমকে দায়ী করে প্রতিশোধ নিয়েছেন। বলেছেন ঃ اَنَا اَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ 'যিম্মার দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে তা পালন করার জন্যে আমি সবচেয়ে বেশি অধিকারী।'

তাহাভী, সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, ইয়াহইয়া ইবনে সালাম, মুহাম্মাদ ইবনে আবূ হুমাইদ আল-মাদানী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাফির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথা-ই বর্ণনা করেছেন।

উমর, আলী ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে সুমকে যিম্মীর বদলে হত্যা করার বর্ণনা এসেছে। ইবনে কানে আলী ইবনুল হাইসাম-উসান—আল ফয়ারী-মাসউদ ইবনে জুয়ায়রিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে খারাশ-ওয়াসিত-হাসান ইবনে মায়মূন-আবুল জুনুব আল-আসাদী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হীরাবাসীদের এক ব্যক্তি হযরত আলী কাররামাল্লাহু আজহাহুর নিকট এসে বললে ঃ হে আমীরুল মুমিনীন; একজন মুসলমান ব্যক্তি আমার পুত্রকে হত্যা করেছে। আমার নিকট তার প্রমাণ রয়েছে। পরে সাক্ষী আনা হল, তারাও

সাক্ষ্য দিল। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ভালো লোক বলা হল। তখন সেই অভিযুক্ত মুসলিমকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বসানো হল। অতঃপর হীরাবাসীকে তরবারি দেয়া হল এবং হযরত আলী (রা) বললেন, দুর্বল-ভীরুতার কারণে ওকে বের করে নিয়ে হত্যা কর। তাকে তরবারি চালাতে সক্ষম কর। কিন্তু হীরাবাসী তরবারী চালায়ে হত্যা করতে খুব দেরী করছিল। তার বংশের কোন কোন লোক তাকে বলল ঃ তুমি কি দীয়ত দিয়ে বেঁচে যেত চাও ? এ করে তুমি আমাদের সাথে একটা শক্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাও ? সে বলল, হ্যাঁ। সে তরবারি কোষবদ্ধ করল এবং হযরত আলী (রা)-এর নিকট চলে গেল। তিনি বললেন ঃ ওরা কি তোমাকে গালমন্দ করেছে ও নানা ওয়াদা করে তোমাকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত করেছে ? সে লোকটি বলল ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমি বরং দীয়ত গ্রহণ করেছি। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ এ বিষয়ে তুমিই জান। পরে হযরত আলী (রা) জনগণের নিকট গেলেন। বললেন ঃ আমরা তো তোমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলাম যেন আমাদের তোমাদের রক্তের সমান হয় এবং আমাদের দীয়ত তোমাদের দীয়তের মতই মর্যাদা পায়।

ইবনে কানে মুয়ায ইবনুল মুসান্না-আমর ইবনে মরযুক—শুবা আবদুল মালিক ইবনে মায়সাবাতা-নিজাল ইবনে সবরাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলমান ইবাদী বংশের (খৃস্টান ধর্মাবলম্বী) এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। নিহতের ভাইরা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট মামলা পেশ করল। তখন হযরত উমর সেই হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্যে ফরমান লিখে পাঠালেন। তখন তারা বলতে লাগল ঃ হে যুবায়র, তুমি এই হত্যাকারীকে হত্যা কর। এভাবেই বলতে থাকল, যেন তার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়। তা দেখে হযরত উমর (রা) ফরমান লিখলেন, না, তাকে হত্যা করা হবে না, তার 'দীয়ত' আদায় করা হবে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন হযরত উমর (রা) 'দীয়ত' দেয়ার ভিত্তিতে সন্ধি করার প্রস্তাব করেন। জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, হত্যাকারী মুসলমানের একজন অশ্বরোহী যোদ্ধা। আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ইবনে ইদরিস লাইস হিকাম-আলী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত, তাঁরা দুজনই বললেন ঃ একজন ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টানকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

হুমাইদ আত-তায়ালী মায়মুন-মেহবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ ফরমান জারী করেছেন যে, একজন ইয়াহূদীকে হত্যা করার অপরাধে একজন মুসলিমকে হত্যা করা হবে এবং কার্যত তা-ই করা হয়েছিল।

বস্তুত এই তিনজন মহান সাহাবী, তাঁদের সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা পাওয়া গেছে। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁদেরই অনুসরণকারী। তাদের সমকক্ষ অপর কেউ ভিন্নমত দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

যিম্মী হত্যার দায়ে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করার বিরোধী মত ধারণকারীরা

তাদের মতের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে তাঁর কথা এই বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْعَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ -

মুসলমান কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিভুক্ত (যিম্মী) ব্যক্তিও তার চুক্তি বহাল থাকা কালে হত্যা করা যাবে না।

আমাদের মতে এই হাদীসটির নানা প্রকারের ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। সে সব কয়টি ব্যাখ্যাই পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন।

উপরে আমরা যে সব আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত মক্কা বিজয় দিনের ভাষণ। ব্যক্তিটি ছিল খুজায়া বংশের। সে হুযায়ল বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল জাহিলিয়াতের শত্রুতাবশত। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

اَلَا اِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْعَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ -

জেনে রাখো ঃ জাহিলিয়াতের যুগের সব রক্তপাত আমার এই পায়ের তলে পরিত্যক্ত। কোন মুমিন কোন কাফির হত্যার দায়ে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিভুক্ত ব্যক্তিও তার চুক্তি বহাল থাকা কালে।

এখানে কাফির বলতে জাহিলিয়াতের যুগের কোন কাফিরকে হত্যার দায়ে এখন কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। 'সর্ব প্রকারের রক্তপাত আমার এই দুই পায়ের তলায় রক্ষিত, প্রত্যাহারকৃত' বলতে এই কথাই বোঝানো হয়েছে। কেননা এই দুটি কথা একই হাদীসের ভাষণে বলা হয়েছে।

যুদ্ধের ইতিহাস লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, যিম্মার চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। তবে তার পূর্বে নবী করীম (স) ও মুশরিকদের মধ্যে বহু চুক্তি ছিল যা 'সাহায্য চুক্তি' নামে অভিহিত। কিন্তু তার অর্থ এই ছিল না যে, তারা ইসলামের যিম্মাহভুক্ত ছিল ও তাতে যিম্মাহর হুকুম কার্যকর ছিল। না, তা নয়। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কথা 'কাফির-এর বদলে মুসলিম হত্যা করা যাবে না'টি চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল। কেননা তখনো কোন যিম্মী ছিল না, যার সম্পর্কে উক্ত কথা বলা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। রাসূলের কথা ولاذوعهد فىْ عهده থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ -

তোমরা তাদের প্রতি তাদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।

বলেছেন ঃ

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ –

অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে চারমাস কাল চলাফেরা করতে থাক।

এই সময়ের মুশরিক দুই ভাগে গণ্য হতো। এক ভাগে যুধ্যমান মুশরিক, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সাথে নবী করীম (স)-এর কোন চুক্তি ছিল না। আর দ্বিতীয় ভাগে ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। একটা মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে তাদের সাথে 'যুদ্ধ নয়'-এর চুক্তি ছিল। তখন পর্যন্ত মুসলমানদের যিম্মী কেউ ছিল না। অতএব রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথা এই দুই ভাগের মুশরিকদের সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করতে হবে। যারা এই দুই পর্যায়ের কোন ভাগে পড়ে না, তারা সেকথার আওতায় পড়ে না। এই হাদীসটির শুরুতেও সে বক্তব্যে এই দলীল রয়েছে যে, উল্লিখিত হুকুমটি 'কিসাস'কে অকার্যকর করে দিয়েছে, চুক্তিবদ্ধ যুধ্যমানদের জন্যে সীমাবদ্ধ কোন যিম্মী নয়। কেননা কথাটি শেষে যুক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তারাও নয়, যারা চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তিটি এখনও বহাল আছে। কেননা একথা জানা আছে যে, এই শেষের কথাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা নয়। কাজেই কথার ফায়দাটা তারা এককভাবে পাবে না। যদি কথাটি আগের কথা থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তাতে পূর্বে উল্লিখিত কথার সাথে সম্পর্ক তালাশ করতে হবে। জানা আছে যে, যে চুক্তিবদ্ধ নিরাপত্তা লাভকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, সে আসলে মুসলমানদের সাথে যুধ্যমান। কাজেই প্রমাণিত হল যে, কথার তাৎপর্য ও লক্ষ্য সীমাবদ্ধ যুধ্যমানের মধ্যে।

'কোন চুক্তিমান চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না' কথাটির দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি—যে হত্যার উল্লেখ প্রথমে হয়েছে তা যদি 'কিসাস'-এর হত্যা হয়, তা হলে ঠিক সেই হত্যার কথাই দ্বিতীয় কথায় নিহিত। তাহলে আমরা শুধু হত্যার কথা বুঝতে পারি না। কেননা পূর্বে—কথার মধ্যে শুধু হত্যার কথা—যার সাথে কিছু পরিচিতি নেই—উল্লেখ করা হয়নি।

কেননা সে হত্যা ছিল প্রতিশোধমূলক—হত্যার বদলে হত্যার ব্যাপার। তাই وَلَاذُوۡعَهۡدٍ فِىۡ عَهۡدِهٖ 'চুক্তিবদ্ধও কেউ নয় তার চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায়' কথাটি দ্বারা সেই হত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তা হলে কথাটি দাঁড়ায় ঃ

'কোন মুমিন কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকেও হত্যা করা যাবে না চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় কাফির ব্যক্তির বদলে, যার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে।'

আমরা যদি নিঃশর্ত হত্যা মনে করি, তা হলে ইঙ্গিতটা দ্বারা এমন প্রমাণ করা হবে, যার কথা গোটা ভাষণে বলাই হয়নি। কিন্তু তা সঙ্গত নয়। এটা যখন প্রমাণিত হল আর যে কাফিরের বদলে চুক্তিবদ্ধ যুধ্যমান কাফির হত্যা করা যাবে না, তখন তাঁর কথাটি এই দাঁড়াল যে, মুমিনকে কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না, তার অর্থ, কোন মুমিন

যুধ্যমান কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না। তাহলে নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে মুমিন যিম্মী কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না, এমন কথা পাওয়াই যায়নি।

আর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, একথা জানা আছে যে, চুক্তির কথা উল্লিখিত হওয়ার কারণে চুক্তি বহাল থাকাকাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হবে। রাসূলের 'চুক্তিবদ্ধ তার চুক্তি বহালকালে' কথাটির অর্থ যদি আমরা এই রূপ গ্রহণ করি যে, 'চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি চুক্তি বহাল থাকা কাল' পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না, তাহলে কথাটিকে অর্থহীন নিষ্ফল করে দেয়া হবে। বরং রাসূলে করীম (স)-এর কথার প্রকৃত তাৎপর্যকে বাস্তবায়িত করাতেই ফায়দা ও কল্যাণ নিহিত। তাকে বেকার ও নিষ্ফল করে দেয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাঁর হুকুম কোন ক্রমেই প্রত্যাহার করা যেতে পারে না।

যদি কেউ বলেন, আবূ হুযায়ফা আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর এ কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মুমিন কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না' তাতে চুক্তিবদ্ধ লোকদের কথা বলা হয়নি। ফলে এরূপ হাদীস সকল প্রকারের কাফিরের বদলে মুমিনকে হত্যা করা যায় না বোঝা যায়।

এর জবাবে বলা যাবে, সেই একটি হাদীস। আবূ হুযায়ফা হাদীসটিকে তাঁর সহীফায়ও সন্নিবদ্ধ করেছেন। কায়স ইবনে উবাদও তাই করেছেন। হ্যাঁ, কোন কোন বর্ণনাকারী চুক্তি সম্পর্কিত কথাটি বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মূল হাদীস একই। তা সত্ত্বেও যদি তা একই হাদীস প্রমাণিত না হয়, তবুও এ দুটোকে একসাথে সৃষ্ট হাদীসই বলতে হবে। কেননা নাবী করীম (স) উক্ত কথা দুইবার বলেছেন, একবার শুধু প্রথম অংশ 'মুমিন কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না' চুক্তিবদ্ধদের উল্লেখ না করেই, আর অন্যবার তাদের কথা উল্লেখসহ, সে কথা প্রমাণিত নয়। ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী মাযহাবের আনুকূল্য করেছেন। তাঁর কথা হল— এক যিম্মী যদি অপর যিম্মীকে হত্যা করে, তারপর সে ইসলাম কবুল করে, তাহলে তার উপর প্রতিশোধ লওয়া প্রত্যাহার হয়ে যাবে না। শুরুতেই যদি ইসলাম কিসাস করার প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তা পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে তা পূর্ণ করার পূর্বেই। পিতা তার সন্তানকে হত্যা করলে যদি কিসাস ফরয না হয়ে থাকে, তার পুত্র যখন তার উত্তরাধিকারী হবে তখন অন্য থেকে তার প্রতিশোধ লওয়া তার কর্তব্য হবে। অতএব ফরয হওয়ার শুরুতে যেমন তা নিষিদ্ধ, তেমনি তা পূর্ণত্বের পর্যায়েও নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যদি কোন 'মুরতাদ'কে হত্যা করে, তাহলে তার কোন প্রতিশোধ লওয়ার থাকবে না। মুসলিম থাকা অবস্থায় যদি তাকে আহত করে, তারপর সে 'মুরতাদ' হয়ে যায়, পরে সেই যখমের ফলে সে মরে যায়, তাহলেও প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল হয়ে হবে। তাতে শুরুর ও স্থিতির হুকুম সমান হয়ে যাবে। তাই শুরুতেই যদি হত্যা করা ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে হত্যার পর ইসলাম কবুল করলে তা কখনই ওয়াজিব হতে পারে না, উপরন্তু কিসাস ফরয করায় মানুষের জীবনই লক্ষ্য, তারও কোন অর্থ হতো না। আল্লাহ তো বলেছেনই ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ –

কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।

যিম্মীর ক্ষেত্রে এই তাৎপর্য বর্তমান। কেননা আল্লাহ যিম্মাহ গ্রহণের মাধ্যমে তার রক্ত রক্ষার ইচ্ছা করেছেন। তাই তারও মুসলিমের মধ্যে 'কিসাস' কার্যকর হওয়া একান্তই আবশ্যক। যেমন তাদের পরস্পরের মধ্যেও কার্যকর হওয়া কর্তব্য।

যদি বলা হয়, এ নীতি অনুযায়ী নিরাপত্তা গ্রহণকারী যুধ্যমান (কাফিরের) বদলে মুসলিমকে হত্যা করা তোমার জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়। কেননা তার রক্তপাতও তো নিষিদ্ধ।

জাবাবে বলা যাবে—না, ব্যাপার তা নয়। বরং তার রক্তপাত মুবাহ, যদিও তা বিলম্বে ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কেননা আমরা তো দারুল ইসলামে এমনি ছেড়ে দেব না, তাকে তার জন্যে নিরাপদ স্থানে আমরা পৌঁছিয়ে দেব। এই বিলম্ব তার রক্তপাত মুবাহ হওয়াকে দূরীভূত ও বাতিল করে না। যেমন বাকী মূল্যে কিছু বিক্রয় করা। এ বিলম্ব মূল্য দেয়ার কর্তব্যকে নাকচ করে না।

যারা এই কিসাস নিষিদ্ধ মনে করে, তাদের আর একটি দলীল হল রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَا دِمَاؤُهُمْ 'মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদার।' এ কথাটি কাফিরের রক্তকে মুসলমানদের রক্তের সমান মর্যাদার হওয়াকে বাধা দান করে।

এর জবাবে বলব, এটা তাদের মতের পক্ষের কোন দলীল হল না, কেননা রাসূলের কথা ঃ 'মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা সমান' অমুসলিমদের রক্তের সমতা নিষিদ্ধ করে না। বরং তার ফায়দাটা স্পষ্ট। আর তা হল স্বাধীন ও গোলামের রক্তের সমমর্যাদা উচ্চভদ্র ব্যক্তির নীচ অনভিজাত এবং সুস্বাস্থ্যবান ও রোগাক্রান্তের মাঝেও সমতা বিধান করে। এই সবই এ হাদীসের কল্যাণময় অবদান। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের এবং তাদের রক্তের সমতার বিধানও এরই একটি ফায়দা। আর হত্যাকারীকে যদি নিহতের লোকেরা হত্যা করে তাহলে নারীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবকদের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ হত্যাকারী নারীকে হত্যা করার পর-ও তার ধন-মাল থেকে অর্ধেক দীয়ত দেয়ানো নিষিদ্ধ হওয়াটি এ হাদীস থেকেই প্রাপ্ত ফায়দা। রাসূলের মুসলমানদের রক্তের সমান মর্যাদা কথাটি থেকেই এসব তাৎপর্য লাভ করা গেছে। এ হুকুমটি উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু অমুসলিমদের এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য যিম্মীদের পরস্পরে মধ্যে সমতা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল এতে নেই। কাফিরদের রক্তের ও পারস্পরিক সমতাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। ফলে তাদের একজন থেকে অন্য জনের প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়ম কার্যকর হবে, যখন আমাদের যিম্মী হবে। মুসলমানদের ও যিম্মীদের রক্তের সমমর্যাদাও নিষিদ্ধ হয়নি।

যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিমকে দায়ী করে তাকে হত্যা করার বিধান সর্বসম্মত। মুসলমান চুরি করলে তার হাত-ও কাটা যাবে। অতএব তার উপর দিয়ে হত্যাকার্যের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কেননা তার মালের হুরমাত ও মর্যাদা অপেক্ষা তার রক্তের মর্যাদা অনেক বেশি। লক্ষণীয়, গোলাম তার মনিবের মাল চুরি করলে এই চুরির অপরাধে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু হত্যার বিনিময়ে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।

ইমামা শাফেয়ীর দলীল হচ্ছে—মুসলমানকে যুধ্যমান নিরাপত্তা গ্রহণকারীকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হবে, কিন্তু যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে তারা দুজনই সমান। তবে এ দুজনের মধ্যে পার্থক্যের যে দিকগুলো রয়েছে তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

ইমাম শাফেয়ী যে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন তা তেমন নয়, যেমন তিনি মনে করেছেন। কেননা বিশর ইবনুল ওলীদ ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ব্যক্তিকে নিরাপত্তা গ্রহণকারী যুধ্যমানকে হত্যার দণ্ড হিসেবে হত্যা করা হবে। তবে ইমাম মালিক ও লাইস ধোঁকাবাজির হত্যা পর্যায়ে যা বলেছেন, তা তাঁরা দুজন 'হদ্দ' মনে করেই বলেছেন, প্রতিশোধ মনে করেন নি। যে আয়াতসমূহে হত্যার উল্লেখ আছে, তাতে ধোঁকাবাজির হত্যা ও অন্যান্য ধরনের হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আমাদের উল্লিখিত হাদীসসমূহেও তাই। তা যে সাধারণ ও নির্বিশেষ ভাবধারা নিয়ে এসেছে তা কিসাস হিসেবে হত্যা করাকে ফরয করে দেয়, হদ্দ হিসেবে নয়। অতএব যারা দলীল ছাড়াই কথা বলেন, তারা দলীলের নিকট পরাভূত।

সন্তানের বদলে তার পিতাকে হত্যা করা

পিতা তার সন্তানকে হত্যা করলে সেই পিতাকে সন্তান হত্যার দায়ে হত্যা করা পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত। সাধারণ ফিকাহবিদগণের বক্তব্য হচ্ছে, পিতাকে তার সন্তান হত্যার দায়ে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে তার মাল থেকে দীয়ত দিতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এবং আওজায়ী ও ইমাম শাফেয়ী এই মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তারা পিতা ও দাদাকে সমান রেখেছেন। হাসান ইবনে সালিহ ইবনে হাই বলেছেন, পুত্রের পুত্রকে হত্যার দায়ে দাদার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। আর তিনিই পুত্রের পুত্রের জন্যে দাদার সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু পিতার সাক্ষ্য তার পুত্রের জন্যে গ্রহণীয় মনে করেন নি। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, পিতা যদি তার পুত্রকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তা হলে সে হত্যার জন্যে পিতাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। ইমাম মালিকেরও এই মত। তাঁর নামে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, পিতা যদি তার সন্তানকে যবেহ করে তা হলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি তাকে তরবারির দ্বারা ঠেলা দেয়—নিক্ষেপ করে, তা হলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে না। সন্তান হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা যাবে না বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই একটি হাদীস। হাদীসটি আমর ইবনে শুয়াইব—তার পিতা—তাঁর দাদা উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ -

আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সন্তান হত্যার দণ্ডে তার পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

এই হাদীসটি উন্নত মর্যাদার এবং খুবই প্রসিদ্ধ। হযরত উমর (রা) সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এই হাদীসের ভিত্তিতেই ফায়সালা দিয়েছেন। কিন্তু কোন একজন সাহাবীও তার বিপরীত মত প্রকাশ করেন নি। ফলে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ওয়ারিসের জন্যে 'অসিয়ত নেই' কথার মতই অবশ্য পালনীয় হয়ে গেছে। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে হাশিম, ইবনুল হুসায়ন আবদুল্লাহ ইবনে মিনাসুল মারওয়াজী ইবরাহীম ইবনে রুস্তম হাম্মাদ ইবনে সালমাহ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ لَايُقَادُ الْاَبُ بِابْنِهِ 'পিতা তার সন্তানের জন্যে প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে না।' আবদুল বাকী বিশর ইবনে মূসা খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া-কায়স-ইসমাঈল ইবনে মুসলিম-আমর ইবনে দীনার-তায়ূস-ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ لَايُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ। 'পিতাকে তার সন্তান হত্যার দায়ে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে না।' নবী করীম (স) এই কথা এক ব্যক্তিকে বলেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে ঃ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ 'তুমি নিজে এবং তোমার ধন-মাল তোমার পিতার জন্যে।' সন্তানকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে, যেমন ধন-মালের মালিকানা হয়ে থাকে। আর এরূপ মালিকত্ব ঘোষণার কারণেই মনিবকে তার গোলামের কারণে শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন করা যাবে না। কেননা তাতেও গোলাম মনিবের মালিকানাভুক্ত বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে। পিতা যদিও পুত্রের প্রকৃত 'মালিক' নয়, তবুও সন্তানকে পিতার সাথে সম্পর্কিত اضافت। করা হয়েছে বিধায় আমাদের যুক্তি প্রদর্শন নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন হবে না। কেননা এখানে যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা পিতার উপর প্রতিশোধ চাপানোকে প্রত্যাহৃত করে। আর এই সম্পর্ক স্থাপন তা প্রত্যাহারে সংশয় সৃষ্টি করে।

রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও তাই প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسَبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ –

ব্যক্তি তার নিজের উপার্জনে যা আহার করে তা-ই অতীব পবিত্র এবং তার সন্তানও তার উপার্জিত বটে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ –

নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে আহার কর।

এ হাদীসসমূহে সন্তানকে পিতার উপার্জন বলা হয়েছে। যেমন করে কারো গোলাম তার উপার্জন। এ কারণে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই

গোলাম যদি তার পুত্রকে হত্যা করে তাহলে সে জন্যে তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা নবী করীম (স) তাকে তার উপার্জন বলেছেন। অনুরূপভাবে সে যদি নিজকে নিজে হত্যা করে।

আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَيَّ الْمَصِيْرُ - وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ -

এবং মানুষকে তাঁর পিতা-মাতা সম্পর্কে উপদেশ (আদেশ) দিয়েছি। তার মা তাকে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা নিয়ে বহন করেছে। আর দুই বছর ধরে দুধ খাইয়ে তা ছাড়িয়েছে। আদেশ হল তুমি আমার ও তোমার পিতা-মাতার শোকর কর। শেষ পর্যন্ত তো আমার নিকটই পরিণতি লাভ হবে। আর এই পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না ......

এ আয়াতে কাফির পিতা-মাতার সঙ্গ গ্রহণ ও তাদের সাথে ভালো আচরণ অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেই সাথে তাদের শোকর আদায় করতেও হুকুম করা হয়েছে। পিতা-মাতার শোকর করার আদেশের পূর্বেই আল্লাহ্‌র শোকর করতে বলা হয়েছে। তাই কোন পিতা যদি তার সন্তানকে হত্যা করে তা হলে এই সন্তানের বদলে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে সন্তান যদি পিতাকে হত্যা করে, তা হলেও সন্তানের বিচার ও কিসাস করা চলবে না। কেননা যে লোক নিজ সন্তান হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ও প্রতিশোধের সম্মুখীন হয়, পুত্র নিহত হলে তার দিক থেকেও তা-ই প্রমাণিত ও কার্যকর হবে। কিন্তু সে নিহত যদি নিজে তা না পায়, তা হলে তার দিক থেকেও কেউ তা পেতে পারে না। আল্লাহ্‌র এই কথাও অনুরূপ ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا -

তোমার নিকট যদি তাদের (পিতা-মাতার) একজন বা দুজনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তুমি তাদেরকে 'উহ' বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের দুজনকে সম্মানজনক কথা বলবে। তাদের দুজনের জন্যে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দেবে দয়া-মমতা সহকারে এবং বলবে ঃ হে রব্ব! তাঁদের দুজনকে তুমি দয়া কর, যেমন করে তাঁরা দুজন (দয়া সহকারে) আমাকে ছোটকাল থেকে লালন-পালন করেছেন।

অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উপরোক্ত আদর্শ সর্বাবস্থায়ই অবশ্য পালনীয়। এ এক নিঃশর্ত নির্দেশ। কাজেই তাকে সন্তানের দরুন অভিযুক্ত করার কোন অধিকার কখনই প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা সন্তানের জন্যে পিতাকে হত্যা করা পিতা-মাতার জন্যে আল্লাহ্র আদিষ্ট কার্যাবলীর পরিপন্থী। উপরন্তু নবী করীম (স) জিনজালা ইবনে আবূ আমের (পাদ্রী)-কে তার পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ সে ছিল মুশরিক, আল্লাহ ও তার রাসূলে বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। সে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয়ে ওহুদ-এর যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কাজেই পুত্রের পক্ষে তার পিতাকে যে কোন অবস্থায় হত্যা করা যদি জায়েযহতো, তাহলে সমস্ত অবস্থার মধ্যে সেই অবস্থা ছিল তা করার অধিক উপযুক্ত, যখন সে (পিতা) মুশরিক থাকা অবস্থায় রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। কোন ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার, নিন্দা পাওয়ার ও নিহত হওয়ার অধিক যোগ্য এর চাইতে অন্য কোন সময়ই হতে পারে না। কিন্তু সেই অবস্থায়ও রাসূলে করীম (স) তাকে তার পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সন্তান কোন অবস্থায়ই পিতাকে হত্যা করতে পারে না।

আমাদের ফিকাহবিদরা একথাও বলেছেন যে, পিতা যদি তার পুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তবু এই মিথ্যা অভিযোগের কারণে পিতার 'হদ্দ' করা যেতে পারে না। যদি তার হাত কেটে ফেলে, তবু তার 'কিসাস' করা যেতে পারে না। যদি তার ঋণ থাকে তার নিকট, তাহলে সেজন্যে তাকে বন্দী করা যেতে পারে না। কেননা এই সবই কুরআনের সে সব আয়াতের সাথে সাজ্জর্ষিক, যা আমরা এই মাত্র উদ্ধৃত করলাম।

এমন কিছু ফিকাহবিদ আছেন, যাঁরা পুত্রের মাল প্রকৃতপক্ষেই পিতার মাল মনে করেন, ঠিক যেমন গোলামের মাল তার মনিব-মালিকের। সে যদি তা নিয়ে যায়, তাহলে তা ফেরত দিতে বলা যাবে না। তাহলে পিতার উপর প্রতিশোধ না লওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য ছাড়া আর কোন কারণ নাও থাকত, তবুও প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার সংশয় সৃষ্টি জন্যে তা-ই যথেষ্ট, যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। আমরা এখানে যেসব দলীলের উল্লেখ করেছি, তা কিসাসের আয়াতসমূহকে বিশেষীকরণ করে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, পিতা তার আওতার মধ্যে পড়ে না।

এক ব্যক্তিকে হত্যা করায় দুজন শরীক হলে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا-

যে লোক ইচ্ছাপূর্বক কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -

যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার দণ্ড হচ্ছে একটি মুমিন দাস মুক্তকরণ।

এই ভীতি ও খারাপ পরিণতির খবর নিশ্চয়ই তার জন্যেও, যে ব্যক্তি অপরকে হত্যা করার কাজে শরীক হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

যদি দশজন মিলেও একজন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই এই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে নিঃসন্দেহে। কেননা তারা সকলে মিলে একজন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। অনুরূপভাবে দশ ব্যক্তি মিলে যদি ভুলবশত এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেককেই উপরোক্ত কাফফারা দিতে হবে, যেমন একজন একক ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করলে তাকে সেই একই কাফফারা দিতে হবে। এ ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই যে, প্রাণ সংহারে কম অপরাধ করলে তাতে উক্ত কাফফারা দিতে হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই যেন কার্যত সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করার অপরাধ করে বসেছে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -

এই কারণে আমরা বনী ইসরাঈলীদের এই আইন জারী করে দিয়েছি যে, যে লোক প্রাণ হত্যা বা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণ ছাড়াই অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল।

অতএব একটি দল মিলিত হয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে দলের প্রত্যেকেই প্রাণ হরণকারী হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে অতএব তারা সকল মানুষকে হত্যা করেছে—বলা যাবে। এরূপ হলে, দুজন লোক মিলিত হয়ে যদি দুজনের একজনকে ইচ্ছাপূর্বকভাবে হত্যা করে বা অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করে অথবা দুজনের একজন হয় পাগল আর অপর জন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির, তা হলে জানা যাবে, সেই ভুলকারী ব্যক্তি সমস্ত মানুষের প্রাণ হরণকারী হয়ে গেল। তাই তাদের সকলেই ভুলবশত হত্যকারী সাব্যস্ত হবে। তাতে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার হুকুম থেকে তারা দুজনই নিস্কৃতি পেয়ে যাবে। কেননা সকলেই ভুল করেছে; এই কথা প্রমাণ করা যায় না। আবার সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী এমন কথাও বলা মুশকিল। অনুরূপভাবে পাগল, বুদ্ধিমান এবং বালক ও পূর্ণবয়স্কের ব্যাপার মনে করতে হবে। কেননা সকলেই ভুল করে হত্যা করেছে—এই কথা যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে পূর্ণ মাত্রার দীয়ত দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছে, একথা প্রমাণিত হলে সকলেই হত্যার প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে। তবে প্রাণ-সংহারে পূর্ণ দীয়ত ফরয না হওয়ার ব্যাপারে এবং সেই সাথে প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অতএব তাতে কর্তব্য হয়ে গেল, প্রাণ-সংহারের কাজে শরীক হওয়ার কারণে দীয়ত ফরয হবে, তখন তাদের কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হবে না। কেননা তাতে সকলেরই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা প্রমাণিত হতে হয়। আর সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা প্রমাণিত হলে সেজন্যে কোন জরিমানা গ্রহণ না করা প্রমাণিত হবে।

বালক ও পূর্ণ বয়স্ক এবং পাগল ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন, ইচ্ছা গ্রহণকারী ও ভুলকারী

দুজন ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে তার হুকুম কি হবে—এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় (আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ) বলেছেন, তাদের দুজনের একজনের উপরও কিসাস কার্যকর হবে না। অনুরূপভাবে তাদের একজন যদি নিহতের পিতা হয়, তা হলে পিতার উপর ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি লোকটির উপর তার মালের অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে। আর ভুলকারী ও বালকের ক্ষেত্রে তার 'আকিলা'র উপর ধার্য হবে। এই মত হাসান ইবনে সালিহ দিয়েছেন। মালিক বলেছেন, বালক ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তির হত্যায় শরীক হয়, তা হলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা হবে। আর বালকের 'আকিলা'র উপর অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, তাদের দুজনের আকিলার উপরই দীয়ত দেয়া কর্তব্য হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন—একজন ব্যক্তি কোন বালকের সাথে মিলিত হয়ে যদি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে ইচ্ছা গ্রহণকারী বালককে অর্ধ দীয়ত দিতে হবে তার মাল থেকে। অনুরূপভাবে স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলাম একত্র হয়ে যদি অপর কোন গোলামকে হত্যা করে, তা হলেও সেই হুকুম কার্যকর হবে। ভুলবশত যে লোক এই হত্যা কাজে শরীক হবে, আর যে ইচ্ছামূলক হত্যায় লেগে যাবে, এই শেষোক্ত ব্যক্তির উপর তার মালে অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে, আর ভুলবশত শরীক ব্যক্তির আকিলার উপর ধার্য হবে তার ভুলের মাশুল।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদদের মূল কথা হল, এক ব্যক্তিকে হত্যা কাজে যখনই দুজন অংশ নেবে, সে দুজনের উপরই প্রতিশোধ আবর্তিত হবে না। একজনের উপর তা প্রবর্তিত হবে। পূর্বে আমরা আমাদের দলীলাদি পেশ করাকালে উল্লেখ করেছি যে, যে একজন ইচ্ছামূলক হত্যায় শরীক হয়েছে, তার উপর বিচার কার্যকর হওয়া এবং অপর জনের উপর মাল দেয়া কর্তব্য হওয়া নিষিদ্ধ, এজন্যে যে, নিহত ব্যক্তির প্রাণের উপর সে ভুলবশত আঘাত হেনেছে, আর ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত হত্যা মাল দেয়া ও শাস্তি পাওয়া একই অবস্থায় একটি মানুষের জন্যে—যা বিভক্ত হয় না—তা সঙ্গত নয়। কেননা নিহত ব্যক্তির কতক ধ্বংসপ্রাপ্ত আর কতক জীবিত, এটা তো হতে পারে না। একই সময় এক ব্যক্তি জীবিত ও মৃতও, এরূপ হওয়া তো অসম্ভব। আর তা যখন অসম্ভব, তখন প্রমাণিত হল যে হত্যাকারীদ্বয়ের প্রত্যেকজন গোটা মানুষটির ধ্বংসকারী হয়ে দাঁড়াবে। অতএব সে জনের উপর প্রতিশোধ ধার্য হবে না, তার দীয়ত দেয়া কর্তব্য হবে। এরূপ অবস্থায় সকলেই ভুলবশত হত্যাকারীতে পরিণত হবে। এরূপ অবস্থায় একজনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা তা যদি যেত, তাহলে উভয়কেই গোটা দীয়ত দিতে বাধ্য করা হতো। এই দিক দিয়েই সাদৃশ্যপূর্ণ হয় সে ব্যক্তি, যে দাসীর সাথে সঙ্গমকারী, তার ও অপরের মধ্যে 'হদ্দ' প্রত্যাহৃত হওয়ার ব্যাপারে ভাগাভাগি হতে পারে। কেননা তার কাজ তার ভাগে বিভক্ত হবে, এ কাজে তার শরীকের ভাগ বাদ দিয়ে, তা হতে পারে না। তার ভাগের কাজে যখন হদ্দ ওয়াজিব হল না, তার শরীকের ভাগে তা ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কেননা এই কাজে অংশ ভাগ হয় না। এই ভিত্তিতেই আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, দুই ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাদের একজনের পুত্রের কোন মাল চুরি করল। এক্ষেত্রে তাদের দুজনের হাত সেই চুরি

জন্যে কাটা যাবে না। কেননা সে শরীক হয়েছে এমন ব্যক্তির সংরক্ষণ ছিন্ন করার কাজে যার হাত কাটা যাবে না।

কেউ যদি বলেন, ইচ্ছা-সংকল্প সংশ্লিষ্ট হচ্ছে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর সাথে। আর সুস্থ সবল ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ আরোপিত হবে তোমার উল্লিখিত আয়াতসমূহের যৌক্তিকতার কারণে, যখন সে সমস্ত মানুষের হত্যাকারী, সমস্ত জীবন বরবাদকারী। এই কারণে অংশীদারিত্ব ও এককত্বের—উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ ঘোষিত অশুভ পরিণতি ভোগ করার যোগ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে যে লোকেরা একত্র হয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে, তাদের প্রত্যেকেই প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে অনিবার্যভাবে। কেননা তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত মানুষকে হত্যা করার মত কাজ করেছে। এই জিনিসটিই দুজনের মধ্যে যে লোকটি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন, দণ্ডস্বরূপ তাকে হত্যা করা কর্তব্য হবে। বালক ও পূর্ণবয়স্ক—এ দুজনের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিই অনুরূপভাবে হত্যাযোগ্য হবে। প্রতিশোধ ধার্য হয় না যে বালকের উপর, তার অংশীদারিত্ব থাকা সত্ত্বেও।

জবাবে বলা যাবে, না, তা কর্তব্য নয়। তার কারণ হচ্ছে, যে শরীকের উপর প্রতিশোধ আবর্তিত হয় না, তার ভাগের দীয়ত দেয়া তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। তাতে জরিমানা দেয়া ওয়াজিব হবে না। তখন সকলের ক্ষেত্রেই সংকল্প না থাকার কথা প্রমাণিত হবে কেননা ধ্বংস সাধনের কাজে অংশ ভাগ নিষিদ্ধ। সকলেই ভুলবশত হত্যা করেছে, বলতে হবে। আর তাতে খুনের প্রতিশোধের প্রশ্ন উঠবে না। যে শরীকের উপর প্রতিশোধ ধার্য হয় না, তার দীয়তের অংশ সম্পূর্ণ দীয়ত নয়—দেয়া যখন কর্তব্য সাব্যস্ত হল, তখন প্রমাণিত হল যে, সকলেই ভুলবশত হত্যায় শরীক হয়েছে। তা না হলে সম্পূর্ণ দীয়ত দেয়াই ওয়াজিব হতো। লক্ষণীয়, হত্যাকারীদের সকলেই যদি এমন হতো যে, তাদের সকলেরই উপর প্রতিশোধ কার্যকর হওয়া কর্তব্য, তা হলে তাদের সকলেরই উপর তাই করা হতো, যদিও তাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হত্যাকারী। যার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হয় না, সেই শরীকের উপর যখন তার ভাগের দীয়ত দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হল তখন বোঝা গেল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। আর প্রাণ সংহারের কাজটা ভুলবশত হয়ে গেছে। এ কারণে দীয়ত হত্যাকারীদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত এই দুই হত্যাকারীর ব্যাপারে এই মত দিয়েছেন যে, দুজনের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে না। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকও পাগল এবং বালক ও পূর্ণ বয়স্ক লোক একটি হত্যাকাণ্ডে পরস্পর শরীক হলে—এর মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হয় না—এজন্যে অনুরূপ রায়ই চূড়ান্ত ধরতে হবে।

এ থেকে আমরা এই মৌল নীতি পেলাম যে, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশোধ কার্যকর হওয়া এবং মালও দেয়া কর্তব্য হওয়া নিষিদ্ধ। লক্ষণীয় যে, হত্যাকারী যদি একজন মাত্র হতো, তাহলে মাল দেয়াই তার কর্তব্য হত। কিসাস না হওয়াই সাব্যস্ত হতো। যৌন

সঙ্গমের ব্যাপারেও তাই। তার কারণে মহরানা দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হলে তার উপর 'হদ্দ' হতে পারে না। চুরির ব্যাপারেও তাই। যদি তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয়, তাহলে তার হাত কাটা যেতে পারে না। এটা আমাদের মত। কেননা এসব ক্ষেত্রে মাল দেয়া ওয়াজিব হয় শুধু প্রতিশোধের 'হদ্দ' উভয় বাতিলকারী সংশয়ের উপস্থিতিতে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মাল দেয়া যখন ওয়াজিব সাব্যস্ত হল, তখন কিসাস ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া তা ওয়াজিব হওয়ার পরিবর্তে অধিক উত্তম—এ কথার প্রমাণ এই যে, প্রতিশোধ মালে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা প্রমাণিত হওয়ার পর। কিন্তু মাল কখনও প্রতিশোধে রূপান্তরিত হয় না কোন রূপেই। কাজেই যা ভেঙ্গে অন্যটা হয় না, তা স্থিতিশীল থাকে, তা অধিক উত্তম সেই ব্যবস্থার তুলনায় যা প্রমাণিত হওয়ার পর ভেঙ্গে অন্যটা হয়ে যায়। আর দুজনের একজনের উপর থেকে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া অপর জনের উপর থেকেও তার প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

যদি বলা হয়, দুজন লোক ইচ্ছাপূর্বকভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। পরে নিহতের অভিভাবক একজনকে ক্ষমা করে দিল, এক্ষেত্রে তোমরা বল যে, অপর জনকে কিসাসে হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য বিষয়ে তোমাদের সে কথা বলা উচিত।

জবাবে বলা যাবে, এই প্রশ্নটি ইমাম শাফেয়ীর মূলনীতির বাইরে। কেননা ভুলক্রমে হত্যাকারীর সাথে শরীক হয়—এমনভাবে যে, যার উপর প্রতিশোধ ওয়াজিব তার উপর তা কার্যকর না করার ব্যাপারে কোন অংশ নেই তাহলে তাকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী থেকে আলাদা করাকে তিনি বাধ্যতামূলক মনে করেন। কেননা সে একক হত্যাকারী হলে তা-ই হতো। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী দুজনের একজনকে ক্ষমা করার কারণে তার উপর প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হলে অপরজনের উপর থেকে তা প্রত্যাহৃত হবে না। কিন্তু ভুলবশত হত্যাকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর ব্যাপারে তা যখন বাধ্যতামূলক নয়, তখন আমরা বালক ও পূর্ণবয়স্ক এবং পাগল ও সুস্থবুদ্ধির লোকদের শরীকানায় যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাতেও আমরা বাধ্যতামূলক করিনি। দুজনের অপরজনের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি উঠে না এই কারণে যে, কথা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে। আর শরীকানার কারণে একজনের পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়ার কর্তব্য হতে পারে না। কেননা দুজনের একজনকে অপরজনের আগেই কিসাসের দ্বারা হত্যা করা হয়ে যেতে পারে। এও হতে পারে যে, দুজন আসামীর মধ্যে একজনকে পেয়ে হত্যা করা হল আর অপরজনকে ধরা যায়নি বলে তাকে হত্যাও করা যায়নি।

হত্যাকাণ্ড যদি কয়েকজনের অংশীদারিত্বে সংঘটিত হয়, তখন প্রাথমিক কর্তব্য আমাদের একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন দুজনের প্রত্যেকেই হুকুমের আওতার মধ্যে হবে, তা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একজন প্রকৃত ধ্বংসকারী হত্যাকারী, অপরজন নয়। এখন শরীক ব্যক্তি ছাড়াই একজনের উপর হুকুম কার্যকর করা

কঠিন। তখন সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করা ছাড়াই হুকুম কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তখন সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করতে বাধ্য করা সঙ্গত হয় না। কেননা পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করার অবস্থাকে কর্তব্যের অবস্থার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা অসঙ্গত।

লক্ষণীয়, সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করা অবস্থায় সে তওবাকারী ও আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু যে হত্যা প্রতিশোধযোগ্য, সেই হত্যা কালে কারোর অলী-আল্লাহ্ (আল্লাহ্র বন্ধু) হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যভিচারীও তওবা করতে পারে। তাহেল পূর্ণ 'হদ্দ' দেয়ার অধিকার তার উপর অবশিষ্ট থেকে যাবে। আর 'হদ্দ' ওয়াজিব হলে তা এ অবস্থায় পড়ে থাকবে, তা সঙ্গত নয়। এরূপ অবস্থায় ওয়াজিব হওয়ার অবস্থাকে প্রাপ্য পূর্ণ আদায়ের অবস্থার সাথে বিবেচনা করবে, সে তার উপর ধার্য কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল।

তাছাড়া দুজনের একজন থেকে প্রাপ্য ক্ষমা করা হলে তাকে হত্যা করার হুকুম নাকচ হয়ে যাবে। তখন একক হত্যাকারীর হুকুমও অবশিষ্ট থেকে যাবে। তখন তার প্রতিশোধ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। তখন অপর জনের উপর থেকে তা নাকচ হয়ে যাওয়ার দরুন সে প্রতিশোধ নাকচ হয়ে যাবে না। অর পাগল এবং আর যার উপর প্রতিশোধ লওয়া ওয়াজিব হয় না, তার কাজের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে ভুলের উপর। বলা হবে, সে ভুলবশত হত্যা কাণ্ড ঘটিয়েছে। আর তা তার সাথে শরীক ব্যক্তির রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা হত্যাকাণ্ডে দুজনই শরীক বলে উভয়ের ক্ষেত্রে হুকুম হবে অভিন্ন।

আমরা এ পর্যায়ে কুরআনের যে আয়াত এবং যে যুক্তি পেশ করেছি তাতে যখন যার উপর প্রতিশোধ ওয়াজিব হয় না তার সাথে শরীক ব্যক্তির উপর থেকে প্রতিশোধ নাচক হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হল, তখন তাদের দুজনের ক্ষেত্রে আয়াতসমূহের সিদ্ধান্ত বিশেষীকরণ সঙ্গত হবে। এ সে সব আয়াত, যা কিসাস পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ঃ 'তোমাদের উপর নিহত ব্যক্তির জন্যে কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে,' 'স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যার দরুন নিহত হবে,' 'যে লোক মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছে,' 'তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি' এবং 'প্রাণের বদলে প্রাণ হরণ করতে হবে।' সেই সাথে যেসব হাদীস কিসাস ফরয প্রমাণ করে, তার সাধারণ ও ব্যাপক প্রয়োগ। কেননা এই সবই সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। সে সব থেকেই বিশেষীকরণ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশেষীকরণ সঙ্গত যুক্তির ভিত্তিতে।

আল-মুজানী উল্লেখ করেছেন, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর সাথে যদি কোন বালক বা পাগল শরীক হয়, তা হলে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ ধার্য করার নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে ইমাম মুহাম্মাদের বিপরীত মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী এবং যুক্তি হিসেবে বলেছেন, তুমি তো তার উপর থেকে হত্যার অভিযোগ তুলে নিয়েছ। কেননা তাদের দুজনের উপর থেকে কলম উঠে গেছে। আর তাদের হত্যা-ইচ্ছা ভুলবশত হত্যা পর্যায়ে গণ্য। তা হলে পিতার সাথে একজন লোক ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় কোন ভিন্ন ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর না কেন? কেননা পিতার উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়নি। তা তার আমলকে ত্যাগ করার শামিল।

আল-মজানী বলেছেন, এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মুহাম্মাদ যা অস্বীকার করেছেন, তাতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছেন। কেননা ভুলবশত হত্যাকারী ও পাগলের উপর থেকে কিসাস তুলে নেয়া একই ব্যাপার। অনুরূপভাবে ইচ্ছামূলক হত্যায় হত্যাকারীদের সাথে যে শরীক হয়েছে, তারাও অভিন্ন।

আবূ বকর বলেছেন, আল-মুজানী ইমাম শাফেয়ীর নামে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কেননা তিনি বিপরীত কথাই চাপিয়ে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা ভুল, তার সাথে হত্যা কাজে শরীককে আলাদা করা যাবে না, এই মূল নীতির ভিত্তিতে হত্যায় শরীক ব্যক্তিকে আলাদা করা যাবে না, সে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী হলেও। তবে যার ইচ্ছাটা ভুল নয়, তাদের দুজনের প্রসঙ্গের হুকুমটা পরস্পর বিপরীত হওয়া জরুরী নয়। বরং সে প্রসঙ্গে হুকুম তার দলীলের উপর নির্ভরশীল। কেননা তা 'ইল্লাত'-এর বিপরীত। আর শরীয়াতে যেলোক কোন 'ইল্লাত' ধারণ করবে, সে তার বিপরীত করবে, তা বাধ্যতামূলক নয়। আর তা না হওয়ার সময়ে তার হুকুম বিপরীত হবে, তার উপস্থিতকালীন হুকুমের, তাও জরুরী নয়। লক্ষণীয়, আমরা যদি বলি غرر ধোঁকা প্রতারণা হলে ক্রয়-বিক্রয়ের জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ, তখন غرر না হলে তা জায়েয বলে হুকুম লাগানো আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয় না। বরং غرر না হলেও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সম্ভব। সম্ভব অপর এক অর্থের দৃষ্টিতে। তা এভাবে যে, বিক্রেতা তা দখলে নিল না কিংবা এমন শর্ত আরোপ করল, যে শর্ত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাধ্যতামূলক করে না। কিংবা মূল্যটা অজ্ঞাত হতে পারে। এই ধরনের আরও যে সব কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তা-ও হতে পারে। غرر দূর হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হতে পারে জায়েয হওয়ার দলীল প্রাপ্তির অনুপাত অনুযায়ী বা তা ভেঙ্গে যাওয়ার অনুপাত অনুযায়ী। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে ধারণা রাখেন এমন লোকদের নিকট তা কিছু মাত্র অস্পষ্ট নয়। এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে যা যা উল্লেখ করা হয়, তন্মধ্য থেকে একটি হচ্ছে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلاَاِنَّ قَتِيْلَ خَطَاءَ الْعَمْدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا -

জেনে রাখো! ভুল ইচ্ছার ফলে যে লোক নিহত হয়, সে চাবুক ও লাঠির আঘাতে নহিত।

এতে ভারী দীয়ত হবে। বালক-পূর্ণ বয়স্ক, পাগল-সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোক এবং ভুলকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী, এরা ইচ্ছাকারী ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তা দুটি দিক-দিয়ে। একটি—নবী করীম (স) বলেছেন, ইচ্ছা-ভুলকারীর দ্বারা নিহত সে, যে চাবুক ও লাঠির আঘাতে নিহত। এতে পাগল যদি শরীক হয় লাঠি নিয়ে, আর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোক তরবারি নিয়ে, তা হলে সে ভুল-ইচ্ছার অধীন নিহত। কেননা নবী করীম (স) এই রূপই ফয়াসালা দিয়েছেন, কাজেই তাতে কিসাস না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, বালক ও পাগলের ইচ্ছা-সংকল্প ভুল। কেননা নিহত ব্যক্তির

তিনটির মধ্যে যে-কোন একটি কারণে নিহত হয়ে থাকবে। হয় ভুলবশত, না হয় ইচ্ছা-সংকল্পের ফলে, অথাব প্রায় ইচ্ছামূলকভাবে। কিন্তু বালক ও পাগলের হত্যাকরণ যখন ইচ্ছামূলকভাবে হয়নি, তখন তা ভুল বা প্রায় ইচ্ছামূলক—এই শেষ দুটির কোন একটি দিক দিয়ে নিহত হয়ে থাকবে। এর যে-টিই হোক, নবী করীম (স) ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, হত্যায় তার শরীকের উপর থেকে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া। কেননা সে ভুলে নিহত, অথবা নিহত ভুল ইচ্ছার ফলে। উপরন্তু যে লোক এই পরিচিতির অধিকারী হয়েছে, তার উপর ভারী দীয়ত ধার্য করেছে। আর দীয়ত যখন পূর্ণ মাত্রার ওয়াজিব করা হবে, তখন তার উপর প্রতিশোধ নেয়া নিষিদ্ধ হবে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) তার 'ভুল ইচ্ছার ফলে নিহত' কথাটি দ্বারা বলতে চেয়েছেন, যদি কেউ এককভাবে চাবুক ও লাঠির দ্বারা হত্যা করে। জবাবে বলা যাবে, তার সঙ্গে তরবারি নিয়ে হত্যাকারীর অংশিদারিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চাবুক ও লাঠির দ্বারা নিহত হওয়া মিথ্যা হয়ে যায় না। আর তা-ই হচ্ছে ভুলে ফলে হত্যা। কেননা দুজনের প্রত্যেকেই হত্যাকারী হিসেবে তার প্রত্যেকের দ্বারা নিহত হওয়াই বাস্তব কথা। তা হলে নবী করীম (স)-এর কথাটি দুটি অর্থ সমন্বিত এবং উভয় অবস্থায়ই কিসাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এবং তাতে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। পাগলের সাথে সুস্থ বুদ্ধির ও ভুলক্রমে হত্যাকারীর ইচ্ছামূলক হত্যাকারীর সাথে শরীক হওয়ার হুকুম বিভিন্ন হতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তিকে আহত করে যে ব্যক্তি পাগল। পরে সে সুস্থ হয়ে যায়। এই সুস্থ হওয়ার পর তার উপর আবার আহত করে, পরে সে আহত ব্যক্তি মরে যায়, তা হলে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ আরোপিত হবে না। যেমন ভুলবশত তাকে আহত করা হলে পারে ইচ্ছাপূর্বক আবার আহত করা হলে ও এ দুটি আঘাতের ফলে সে মরে গেলে আঘাতকারীর উপর প্রতিশোধ ধার্য হবে না। অনুরূপভাবে 'মুরতাদ' অবস্থার এক ব্যক্তিকে আহত করা হলে পরে সে ইসলাম কবুল করলে পর তাকে আবার আহত করা হলে, পরে এই দুটি আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করলে যখমকারীর উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে না। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, তার মৃত্যুটা দুইটি যখমের দরুন হয়েছে। তার একটি প্রতিশোধ গ্রহণকে জরুরী করে না। আর দ্বিতীয়টি এমন কারণ সৃষ্টি করেছে, যার দুরুন প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া জরুরী হয়, আর যে একক যখমের কোন সংশয় নেই তাতে প্রতিশোধ আবশ্যিক হওয়ার কোন হুকুম নেই; বরং হুকুম আছে প্রতিশোধ আবশ্যিক না হওয়ার। এমতাবস্থায় দুই ব্যক্তির একজনের কৃত যখমের দুরুন যদি সে মরে গিয়ে থাকে, আর সে একক হয়ে থাকে, তা হলে তার কৃত যখম প্রতিশোধ গ্রহণকে আবশ্যিক বানায়। আর অপর যখমটির প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার পরিবর্তে তা কার্যকর হওয়ার হুকুমই উত্তম হবে। কেননা মৃত্যুটা উভয় যখমের দরুন হয়েছে। তা হলে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণকারী হুকুম তা আবশ্যিক করার হুকুমের তুলনায় অধিক উত্তম। এ দুটিতে 'ইল্লাত' হচ্ছে উভয় যখমের ফলে ঘটিত মৃত্যু। সে যখম দুটির একটি প্রতিশোধ আবশ্যিক বানায়, অন্যটি আবশ্যিক বানায় না।

আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, শুরুতেই আমরা তার ভিত্তিতে কথাকে বিভক্ত করে এসেছি ভুলবশত হত্যাকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী এবং পাগল ও সুস্থ বিবেকবানের কোন পার্থক্য করা যায় না। যদি হত্যা কাজে শরীকানা হয়। যেমন পাগলের পাগলামী অবস্থায় কৃত অপরাধ এবং পরে তার সুস্থ অবস্থায় কৃত অপরাধের বিভিন্ন হয় না, যদি উভয় অবস্থায় কৃত অপরাধের দরুন মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। আর ভুলবশত ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ—যদি উভয়ের ফলে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে উভয় অবস্থায় প্রতিশোধ প্রত্যাহৃর হওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্নতর কিছু হয় না। অনুরূপভাবে সুস্থ ব্যক্তির অপরাধ তার সাথে গাপলের শরীক হওয়ার কারণে ভিন্নতর কিছু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর ইচ্ছাপূর্বক কৃত অপরাধের সাথে ভুলকারীর শরীক হওয়াতেও পার্থক্য হয় না।

ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের করণীয়

আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে নিহতের ব্যাপারে।' বলেছেন ঃ 'তাতে তাদের উপর লিখে দিয়েছি যে, জানের বদলে জান নিতে হবে' বলেছেনঃ 'যে লোক অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি।'

ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এ সব আয়াতে নিহতের জন্যে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন—তোমরা যদি প্রতিশোধ লও, তাহলে প্রতিশোধ লও ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। বলেছেন, 'তোমাদের উপর যে সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ কাজ কর, যেমন তারা তোমাদের উপর করেছেন।'

এই সব আয়াত 'কিসাস' করাকে ফরয করে দিয়েছে, অন্য কিছু নয়, ইচ্ছামূলক হত্যা কি ফরয করে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ, মালিক ইবনে আনাস, সওরী, ইবনে শাবরামাতা, হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, নিহতের অভিভাবক 'কিসাস' করার অধিকারী। এ ছাড়া অন্য কিছু করার তার অধিকার নেই। আর দীয়ত গ্রহণ করতে হলে হত্যাকারীর সেজন্যে রাজি হওয়া জরুরী, অন্যথায় দীয়ত গ্রহণ করতে পারবে না।

ইমাম আওজায়ী, লাইস ও শাফেয়ী বলেছেন, কিসাস লওয়া বা দীয়ত গ্রহণ করা—এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে অভিভাবকের, হত্যাকারী রাজি না হলেও। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দরিদ্র অভিভাবক যদি কিসাস মাফ করে দেয়, তাহলে তা করা জায়েয হবে। যাদের জন্যে নিহতের অসিয়ত রয়েছে, কিংবা ঋণ প্রাপ্য রয়েছে, তাদের তাকে নিষেধ করার অধিকার নেই। কেননা ধন-মালের মালিক হওয়া শুধু সংকল্পের দ্বারা সম্ভব নয়। যার উপর অপরাধটা করা হয়েছে তার ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক, যদি সে জীবিত থাকে। কিংবা সে মরে গেলে তার ওয়ারিসগণের ইচ্ছা থাকতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের আয়াতে যাহিরী অর্থে পূর্বে বলা হয়েছে। শব্দে বিভিন্ন

তাৎপর্য নেই, নিহিত বক্তব্য স্পষ্ট। তা কিসাসকেই ওয়াজিব করে, মাল গ্রহণ নয়। ইখতিয়ার হিসেবেও মাল লওয়া ওয়াজিব হওয়া সঙ্গত নয়। তবে যা দ্বারা তা মনসূখ করা জায়েয, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা কুরআনের দলীলে বাড়তি ধরলে তা মনসূখ হওয়ার শামিল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র এই কথাটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বাতিল পন্থায় ধন-মাল ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক ব্যবসা যদি তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

মুসলমানদের পারস্পরিক ধন-মাল গ্রহণ নিষিদ্ধ। তবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা হতে পারে।

অনুরূপ কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ مَالُ اَمْرَىءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّابِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهٖ –

মুসলিম ব্যক্তির মাল অন্যজনের পক্ষে হালাল হবে কেবল তখন যদি তা তার মনের খুশীতে দেয়।

কাজেই হত্যাকারী যদি মাল দীয়ত দিতে রাজি না হয়, তার মন দিতে আনন্দ বোধ না করে, তা হলে তার মাল সকলেরই উপর নিষিদ্ধ হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বে এর সনদ উল্লেখ করা হয়েছে—রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَمَدُ قَوْدٌ اِلَّاَنْ يَّعْفُوَ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ –

ইচ্ছামূলক হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণীয়। তবে নিহতের অভিভাবক যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সুলায়মান ইবনে কাসীর আমর ইবনে দীনার, তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ فِىْ عِمِّيًا اَوْفِىْ زَحْمَةٍ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهٗ اَوْ رِمِيًا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ اَوْسَوْطٍ اَوْعَصَا فَعَقْلُهٗ عَقْلُ خَطَاَ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ –

যে লোক দুর্বোধ্য বা গুপ্তভাবে কিংবা ভিড়ের মধ্যে পড়ে নিহত হবে তার হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায় না অথবা যে ব্যক্তি উড়ো আঘাতে নিহত হবে, পরস্পরের মধ্যে

পাথর, চাবুক বা লাঠি চলছিল, তাতে মরে গেল, তার এই হত্যা ভুলক্রমে হত্যারূপে অভিহিত হবে। আর যে লোক কারো দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক নিহত হবে, তার হস্তদ্বয় থেকে প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। এরূপ অবস্থায় যে লোক এর ও ওর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তার উপর আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত।

রাসূলে করীম (স) উপরোদ্ধৃত হাদীস দুটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইচ্ছামূলক হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। দীয়ত গ্রহণের ইখতিয়ার থাকলে তিনি শুধু প্রতিশোধ লওয়ার কথাই বলতেন না; দীয়তের কথাও বলতেন। কিন্তু তা তিনি বলেন নি। ইখতিয়ারের ভিত্তিতে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, আর খোদ রাসূলে করীম (স)-ই তার একটি মাত্রের উল্লেখ করবেন, অন্যটির কথা বলবেন না—তা হতেই পারে না। কেননা তাতে ইখতিয়ারকেই অস্বীকার করা হয়। এর পরও তাতে ইখতিয়ার আছে বলা তাঁর কথাকেই মনসূখ করে দেয়ার শামিল।

যদি বলা হয়, ইবনে উয়াইনা অপর একটি হাদীস আমর ইবনে দীনার তায়ূস সূত্রে (মওকূফ) বর্ণনা করেছেন, তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)–এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তা নবী করীম (স) কথা হিসেবেও বর্ণিত হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, ইবনে উয়াইনা কখনও এই হাদীসটি 'অ-মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনও বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে কাসীরের বর্ণনার ন্যায়। মূলত ইবনে উয়াইনা খুব খারাপ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বর্ণনায় খুব বেশি ভুল করতেন। তা সত্ত্বেও তায়ূস-ই হয়ত কখনও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, কখনও তিনি এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন, তাঁর নিজের বিশ্বাসটা প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাতে হাদীসকে দুর্বল করে দেবার মত কিছুই নেই।

ইলমওয়ালা মনীষীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র এই কথাটি নিয়ে বিশেষ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ بِاِحْسَانٍ –

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তা হলে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য।

কিছু লোক বলেছেন, আয়াতের لعفو শব্দের অর্থ, যা সহজ এবং অনায়াসে করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ যে ব্যবহার ও আচরণ, নৈতিকতা সহজসাধ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ –

প্রথম সময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির, আর শেষ সময় আল্লাহ্‌র কৃত সহজাতের।

অর্থাৎ যা বান্দার জন্যে সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। অতএব আল্লাহ্র কথা فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ 'নিহতের অভিভাবককে যখন কোন মাল দেয়া হয়, তখন তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং প্রচলিত নিয়মে তা অনুসরণ করা উচিত, এবং হত্যাকারীর উচিত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে তা যথাযথভাবে দিয়ে দেয়া। এর অর্থ, হত্যাকারীর পক্ষ থেকে মাল দেয়া সহজ ও সম্ভব হলে তা গ্রহণ করা আল্লাহ্র দিক থেকে মুস্তাহাব বানানো হয়েছে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা আল্লাহ্র দিক থেকে বান্দাগণের প্রতি সহজতা বিধান এবং রহমতের ব্যবস্থা। যেমন সূরা আল-মায়িদায় 'কিসাস' সম্পর্কিত আয়াতের শেষেই বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ –

যে লোক তা সাদ্কা করে দেবে, তা তার জন্যে কাফফারা স্বরূপ হবে।

এ আয়াতে ক্ষমা ও সাদকাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ আয়াতে অপরাধী দীয়ত দিলে তা কবুল করাকেও মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কেননা তার উল্লেখ শুরু করা হয়েছে অপরাধীকে ক্ষমা করা দীয়ত দানের বিনিময়ে থেকে। পরে অভিভাবককে তা অনুসরণ করার—মেনে নেয়ার এবং অপরাধীকে তা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে।

অন্যান্য কিছু লোক বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতের অর্থ তাই, যা এ হাদীসটিতে বলা হয়েছে—হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তা আবদুল বাকী ইবনে নাফে—আল হুমাইদী, সুফিয়ান সওরী, আমর ইবনে দীনার, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

كَانَ الْقِصَاصُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ –

বনী ইসরাঈলীদের সমাজে কিসাস কার্যকর ছিল, কিন্তু সেখানে দীয়তের প্রচলন ছিল না।

তাই আল্লাহ মুসলিম উম্মতের জন্যে এই আয়াতটি নাযিল করেছেন ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে .... তবে যদি কারুর জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কিছু সুবিধা করে দেয়া হয় ....

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ আয়াতের اَلْعَفْوُ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছামূলক হত্যায় দীয়ত কবুল করা। আর প্রচলিত ন্যায়নীতির অনুসরণ এবং তা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে দিয়ে দেয়া—'এটা তোমাদের রব্ব-এর দিক থেকে বোঝা হালকাকরণ ও রহমত ব্যবস্থা' কথাটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যা ফরয করা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

'এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে' কথাটি দীয়ত কবুল করার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ কথাগুলোর মাধ্যমে ইবনে

আব্বাস জানালেন যে, এ আয়াতটি বনী ইসরাঈলীদের জন্যে কার্যকর আইন নাকচকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে। কেননা তাদের সমাজে হত্যার ক্ষেত্রে দীয়ত গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আর মুসলিম সমাজের জন্যে নিহতের অভিভাবককে 'দীয়ত' গ্রহণ মুবাহ করে দিয়েছে, যদি হত্যাকারী তা দিতে প্রস্তুত হয় এবং এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বোঝা হালকাকরণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ রহমত। কাজেই আমাদের বিপরীত মতের লোকেরা যে বলেছেন ঃ নিহতের অভিভাবকের জন্যে দুটির যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে, ব্যাপার যদি প্রকৃতপক্ষে তাই হতো, তা হলে দীয়ত গ্রহণ اَلْعَفْوُ পর্যায়ের কাজ এই কথাটি কখনই বলা হতো না। কেননা কবুল করার প্রশ্ন হয় প্রতিপক্ষ যদি তা দেয়। যদি তাই বলতে চাওয়া না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বলা হতো ঃ অভিভাবক যখন গ্রহণ করবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, উভয় পক্ষে দীয়ত দেয়া ও গ্রহণ করায় যখন উভয়ই রাজি হবে, তখন তা গ্রহণ করা জায়েয।

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, বনী ইসরাঈলীদের প্রতি দীয়ত করা নিষিদ্ধ ছিল, সেটি মুসলিম সমাজে প্রযোজ্য হবে দীয়ত কবুল করার পরও হত্যাকারীকে হত্যা করার অবস্থায়। এ কথাটিই বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মিওয়াজী বর্ণিত হাদীসে। বলেছেন, হুসায়ন ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরযানী আবদুর রাযযাক—মা'মার কাতাদাহ সূত্রে বর্ণনা করেছে 'যে লোক অতঃপর সীমালঙ্ঘন করবে' আল্লাহ এই কথার পর্যায়ে। তার অর্থ দীয়ত গ্রহণের পর যদি হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তাকে সেজন্যে হত্যা করা হবে, তার কাছ থেকে দীয়ত কবুল করা হবে না।

এ পর্যায়ে একটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন ইবনে আশু—শাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, দুটি আরব গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। তাতে উভয় পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল। তখন একটি গোত্র বলল ঃ একজন মেয়ে লোককে হত্যা করা হলে আমরা তার বদলে একজন পুরুষ এবং একজন পুরুষ হত্যা করা হলে আমরা তার বদলে দুজন পুরুষকে হত্যা না করে ছাড়ব না। পরে ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর সমীপে পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন, اَلْقَتْلُ بَوَاءٌ হত্যা সমান সমান। এ থেকেই 'দীয়ত' পরিভাষাটি তারা বানিয়ে নেয়। এতে গোত্রদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপর অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র উক্ত কথা ঃ তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে ... যদি কাউকে তার ভাই কোন কিছু ক্ষমা করে—পর্যন্ত। সুফিয়ান বলেছেন ঃ এই কথাটির অর্থ হচ্ছে ঃ যাকে তার ভাইর কোন অনুগ্রহ দান করা হবে, তা অবশ্যই প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী আদায় করে দেয়া কর্তব্য হবে। শাবী উক্ত আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষের কথা জানিয়ে দিলেন। সুফিয়ান উল্লেখ করেছেন, اَلْعَفْوُ এর এখানে অর্থ হচ্ছে اَلْفَضْلُ অনুগ্রহ। শব্দটি এই অর্থটিও দিতে পারে। আল্লাহ বলেছেন ঃ حَتّٰى عَفَوْا এমন কি তারা বিপুলভাবে ছিল। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ اَعْفُوْا الّاَحٰى 'তোমরা শত্রু বৃদ্ধি কর'। এ প্রেক্ষিতে

আয়াতটির তাৎপর্য হবে ঃ 'যাকে তার ভাইর উপর অধিক মর্যাদা দেয়া হবে—দীয়ত স্বরূপ কিছু (এই পরিভাষাই তৈরী হয়েছে) তাহলে তা অনুসরণ করা উচিত তার, যে তা পাওয়ার অধিকারী প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী এবং তা দিয়ে দেয়া উচিত আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে।

এ আয়াতের আরও একটা তাৎপর্য বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, এ আয়াতটির কথা একদল লোকের মধ্যকার রক্তের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তাদের কিছু লোক যদি অপর লোকদের ভাগ্যকে মালে রূপান্তরিত করে ক্ষমার সাহায্যে। হযরত উমর, আলী ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও তারা এ কথাকে আয়াতটির ব্যাখ্যা তাৎপর্য হিসেবে বলেন নি। তবে এ এমন একটি ব্যাখ্যা, যা আয়াতের শব্দগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা আয়াতটি হচ্ছে "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ" 'যে লোকের জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কোন কিছু ক্ষমা করা হবে' এর দাবি হচ্ছে, রক্তের দাবির কোন অংশের উপর যদি ক্ষমা সঙ্ঘটিত হয়। সমস্ত দাবি নয়। তাহলে শরীক লোকদের অংশ মালে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন তাদের কর্তব্য হবে হত্যকারীকে অনুসরণ করা প্রচলিত ন্যায়-নীতির নিয়ম অনুযায়ী। আর হত্যাকারীর কর্তব্য—তা তাদের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দেয়া।

অপর লোকেরা তার তাৎপর্য বলেছেন, রক্তের অভিভাবকের জন্যে হত্যাকারীর রাজি না হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ জায়েয। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। কেননা اَلْعَفْوُ। দীয়ত গ্রহণ করার দ্বারা তো হতে পারে না। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ "اَلْعَمَدُ قَوَدٌ"। ইচ্ছামূলক হত্যা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য। অভিভাবকগণ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, একথা নয়। এতে দুটি জিনিসের একটি প্রমাণিত হল—হয় হত্যার বদলে হত্যা, না হয় ক্ষমা। মাল গ্রহণ প্রমাণিত হয় না কোন অবস্থাতেই।

যদি কেউ বলেন, রক্তপাত যখন ক্ষমা করে দেয়া হল মাল (দীয়ত) গ্রহণের জন্যে, তখন সে ক্ষমাকারী হয়ে গেল। আয়াতের শব্দ এই তাৎপর্যের ধারক।

জবাবে বলা যাবে, দুটি জিনিসের কোন একটি যখন অবশ্য কর্তব্য হবে, তখন মাল গ্রহণ না করে বরং প্রতিশোধ গ্রহণ করেও সে ক্ষমা দানকারী হতে পারে। এরূপ অবস্থায় অভিভাবক হয় হত্যা ক্ষমা করবে, না হয় মাল গ্রহণ ক্ষমা করবে (অর্থাৎ দীয়ত গ্রহণ করবে না)। কিন্তু এরূপ কথা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তা কেউ গ্রহণ করতে পারে না। অপর দিক দিয়ে তা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে নস্যাৎ করে। তা এভাবে যে, অভিভাবক যদি প্রতিশোধ গ্রহণ ও মাল গ্রহণ না করে ক্ষমাদানকারী হয়, তাহলে তখন তার সম্পর্কে বলা হবে না যে, সে তাকে ক্ষমা করেছে। বলা হবে তার থেকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু এই অর্থটা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা তাতে عن - لام এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে। অথবা তার অর্থ হবে তার জন্যে রক্তের মূল্য ক্ষমা করেছে। তাতে একটি অক্ষর উহ্য মানতে হয়, যা এখানে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আমরা যদি যা উল্লিখিত, তাকে যথেষ্ট মনে করি,

তা হলে উহ্য প্রমাণ করা আমাদের জন্যে জায়েয হয় না। অথচ আমাদের যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাহ্যিকের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোন সর্বনাম প্রতিষ্ঠিত না করেই কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, হত্যাকারীর দিক থেকে মাল দানের সাহায্যে সহজতা করে দেয়া। অপর একটি দিক থেকে তা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। তা হচ্ছে مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ। তার ভাইর দিক থেকে কোন জিনিস .... এতে ব্যবহৃত مِنْ কিছু অংশ বোঝায়। তার তা মূল ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে তার বিপরীতের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে তার ভাইর রক্তের কিছু অংশ ক্ষমা করা হবে। আর বিপরীত মতের লোকের নিকট তা-ই রক্তের সমস্ত দাবিই ক্ষমা করা ও ছেড়ে দেয়া এবং বিনিময়ে দীয়ত লওয়া। তাতে مِنْ শব্দের হুকুম নাকচ করা হয়। আরও একটি কারণ আছে। তা হল ঃ شَىْءٌ তা-ও রক্তের কিছুটা ক্ষমা করা কর্তব্য করে দেয় ও তার সম্পূর্ণটা নয়। যার মতে সম্পূর্ণটা ক্ষমা করা অর্থ, তা বলা কথা দ্বারা বোঝা যায় না, তার অনিবার্য দাবিও তা নয়। কেননা তা এ পর্যায়ের কথা হয়ে যায় যে, যদি বলা হতো, فَمَنْ عُفِىَ لَهُ عَنِ الدَّمِ যে লোক ক্ষমা করে দেয়া হবে রক্ত থেকে (অর্থাৎ রক্তের দাবি ক্ষমা করা হবে) 'এবং দীয়ত চাওয়া হবে'। এতেও مِنْ ও شَىْءٌ শব্দের হুকুমটা নাকচ হয়ে যায়। আয়াতটির এমন ব্যাখ্যা দেয়া যাতে شَىْءٌ শব্দের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়, কারো অধিকার থাকতে পারে না। বরং সেটি তার প্রকৃত তাৎপর্যের উপর যতটা সম্ভব দাঁড় করে রাখা আবশ্যক। আর আমরা যেমন বলেছি, সেই অর্থে যখনই ব্যবহার করা হবে, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের অনুকূল হবে। তা থেকে কোন কিছু ফেলে দেয়ার প্রশ্ন হবে না। কেননা শাবী আয়াতের শানে নুযুল পর্যায়ে যা বলেছেন, তা-ই যদি তার ব্যাখ্যা হয় এবং দীয়ত দিয়ে কতক লোকের উপর অপর কতক লোকের অনুগ্রহ ধরা হয়, তাহলে তা ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কেননা عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ অর্থ হচ্ছে, তাকে অনুগ্রহ করে কিছু মাল দেয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে তাগাদা করা। তা বাক্যের একটা অংশ। তা থেকে একটি জিনিস। তাতে শব্দটি তার আসল ও প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে। আর ব্যাখ্যা যদি এই করা হয় যে, যদি মালের কোন অংশ দিয়ে তার জন্যে সহজতা করে দেয়া হয়, তা হলে অভিভাবকের তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব—পছন্দনীয়, সেজন্যে সওয়াব দেয়ার প্রতিশ্রুত। এই ব্যাখ্যা এমন লোককে শামিল করে, যে কতক দীয়ত ব্যয় করবে। আর তা ব্যয় করা সমগ্র মালের একটা অংশ।

আর বনী ইসরাঈলীদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্তব্য এবং দীয়ত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার আইন মনসূখ হয়ে যাওয়া পর্যায়ের বর্ণিত হাদীসই যদি ব্যাখ্যা ধরা হয়, তা হলে আমাদের দেয়া ব্যাখ্যা আয়াতের অর্থের সাথে বিপুলভাবে আনুকূল্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কেননা আমরা বলছি, আয়াতটির দাবি হচ্ছে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি গ্রহণ জায়েয, তাতে পরিভাষাটি অল্প বা বেশি যা-ই অনুকূল হোক। কিছুর উল্লেখ এবং তার উপর সমগ্রটার হুকুম আরোপ করা—যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ – فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْ هُمَا 'তুমি পিতা-মাতার জন্যে 'উহ' বলো না এবং সে দুজনকে ভর্ৎসনা করো না। 'সরাসরি এই

কথাটির প্রসঙ্গে একটি অকাট্য দলীল। আসলে আয়াতটিতে বলা অতটুকু কথাই লক্ষ্য নয়। বরং তার চাইতেও অনেক উঁচু ও বড় লক্ষ্য রয়েছে এই কথার মূলে। কুরআনে এ ধরনের কথার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর তার ব্যাখ্যা যদি হয় কতক অভিভাবকের তার অংশ ক্ষমা করা, তা হলেও তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কেননা ক্ষমা তো কতক থেকেই হবে, সমগ্র থেকে নয়। পূর্বে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য থেকে যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য সম্পন্ন হবে। তবে সেই ব্যাখ্যা নয়, যাতে অভিভাবকের সবকিছু ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার আছে বলে বলা হয়েছে—দীয়ত বাবত গ্রহণসহ। আমরা উপরে যেসব ব্যাখ্যার কথা বলেছি, তার সবই অর্থ হওয়াও নিষিদ্ধ নয়। তা হলে বলা যাবে যে, আয়াতটি নাযিল হয়ে বনী ইসরাঈলীদের জারী হওয়া আইন মুসলমানদের ক্ষেত্রে মনসূখ হয়ে গেছে। ফলে কিছু পরিমাণ বা বেশী মাল গ্রহণ আমাদের জন্যে মুবাহ্ করা হয়েছে। হত্যাকারী তা দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজ করে দিতে প্রস্তুত হলে অভিভাবকের পক্ষে তা কবুল করা মুস্তাহাব এবং তাতে সওয়াবেরও ওয়াদা করা হয়েছে। আর আয়াতটির নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হবে ঃ কতক থেকে কতকের উপর দীয়তের অনুগ্রহ লাভ। এরূপ অবস্থায় তাদের সকলকে প্রচলিত ন্যায়নীতির অনুসরণ করতে এবং হত্যাকারীকে তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আদায় করে দিতে আদেশ করা হয়েছে। আর কতিপয় অভিভাবক যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে রক্তের ব্যাপারটি বর্ণনা পার্থক্যপূর্ণ হবে। এই সব কয়টি দিকই আয়াতের অর্থের বিভিন্নতার ভিত্তিতে, আয়াতটিতে সবগুলো ধারণের ক্ষমতা আছে। এরূপ অর্থ গ্রহণে শব্দের কোন অংশ ফেলে দিতে হয় না।

যদিও বলেন, হত্যাকারীর রাজি না হওয়া অবস্থায়ও অভিভাবকের জন্যে দীয়ত গ্রহণ ওয়াজিব, বিপরীত মতের লোকদের এই ব্যাখ্যা ও আয়াত ধারণ করে, তাই তা এ আয়াতের অর্থ হওয়া উচিত। কেননা অন্যান্য ব্যাখ্যার অসম্ভব হওয়া প্রমাণিত নয়। আর فَمَنْ عُفِيَ لَهُ এর অর্থ হবে, তার জন্যে ছেড়ে দেয়া হবে। আরবী ভাষায় যেমন বলা হয় عَفَتِ الْمَنَازِلُ অর্থাৎ ঘরসমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে। আর عفو عن الذنوب গুনাহ মাফ করে দেয়া অর্থ, গুনাহের শাস্তি না দেয়া। এ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছেড়ে দিয়ে দীয়ত গ্রহণের উপর নির্ভর করা বোঝায়।

এর জবাবে বলা যাবে, যদি তা-ই হয়, তাহলে দীয়ত ছেড়ে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করলে অভিভাবকের ক্ষমাকারী বলে অভিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। কেননা সে দীয়ত গ্রহণ ত্যাগ করেছে। মাল ছেড়ে দেয়া ও তা প্রত্যাহার করাকে ক্ষমা করা বলা হয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ –

তা হলে ধার্যকৃত মহারানার অর্ধেক দিতে হবে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধনটা নিবদ্ধ সে যদি ক্ষমা করে দেয়।

এ আয়াতের মালে দাবি ছেড়ে দেয়াকে اَلْعَفْوُ বলা হয়েছে। আর সকলেই জানা আছে, যে লোক প্রতিশোধ গ্রহণ ও দীয়ত গ্রহণ ত্যাগ করাকে অগ্রাধিকার দেবে—গ্রহণ করবে, তার জন্যে العفو। শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে লোক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে ফিরে গিয়ে দীয়ত গ্রহণকে অবলম্বন করল, তাকেও ক্ষমাকারী বলা যায় না। কেননা সে গ্রহণীয় দুটি জিনিসের মধ্যে থেকে একটি গ্রহণ করেছে। সে দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিল। কেননা দুটি জিনিসের মধ্যে থেকে একটি জিনিস গ্রহণ করলে সে তো তার প্রকৃত প্রাপ্যটা—যা তার জন্যে নিশ্চিত—গ্রহণ করেছে। সেটা গ্রহণকালে তার জন্যে সেটাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তখন অন্য কোনটা তার জন্যে গ্রহণীয় থাকে না। লক্ষণীয় কসমের কাফফারা হিসেবে যে লোক গোলাম আযাদ করাকে গ্রহণ করল, এই গোলাম আযাদকরণই তার জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। যেন অন্য কোনটি তার জন্যে কাফফারা ছিলই না। অন্যটির হুকুমই তার উপর থেকে পড়ে গেছে, তা তার জন্যে ফরয ছিল না। অনুরূপভাবে আলোচ্য অভিভাবক যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা মাল গ্রহণের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিল, পরে সে তার একটিকে গ্রহণ করল, তা হলে সে তো ক্ষমাকারী নাম পাওয়া অধিকারী হতে পারে না। কেননা সে একটি ছেড়ে অন্যটি গ্রহণ করেছে মাত্র, কিছুই ক্ষমা করেনি। আমরা যার অবস্থা বললাম, তার পক্ষে ক্ষমার ব্যাপারটি যখন নেতিবাচক হয়ে গেল, তখন আয়াতটির যেন-তেন ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয হতে পারে না, বরং আমরা তার যে তাৎপর্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা-ই আয়াতটির যথার্থ ব্যাখ্যা।

অতঃপর মূল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপের নিহতের অভিভাবকের পক্ষে প্রতিশোধ ও দীয়ত—উভয়টা গ্রহণই কর্তব্য হবে অথবা শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ—দীয়ত নয় কিংবা দুটির যে কোন একটি ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু উভয়টা গ্রহণ জায়েয নয় এ ব্যাপারে সকলেই একমত। আর ইখতিয়ার হিসেবে দুটির একটি গ্রহণও কর্তব্য হতে পারে না। যেমন কসম ভঙ্গের কাফ্ফারায় হতে পারে। তার কারণ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্টভাবে কর্তব্য ঘোষণা করেছেন কিসাসকে। এখানে কিসাস গ্রহণ কিংবা তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণের ইখতিয়ার থাকার কথা বলা কুরআনের মূল দলীলের উপর বৃদ্ধি, কিসাস কার্যকর হওয়ার বিপরীত। আমাদের মতে এ রকমটা করা হলে কুরআনী বিধানকে মনসূখ করা হয়। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণটাই বাধ্যতামূলক থেকে যায়। অন্য কিছু করণীয় থাকতে পারে না। অতএব অভিভাবকের পক্ষে মাল গ্রহণ জায়েয হতে পারে না। তবে হত্যাকারীর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হলে ভিন্ন কথা। কেননা আর কিছুর পূর্বেই যে জিনিসটির হক্ হবে, তার পুরা মাত্রায় নিয়ে নেয়া সম্ভব, তাকে অন্য কিছুর দিক সরিয়ে দেয়া—যার উপর হক ধার্য হয়েছে তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে—জায়েয হতে পারে না। তাই হতে পারে বলে যে দাবি করে, যে মূল কথা বুঝতে ভুল করেছে, যখনই বলেছেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণ-ই কর্তব্য, তবে তার ইখতিয়ার রয়েছে মাল গ্রহণের। কেননা এ কথার

দ্বারা তার ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার কথাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে। কেননা সে বলেছে, সে চাইলে প্রতিশোধ আদায় করতে পারে, চাইলে মাল গ্রহণ করতে পারে।

কেউ যদি বলে, মাল লওয়াই কর্তব্য, তবে তার বদলে প্রতিশোধও তার জন্যে সমান সমান। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেননা সে বলেছে, মাল গ্রহণই কর্তব্য, তবে তার বদলে সে প্রতিশোধও নিতে পারে, তার এই ইখতিয়ার রয়েছে, অনুরূপভাবে তার কথাও বাতিল, যে বলে যে প্রতিশোধ গ্রহণই মূল কর্তব্য, তবে সে তা মালে বদলে দিতে ও তার বদলে মাল গ্রহণ করতে পারে। এর উভয় অবস্থায়ই মূল হত্যার ব্যাপারে ইখতিয়ারকেই ওয়াজিব প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তো হত্যাকারীর উপর কিসাস অবশ্য কর্তব্য রূপে ফরয করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে। এ কথাও বলেন নি ঃ 'তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস অথবা মাল লিখে দেয়া হয়েছে।'

যিনি বলতে চেয়েছেন, প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্য। তবে তার অধিকার আছে তাকে মালে বদলে দেয়া, তিনি ইখতিয়ার থাকার কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তা-ই তার জন্যে বাধ্যতামূলক যদিও তার নাম নেন নি। আর তিনি আসলে কথা বোঝাতে ভুল করেছেন।

যদি কেউ বলেন, এ কথাটি তো তেমনই, তুমি বল যে, ওয়াজিব হচ্ছে কিসাস। আর উভয়ের (হত্যাকারী ও নিহতের অভিভাবক) জন্যে সব কিছুই মালে পরিণত করার অধিকার রয়েছে উভয়ের রাজি থাকার ভিত্তিতে। মালে পরিণত করাতে উভয়ের রাজি থাকা জায়েয় হওয়ার আয়াতের ওয়াজিব হুকুম কিসাস ফেলে দেয়ার কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, আমরা তো শুরুতেই বলে দিয়েছি যে, নিহতের অভিভাবকের হত্যাকারীর উপর কিসাসই হচ্ছে হক—প্রতিশোধ বা অন্য কিছুর মধ্যে কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই। আর তাকে মালে পরিবর্তন করায় উভয়ের রাজি হওয়াতে তারই বাধ্যতামূলক হক হওয়া এবং অন্য কিছুর হক না হওয়ার আওতার বাইরে যাওয়ার ঘটনা ঘটে না। কেননা যার হুকুম উভয়ের রাজি থাকার সাথে সম্পর্কিত, তা কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই মূলে ওয়াজিব হওয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। লক্ষণীয়, এক ব্যক্তি একজন গোলামের মালিক হল, মালিক হল একটি ঘরের। অন্যরা তার সন্তুষ্টিতে তার থেকে তা খরিদ করেও নিতে পারে। তা জায়েয হলে তার প্রথম মালিকের মালিক হওয়াটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। আর তার মালিকানা কোন ইখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল হওয়াও জরুরী হয় না। অনুরূপভাবে পুরুষ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার মালিক হতে পারে, খোলা তালাকের অধিকার দেয়ারও মালিক হতে পারে এবং তালাক দেয়ার বদলে মালও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাতে স্ত্রীর রাজি হওয়া ছাড়াই এবং শুরুতেই তালাকের মালিকানা মালে পরিণত করার ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার কথা প্রমাণ করে না। তার যদি তালাক দেয়ার বা মাল গ্রহণের অধিকার থাকে শুরুতেই স্ত্রীর রাজি হওয়া ছাড়াই, তাহলে তদ্দরুন সে তালাক কিংবা মাল এ দুটির যে কোন একটির মালিক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।

হত্যার প্রতিশোধ লওয়াই ওয়াজিব হয়, অন্য কিছু নয়, এ কথা প্রমাণকারী একটি দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন। রুবাই তার ক্রীতদাসীর দাঁত ভেঙে দিলে যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তার বর্ণনায় আমরা তার সনদেরও উল্লেখ করেছি। সে ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ। 'আল্লাহ্ তো কিসাস-ই লিখে দিয়েছেন; এতে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় আল্লাহ কিসাস কার্যকর করার বিধান দিয়েছেন। অতএব তার সাথে অতিরিক্ত কিছু প্রমাণ করার কারোর কোন অধিকার থাকতে পারে না। অন্য কোন জিনিসে তাকে পরিণত করাও যাবে না। যদি করা হয়, তাহলে কুরআনকে মনসূখ করার শামিল হবে, যার অধিকার কারোই নেই। অন্যরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'যার জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কোন কিছু ক্ষমা করা হলে'.... আয়াতের ভিত্তিতে হত্যাকারীর রাজি হওয়া ছাড়াই মাল গ্রহণ জায়েয বলেছেন, আয়াতটির এ ব্যাখ্যা সম্ভব একথা যদি আমরা মেনে নেই, আমরা যেসব দিকের উল্লেখ করেছি সেগুলো সম্ভাবনা সহ তাহলে তার সবচেয়ে বড় অবস্থা এই হবে যে, শব্দটিকে বহু অর্থ সমন্বিত মনে করা হবে। আর তার ফলে আয়াতটি 'মুহকাম' (স্পষ্ট অকাট্য অর্থবোধক) থাকবে না, 'মুতাশাবিহ' (যার অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নয়) হয়ে যাবে। অথচ একথা জানা যে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ একটি 'মুহকাম' আয়াত, 'মুতাশাবিহ্' নয়। এর অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট, নির্দিষ্ট। এর অর্থে বহু অর্থের সমন্বয় ঘটেনি। তার ব্যাখ্যায়ও বহু সম্ভাবনা নিহিত নয়। আর 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের হুকুম হচ্ছে, তাকে 'মুহকাম' অর্থে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ এই কথাটি স্মরণীয় ঃ

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ .... وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ -

এই কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। এক মুহকামাত, যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ। আর দ্বিতীয়, মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করতে চেষ্টা করে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুতাশাবিহ্ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ফেলবার (অর্থাৎ তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বের করার) আদেশ করেছেন। কেননা মুহকাম আয়াতকে উম্মুল কিতাব—কিতাব আসল বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে। এর দাবি হচ্ছে অন্যান্য আয়াতকে তার উপর রেখে (তার আলোকে) ব্যাখ্যা দিতে হবে। এর অর্থ তারই সাথে যুক্ত হবে। কেননা একটি জিনিসের মা-ই হয় তার নিরাপত্তার স্থান, তার শুরু যেখান থেকে, পরিণতিও সেখানেই। পরে নিন্দা করা হয়েছে তাদের যারা 'মুতাশাবিহ' আয়াতের পিছনে পড়ে থাকে এবং তার যে ব্যাখ্যা 'মুহকাম' আয়াত ভিত্তিক নয়, যার অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সেগুলোকেই যথেষ্ট মনে করে নেয়। বলা হয়েছে, এই লোকদের অন্তরের মধ্যে বক্রতা রয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ -

তবে যাদের অন্তরে বক্রতা ও কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করতে চেষ্টা করে।

আর যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে' একটি 'মুহকাম' আয়াত এবং তাঁর কথা যার ভাই তার জন্যে কিছু ক্ষমা করে দেবে .... একটি মুতাশাবিহ আয়াত, তখন এ আয়াতটিকে মুহকাম আয়াতের উপর স্থাপন করে তার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেন তার ব্যাখ্যাটা 'মুহকাম' আয়াতের বিপরীত কিছু না হয়। তার হুকুম থেকেও যেন কোন জিনিস দূর করাতে না হয়। তাই আমাদের পূর্বে উল্লিখিত যে-কোন একটি দিকের ভিত্তিতে হতে হবে। তাতে আয়াতে 'কিসাস' শব্দের দাবি অস্বীকৃত হবে না, তার সাথে অপর কোন তাৎপর্যকেও মেলানো হবে না, সে দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরেও যাওয়া হবে না। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তেমন ঃ

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ আচরণ কর যেমন করে সে তোমাদের প্রতি করেছে।

কেননা নরহত্যায় নিহতের অভিভাবক প্রতিশোধ লওয়ার অধিকারী। কেননা তাই তার কাজের সমান। হত্যাকারী যখন একটি প্রাণ সংহার করেছে, সেই প্রাণ সংহারের প্রতিশোধস্বরূপ তারও প্রাণ সংহার করা হবে। যেমন কেউ যদি কারোর মাল ধ্বংস কর, তার অনুরূপ মাল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তাছাড়া অন্য কিছু করতে হলে সে পক্ষকে সেজন্যে রাজি হতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ 'ঠিক যেমন তোমাদের উপর সীমাঙ্ঘনমূলক কাজ করেছে।' মৌলনীতিও তা-ই বলে।

যারা মনে করেন, হত্যাকারীর রাজি হওয়া ছাড়াই প্রতিশোধ ও মাল গ্রহণ—এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে এবং তাদের মতের সমর্থনে কতিপয় হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটি হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর, আবূ সালমা, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়কালে বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُّوْدَى -

যার নিকটাত্মীয় নিহত হবে, তার দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে। হয় সে হত্যা করবে, না হয় সে আদায় করবে।

আর একটি হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আবূ যিব, সাঈদুল মুকবেরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ শুরাইহকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ভাষণে বলেছেন ঃ

اَلَا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلَ وَاِنِّىْ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِىْ هٰذِهٖ قَتِيْلٌ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : بَيْنَ اَنْ يَّاْخُذُوْا الْعَقْلَ وَبَيْنَ اَنْ يَّقْتُلُوْا –

জেনে রাখো, হে খুজায়া গোত্র, তোমরা হুযায়ল গোত্রের এই লোকটিকে হত্যা করেছ। আমি তার আকিলা। আমার এই কথার পর যদি কেউ নিহত হয়, তাহলে তার পরিবারবর্গের দুটি জিনিসের মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে। হয় 'দীয়াত' গ্রহণ করবে, না হয় হত্যাকারীকে হত্যা করবে।'

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, হারস ইবনে ফুযায়ল, সুফিয়ান, আবুল আরজা, আবূ শুরাইহ আল-খুজায়ী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ بِخَبَلٍ – يُعْنِىْ الْجَرَّاحِ – فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَى ثَلَاثٍ بَيْنَ الْعَفْوِ اَوْ يَقْتَصَّ اَوْ يَاخُذُ الدِّيَةَ –

যে লোকের রক্তপাত (অর্থাৎ হত্যা) করা হবে, কিংবা ক্ষতকারী বিহ্বলতায় পড়বে, তার অভিভাবকের তিনটি জিনিসের যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে, ক্ষমা অথবা কিসাস কিংবা দীয়ত গ্রহণ।

কিন্তু যে মতের সমর্থনে এই হাদীসসমূহে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে, এই হাদীসসমূহ সে মতকে প্রমাণ করে না। কেননা হাদীসে যে দীয়ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তা হয়ত হত্যাকারী তাতে রাজি থাকার ভিত্তিতে দীয়ত গ্রহণের কথাই মূল বক্তব্য হয়ে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً –

হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে, না হয় বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া হবে।

এ আয়াতে বলা বিনিময় গ্রহণটা বন্দীর রাজি থাকার ভিত্তিতে হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। বন্দীর রাজি থাকার কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে। কেননা মালের উল্লেখটাই যে মালদাতার তাতে রাজি থাকার শর্ত রয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা আছে, সেই জন্যে তার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। তাছাড়া দাতার রাজি থাকা ছাড়া তার মাল গ্রহণ তো কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর 'অথবা দীয়ত গ্রহণ করবে' কথাটিও ঠিক তেমনি। আর তাঁর 'অথবা আদায় করবে' কথাটিও সেরূপ অর্থ দেয়। যেমন অপর কারো উপর কারো ঋণ থাকলে বলে ঃ 'তুমি চাইলে তোমার ঋণ দিরহামে নিয়ে নাও; চাইলে দীনারে নিয়ে নাও'; যেমন রাসূলে করীম (স)

হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন তিনি তাকে বিশেষ ধরনের খেজুর (تمر) দিয়েছিলেন ঃ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا 'খায়বরের সব খেজুরই কি এই রকম ?' তখন তিনি বলেছিলেন ঃ না, তা নয়। বরং আমরা তার এক সা পরিমাণ নিই দুই সা'র বিনিময়ে কিংবা দুই সা নিই তিন সা' দিয়ে। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

لَاتَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ بِعْ تَمْرَكَ بِعَرْضٍ ثُمَّ خُذْ بِالْعَرْضِ هٰذَا –

তোমরা এরূপ করবে না। বরং তুমি তোমার খেজুর একটা দামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দাও। পরে এই খেজুর মূল্যের বিনিময়ে খরিদ কর।

আর একথা তো জানাই আছে যে, নবী করীম (স) মূল্যের বিনিময়ে খেজুর বিক্রেতার বিক্রয় করতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও নিতে বলেন নি নিশ্চয়ই।

রাসূলে করীম (স) দীয়তের কথা বলেছেন বনী ইসরাঈলীদের উপর জারি থাকা বিধানকে আল্লাহ তা'আলা মনসূখ করেছেন—তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে। সে বিধান ছিল হত্যাকারীর রাজি থাকা সত্ত্বেও তার দেয়া দীয়ত নিষেধের বিধান। তার রাজি না থাকা অবস্থায়ও তা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ মুসলিম উম্মতের উপর এই আইনটাকে সহজ ও হালকাভাবে পালনযোগ্য করে দিয়েছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

বনী ইসরাঈলী সমাজে কিসাস আইন কার্যকর ছিল কিন্তু দীয়ত গ্রহণের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে ছিল না। আল্লাহ এ উম্মতের জন্যে আইনটি হালকা করে দিয়েছেন।

আমরা বলছি, রাসূলে করীম (স)-এর কথার তাৎপর্য হচ্ছে, হত্যাকারী রাজি থাকার ভিত্তিতে দীয়ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কথার আর একটি দলীল হচ্ছে আওজায়ী বর্ণিত হাদীস। তিনি আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর আবূ সালমা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُّفَادَ –

যার লোক নিহত হবে, তার দুটির মধ্যে উত্তমটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে। হয় সে হত্যাকারীকে হত্যা করবে কিংবা ফিদিয়া—রক্ত-বিনিময়—গ্রহণ করবে।

ফিদিয়ার লেন-দেন তো দুজনের মধ্যে সাধিত হয়, যেমন যুদ্ধ, মারামারি ও গালাগালি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সব হাদীসেই দীয়ত গ্রহণটা হত্যাকারীর রাজি থাকার সাথে সংযুক্ত ও তার শর্তাধীন, তা থেকে মুক্ত নয়। আর এ সব হাদীস তাদের কথা বাতিল করে দেয় যারা বলে যে, হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়াই মূল কর্তব্য। আর অভিভাবক তাতে দীয়তে পরিবর্তিত করতে পারে। বাতিল এ জন্যে যে, তার সব কয়টিতেই অভিভাবকের মূল হত্যাকাণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণ ও দীয়ত গ্রহণ—হত্যাকারীর রাজি থাকার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। যদি প্রতিশোধ গ্রহণই কর্তব্য হতো, অন্য কিছু

নয়, তাহলে অভিভাবক তা প্রমাণিত হওয়ার পর দীয়তে রূপান্তরিত করতে পারত। যেমন ঋণটা মূল্যে ও মূল্যটা ঋণে রূপান্তরিত করা যায় বিনিময়ের নিয়মে।

কিন্তু মূল হত্যাকাণ্ডে ইখতিয়ারের কোন প্রশ্ন নেই। এখানে একটাই করণীয়। আর তা হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণ। যে লোক বলে, হত্যায় প্রতিশোধ গ্রহণই কর্তব্য, অন্য কিছু নয়, তবে অভিভাবক তাকে দীয়তে রূপান্তরিত করতে পারে, তার এই কথা এসব হাদীসের পরিপন্থী। আনসারী হুমাইদ তয়ীল আনাস ইবনে মালিক থেকে রুবাইর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র লিখন হচ্ছে কিসাস। এই কথাটি কিতাবের অর্থ মাল বা কিসাস হওয়ার পরিপন্থী। আল-কামা ইবনে অয়েল তার পিতা ও সাবিতুল বানানী, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তখন নবী করীম (স) সেই হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দিলেন। বললেন ঃ তুমি কি একে ক্ষমা করে দিচ্ছ ? সে বলল, না। বললেন ঃ তা হলে কি দীয়ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত? বলল ঃ না। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ মনে রেখ, তুমি যদি ওকে হত্যা কর, তাহলে তুমি ওরই মত হয়ে গেলে। পরে লোকটি চলে গেল। তখন লোকেরা তার সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ রাসূলে করীম (স) তো বলেছেন ঃ তুমি ওকে হত্যা করলে তুমি ওরই মত হয়ে যাবে। লোকটি পরে তাকে ক্ষমা করে দিল।

যারা প্রতিশোধ বা মাল গ্রহণের ইখতিয়ার অভিভাবকের আছে বলে মত পোষণ করে, এই হাদীসটিকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছে। কিন্তু এ হাদীসে তাদের মতের কোন সমর্থন বা প্রমাণ নেই। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি হয়ত বলেছেন, দীয়ত গ্রহণ করবে হত্যাকারীর রাজি থাকার ভিত্তিতে। যেমন তিনি সাবিত ইবনে কায়স-এর স্ত্রীকে বলেছিলেন, যখন সে তাঁর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছিল اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ 'তুমি কি তোমার স্বামীর নিকট থেকে তা—বাগানটি—নিয়ে নিতে চাও ? (অর্থাৎ তুমি কি তার কাছ থেকে তালাক নিতে চাও) বলল ঃ হ্যাঁ! এই নিয়ে নেয়ায় স্বামীর অনুমতি থাকার যে শর্ত রয়েছে, তা তো জানা কথাই। তা মূল ভাষণে উল্লিখিত না হলেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা স্বামীর রাজি থাকা ছাড়া তালাকের ও বাগানের মালিকানা অন্যকে দেয়ার যে পক্ষপাতি ছিলেন না, তা তো জানা কথা। এ-ও হতে পারে যে, নবী করীম (স) তিনি মালের উপর একটা চুক্তি করাতে চেয়েছিলেন। আর এই চুক্তি যে হত্যাকারীর রাজি থাকা ছাড়া সম্ভব নয়, একথা তো প্রমাণিত কিংবা এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। আর এ-ও হতে পারে যে, তিনি নিজেই দীয়ত দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। যেমন মক্কায় খুজায়ী গোত্রের—নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে করেছিলেন, বলেছিলেন ঃ আমি-ই তার 'আকিলা'। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সহলকে খায়বরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকে দীয়ত বহন করেছিলেন।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তুমি যদি ওকে হত্যা কর, তাহলে তুমি ওরই মত হয়ে গেলে' এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি, 'তুমিও হত্যাকারী, যেমন সে একজন হত্যাকারী।' 'তুমি তারই মত গুনাহগার' তা বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কেননা, সে (অভিভাবক) হত্যাকারীকে হত্যা করে তার হক্ই আদায় করেছে মাত্র। তাতে সে কোন

অপরাধ করেনি, সে জন্যে সে নিন্দা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। প্রথমটা তো এমন কাজ, যা করার কোন অধিকার তার ছিল না। এই কারণে সে অপরাধী, গুনাহ্‌গার। বোঝা গেল, তিনি অভিভাবকও প্রতিশোধের হত্যা কার্য করে গুনাহ্‌গার হবে, তা বলতে চাননি।

আর দ্বিতীয় অর্থ, তুমি যদি হত্যাকারীকে হত্যা কর, তাহলে তুমি তার কাছ থেকে তোমার পাওনা পুরামাত্রায় আদায় করে নিলে। তোমাদের কোন বিশেষত্ব থাকল না। আল্লাহ্‌ও ক্ষমা করে বিশেষত্ব অর্জনকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁর কথা হল ঃ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ –

যে লোক তার সাদকা করল (হত্যাকারীকে মাফ করে দিল) তা তার জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে।

যদি কেউ বলে, অভিভাবকের যখন হত্যাকারীর জীবন রক্ষা করার অধিকার আছে, সে হত্যাকারীর নিকট থেকে মাল গ্রহণ করলে তা করার তার ইখতিয়ার আছে বলে হুকুম করাই বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই কর্তব্য অপরকে বাঁচিয়ে রাখা, যখন সে তার উপর ধ্বংসের ভয় পাবে। যেমন কেউ যদি কোন লোককে দেখতে পায় যে, সে অন্যকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়েছে—কিংবা কেউ পানিতে ডুবে যাবে বলে ভয় পায়, আর তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে বলে মনে করে, কেউ যদি দেখে, একটি লোক ক্ষুধা তাড়নায় ছটফট করে মরে যাচ্ছে, আর তার নিকট খাবার রয়েছে, যা খাইয়ে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে তাকে তা খাইয়ে তাকে বাঁচানোই তার কর্তব্য—তার মূল্য যত বেশিই হোক না কেন। এতে কোনই সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে হত্যাকারী যদি মাল দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে, তাহলে নিহতের অভিভাবকের কর্তব্য, সম্ভব হলে মাল গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেয়া, এও নিঃসন্দেহ কথা। এমতাবস্থায় হত্যাকারী যদি মাল দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে, তাহলে নিহতের অভিভাবকের কর্তব্য, সম্ভব হলে মাল গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেয়া, এও নিঃসন্দেহ কথা। এমতাবস্থায় হত্যাকারী মাল দিতে চাইলে নিহতের অভিভাবককে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা করা হলে আল্লাহ্‌র দেয়া কিসাস-এর হুকুম মূলতই বাতিল হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেকেই যদি হত্যাকারীর জান বাঁচানোর চেষ্টায় লেগে যায়, তাহলে হত্যার প্রতিশোধে হত্যাকে বাদ দিয়ে উভয়ই ধন-মালের লেন-দেন করতেই উঠে পড়ে লেগে যাবে, কিসাসের ধার কেউ ধারবে না। উপরন্তু অভিভাবক যদি হত্যাকারীর বাড়ি-ঘরের দাবি করে বসে বা তার গোলাম কিংবা বিপুল পরিমাণের দীয়ত চেয়ে বসে তাহলে তা-ই তাকে দিতে হবে। কেননা জীবন রক্ষার জন্যে যা দরকার, তার বেশি বা কমের কোন প্রশ্ন থাকে না। এ মত গ্রহণকারীদের দৃষ্টিতেও প্রকৃত দীয়তের বেশী দেয়া যখন বাধ্যতামূলক নয়, তখন বেশী দিতে বাধ্য হলে তদ্দরুন বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা। ফলে গোটা ব্যাপারটিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

এই ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূলে আল-মুজানী একটি দলীল সংগ্রহ করেছেন। তা হল, কযফ বা যিনার মিথ্যা অভিযোগের দণ্ডের ব্যাপারে যদি কেউ কিছু পরিমাণ মালের ভিত্তিতে সন্ধি করে কিংবা প্রাণের দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিতে, তাহলেও তার জন্যে শরীয়াত নির্ধারিত হদ্দ ও কাফালত উভয়ই অকার্যকর হয়ে যায়। ফলে সে কিছুই পাওয়ার অধিকারী থাকে না। অনুরূপভাবে ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারটিতেও যদি অর্থের ভিত্তিতে মীমাংসা হয়ে যায়, সকলেরই ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং তা কবুল করে নেয়া হয়, তাতে বোঝা যাবে যে, ইচ্ছামূলক হত্যার মূল শাস্তিই বুঝি মাল দেয়া, অন্যথায় মালের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সহীহ্ হতে পারত না, যেমন সহীহ্ হতে পারে না, কযফ ও কাফালতের ব্যাপারে।

আবূ বকর বলছেন, এরূপ যুক্তি উপস্থাপনে বিরাট ভুল রয়েছে। রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা। ভুল হচ্ছে, এ ব্যাপারে আসল কথা হচ্ছে, সন্ধি-সমঝোতার দ্বারা নির্দিষ্ট শরীয়াতী শাস্তি হদ্দ কখনই বাতিল করা যেতে পারে না। এরূপ করা হলে মাল ও কিফালাহ্-ই বরং বাতিল হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা উল্লেখ্য। একটি—না, তা বাতিল করা যেতে পারে না। আর দ্বিতীয়—হ্যা, বাতিল করা যায়।

আর পরস্পর বিরোধিতা হচ্ছে, তালাকের বিনিময়ে মাল গ্রহণ সর্বসম্মতভাবে ও কোনরূপ মতদ্বৈততা ছাড়াই—জায়েয। অথচ এটাও সর্বসম্মত যে, মালের বিনিময়ে তালাক লওয়া তালাকের আসল বিধান নয়। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে মাল গ্রহণের বিনিময়ে তালাক দেয়া স্বামীর কোন অধিকার নেই। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর পক্ষ থেকে আল-মাজানীর বর্ণনানুযায়ী বলেছেন, নিষিদ্ধ সমাজচ্যুত (Interdicted) ব্যক্তিকে রক্তপাতের দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করা জায়েয। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে কিংবা যারা পাওনাদার তাদের পক্ষে তা নিষেধ করার কোন অধিকার নেই। কেননা ইচ্ছামূলক হত্যায় যার উপর অপরাধটা হয়েছে, তার ইখতিয়ার ব্যতীত মালের মালিক হওয়া যায় না। হত্যার প্রতিশোধ যদি মূলত মালই হয়, তাহলে তার উপর পাওনাদারদের দাবি অবশ্যই স্বীকৃত হবে। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে তারাও পাবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে ইচ্ছামূলক হত্যার দণ্ড হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্য কিছু নয় এবং তা হত্যা ও দীয়তের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার থাকার দরুন তা জরুরী হয় নি।

কেউ যদি বলেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ যে লোক মজলুম হিসেবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি-ই প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা মাল গ্রহণের মধ্যে অভিভাবকের ইখতিয়ার থাকার কথা প্রমাণ করে—যদি 'সুলতান' শব্দটি তার উপর প্রযোজ্য হয়। আর তার দলীল হচ্ছে, জুলুমস্বরূপ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে দীয়ত গ্রহণই কর্তব্য হয়। যেমন প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যায় বা পিতা যদি তার পুত্রকে হত্যা করে, তাহলে তাই হয়ে থাকে। আর কতকের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ লওয়াই কর্তব্য হয়। মনে হয়, এই সব অর্থই আয়াতের তাৎপর্য। কেননা ব্যবহৃত শব্দে তার

সম্ভাবনা বিদ্যামন। দহাক ইবনে মুযাহিম এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তিনি فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে দীয়ত গ্রহণ করতে পারে। দেখা যায়, 'সুলতান' শব্দটিতে এসব অর্থ নিহিত আছে, তখন মাল গ্রহণে তার সুলতান (অধিকার) থাকার কথাও প্রমাণিত, যেমন প্রমাণিত প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে। কেননা 'সুলতান' শব্দটিতে এ দুটি অর্থই হয়। উপরন্তু সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, এ দুটির প্রত্যেকটিই একই অবস্থায় আল্লাহ্র বক্তব্য হতে পারে। এরূপ অবস্থায় মূল আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে ঃ

যে ব্যক্তি মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবকের জন্যে কর্তৃত্ব (সুলতান) প্রতিষ্ঠিত করেছি প্রতিশোধ ও দীয়ত গ্রহণের।

আর একথাও যখন প্রমাণিত যে, এ দুটি কাজ এক সাথে করা যেতে পারে না, তখন মনে করতে হবে যে, দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ারই কার্যকর হবে। তোমরা যেমন করে—"নিশ্চয়ই তার অভিভাবকের জন্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি" কথা দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণকে কর্তব্য করে দিয়েছ তার উপর সকলের ঐকমত্য হওয়ার কারণে। আর তা-ই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অকাট্য হয়ে গেছে। তোমরা এই শব্দটিকে 'প্রতিশোধ' শব্দটির মতই সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক বানিয়ে দিয়েছ। অতএব মাল গ্রহণ প্রমাণ করা অনুরূপভাবে তোমার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। জুলমমূলক হত্যায় অভিভাবকের ক্ষমতা আছে মাল গ্রহণের।

জবাবে বলা যাবে, এই শব্দের অর্থ হিসেবে 'প্রতিশোধ'-কে গ্রহণ করা অধিক উত্তম তাকে দীয়ত গ্রহণ অর্থে গ্রহণের তুলনায়। তা এ জন্যে যে, 'সুলতান' শব্দটি যখন বহু অর্থের ধারক মনে করা হচ্ছে, তখন তা 'মুতাশাবিহ' গণ্য হবে। আর 'মুতাশাবিহ'কে 'মুহকাম' বানানো ওয়াজিব। 'মুহকাম'-এর অর্থ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে, "তোমাদের প্রতি ফরয লিখে দেয়া হয়েছে কিসাস নিহতের জন্যে" এ আলোচনার প্রমাণিত কথা হল যে, আয়াতের শব্দ 'সুলতান' বলতে 'প্রতিশোধ'ই বুঝতে হবে। তাই মুহকাম আয়াতের পরে পরে সংযোজনের মাধ্যমে সংযোজিত। কিসাসই ওয়াজিব, ইচ্ছামূলক হত্যায় মাল গ্রহণ ওয়াজিব প্রমাণকারী কোন আয়াত নেই। এতে করে 'মুতাশাবিহ' আয়াতের 'মুহকাম' আয়াত ভিত্তিক অর্থ হয়ে যায়। আর সেজন্যে তার অর্থ কেবলমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণই বুঝতে হবে, মাল নয়। এই অর্থই 'মুহকাম' আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। এ শব্দে অন্য কোন অর্থের শরীকদারী নেই। যে লোক এ থেকে দীয়ত বা প্রতিশোধ গ্রহণের ইখতিয়ার আছে বলে মনে করেছেন, সে কোন 'মুহকাম' আয়াতের উপর ভিত্তি করতে পারে নি। কাজেই ইখতিয়ার প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই। যদিও শব্দটিতে তার সম্ভাবনা আছে।

আয়াতে সূচনায় এমন কিছু আছে, যা প্রতিশোধ অর্থই প্রমাণ করে, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا - فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

যে লোক মজলুম হয়ে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব সে যেন হত্যায় সীমালজ্ঘন না করে। সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

হত্যায় সীমালজ্ঘন হচ্ছে হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য কাউকে হত্যা করা। অথবা হত্যাকারীকে এমনভাবে হত্যা করবে, যেভাবে নিহত হওয়ার সে যোগ্য বা অধিকারী নয় কিংবা তাকে বিকৃত করে দেবে।

এতে এই দলীল রয়েছে যে, 'সুলতান'-এর অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ । উপরন্তু যখন প্রমাণিতই হল যে, প্রতিশোধই আয়াতটির আসল বক্তব্য, তখন মাল গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কেননা প্রতিশোধ গ্রহণের সাথে সাথে মাল গ্রহণও যদি বৈধ হতো তাহলে একই অবস্থায় সেই দুটিই গ্রহণ করা কর্তব্য হতো—ইখতিয়ার হিসেবে নয়। কেননা আয়াতে ইখতিয়ারের কোন কথাই নেই। আর সে দুটিকেই এক সাথে গ্রহণ যখন নিষিদ্ধ, তখন প্রতিশোধ গ্রহণই তার অর্থ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। এ থেকে আমরা বুঝলাম, মাল গ্রহণের কথা মূলতই বলা হয়নি। কোন কোন জুলুমের হত্যাকাণ্ডে আমরা যে দীয়ত গ্রহণ জায়েয বলি, তা এ আয়াতের ভিত্তিতে অবশ্যই নয়।

'আকিলা'—ইচ্ছামূলক হত্যায় 'আকিলা'র অবকাশ আছে কি ?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ -

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়। তাহলে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততা সহকারে রক্তপাতের বিনিময় দিয়ে দেয়া হত্যাকারীর কর্তব্য।

পূর্বে আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা নানা পর্যায়ে পেশ করেছি। নিহতের অভিভাবক বহু হলে এবং তাদের মধ্য থেকে কতক যদি তাদের অংশের দাবি ছেড়ে দেয়, আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। তখন অবশিষ্টদের জন্যে জরিমানা (ارش) দেয়া কর্তব্য হবে। ব্যবহৃত শব্দের এই তাৎপর্য হতে পারে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, যে হত্যাকারী মাল দিয়ে ক্ষমা পায়নি, যে ইচ্ছামূলক হত্যায় হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্য তাতে মাল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে। যেমন বাপ—যদি সে তার পুত্রকে হত্যা করে অথবা হত্যার কম শুধু যখমের ঘটনা হয় এবং যাতে কিসাস লওয়া সম্ভব হয় না। যেমন বাহুর মাঝখান থেকে হাত কেটে ফেলা। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকারী ও ভুলকারী দুজনই যদি হত্যায় শরীক হয়, তাহলে ইচ্ছাকারীকে তার মাল থেকে অর্ধদীয়ত দিতে হবে, আর ভুলকারীকে যা দিতে হবে, তা

দেবে তার 'আকিলা'। হানাফী ফিকাহবিদদের এটাই কথা। উসমান আলবত্তী, সওরী ও শাফেয়ীরও এই মত। ইবনে অহব ও ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তা আকিলার উপর ধার্য হবে। এটা ইমাম মালিকের সর্বশেষ কথা। ইবনুল কাসিম বলেছেন, কোন ব্যক্তির ডান হাত কাটা হলে তার ডান হাত থাকে না। তার হাতের দীয়ত দিতে হবে মাল দিয়ে কিন্তু তা 'আকিলা' বহন করবে না। আওজায়ী বলেছেন ঃ সে দীয়ত অপরাধী মাল থেকে দিতে হবে। হ্যাঁ, তার মাল যদি দীয়ত দেয়ার জন্যে যথেষ্ট না হয় তাহলে তা দেয়ার দায়িত্ব বর্তিবে 'আকিলা'র উপর। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে হত্যা করে ইচ্ছাপূর্বক ও সংকল্প নিয়ে, এক অবস্থায় যে, সে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সন্তান তার রয়েছে, তাহলে তার দীয়ত স্ত্রীর মাল থেকে দিতে হবে বিশেষ করে। তার মাল যদি সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে তার 'আকিলা'কে তা দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটি বাহ্যতই প্রমাণ করে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ব্যাপারে কোনরূপ সন্ধি করা এবং কোন কোন অভিভাবকের ক্ষমার দরুন প্রতিশোধ লওয়া প্রত্যাহৃত হলে অপরাধীর মাল থেকে দীয়ত আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যে হত্যাকারীকে তার ভাইর পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করা হবে....' এখানে হত্যাকারীকে বোঝানো হয়েছে, যখন কোন কোন অভিভাবকের ক্ষমা সঙ্ঘটিত হবে।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ 'প্রচলিত নিয়মনীতির অনুসরণ করা হত্যাকারীর জন্যে জরুরী' অর্থাৎ হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের অনুসরণ করতে হবে। এরপর বলেছেন وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ 'তার দিকে আন্তরিকভাবে আদায় করে দিতে হবে।' অর্থাৎ হত্যাকারী দীয়ত আদায় করে দেবে, তা তার মাল থেকে দেবে। যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মালের ভিত্তিতে সন্ধি করা হলে উভয়ের সে জন্যে রাজি হতে হবে, সে ব্যাখ্যায়ও হত্যাকারীকেই দীয়ত দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে, অন্য কাউকে নয়। কেননা আয়াতে 'আকিলার' কোন উল্লেখ নেই। তাতে অভিভাবক ও হত্যাকারীর উল্লেখ আছে মাত্র। ইবনে আবুজ্জিনাদ তার পিতা উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمَدًا وَلَاعَبْدًا وَلَاصُلْحًا وَلَااعْتِرَافًا -

ইচ্ছামূলক হত্যায়, কোন দাসকে, সন্ধির ভিত্তিতে বা অঙ্গীকার হিসেবে 'আকিলা' দীয়ত দেয়ার দায়িত্ব বহন করবে না।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনুল ফযল আল খতীব—ইসমাঈল ইবনে মূসা, শরীক জাবির ইবনে আমির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اِصْطَلَحَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنْ لَا يَعْقِلُوْ عَبْدًا وَلَا عَمَدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا -

মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা কোন ক্রীতদাসকে, ইচ্ছামূলক হত্যাকারীকে, হত্যায় সন্ধি করা হলে এবং কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে আকিলা দিবেন না।

আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর বাবা, তাঁর দাদা থেকে কাতাদাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুদলেজী সংক্রান্ত ঘটনার প্রসঙ্গে—কাতাদাহ্ তার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন—বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তাঁর উপর এক শত উট ধার্য করেছিলেন এবং হত্যাকারী তা নিহতের ভাইদেরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তা থেকে কোন মীরাস বন্টন হয়নি। এই উটগুলো হত্যাকারীর। নিজের মাল থেকেই দেয়া হয়েছিল। কেননা এই হত্যা ছিল ইচ্ছামূলক। তা মূল হত্যার দরুনই ধার্য হয়েছে। তা করে হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামের মতের বিপরীত কাজ করেননি। হত্যা ছাড়া তার কম মানের অপরাধে কিসাস কার্যকর করা হয়নি।

হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِىْ عَمْدٍ وَانَّمَا عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ -

ইচ্ছামূলক হত্যায় আকিলার উপর আকিলা দেয়ার দায়িত্ব নেই, তা তাদের উপর বর্তায় শুধু ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে।

উরওয়া আরও বলেছেন ঃ

مَاكَانَ مِنْ صُلْحٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيْرَةُ اِلَّا اَنْ تَشَاءُ -

হত্যার ব্যাপারে যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি হয়, তখন গোত্রের লোকেরা তাতে আকিলা দেবে না। তবে তুমি চাইলে ভিন্ন কথা ....।

কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ

كُلُّ شَىْءٍ لَايُقَادُ مِنْهُ فَهُوَ فِىْ مَالِ الْجَانِىْ -

যেসব হত্যার প্রতিশোধ লওয়া যায় না, তাতে দীয়ত দিতে হবে হত্যাকারীর নিজের ধন-মাল থেকে।

ইমাম আবূ হানীফা হাম্মাদ, ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمَدًا وَلَا اعْتِرَافًا -

হত্যার মীমাংসায় সন্ধি হলে, ইচ্ছামূলক হত্যা হলে বা তাতে কোন অঙ্গীকার হলে গোত্রের লোকেরা আকিলা দেবে না।

আল্লাহর কথা ঃ

وَلَكُمْ فِىْ الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ -

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিসাস কার্যকর করায় জনগণের জীবন নিহিত রয়েছে। জীবনের স্থিতির কারণ বা মাধ্যমই হচ্ছে এই কিসাস। কেননা যে লোকই কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা করবে, তাকে এই হত্যা থেকে বিরত রাখবে এই জ্ঞান যে, এর বদলে তাকেও হত্যা করা হবে। আর স্বাধীন ও গোলাম, পুরুষ ও নারী এবং

মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে সাধারণত কিসাস কার্যকর হওয়াই কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তো সকলকেই বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী এবং ইচ্ছুক। কাজেই কিসাসের 'ইল্লাত' দুজন স্বাধীন মুসলমানের মাঝে পুরামাত্রায় মওজুদ রয়েছে যেমন তেমন এসব লোকের পরস্পরের মধ্যেও। তাই সকলের মধ্যেই আইনের পূর্ণ সমতা রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। আয়াতে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করায় এই সার্বিক সাম্য ও সমতার পরিপন্থী কিছুই হয়নি। কেননা এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে কারণে এই বিধানটি দেয়া হয়েছে তা বুদ্ধিমান লোক ছাড়া অন্যদের মধ্যেও বর্তমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেবল বুদ্ধিমান লোকদের সম্বোধন করার কারণ হচ্ছে, মূলত তারাই এই বিধানের গভীরে নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে, পারে এই বিধানকে কার্যকর করতে, এ থেকে উপকৃত হতে। যে ঘটনায় কিসাস কার্যকর হয় তা থেকে বিরত থাকার জন্যে বুদ্ধিমত্তা জাগ্রত থাকা আবশ্যক। যে নরহত্যার কারণে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার প্রতিরোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও অনুরূপ ঃ

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا –

হে নবী! আপনি ভয় প্রদর্শনকারী কেবল তার জন্যে, যে পরকালকে ভয় করে।

যদিও নবী করীম (স) সকল মানুষের জন্যেই ভয় প্রদর্শক, সাবধানকারী, তাঁর এই ভয় প্রদর্শন থেকে উপকৃত হতে পারে কেবল তারাই যারা পরকালের প্রতি ঈমানদার ও তাকে ভয় পায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ –

তিনি তো কঠিন আযাবের পূর্বেই তোমাদের জন্যে সাবধানকারী।

যেমন ঃ هدى للمتقين 'কুরআন মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েতকারী।'

কুরআন সকলের জন্যেই হেদায়েতকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে, একথা ঠিক; কিন্তু কুরআন থেকে হেদায়েত কার্যত পেতে পারে কেবল তারাই, যাদের মনে তাকওয়া রয়েছে। তাই অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ –

রমযান মাস, এই মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে সমগ্র মানুষের জন্যে হেদায়েত হিসেবে।

কুরআনের হেদায়েতে সমগ্র মানুষ শরীক।

আর একটি আয়াত ঃ

قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا – (مريم : ١٨)

মরিয়ম বলল, তুমি যদি সত্যিই কোন আল্লাহ্‌কে ভয়কারী ব্যক্তি হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যদিও 'তকী' তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় লয় ক্ষতিকর সব জিনিস থেকে বাঁচার জন্যে। কোন কোন বুদ্ধিমান লোক থেকে তাদের এই কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَتْلُ الْبَعْضِ اِحْيَاءُ الْجَمِيْعِ -

কতিপয় লোককে হত্যা সমগ্র মানুষের জীবনের নিরাপত্তা।

অপর লোকদের কথা ঃ اَلْقَتْلُ اَقَلُّ لِلْقَتْلِ 'হত্যা হত্যা হ্রাসকারী' বা اَكْثِرُوْا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ 'বেশি বেশি করে হত্যা কর, তাহলে হত্যা কম হয়ে যাবে।'

বস্তুত এ হচ্ছে সব বিবেক-বুদ্ধিমান লোকদের জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা। এসব কথার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথায় "وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ" 'কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।'

কিন্তু এই কথাসমূহ যখন পারস্পরিক তুলনা ও যাচাই করে দেখা হল, তখন এসব কথার মধ্যে بلاغت-এর দিক দিয়ে বিরাট দূরত্ব পাওয়া গেল। অর্থের সঠিকতার দিক দিয়েও যথার্থ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ পাওয়া গেল না। কয়েকটি দিক দিয়ে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ 'কিসাসেই জীবন' কথাটি 'কতককে হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা' ও 'হত্যা হত্যাকেই হ্রাস করে' কথার মতই এবং অভিন্ন তাৎপর্যবহ। এ সব বাক্যে শব্দ বা অক্ষর কম হলেও প্রয়োজনীয় তাৎপর্য পুরামাত্রায়ই তাতে রয়েছে যা না হলে কথা-ই হয় না। কিন্তু এসব কথায় তা নেই। কেননা এতে হত্যার উল্লেখ হয়েছে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে, সে জন্যে 'কিসাস' শব্দের উল্লেখ জরুরী। কুরআনে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। আর তাতেই জীবন নিহিত। কিন্তু বুদ্ধিমানদের 'কতকের হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা' 'হত্যা হত্যাকে হ্রাস করে', 'হত্যা হত্যা বন্ধ করে' ইত্যাদি কথাসমূহের তাৎপর্য যাচাই করলে তা যথার্থ মনে হয় না। কেননা সব হত্যাই যে হত্যা বন্ধ করে, সব হত্যায়ই যে হত্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সব হত্যায়ই যে জীবন নিহিত, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বরং অনেক হত্যা জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়। তাহলে তো তা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। তার যথার্থতা স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব এসব কথার তাৎপর্য অব্যবহৃত, অবাস্তবায়িত। এসব কথার প্রতিক্রিয়ায় এই প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠে যে, কোন হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে (যেমন আজকের দিনে প্রশ্ন উঠেছে ঃ কোন্ যুদ্ধ যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে পারে?) অতএব এসব কথা অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। তার কার্যকারিতা অ-স্বীকার্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন' এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। তার লক্ষ্য কার্যকর হওয়ার যোগ্য, তা বাস্তবতা ভিত্তিক। শব্দ যা বলে, তা-ই যথার্থ, তার ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, যদিও তাতে অক্ষর বা শব্দ বেশি নয়। বস্তুত فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ 'কিসাসে জীবন' তুলনামূলকভাবে খুব কম অক্ষর সম্পন্ন বাক্য—'কতকের হত্যা সকলের নিরাপত্তা' 'হত্যা হত্যা কমকারী' বা 'হত্যা হত্যা বন্ধ করে' ইত্যাদি কথার অপক্ষে।

অপর দিক দিয়ে আল্লাহ্ 'কিসাসে জীবন' কথাটির বুদ্ধিমান লোকদের কথা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ওদের কথায় শব্দের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। আল্লাহ্র কথায় তা নেই। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি অধিক উত্তম 'বালাগত'-এর দৃষ্টিতে, যা কুরআনের কথায় রয়েছে। একই কথা বিভিন্ন শব্দ দ্বারা একই বাক্যে বলা একই ধরনের শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা তা বলার তুলনায় অনেক সুন্দর ও উন্নতমান সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ্র কথা وَغَرَابِيبُ سُوْدٌ 'গাঢ় কৃষ্ণ'।

একই কথা দুটি শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু একই শব্দের বারবার ব্যবহার সঠিক কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ-এ তা নেই। অথচ তার তাৎপর্য ব্যাপক। তা হত্যাকারীর হত্যা বোঝায়। 'কিসাস' শব্দ শুনলেই এই অর্থ মনে জেগে উঠে যে, হত্যাকারীর হত্যাকাণ্ডের শরীয়াতী বিচারে প্রদত্ত দণ্ডই হচ্ছে 'কিসাস'। হত্যাকাণ্ড না ঘটলে 'কিসাস'-এর প্রশ্ন উঠে না। আর হত্যাকাণ্ড হলে একজন হত্যাকারী যেমন হয়, হয় একজন লোক নিহত এবং ঘটে হত্যার ঘটনা, যার শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী অবশ্য বিচার হতে হবে। কিন্তু ওদের কথায় একই 'হত্যা' শব্দের বারবার ব্যবহার রয়েছে। আরবী 'বালাগাত'-এর দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এভাবে যত বিবেচনা ও যাচাই করা হবে, কুরআনের ঘোষণাটি অত্যন্ত উন্নতমানের প্রমাণিত হবে। এটাই কুরআনের 'মুজিযা'। কোন মানুষের পক্ষে এই ধরনের বাক্য রচনা সম্ভব নয়, আল্লাহ্র কালামের অল্প কথায় যে বিরাট বিশাল বিস্তীর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়, তা উচ্চতর সাহিত্যিকদের রচিত কথায় কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

কিসাস-এর ধরন

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى –

হে ঈমানদারগণ তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে নরহত্যার ব্যাপারে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ – فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ –

এবং সকল প্রকারের যখমে সমান সমান বদলা নির্দিষ্ট। অতএব যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে তোমরাও তার উপর অনুরূপ কর, যেমন তোমাদের উপর করেছে।

বলেছেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ –

তোমরা যদি প্রতিশোধ লও-ই তাহলে প্রতিশোধ নাও ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের উপর জ্বালাতনের কাজ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে যেমন অপরাধ তেমন শাস্তিদান পুরামাত্রায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনটা অপরাধ, তার অধিক করার অধিকার কাউকে—তার অভিভাবককেও দেয়া হয়নি।

ফিকাহ্বিদগণ কিসাসের ধরন পর্যায়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, প্রথম হত্যা যেভাবেই হয়ে থাকুক, তার দণ্ডের হত্যা কেবলমাত্র তরবারির দ্বারাই হতে হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক-এর এই মত বলেছেন যে, যদি লাঠি বা পাথর কিংবা আগুন অথবা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে দণ্ডস্বরূপ অনুরূপভাবে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তাতে যদি না মরে তাহলে যে জাতীয় ঘটনার দ্বারা প্রথম হত্যা হয়েছে, সেই জাতীয় ঘটনা বারবার ঘটিয়ে হত্যাকারীকে মারতে হবে। তা যদি প্রথম হত্যাকারীর কাজের তুলনায় বেশি বা বাড়তি হয়ে যায়, তবুও।

ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, যেমন করে সে মেরেছে, আমরাও সেই ভাবেই অকে মারব। তার চাইতে বেশি কিছু করে মারব না। তবে সকলেই দেহ বিকৃতকরণকে অপসন্দ করেছেন। বলেছেন, তরবারিই এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে। সে যদি পানিতে ডুবিয়ে মেরে থাকে, তা হলে তাকে পানিতে ডুবিয়েই মারব, যেন তার মৃত্যুটা নিশ্চিত হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ

যদি পাথরের আঘাতে মেরে থাকে, তা হলে তাকে পাথর দিয়েই মারা হবে, তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা বা সরানো হবে না। এটা যেমনটার জন্যে তেমনটার ব্যবস্থা মাত্র। যদি খাদ্য পানীয় না দিয়ে আটকে রেখে মেরে থাকে, তাহলে তাকে সেই ভাবেই বন্দী করে রাখা হবে। অনুরূপ সময়ের মধ্যে যে যদি না মরে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে ঠিক ঠিক অনুরূপ দণ্ড দেয়ার কথা বলা হয়েছে কোনরূপ অতিরিক্ত কাজ ছাড়া-ই, তাই নিহতের অভিভাবকের পক্ষে আপরাধীর কাজের অধিক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যখনই উক্ত মত অনুযায়ী আগুনে জ্বালানো হবে, পানিতে ডুবানো হবে, পাথর বর্ষণ করা হবে, আটকে রাখা হবে, তখন তাতে প্রথম হত্যাকারী যা করেছে তার চাইতে অতিরিক্ত করার আশংকা থাকে। কেননা অনুরূপ কাজে সে না মরলে, তাকে শেষ পর্যন্ত তরবারী দ্বারা হত্যা করতেই হবে। সমজাতীয় কাজ অতিরিক্তও হয়ে যেতে পারে। তাতে সীমালঙ্ঘনের অপরাধ হয়ে যেতে পারে। অথচ আল্লাহ্ তা করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

এই কিসাসের ব্যবস্থা দেয়ার পরও যদি কেউ সীমালঙ্ঘমূলক কাজ করে, তা হলে তার জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

কেননা সীমালঙ্ঘন কিসাস-এর বিধান অতিক্রম করে যাওয়া। কিসাস হচ্ছে, যেমন করা হয়েছে ঠিক তেমন করা। তা করা সম্ভব হোক কি কঠিন হোক, উভয়ই সমান। তাকে যদি হত্যার ওই প্রদত্ত পন্থায় হত্যা করা হয়, তা হলে কিসাসটা প্রাণ সংহারের পর্যায়ে গণ্য হবে, প্রদত্ত পন্থার সীমালঙ্ঘন করা হবে না তাতে। ইমাম মালিক পূর্বকৃত কাজটি বারবার করেও মারতে হলে তাই করতে হবে বলে যা বলেছেন, তাতে প্রথম হত্যাকারীর কাজের অতিরিক্ত করার আশংকা নিহিত এবং তাতে ঠিক কিসাস-এর তৎপর্য বিনষ্ট হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর কথা ঃ 'যা করা হয়েছে তাই করা হবে।' তাতেই প্রতিশোধটা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ হয়ে যাবে। তার পরেও তাকে তরবারির দ্বারা হত্যা করা—এটাও সীমালঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ি—কিসাস-এর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হবে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

যে লোক আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, সে তো নিজের উপর নিজেই জুলুম করল।

যদিও কিসাস-এর মূল তাৎপর্য হল প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার, প্রথম করা কাজের পরিমাণ অতিক্রম না করেই। এই কথাই তো বলা হয়েছে। তা হলে কিসাস ফরয হওয়ার কারণ সেই দিক দিয়ে—যেদিক দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা আয়াতেরও বিরোধিতা করেছে কিসাস-এর সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে—তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা সেভাবে যে-ই কাজ করবে, সে-ই সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ এই সীমালঙ্ঘনকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তিনি তো বলে দিয়েছে ঃ তোমরা প্রতিশোধ নিলে ঠিক যেভাবে তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, ততটুকু কষ্টই তোমরা দেবে। যতটা যখম করা হয়েছে তার তুলনায় বেশি যখম করা বা যা করা হয়েছে তার চাইতে বেশি করা এ আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আয়াত থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যা করা হয়েছে তা-ই করা, তার চাইতে এক বিন্দু বেশি না করা সকলেরই এই মত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই যদি কেউ কোন ব্যক্তির হাত বাহু পর্যন্ত কেটে ফেলে, তা হলে তার কিসাস লওয়া যায় না। কেননা ঠিক ততটুকু কেটে হক আদায় করা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত হতে পারে না। যদি বহু চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করে ঠিক সেই স্থানে চাকু রাখা যেখানে প্রথম কর্তনকারী রেখেছিল, যদি সম্ভব হয়ও, তবুও। এতে ইজতিহাদের যদি কোন ভূমিকা না থাকে, তা হলে কিসাস কি করে জায়েয হবে, যাতে আমরা নিশ্চিত জানতে পারব যে, সে তার পাওনা হক্-এর বেশি আদায় করেছে, তার অপরাধ পরিমাণের চাইতে বেশি অপরাধ করেছে ?

তবে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, অভিভাবকের পক্ষে হত্যাকারীকে হত্যা করা তো জায়েয; কিন্তু তাকে জ্বালিয়ে মারা বা ডুবিয়ে মারা জায়েয হতে পারে না। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, আয়াতের বক্তব্যও তাই। তরবারির দ্বারা হত্যাই যদি লক্ষ্য হয়, তা হলে প্রমাণিত হল যে, হত্যার বহু দিক ও উপায়-পন্থার মধ্যে এটাই অধিক সহজ পন্থা। আর সেটাই বক্তব্য হলে জ্বালিয়ে, ডুবিয়ে, পাথর মেরে বা অনুরূপ কোন কাজ দ্বারা মারা নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা হত্যাকারিকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা যখন সহজতর পন্থা, তখন অন্য কোন ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি বলা হয়, 'কিসাস'-এ অনুরূপ বা সমান সমান হতে পারে তরবারির দ্বারা হত্যা করা হলে। কিংবা যেমন করেছিল, তেমনটা করা হলে। তাতে না মরলে তরবারির দ্বারা হত্যা করা তার জন্যে জায়েয। তার জন্যে এটাও জায়েয যে, শুরুতেই—অন্য কিছু না করে—তরবারির দ্বারাই হত্যা কার্য সম্পাদন করবে। তাতে হয়ত সে তার হক্-এর কিছু অংশ ছেড়ে দেবে। আর তা করা তার জন্যে জায়েয।

জবাবে বলা যাবে, তরবারির দ্বারা হত্যা করা হলে তার প্রতি পাথর বর্ষণ বা তাকে জ্বালানোর অধিকারী সে হতে পারে না। কেননা তা 'কিসাস'-এর পবিত্র ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ—সমান কাজ করা হয় না। আর আল্লাহ্ তো কিসাস-এর বিধান দিয়েছেন, অন্য কিছু করার নয়। অতএব আয়াতের এমন অর্থ করা উচিত নয়, যা শব্দে নিহিত ভাবধারার পরিপন্থী। পাথর নিক্ষেপণ, জ্বালানো, ডুবানো বা তীর নিক্ষেপ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ মাত্রার কিসাস সম্ভব হয় না। কেননা কিসাস হচ্ছে সমপরিমাণ সমমাত্রায় আদায় করা। পাথর মারার কোন সীমা তো নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত নেই। ফলে তার দ্বারা হত্যাকারীর পাথর নিক্ষেপণ পরিমাণের সাথে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তীর নিক্ষেপ ও জ্বালিয়ে মারার ব্যাপারটিও তাই। তা কখনই কিসাস-এর লক্ষ্য হতে পারে না। তাই সহজতর পন্থায় প্রাণ সংহার-ই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নবী করীম (স) এর একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। সে হাদীসে স্থানান্তরকরণ বা নির্বাসন কিংবা বল্লমের পেটের অভ্যন্তর ভেদী আঘাত দ্বারা কিসাস হয় না—বলা হয়েছে। কেননা কৃত অপরাধের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ পুরামাত্রায় আদায় হওয়া কঠিন। তীর নিক্ষেপ করে বা প্রস্তর বর্ষণের দ্বারা কিসাস হয়, তা বলা যায় না। কেননা প্রথম ব্যক্তি যেভাবে কষ্ট দিয়েছে, যে কাজ দ্বারা প্রাণ সংহার করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে করা এ সবের দ্বারা সম্ভব হয় না।

যদি বলা হয়, ঠিক অনুরূপ কাজ কেবল দুভাগে সম্ভব, কিসাস-ও তাই। একটি হত্যাকারীর প্রাণ সংহার, যেমন সে প্রাণ সংহার করেছে। এতে কিসাস কার্যকর হবে। আর এক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হচ্ছে প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার। আর দ্বিতীয়, হত্যাকারীর সাথে ঠিক তেমনই করা, যেমন সে করেছে। শব্দের দাবি এ ক্ষেত্রে দুটিতেই ব্যবহৃত হয়। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে তারই দাবি করে। তখন আমরা বলব, আমরা তার সাথে তেমনই করব, যেমন সে করেছে। তাতে যদি সে মরে যায়, তো ভালো-ই। অন্যথায় অনুরূপ কাজ পূর্ণ মাত্রায় করা হবে প্রাণ সংহার করে।

জবাবে বলা যাবে, অনুরূপ ও কিসাস-এর অর্থ এই দুটি কাজই এক সঙ্গে হতে পারে না। সে নিহতের সাথে যা করেছে, তার সাথে তেমন করা, তার পরে তাকে হত্যা করা—এটা হয় না। যদিও আলাদা আলাদা ভাবে দুটিকে একত্রিত না করে উভয় অর্থের প্রত্যেকটি হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। কেননা এই নামটাই তা শামিল করে, তা আয়াতের আদেশেরও পরিপন্থী নয়। কিন্তু উভয়টিকে একত্রিত করা হলে একত্রিতভাবে তা লক্ষ্য হতে পারে না। কেননা তা কিসাস ও অনুরূপ কাজের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বরং তার চাইতে অতিরিক্ত করা হয়। কিন্তু আয়াতটির এমন অর্থ করা যা তার মূল প্রতিপাদ্যের পরিপন্থী এবং তার লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দেয়, তা জায়েয নয়। এই কারণে প্যাথর নিক্ষেপকরণ, ডুবানো, বন্দী করে অভুক্ত রাখা ইত্যাদি করার পর তাকে তরবারির দ্বারা হত্যা করার সংকল্প করাই নিষিদ্ধ।

সুফিয়ান সওরী জাবির-আবূ আযিব নুমান ইবনে বশীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

الاَقَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ –

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কেবলমাত্র তরবারির দ্বারাই করতে হবে।

এই হাদীসটি দুটি অর্থ পরিব্যাপ্ত। একটি—কিসাস ও অনুরূপ কাজের উল্লেখে আয়াতটির আসল বক্তব্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা। আর দ্বিতীয়—সাধারণ তাৎপর্যের সূচনার দ্বারা অন্য কিছু করে প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ। এই হাদীসটিও তা-ই বোঝায়, যা ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা যুবায়র জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لايُسْتَقَادُ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى تَبْرَءَ –

যখমের প্রতিশোধ সে যখম ভালো হওয়ার আগে নেয়া যাবে না।

এ হাদীসটি আমাদের বিপরীত মতটি অস্বীকার করে এভাবে যে, অপরাধীর সাথে যে যেমনটা করেছে তা করাই যদি কর্তব্য হয়, তা হলে তাকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। যদি বাদ দেয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে যখম কি অবস্থায় পরিণত হয়, যখম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তারই দৃষ্টিতে নিতে হবে।

যদি বলা হয়, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না, তা হলে তার জবাবে বলা হবে ঃ

এটা জাহিল লোকদের কথা। তাদের এ 'জরহ' ও 'তা'দীল'[১] লক্ষযোগ্য নয়। আর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ফিকাহবিদদের এটা নিয়ম নয়। তাছাড়া প্রখ্যাত

১. জরহ তা'দীল جرح وتعديل হাদীস বিজ্ঞানের একটি বিশেষ পরিভাষা। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বের করার জন্যে তার সনদের যাচাই করা—বর্ণনাকারীদের চরিত্র, স্মরণ শক্তি ও ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে বোঝায়।

হাদীস সনদবিদ আলী ইবনুল মদীনী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, জুহরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা আমার নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি।

খালিদুল হাযযা আবূ কালাবাতা, আবূল আসয়াস, শাদ্দাদ ইবনে আউস সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা-ও এই কথাই প্রমাণ করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِ حْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ -

আল্লাহ্ তা'আলা সব জিনিসের উপরই ইহসান—দয়া করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন (দণ্ড হিসেবে) হত্যা করবে, তখন এই হত্যাকার্যটি দয়া সহকারে ও উত্তমভাবে সম্পন্ন করবে। আর যখন পশু যবেহ্ করবে তখনও দয়া সহকারে ও উত্তমভাবে এই যবেহ্ কার্যটি সম্পন্ন করবে।

এ হাদীসের সাধারণ ও নির্বিশেষ বক্তব্যের দাবি হচ্ছে, যে লোক অন্য কাউকে হত্যার দণ্ড হিসেবে হত্যা করবে, সে যেন হত্যা করার সর্বোত্তম পন্থায় হত্যা করে। সেই পন্থায় হত্যা করে যা অধিক সহজ, কম কষ্টদায়ক। এতে তাকে আযাব দিয়ে মারা, তাকে বিকৃত করা (হাত-পা-কান-নাক কাটা, চক্ষু উৎপাটিত করা ইত্যাদি) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও এই কথা-ই বলে। তা হল, তিনি প্রাণীদেহের কোন অংশকে লক্ষ্য বানিয়ে সেই স্থানে তীর মেরে মেরে তাকে হত্যা করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

বর্ণিত হয়েছে, কসম ইবনে মায়ান শরীফ ইবনে আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে কোন সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—যে ব্যক্তি তীর মেরে মেরে এক ব্যক্তিকে হত্যা করল, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি করতে বল ? বললেন—তাকেও তীর মেরে মেরেই হত্যা করতে হবে। বললেন—প্রথম তীর নিক্ষেপে যদি সে না মরে ? বললেন, তা হলে দ্বিতীয় বারও মারা হবে। বললেন, তুমি কি তাকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে বল ? অথচ নবী করীম (স) কোন প্রাণীকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। শরীফ বললেন, সে মরছে না তো! তখন কসম বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্, এ এমন একটি ক্ষেত্র, এতে আমরা যদি পরস্পর প্রতিযোগিতা করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন প্রমুখ বর্ণিত হাদীস-ও এ কথাই প্রমাণ করে। তিনি লাশ বিকৃত করণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম (স) আমাদের সামনে যে ভাষণই দিয়েছেন, তাতে আমাদেরকে সাদ্কা করতে আদেশ করেছেন এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ্ ও প্রমাণিত। ফিকাহবিদগণ এ হাদীসটি কবুল করেছেন। এ হাদীসটির ভিত্তিতে মাসআলার

রায় দিয়েছেন। আর তার ফলে হত্যাকারীকে বিকৃত অবয়বে পরিণত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সেই সাথে এ হাদীসটি দ্বৈতভাবে কিসাস ও অনুরূপ হক আদায় পূর্ণ করাকেও ওয়াজিব করে দিয়েছে। তাই কিসাস অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে; কিন্তু দেহ বিকৃতকরণ চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আয়াতটির তাৎপর্য এমনভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে, যার ফলে তা হাদীসের তাৎপর্যের পরিপন্থী হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (স) عرنيين দের দেহ বিকৃত করিয়েছিলেন, তাদের হাতসমূহ ও পা সমূহ কেটে দেয়া হয়েছিল। তাদের চক্ষুগুলোও উৎপাটিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সূর্যতাপে ফেলে রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সকলে মরে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে চক্ষু উৎপাটন নিষিদ্ধ হয়ে যায়, নিষিদ্ধ হয়ে যায় বিকৃতকরণও। এ প্রেক্ষিতে কিসাসের আয়াতের অর্থ হবে হত্যাকারীকে এমনভাবে হত্যা করা, যাতে তার দেহ-মুখাবয়ব বিকৃত করা হবে না।

আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি হুমাম, কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণিত। তাতে বলা হয়েছে, একজন ইয়াহুদী একটি বালকের মাথা দুখানি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দিয়েছিল। নবী করীম (স) তার মাথাটিও দুটি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দেয়ার আদেশ করেছিলেন।

এ হাদীসটি যদি সহীহ ও প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তা মনসূখ হয়ে গেছে দেহ বিকৃতকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তা এজন্যে যে, বিকৃতকরণ সকলের নিকট নিষিদ্ধ। হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের এই পন্থার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। আর নবী করীম (স) থেকে কোন বিষয় দুটি হাদীস বর্ণিত হলেও জনগণ তার একটিকে গ্রহণ করলে এবং অপরটি গ্রহণে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে সর্বজনগৃহীত হাদীসটিই অপরটির উপর—যেটি সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে—বিচারকারী হবে। তা বিশেষ হোক, কি সাধারণ। তা সত্ত্বেও ইয়াহুদীকে 'হদ্দ' হিসেবেই হত্যা করা হয়েছে, এটা খুবই সঙ্গত। যেমন শুবা হিশাম ইবনে জায়দ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের উপর বাড়াবাড়ি করে। লোকেরা তাকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, মেয়েটির উপর বলাৎকারের সব চিহ্ন প্রকট ছিল। সে মেয়েটির মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, পরে মেয়েটির পরিবারের লোকে তাকে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নিয়ে এল। তখন তার মুমূর্ষ অবস্থা। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে কে মেরেছে, অমুকে কি ? মেয়েটি মাথা নেড়ে প্রথমে বলল, না। পরে নবী করীম (স) বললেন, অমুক ইয়াহুদী ? বলল, হ্যাঁ, তখন নবী করীম (স)-এর আদেশক্রমে ইয়াহুদীর মাথা দুটি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দেয়া হয়।

তাহলে বোঝা গেল, এটা ছিল 'হদ্দ'। কেননা ইয়াহুদীটি মাল নিয়েছিল, হত্যাও করেছিল।

পূর্বে এই বিকৃতকরণ জায়েয ছিল, যেমন عرنيين দের চক্ষু উৎপাটিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বিকৃতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইবনে জুরাইজ মামর আইয়ূব আবূ কালাবা আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ইয়াহুদী ব্যক্তি একটি মেয়ের মস্তক চূর্ণ করে দিয়েছিল, তার অঙ্গে ছিল অলংকার। নবী করীম (স) তাকে পাথর মেরে মেরে রজম করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ হাদীসে 'রজম' করার কথা বলা হয়েছে। অথচ 'রজম' কিসাস নয়, এটা সর্বসম্মত মত। এ-ও হতে পারে যে, ইয়াহুদী ব্যক্তিটি চুক্তি ভঙ্গ করে দারুল হরব-এ চলে গিয়েছিল। ইয়াহুদীর অবস্থার স্থান থেকে তা নিকটেই অবস্থিত ছিল। তখনকার সময়ে 'দারুল হরব' মদীনা থেকে খুব একটা দূরেও ছিল না। পরে তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তাকে যুধ্যমান حربى ও চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। সে অভিযুক্ত ছিল এক বালিকাকে হত্যা করার জন্যে। অন্যথায় একটি বালিকার ইঙ্গিতে এবং সে তাকে হত্যা করেছে—এই ইশারা পেয়েই তো তাকে হত্যা করা যেতে পারে না। কেননা কারোর উপর হত্যার অভিযোগ হওয়া মাত্রই তো আর তাকে হত্যা করা যায় না। এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাই মনে করতে হবে, তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়ার মূলে অন্য একটি বড় কারণ অবশ্যই ছিল। আর সেই কারণে সে হত্যা দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। যদিও হাদীসের বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেন নি।

আমরা যে বলেছি, কিসাস-এর লক্ষ্য হচ্ছে যে-কোন সহজ পন্থায় প্রাণ সংহার, এবং তা তরবারির দ্বারা হত্যা, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যদি কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে মদ্য দিয়ে মারা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অনুরূপভাবে মদ্য পারিশ্রমিক হিসেবে দিয়ে তরবারির দ্বারা হত্যা করানো জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, মদ্যপান তো গুনাহ, তাহলে বলা হবে, হ্যাঁ, দেহবিকৃতকরণও অনুরূপ গুনাহ বটে।

অসিয়ত ওয়াজিব—এই পর্যায়ে আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ -

তোমাদের মধ্যে কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করাকে তোমাদের প্রতি ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের জন্যে তা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।

আবূ বকর বলেছেন, আগের দিকের ফিকাহবিদদের থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে দেখা যায়, আয়াতের خير শব্দের অর্থ হচ্ছে ধন-মাল। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে এই ধন-সম্পদের কত পরিমাণ হলে তাতে অসিয়াত করা ফরয, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেননা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ -এর অর্থ তোমাদের প্রতি

ফরয করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ -এর অর্থ, 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে।' যেমন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের প্রতি সময় ভিত্তিক ফরয।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু আজহাহু (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর এক আযাদ করা ব্যক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার ঘরে গেলেন। তখন তার মালিকানায় সাতশ কি ছয়শ দিরহাম নগদ মুদ্রা ছিল। সে বলল ঃ আমি অসিয়ত করব না। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ না। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا যদি বিপুল রেখে যেতে থাকে। আর তোমার এই ছয়শ' কি সাতশ' দিরহাম কোন বিপুল বিরাট সম্পদ নয়। হযরত আলী (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

أَرْبَعَةُ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ وَمَا دُوْنَهَا نَفْقَةٌ -

চার হাজার দিরহাম হলে অসিয়ত, তার কম হলে তা তো দৈনন্দিন খরচের সম্পদ মাত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছে ঃ لاَوَصِيَّةَ فِىْ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمْ 'আটশ দিরহামে কোন অসিয়ত নেই। হযরত আয়েশা (রা) অসিয়ত করতে ইচ্ছুক এক মহিলাকে বলেছিলেন, 'না, তুমি অসিয়ত করবে না। লোকেরা বলেছে, সে মহিলার সন্তানাদি ছিল। আর তার মাল ছিল খুবই সামান্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার সন্তান কয়টি ? বলল, চারটি। বললেন, তার মাল কত ? বলল, তিন হাজার। যেন সে তাদের নিকট স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ মাল তো ভাল পরিমাণের। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, সম্পদের পরিমাণ হাজার দিরহাম থেকে কমের দিকে পাঁচশ দিরহাম হলে অসিয়ত করা যাবে।

হুম্মাম কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যদি মাল রেখে থাকে' বলতে হাজার দিরহাম ও তদুর্ধ্ব পরিমাণ মনে করা হয়েছে। জুহরী বলেছেন, পরিমাণ কম হোক, কি বেশি—যাকেই মাল বা সম্পদ বলে অভিহিত করা যাবে, তাতেই অসিয়ত ফরয। এই সব ফিকাহবিদ মালের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন মুস্তাহাব হিসেবে। এই পরিমাণ মাল হলে অসিয়ত অবশ্যই কর্তব্য হবে, এ হিসেবে নয়। আর তাও তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে বলেছেন যে, এই পরিমাণের মাল হলে অসিয়ত করা যায়। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, যদি কেউ একটি দিরহাম রেখে যেতে থাকে, তাহলে বলা যাবে না যে, সে خير (বিপুল মাল) রেখে যাচ্ছে। বস্তুত এই নামটি সাধারণ প্রচলনের উপর নির্ভরশীল, আর এ ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদের পন্থায়ই সম্ভব। আর অধিক মাত্রার ধারণাই সেখানে কাজ করবে। একথা জানা সহকারে যে, কম বা সামান্য পরিমাণের মালকে এই নামে خير অভিহিত করা যায় না। মালের পরিমাণ বেশি ও বিপুল হলেই এই নাম দেয়া যায়। তাই خير পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদ ও বেশির ধারণার

মাধ্যমেই করা সম্ভব। সেই সাথে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতকেও সামনে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন ঃ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ। এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশই অনেক। বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ -

তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের পরমুখাপেক্ষী রেখে যাবে, তা এ অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক ভালো যে তারা হবে শূন্য হাত, লোকদের পথ আগলে ভিক্ষা চাইবে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতের যে অসিয়তের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে এদিকে দিয়ে যে, তা ফরয, কি ফরয নয়। কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, তা ফরয বা ওয়াজিব ছিল না, ছিল মুস্তাহাব। তার পথটা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। অন্যরা বলেছেন, পূর্বে তা ফরয ছিল, পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে। তবে মনসূখ হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। যারা বলেছেন, তা ফরয বা ওয়াজিব ছিল না, মুস্তাহাব ছিল, তারা দলীল হিসেবে বলেছেন, আয়াতটির পূর্বাপর প্রেক্ষিত ও কথার ধরনে এমন কিছু আছে যা প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব বা ফরয নয়। তা হচ্ছে 'অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্যে' ন্যায়নীতি অনুযায়ী কথাটি। এতে যখন بالمعروف 'ন্যায়নীতি অনুযায়ী' এবং তা 'মুত্তাকীদের জন্যে' বলা হয়েছে, তখন বুঝতেই হবে যে, তা ফরয বা ওয়াজিব নয়। তার তিনটি কারণ। একটি হল بالمعروف 'ন্যায়নীতি অনুযায়ী' কথাটি ফরয বা ওয়াজিব নয়, প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয়, 'তা মুত্তাকী লোকদের জন্যে'—কেবল মুত্তাকীদের জন্যে এই কথা। আর সব মানুষই যে মুত্তাকী হবে, এমন কোন কথা নেই। তৃতীয়—এ কাজটি বিশেষভাবে মুত্তাকী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে ওয়াজিব বা ফরয কখনও মুত্তাকী ও মুত্তাকী নয় এমনভাবে লোকদের মধ্যে পার্থক্য সহকারে বিধিবদ্ধ করা হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই মতে যে অসিয়ত ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, মূলত তার কোন অকাট্য প্রমাণ আয়াতে নেই। কেননা معروف বা প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী বলায় তার ওয়াজিব হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়নি। কেননা لمعروف অর্থ, সুবিচার ও ন্যায়পরতা। এতে কোন মাত্রাতিরিক্ততা নেই, নেই মাত্রাভাব। যেমন আল্লাহ্‌র কথাঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

যার সন্তান, সেই পিতার দায়িত্ব হচ্ছে প্রসূতি ও প্রসূতের রিযিক ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করা প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী।

এখানে এই রিযিক ও পরিধেয় পরিবেশনের ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। আল্লাহ্র কথা وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'এবং স্ত্রীদের সাথে ন্যায়নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন কর।' এখানেও এই আদেশ পালন ওয়াজিব। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

এবং আদেশ কর প্রচলিত ন্যায়-নীতি ইনসাফের এবং নিষিদ্ধ ও শরীয়াত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখ।

বলেছেন ঃ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ 'তারা ন্যায়-নীতি ইনসাফের আদেশ করে'। এসব আয়াতে اَلْمَعْرُوْفِ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই সব কাজে, যা আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন। অসিয়তও এই পর্যায়েরই একটি। তার আয়াতে اَلْمَعْرُوْفِ ব্যবহৃত হওয়ায় তার ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। বরং তা ওয়াজিব, এই কথারই তাগিদ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র সব আদেশ-ই তো منكر-معروف বা অপসন্দনীয় বা খারাপ কিছু নয়। এ-ও জানা আছে যে, معروف-এর বিপরীতটাই হচ্ছে منكر যা معروف নয়, তা-ই منكر – منكر নিন্দিত, তা করা নিষিদ্ধ। অতএব যা معروف তা-ই ওয়াজি। আর আল্লাহ্র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকী লোকদের হক।' একথা বলে তা ওয়াজিব করা হয়েছে, তার উপরই তাগিদ করা হয়েছে। কেননা লোকদের তো মুত্তাকী হওয়াই উচিত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর।

মুসলমানরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত—কোনই দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্র তাকওয়া গ্রহণ ফরয। আর অসিয়ত কার্যকর করার জন্যে তাকওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এজন্যে আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য তাকে মুত্তাকীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু তার ওয়াজিব হওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা তার ওয়াজিব হওয়াটা অন্তত মুত্তাকী লোকদের দ্বারা তো অবশ্যই কার্যকর হবে। সে জন্যে তা অ-মুত্তাকীদের জন্যে ওয়াজিব নয়, তা তো বলা যায় না। যেমন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বললে অ-মুত্তাকীদের জন্যে তা হেদায়েতকারী নয়, এমন কথা বলার কোন যুক্তি নেই। বরং আয়াত অনুযায়ী মুত্তাকী লোকদের জন্যে তো অবশ্যই ওয়াজিব হবে। আর সেই দাবিতে অ-মুত্তাকীদের জন্যেও তা ওয়াজিব। তবে উল্লেখে মুত্তাকীদের বিশেষীকরণের ফায়দা হচ্ছে, একথা বোঝানো যে, এই কাজটি আল্লাহ্র তাকওয়া পর্যায়ের কাজ। আল্লাহ্র তাকওয়া থাকলে পরেই তা করা সম্ভব। আর সেই সাথে লোকদের কর্তব্য হচ্ছে মুত্তাকী হওয়া। তা হলেই সব মানুষের পক্ষে তা কার্যকর করা সম্ভব হবে।

অসিয়তের আয়াত বাহ্যতই অসিয়তকে ওয়াজিব করেছে। তা যে ফরয, এর উপর তাগিদও রয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর লিখে দেয়া হয়েছে, এর অর্থ, ফরয করা হয়েছে। পূর্বে একথা বলে এসেছি। এই কথারই তাগিদ করা হয়েছে ঃ

بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ –

ন্যায়নীতি অনুযায়ী মুত্তাকী লোকদের হক।

একথায় ওয়াজিব প্রমাণিত হয় অত্যন্ত তাগিদ সহকারে। যেমন লোকেরা বলে ঃ هٰذَا حَقٌّ عَلَيْكَ এটা তোমাদের প্রতি হক, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া পোষণকারী লোকদের কথা বিশেভাবে বলে এই হুকুমকে অধিকতর তাগিদপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ কথা পূর্বে আমরা বলেছি। সেই সাথে আগের কালের তাফসীর লেখকরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, অসিয়ত এই আয়াত দ্বারা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসও প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে সুলায়মান ইবনুল ফযল ইবনে জিবরীল, আবদুল্লাহ ইবনে আইয়ূব, আবদুল ওয়াহাব নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يَبِيْتُ ثَلَاثًا اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ –

কোন মুমিন ব্যক্তির তিন রাত্রি সময় অসিয়ত না লিখে অতিবাহিত করা হালাল নয়।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা আল হুমাইদী, সুফিয়ান আইয়ূব নাফে' ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاحَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوْصِىْ فِيْهِ تَمُرُّ عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ

যে মুমিন ব্যক্তির মাল আছে, তার লিখিত অসিয়ত নিজের নিকট লিখিত না রেখে দুটি রাত অতিবাহিত করার কোন হক নেই।

এই হাদীসটি হিশাম ইবনুল গাজী নাফে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَايَنْبَغِىْ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ –

মুসলিম ব্যক্তির নিজের নিকট লিখিত অসিয়ত না রেখে দুই রাতও যাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল। আর যাঁরা তা ওয়াজিব মনে করেন, তাঁরা আবার শুরুতেই তা ওয়াজিব ছিল কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ

করেছেন। তাঁদের কিছু লোক বলেছেন, এই আয়াতে অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার যেসব কথাবার্তা রয়েছে, তা পরে মনসূখ হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) একজন। আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-ওয়াসেতী, আবূল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান আল মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দুল কাসিম ইবনে সালাম, হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

মাল-সম্পদ রেখে যেতে থাকলে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা কর্তব্য।

আয়াতটিকে মনসূখ করেছে এ আয়াত ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا -

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে সেই সম্পদ-সম্পত্তি থেকে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং মেয়েদের জন্যে অংশ রয়েছে সেই সম্পদ সম্পত্তি থেকে যা তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়া রেখে গেছে, তা কম হোক কি বেশি এবং সে অংশ সুনির্দিষ্ট।

ইবনে জুরাইজ ইকরামা থেকে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا। 'যদি ধন-সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে' এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যারা মীরাস পাবে তাদের বেলায় অসিয়ত সম্পর্কিত এ আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু মীরাসী আইন অনুযায়ী যারা মীরাস পাবে না, তাদের বেলায় অসিয়তের আয়াত মনসূখ হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে এই বলে যে, তা সবই—সবার বেলায়ই মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু অপর একটি বর্ণনায় যারা আদৌ মীরাস পায় না তাদের বেলায় নয়, যারা নিকটাত্মীয়দের থেকে মীরাস পায় তাদের বেলায় তা মনসূখ হয়ে গেছে।

আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আবূল ফযল আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, আবূ মাহদী আবুদুল্লাহ ইবনুল মুবারক উমারাতা আবূ আবদুর রহমান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অসিয়তের আয়াত সম্পর্কে ইকরামাকে আমি বলতে শুনেছি نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ ফরায়েযের আয়াত সে আয়াতটিকে মনসূখ করেছে।

ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মীরাস ছিল সন্তানদের জন্যে। আর অসিয়ত ছিল পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে।

অপর কিছু লোক বলেছেন, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। পরে ওয়ারিসদের জন্যে তা মনসূখ হয়ে গেছে এবং তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে, যারা ওয়ারিস হয় না। হাদীসটি ইউনুস ও আশয়াস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান জাবির ইবনে যায়দ ও আবদুল মালিক ইবনে ইয়ালী থেকে বর্ণিত হয়েছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে অ-নিকটাত্মীয়ের জন্যে অসিয়ত করেছে। অথচ তার এমন নিকটাত্মীয় রয়েছে যারা তার মীরাস পায়নি। তারা বলেছেন, দুই-তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ নিকটাত্মীয়ের জন্যে এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে সে পাবে।

তায়ূস বলেছেন, সমস্ত সম্পত্তি নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রত্যাবর্তিত হবে। দহাক বলেছেন, নিকটাত্মীয়ের জন্যে কোন অসিয়ত নেই। তবে মৃতের কোন নিকটাত্মীয় না থাকলে ভিন্ন কথা।

অপর কতিপয় লোক বলেছেন, অসিয়ত মোটামুটিভাবে নিকটাত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তাদের সকলের জন্যে অসিয়ত করা অসিয়তকারীর কর্তব্য ছিল না। বরং তাদের মধ্যেই অসিয়ত সীমাবদ্ধ কর্তব্য ছিল। তা হলে তা দূরবর্তীদের জন্যে ওয়াজিব ছিল না। পরে নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা মনসূখ হয়ে যায়। অতপর তা অবশিষ্ট থেকে যায় দূরবর্তীদের জন্যে। তবে তাদের জন্যে অসিয়ত করা জায়েয মনে করতেন আর তা না করলেও কোন কথা নেই।

যাঁরা বলেছেন, অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে, তারা কোন্ আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাস ও ইকরামার মত উদ্ধৃত করেছি। তাঁদের মতে মীরাসের আয়াতই তা মনসূখ করেছে। অন্যরা বলেছেন, তাতে মনসূখ করেছে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই' এই হাদীস। হাদীসটি শহর ইবনে হাওশব, আবদুর রহমান ইবনে উসমান, আমর ইবনে খারেজাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ উত্তরাধিকার যে পাচ্ছে, তার জন্যে অসিয়ত নেই।

আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা—তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ لَايَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত জায়েয নেই'। ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ শারাহবীল ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ আমামাতাকে বলতে শুনেছি, বলছিলেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর এক ভাষণে বিদায় হজ্জের দিনে বলছিলেন ঃ

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

জেনে রাখো! আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিত ও নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেককে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত নেই।

হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَجُوْزَلِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ اِلَّا اَنْ يُّجِيْزُهَا الْوَرَثَةُ -

কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত জায়েয হবে না। তবে অন্যান্য ওয়ারিসরা যদি তার অনুমতি দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সাহাবীগণের এক জামাআতের নিকট থেকেও এই বর্ণনা পাওয়া গেছে। তা বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ আবূ ইসহাক হারিস আলী সূত্রে। তিনি বলেছেন ঃ 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত হতে পারে না। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত জায়েয নয়। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে এই সব হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে গণ্য হয়। কেননা তা মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বিপুলভাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বিশেষ করে ফিকাহবিদগণ তা সম্যকভাবে কবুল করেছেন ও কাজে ব্যবহার করেছেন। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হতে পারে বলে আমরা মত পোষণ করি। কেননা প্রকৃত পক্ষেই নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যম ও উৎস এবং তদানুযায়ী আমল করা আবশ্যক। তবে আল্লাহ মীরাস তার ওয়ারিসগণের জন্যে অবশ্য প্রাপ্য বানিয়েছেন; তার দরুন কিন্তু অসিয়ত মনসূখ হয়ে যায়নি। কেননা অসিয়ত ও মীরাসী আইন উভয়ই একসাথে কার্যকর হতে পারে। লক্ষ্য করা যায়, নবী করীম (স) ওয়ারিসের জন্যেও অসিয়ত জায়েয় বলেছেন যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ তা করার অনুমতি দেয়। তাহলে মীরাস বণ্টনের সাথে সাথে অসিয়তও কার্যকর হতে পারে। তার জন্যে যে মীরাসের অংশ পাচ্ছে। তবে মীরাস বণ্টিত হবে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার পর। তাহলে অসিয়তের অংশ দেয়ার পর মীরাস দেয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি হতে পারে?

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'কিতাবুল-রিসালা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ সম্ভবত মীরাস অসিয়তকে মনসূখ করেছে। এ-ও হতে পারে যে, অসিয়ত মীরাসের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে। নবী করীম (স) থেকে মুজাহিদ সূত্রে মুনকাতা হাদীস[১] হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের দলীল হচ্ছে, মীরাস পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করেছে। মুনকাতা হাদীস সত্ত্বেও।

আবূ বকর বলেছেন, অসিয়ত ও মীরাস উভয়ই যখন একসাথে কার্যকর হতে পারে, তখন মীরাসী আয়াতে নাযিল হওয়ার এমন কিছুই নেই, যা ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করাকে মনসূখ করতে পারে, তখন বলতে হবে যে, অসিয়ত মীরাসের কারণে মনসূখ হয়ে যায়নি। কেননা এ দুটি এক সাথে কার্যকর হতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর নিকট উক্ত হাদীস হয়ত প্রমাণিত নয় বা গৃহীত হয়নি। কেননা হাদীসটি মুনকাতা সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসকে মুরসালও[২] বলা যায়, আর ইমাম শাফেয়ীর নিকট 'মুরসাল' হাদীস

---

১. রাসূল করীম (স)-এর হাদীস বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হলে তাকে মুনকাতা হাদীস বলা হয়।

২. তাবেঈ যদি সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই রাসূলের হাদীস বর্ণনা করেন, তা হলে তাকে হাদীসে মুরসাল বলা হয়।

গ্রহণীয় নয়। যদিও তা 'মুত্তাসিল' ও 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীস হোক না কেন—কেননা এ দ্বারা আয়াতের প্রতিপাদ্যের উপর হুকুমদারী করতে পারে। তা এজন্যে যে, তাঁর মতে সুন্নাত দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। এমতাবস্থায় পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত অবশ্যই কার্যকর হতে পারে, তা মনসূখ হয়ে যায়নি, অনায়াসেই বলা যেতে পারে। কেননা তা মনসূখ করতে পারে এমন কিছুই আসেনি।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ছয়জন গোলামকে এক ব্যক্তি আযাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া সে ব্যক্তির আর কোন সম্পদ বা সম্পত্তি ছিল না। তখন নবী করীম (স) আযাদকৃত গোলামদেরকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। তন্মধ্যে দুজনকে মুক্তই রাখলেন, আর অবশিষ্ট চারজনকে গোলাম বানিয়েই রেখে দিলেন। এদেরকে মুক্ত করেছিল একজন আরব ব্যক্তি। আর আরবরা কেবল মাত্র তাদেরকেই গোলাম বানিয়ে রাখে, যারা তাদের নিকটাত্মীয় নয়। পরে নবী করীম (স) তাদের জন্যে অসিয়ত করা জায়েয ঘোষণা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল, অ-নিকটাত্মীয়ের জন্যে অসিয়ত না-জায়েয হলে আযাদকৃত এই গোলামদের জন্যে এই অসিয়ত নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যেত। কেননা উক্ত বর্ণনায় তাদের জন্যে অসিয়ত করতে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তারা কেউ সে ব্যক্তির নিকটাত্মীয় ছিল না।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাটি খুবই গণ্ডগোলের। তার মূলের সাথে সাংঘর্ষিক। গণ্ডগোলের এজন্যে যে, আরবরা যে সব অনারব লোক তাদের নিকটাত্মীয় নয়, তাদেরকেই গোলাম বানাত। আর তা ভুল এই দিক দিয়ে যে, তার মা হয়ত অনারব হবে। ফলে অনারব লোক তার মায়ের দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় হতে পারে। তা হলে রোগী ব্যক্তি যে গোলাম আযাদ করলো, তা তার নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত হয়ে থাকবে। অন্য দিক দিয়ে যদি প্রমাণিত হয় যে, মীরাসের আয়াত পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করেছে, তা হলে তা মনসূখ করে থাকবে তাদের মধ্যকার ওয়ারিসদের জন্যে। যারা তার ওয়ারিস হচ্ছে না, তা অন্যদের জন্যে মীরাস প্রমাণ করে না বলে তাতে এমন কিছু নেই, যা তার জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করতে পারে।

আর তার মূলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণ নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত অবশ্যই মনসূখ করা, ইমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণিত এই ঘটনা যে, একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার গোলামকে আযাদ করে দিয়েছিল। আর মূল কথা হচ্ছে, সুন্নাত কুরআনের আয়াতকে মনসূখ করতে পারে না। প্রাথমিক কালের সাহাবী ও তাবেঈনের এক জামাআতের পক্ষ থেকে অনাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, তাদের উপর তা কার্যকর হবে।

বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর সন্তানদের মাদের জন্যে (যারা তাঁর দাসী ছিল) অসিয়ত করেছেন। তাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্যে চার হাজার দিরহাম করে। হযরত আয়েশা, ইবরাহীম, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনে দীনার ও জুহুরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—তার অসিয়ত কার্যকর হবে যাদের জন্যে তা করা

হয়েছে তাদের জন্যে। তাবেঈ যুগের পরবর্তীকালীন ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছে যে, নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলের জন্যেই অসিয়ত করা সম্পূর্ণ জায়েয। আমাদের মতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ করেছে মীরাস সম্পর্কে বলা আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ –

মীরাস বণ্টনের কাজ করা হবে মৃত যে বিষয়ে অসিয়ত করেছে তা দেয়া এবং ঋণ আদায়ের পর।

এ আয়াতে অসিয়তকে নিঃশর্তভাবে জায়েয বলা হয়েছে এবং তা অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিকটাত্মীয়দের জন্যেই জায়েয করা হয়নি। আর তাতেই পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে অনিবার্যভাবে। কেননা তাদের জন্যে পূর্বে অসিয়ত ফরয হয়ে থাকলেও এ আয়াতে তাদের জন্যে তা ত্যাগ করার এবং অন্যদের জন্যে অসিয়ত করার অনুমতি রয়েছে। তার পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিসদের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে। আর তা সম্ভব হচ্ছে তাদের জন্যে সে অসিয়ত মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর।

যদি বলা হয়, এই অসিয়ত ঠিক তা-ই যা মীরাসের আয়াতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তটাই মীরাসে পরিণত হয়েছে। তাহলে যারা ওয়ারিস হয়নি, তাদের জন্যে সে অসিয়ত অবশিষ্ট থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। তার কারণ এই যে, এখানে অসিয়তকে নিরংকুশ ও নিঃশর্ত রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে نكره শব্দ وصية - অনির্দিষ্টভাবে। তাতে সর্বপ্রকারের অসিয়তই এর মধ্যে শামিল ও ব্যাপক পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। কেননা نكره শব্দের হুকুমই তাই। কিন্তু পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে যে অসিয়ত-এর কথা বলা হয়েছে, তার শব্দ نكر নয়; বরং معرفه এর শব্দ। কাজেই তাকে نكره পর্যায়ে গণ্য করা সঠিক হবে না, কেননা আল্লাহ্‌র যদি সেই অসিয়তের কথা বলাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে বলতেন ঃ مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ – معرفه শব্দ দ্বারা। বোঝা যেত যে, এ সেই অসিয়তের কথা বলা হচ্ছে, যা পূর্বেই জানা হয়ে আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوْابِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَفَاجْلِدُوْهُمْ.

যারা সুপরিচিত পবিত্র-সংরক্ষিত মহিলাদের নামে কোন চারিত্রিক অভিযোগ তোলে কিন্তু তা প্রমাণের জন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে দোররা মার ....

এই সাক্ষীদের কথা বলতে গিয়ে অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذْ لَمْ يَاتُوْ بِالشُّهَدَاءِ –

পরে সে সাক্ষীদের যদি নিয়ে আসা না হয়....

এ আয়াতে شهدا শব্দের উপর الف । ও لام বসে তাকে معرفه বানানো হয়েছে। অর্থাৎ সেই সাক্ষীগণকে যাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে...কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মীরাসের আয়াতে যে অসিয়ত-এর কথা বলা হয়েছে, তা نكره শব্দ وصية—তাতে প্রমাণিত হল যে, এ অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত নয়। এ অসিয়ত সাধারণ। তা সব মানুষের জন্যেই জায়েয। তবে সুন্নাত বা ইজমা যদি কোন অসিয়তকে বিশেষীকৃত করে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা; কিংবা হত্যাকারীর জন্যে অসিয়ত করা। আর তা যখন প্রমাণিত হল, তখন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ বলে ধরে নিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য হয় না। নিকটাত্মীয় বললে পিতা-মাতাকে বোঝায় না। কুরআনের আয়াত ঃ

اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلْاَقْرَبُوْنَ –

অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। (এ আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতেও নিকটাত্মীয়দের থেকে স্বতন্ত্রভাবে পিতা-মাতার উল্লেখ করা হয়েছে)

বিশেষ করে এ জন্যে যে, পিতা-মাতা বললে পিতা-মাতাই বোঝায়; অন্যদের বোঝায় না। এদের পরস্পরে রক্তের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে অন্যান্য আত্মীয়জন পিতা-মাতার বাইরে, তাদের ছাড়াই এদেরকে বোঝায়। তাই قربون বলতে বোঝায় সেই আত্মীয়দের যারা অন্যদের অপেক্ষা নিকটবর্তী। বলেছেন, নিজ ঔরসজাত সন্তানও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা সে তো নিজেই তার রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে—তার ও তার পিতার মধ্যে তৃতীয় কোন মাধ্যমে ছাড়াই সম্পর্কিত। আর পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য নয় বলে এবং সন্তান তার পিতার নিকটবর্তী—পিতা তার সন্তানের নিকটবর্তী হওয়ার—তুলনায়। কাজেই সে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য না হওয়াই অধিক উপযুক্ত। এজন্যে অমুকের গোত্রের নিকটাত্মীয়দের যে লোক অসিয়ত করেছে, তাতে তার সন্তান শামিল নয়। শামিল নয় তার পিতাও। হ্যাঁ, তাতে সন্তানের সন্তান, দাদা ও ভাইগণ শামিল হবে। এরূপ অবস্থা আর যার যার, সে-ও। কেননা এদের প্রত্যেকেই কোন মাধ্যমের সাহায্যে 'নিকটবর্তী' হয়ে থাকে। এভাবে নিকটবর্তীর অর্থ ও তাৎপর্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুমতিক্রমে কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত

আবূ বকর বলেছেন, ওয়ারিসগণের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হওয়ার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلاَّ اَنْ يُّجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ –

কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা জায়েয নয়। তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারী অনুমতি দিলে তা জয়েয।

এ হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব হাদীসে 'উত্তরাধিকারীদের জন্যে অসিয়ত জায়েয নয়', উল্লিখিত হয়েছে তার সাথে 'উত্তরাধিকারীদের অনুমতি হলে জায়েয' এই কথার উল্লেখ হয়নি, সে সব হাদীসের অর্থ হবে, অনুমতি না দিলে তা জায়েয হবে-ই না। তা একথাও বোঝায় যে, উত্তরাধিকারীদের অনুমতি গণ্য হবে সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর। কেননা তার জীবদ্দশায় তো কেউ-ই উত্তরাধিকারী নয়। সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পরই নির্দিষ্ট হবে তার উত্তরাধিকারী কে, আর কে নয়। ওয়ারিস না হয়েও অনুমতি দিলে সে অনুমতি অর্থহীন, নিষ্ফল হবে। কেননা রাসূলের 'উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত নেই', কথাটি সাধারণ ভিত্তিক। এ-ও বোঝা যায় যে, উত্তরাধিকারীরা যখন অসিয়ত করার অনুমতি দেবে, তখন তা তাদের দিক থেকে প্রাথমিক ধরনের কোন 'হেবা' গণ্য হবে না। কেননা 'হেবা' হলে তাতে সমর্পণ ও দখল হওয়া শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। যাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন হবে তাদের মধ্যে তা ব্যাপক প্রচলিত হবে না, তাতে প্রত্যাবর্তনও হবে না। বরং তখন তা 'বৈধ অসিয়ত' গণ্য হবে। অনুমতি দানকারী ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে 'হেবা' গণ্য হবে না। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অনুমতি দানকারীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল চুক্তিসমূহও জায়েয।

কেননা মরে যাওয়া ব্যক্তি যে মালের উপর অসিয়ত করেছে, তা এক্ষণে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার সময়ে ওয়ারিসদের মাল। আর নবী করীম (স) তাকে উত্তরাধিকারীদের অনুমতির উপর ভিত্তিশীল বানিয়েছেন। ফলে তা মূল হয়ে দাঁড়াল ক্রয়-বিক্রয়, গোলাম মুক্তকরণ, হেবা, রেহন বা অন্যের মালের ইজারাদারী ইত্যাদির জন্যে। এক্ষণে তা তার মালিকের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। কেননা যে চুক্তিই থেকে থাকুক, তার একজন মালিক রয়েছে, যে তা শুরু করার ও তা ঘটানোর মালিক। এ কথাও বোঝা যায় যে, মরে যাওয়া ব্যক্তি যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের অসিয়ত করে থাকে, তা হলেও তার কার্যকরতা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন করে নবী করীম (স) উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়তকেও তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল বানিয়েছেন। এ সব কথা-ই রাসূলের কথা, ওয়ারিসরা অনুমতি না দিলে কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে কৃত অসিয়ত কার্যকর হবে না।

মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর অসিয়ত করা হলে কি করা হবে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে অনুমতি দেবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে সালিহ ও উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, তার জীবদ্দশায় যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। তা মৃত্যুর পরে অনুমতি দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, শুরাইহ ও ইবরাহীম থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবূ লায়লা ও উসমান-আল-বত্তী বলেছেন, সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর দেয়া-অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে না। তা তাদের জন্যে জায়েয নয়। ইবনুল কাসিম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, ওয়ারিসদের অনুমতি চাওয়া হলে তখন প্রত্যেক ওয়ারিস মরে যাওয়া লোকটির নিকট সম্পর্কহীন। যেমন যে সন্তান তার পিতা থেকে সম্পর্কহীন, ভাই চাচার পুত্র যে

দুজন তার পরিবারবর্গের মধ্যে গণ্য নয়, তাদের জন্যে অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। তার স্ত্রী ও কন্যারা—যা মৃত ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়নি, আর তার পরিবারের সকলে—তারা পূর্ণবয়স্কতা পেয়ে গেলে—তারা ফিরে যেতে পারে। চাচা ও চাচার পুত্র আর যে-ই তাদের থেকে ভয় পাবে যে, তারা অনুমতি না দিলে দৈনন্দিন খরচ ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তাদের অধিকার আছে ফিরে যাওয়ার।

ইবনে অহব মালিক থেকে সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, সে তার কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করার অনুমতি তার হবু ওয়ারিসদের নিকট চেয়েছে, তারা তাকে তার অনুমতি দিয়েছে, তাদের সে অনুমতি থেকে একবিন্দু পরিমাণ ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। যদি সুস্থ অবস্থায় অনুমতি চেয়ে থাকে, তা হলে তাদের পক্ষে সে অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে যদি তারা ইচ্ছা করে। মূলত রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই তাদের অনুমতি বৈধ হতে পারে। কেননা তারা তার মালে তাদের যে হক রয়েছে, তা থেকে ঢাকা পড়েছে। অতএব তাদের জন্যে তা জায়েয। এ পর্যায়ে ইমাম লাইস-এর কথা ইমাম মালিকের মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। আর সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর যদি তারা অনুমতি দেয়, তাহলে তাদের এ অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার তাদের কোন অধিকার নেই—এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

তায়ূস ও আতার এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, জীবদ্দশায় অনুমতি দিয়ে থাকলে তা তাদের জন্যে জায়েয হবে।

আবূ বকর বলেছেন; রাসূলে কথা ঃ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই, তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসান তার অনুমতি দেয়', তা হলে জায়েয, কথাটি সাধারণ অর্থবোধক ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সর্বাবস্থায় অসিয়ত করা জায়েয নয়, জায়েয এই শর্তের অধীন। সাধারণ কথাকে বিশেষীকৃত করে বলা হয়েছে—তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তার অনুমতি দিলে'—বলে। কিন্তু তারা প্রকৃত ও বাস্তবভাবে উত্তরাধিকারী হতে তো সম্পদ-সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পর, তার বেঁচে থাকা অবস্থায় নয়। তাই মৃত্যুর পর তাদের অনুমতি দেয়ার কথা মোটামুটি কথা থেকে বিশেষীকৃত কথা। তা ছাড়া যা কিছু তা ধার্য হবে অবশিষ্ট সাধারণ কথার উপর। একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেই তার যৌক্তিকতা বোঝা যায়। সম্পত্তির মূল মালিকের জীবদ্দশায় তারা কেউ প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারী নয়। এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি কার্যকর হতে পারে না। যেমন তাদের 'হেবা'ও কার্যকর হবে না, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও নয়। তার পর-পরই মৃত্যু সঙ্ঘটিত হলেও নয়। অনুমতি তো তা থেকে অনেক দূরে। যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, তা কার্যকর হবে সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যর পর। ওয়ারিসদের অনুমতিও তাই। অসিয়ত কার্যকর হওয়ার সময়ই তা কার্যকর হবে, যদিও অসিয়ত কার্যকর হওয়ার পূর্বে তা কোন কাজ করবে না।

মরে যাওয়া ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকা অবস্থায় কৃত অসিয়ত প্রত্যাহার করা জায়েয।

কেননা তখন পর্যন্ত সে-ই তো সম্পদ-সম্পত্তির মালিক। তা হলে যারা অনুমতি দিয়েছে তারা সে অনুমতি প্রত্যাহারও করতে পারে। আর তাদের জন্যে অনুমতি প্রত্যাহার করা যখন জায়েয, তখন জানা গেল যে তাদের অনুমতি তখন সহীহ হয়নি।

যদি বলা হয়, সম্পত্তি-মালিকের অসুস্থতা কালে তার মাল সম্পর্কে ওয়ারিসদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই তার রোগে পড়া অবস্থায় তার জন্যে তার মালে এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর তার হুকুম চালানো নিষিদ্ধ হয়েছে—যেমন মৃত্যুর পর হয়ে থাকে। তা হলে তারা অনুমিত দিলে সে অনুমতির হুকুমটা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে সম্পত্তি মালিকের রোগাক্রান্ত অবস্থাকে মৃত অবস্থা মনে করা যেতে পারে। জবাবে বলা হবে, আমাদের মতে সম্পত্তি-মালিক তার সমস্ত মালে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও হেবা, সাদকা, গোলাম আযাদকরণ ও অন্যান্য সর্ব প্রকারের ও সর্বধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা খতম হয়ে যাবে মৃত্যুর পর, যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর কিছু করে থাকে। কেননা এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাধিকারীদের হক ধার্য হয়ে গেছে। তার পূর্বে ওয়ারিসানের কোন কথার গুরুত্ব নেই। মূল সম্পত্তি-মালিকের কোন চুক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারীরা বাতিল করতে পারে না। হ্যাঁ, তাদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার উপর কিছু হস্তক্ষেপ হয়ে থাকলে তা তার মৃত্যুর পরই পণ্ড করে দিতে পারে। তার মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিসানের অনুমতির অবস্থাও তাই। যেমন অনুমতি দেয়া হয়নি, তেমন তার কৃত চুক্তি ভঙ্গকরণে তারা কোন কাজ করতে পারে না। অনুমতি প্রত্যাহার করা হলে তার দিক থেকে ক্ষতির যে ভয় করে, এবং যে ভয় করে না, এ দুজনের মধ্যে ইমাম মালিক যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, তার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা তার দিক থেকে ক্ষতির ভয় তার কৃত চুক্তির সত্যতা-যথার্থতা নিষিদ্ধ করে না। আর তার কথা ঃ কেননা তাতে জোরপূর্বক বাধ্যকৃত মনে করা যায় না। লক্ষণীয়, যদি সে তার নিকট কোন জিনিস বিক্রয় করে, তাহলে তা তার কাছ থেকে চাওয়া হবেই। বলেছেন ঃ আমি ভয় করছি, আমার থেকে তার ব্যয় বহন বন্ধ হয়ে যাবে তার কথায় সাড়া না দিলে, এটাও কোন ওযর হতে পারে না ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়ার। অনুরূপভাবে রোগী ব্যক্তিকে যদি কিছু 'হেবা' চাওয়া হয় এবং সে তা তাকে হেবা করে, তাহলে তার হেবাকরণে তার ডাকে সাড়া না দেয়ায় কোন ভয়ের কারণ প্রভাবশালী হবে না। তাহলে তা হবে তার মত যে, তার দিক থেকে ক্ষতির ভয় করছে। কাজেই এরূপ অবস্থায় ব্যয়ভার বহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতির ভয় গোলাম মুক্তকরণ জরুরী হওয়া—এবং যে তার পরিবারবর্গের মধ্যে শামিল বা শামিল নয় ব্যক্তির মধ্যে ভয়ের কোন হিসেব বা গুরুত্ব হবে না।

অসিয়ত বদলে দেয়া

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَانَّمَا اثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ –

যারা অসিয়ত শুনতে পেল এবং পরে তা পরিবর্তন করে দিল, এই পরিবর্তনকারীদের উপরই তার সব পাপ বর্তিবে ....

বলা হয়েছে, فَمَنْ بَدَّلَهُ -তে যে ه আছে, তা অসিয়তের দিকে ইঙ্গিত করেছে। পুরুষ বাচক এ ه এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা আরবী الیصا ও وصیة অভিন্ন। আর الـمـه। তে ه তা পরিবর্তনের কাজটি বুঝিয়েছে—যা বদলানো হয়েছে। فمن বলে সম্ভবত অসিয়তের সাক্ষীদেরকে বুঝিয়েছে। ফলে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায়, এতে অসিয়ত বদলে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে, বলা হয়েছে, এ অত্যন্ত জঘন্য ও অভিশাপের কাজ। এটা ঠিক সেই রকম, যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ -(المائده : ١٠٨)

এই পন্থায় বেশি আশা করা যায়, লোকেরা যথাযথ ভাবে সাক্ষ্য দান করবে।

আর এ-ও হতে পারে যে, তদ্দ্বারা অসিয়ত বাস্তবায়নকারী وصی -কে বোঝানো হয়েছে। কেননা সে-ই তো অসিয়ত বাস্তবায়নের জন্যে দায়িত্বশীল। তা কার্যকর করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। এই কারণে তার-ই পক্ষে সম্ভব অসিয়ত বদলে দেয়া। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে বুঝিয়েছে, একথা সুদূরপরাহত। কেননা তাদের পক্ষে এ কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। তাতে তারা কোনরূপ রদবদল করবে এমন সাধ্য কারোরই নেই।'

এ কথাটি আমাদের মতে সাক্ষী ও অসিয়ত বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল এই দুজন লোককেই বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ তাদের দুজনকেই বোঝাতে পারে। সাক্ষী যা শুনেছে, তাতে কোনরূপ রদ-বদল না করেই ঠিক কথারই সাক্ষ্য দেবে যখন তাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হবে। আর অসি—অসিয়ত কার্যকরকরণের দায়িত্বশীল অসিয়তটিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করবে। যেমন শুনতে পেয়েছে, ঠিক তেমনি—তেমনই বাস্তবে করে ফেলবে। আতা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা দুজনই বলেছেন, অসিয়ত-এর দায়িত্বশীল এবং তাঁর সাক্ষীকে বোঝানো হয়েছে। হাসান বলেছেন, তা হচ্ছে অসিয়ত, যে-ই অসিয়ত শুনবে এবং পরে তার মূল কথা বদলে দেবে এই বদলানোর গুনাহ তারই হবে, যে তা বদলে দেয়ার কাজটি করবে।

আবূ বকর বলেছেন, শাসকও তার অর্থ হতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তার একটা কর্তৃত্ব রয়েছে। তার সম্মুখে যখন ব্যাপারটি যাবে, তখন সে তাতে হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে। তখন সে তা বাস্তবায়নের জন্যে আদিষ্ট, যখন শাসনে তা বৈধ হবে, তখন তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাতে রয়েছে তা কার্যকর ও বাস্তবায়নের আদেশও পরম সত্যতা সহকারে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَه 'অসিয়ত নিজ কানে শুনার পর যে তা বদলে দেবে'। অসিয়তকারীর নিকট থেকে অসিয়তের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে, অসির পক্ষে তা কার্যকর করা সম্পূর্ণ জায়েয—এ কথাও তাতে রয়েছে। তাতে কেউ সাক্ষী থাক আর না-ই থাক। আসলে সে-ই হচ্ছে মূল ব্যক্তি, যে তা শুনতে পেয়েছে যাকে বলা হয়েছে ও কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সম্ভব সামর্থ্য হলেই তা যথাযথভাবে

কার্যকর করা তার জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। সেজন্যে কোন সরকারী নির্দেশের অপেক্ষা থাকবে না। কোন সাক্ষীর ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। এ আয়াত থেকে একথাও বোঝা গেল, মৃত্যুমুখী মানুষটি কোন ব্যক্তির ঋণ পাওনা থাকার কথার স্বীকারোক্তি করলে, সেই অসির জন্যে জায়েয় রয়েছে কোন ওয়ারিসকে না জানিয়েই সে তা বাস্তবায়িত করে দেবে। সেজন্যে শাসন কর্তৃপক্ষকেও জানাবার কোন প্রয়োজন নেই, অন্য কাউকেও নয়। কেননা অসিয়ত শুনতে পাওয়ার পর তদানুযায়ী কাজ করা ত্যাগ করলে—কাজ না করলে অসিয়তকারীর অসিয়ত বদলে দেয়ার শামিল হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَهُ -

তাঁর গুনাহ্ কেবল তাদেরই উপর বর্তিবে, যারা তা বদলে দেয়ার কাজটি করছে।

এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি—জানা-ই আছে যে, এই কথাটি অসিয়ত-এর কথার সাথে যোগ করে বলা হয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে পূর্বে ফরয করে দেয়া হয়েছিল। তা অবশ্যই এই কথার তাৎপর্যে নিহিত রয়েছে। তা না হলে কথাটাই ঠিক মতো হয় না, কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

যে লোক তা শুনার পর তা বদলে দেবে, গুনাহটা তাদেরই হবে।

কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়, তা থেকে কোন ফায়দাও পাওয়া যায় না। কেননা যে ইঙ্গিত ও সর্বনাম দুটি রয়েছে, তা যে দিকে ইঙ্গিত করে তা পূর্বে প্রকাশমান থাকা একান্তই। কিন্তু আয়াতে প্রথমে যা উল্লিখিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন প্রকাশমান শব্দ নেই। ব্যাপার যখন এই, তখন আয়াতটি একথা বোঝাতে পারল যে, অসিয়তকারীর দায়িত্ব—অসিয়ত করা হলেই শেষ হয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পর সে অসিয়তে কোনরূপ রদ-বদল করা হলে তার গুনাহ তাকে স্পর্শ করবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যারা বলে, পিতৃ পুরুষদের গুনাহের দরুন ছোট বাচ্চাদেরকে আযাব দেয়া হবে, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। যেমন অপর আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

প্রত্যেকটি যে কাজই করে, তা কেবলমাত্র তারই উপর বর্তাবে। আর কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না।

আয়াতটি থেকে একথাও প্রমাণিত হল যে, যার উপর ঋণের বোঝা হয়েছে, সে যদি তা শোধ করার অসিয়ত করে যায়, পরকালের তার কুফর ভোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসানরা তা শোধ না করলেও তার কোন জবাবদিহি তাকে করতে হবে না। কোন গুনাহ তার হবে না। গুনাহ হবে তার, যে অসিয়তকে বদলে দেবে। যে অসিয়ত করেছে বা যার জন্যে অসিয়ত করেছে, সে নয়।

এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যার উপর তার মালের যাকাত অদেয়া রয়েছে, পরে সে সে বিষয়ে অসিয়ত না করেই মরে গেল সে তো তার দায়িত্ব অ-পালনকারী থেকে

গেল। যাকাত না-দেয়া লোক হয়ে গেল। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর পর্যায়ে পড়ে গেল। কেননা অসিয়ত যদি ধন-মাল সংক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে মৃত্যুকালে সে মাল সম্পর্কে যে অসিয়ত করল, তার-ই স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। ফলে অসিয়তকারী নিজে গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এখন তাতে যে কোনরূপ রদবদল করবে, সে-ই হবে সে কাজের গুনাহের বোঝাবহনকারী। যাকাত না দিলে মৃত্যুকালে সে তা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে দায়িত্বশীল হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। তখন তো বলবে, হে রব্ব, তুমি কেন একটা নিকটবর্তী সময়ে জন্যে আমাদের নিয়ে যাওয়ার সময়টা বিলম্বিত করলে না ? যদি করতে তাহলে আমি সত্যকে গ্রহণ করতাম ও নেক আমলকারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।

এ আয়াতে দায়িত্ব না পালনের ও যাকাত না দেয়ার ফলে যে অবস্থা দেখা দেবে তারই সংবাদ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়ারিসদের বা 'অসি'র মৃতের মীরাস থেকে দায়িত্ব পালন যদি বাকী থেকে যায়, তাহলে সেই লোকেরাই তিরস্কার ও ধমক পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে তা না করার কারণে। মৃত ব্যক্তি এই অপরাধের আওতার বাইরে থেকে যাবে। এতে আমাদের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হল। আমরা বলেছি যে, যাকাত আদায় না করে থাকলে মৃত্যুকালে তার মীরাস থেকে তা দিয়ে দেয়া অসিয়ত না করলেও তা দিতে হবে।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, অসিয়ত কার্যকর করা কিংবা তা বদলে দেয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট অসিয়তকারীর অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে কি ? উভয় অবস্থায়ই সে অসিয়তের সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে কি ?

জবাবে বলা যাবে অসিয়তকারীর অসিয়তে দুটি জিনিস রয়েছে। একটি হচ্ছে—তার অসিয়তের কারণে তার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপার। আর দ্বিতীয়—সেই অসিয়তটি যার জন্যে তা করা হয়েছে, তার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং তদ্দরুন আল্লাহ্‌র শোকর ও অসিয়তকারীর জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করার কারণ হওয়া। তার কারণে অসিয়তকারীর কোন সওয়াব হবে না। কিন্তু যার জন্যে সে অসিয়ত করেছে তার দো'আ সে অবশ্যই পাবে। তার আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা তাই কর্মফল, অসিয়তকারীর নয়। এ থেকে অসিয়তকারী দুটি দিক দিয়ে উপকৃত হবে অসিয়ত কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলে। আর তা কার্যকর না হলে সে যে অসিয়ত করেছে তার দরুন সে যে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়েছে, তারই মধ্যে সীমিত থাকবে।

যদি বলা হয়, যার উপর ঋণের বোঝা চাপা আছে, মৃত্যুকালে তা শোধ করার জন্যে সে অসিয়ত করেনি; কিন্তু ওয়ারিসানরা তা শোধ করে দিল, মৃত ব্যক্তি কি তার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে ?

জবাব হচ্ছে, তার ঋণ শোধ করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে দুটি জিনিস সমন্বিত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র হক। আর দ্বিতীয়টি মানুষের হক। মানুষের হক যদি পূর্ণ মাত্রায় আদায় হয়ে যায়, তা হলে তার কুফল ও খারাপ পরিণতি থেকে বেঁচে গেল। তবে ঋণ শোধে বিলম্ব হওয়ার দরুন সাধিত জুলুম ও ক্ষতির কারণে মানুষের হক অ-পূরিত থেকে যাবে। তার থেকে তওবা না করলে পরকালে তাকে পাকড়াও করা হবে। অবশিষ্ট থেকে যাবে আল্লাহ্‌র হক। ঋণগ্রস্তের জীবনকালে যে জুলুম হয়েছে ঋণদাতার প্রতি এবং সে জন্যে তওবা করেনি; তাহলে ব্যাপারটি তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যের হওয়ার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে। যেমন, কেউ যদি অপর কারোর মাল ছিনতাই করে নেয়, তা না দেয়ার জন্যে পৌনপুনিকতা করে, এ জন্যে সে দুটি দিক দিয়ে অপরাধী হবে। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র হক, তা ফিরিয়ে না দেয়ার কারণ আর দ্বিতীয় ব্যক্তির হক, তার উপর জুলুম করার দরুন এবং তার ক্ষতি করার কারণে। এক্ষণে ব্যক্তি যদি ছিনতাইকারীর ইচ্ছা ছাড়াই তার হক্‌টা নিয়ে নেয়, তা হলে তার হক সম্পর্কিত ঝুঁকি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। থেকে যাবে আল্লাহ্‌র হক। সে জন্যে তওবা করা একান্তই আবশ্যক। তওবা না করেই মরে গেলে তার শাস্তিটা তাকে ভোগ করার জন্যে থেকে যাবে। এ কথাই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র কথাটিতে ঃ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَانَّمَا اثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ –

অসিয়ত শুনার পর যে তা পরিবর্তিত করবে, তার এই কাজের গুনাহ্‌ তাদেরই হবে যারা এই পরিবর্তনের কাজটা করল।

অসিয়ত বদলে দেয়ার কাজট যদি সঠিকভাবে জায়েয পন্থায় ও ন্যায়বাদের ভিত্তিতে হয়, তা হলে তার উপরই আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য, আর অসিয়ত যদি জুলুমমূলক হয়, তা হলে তা বদলে দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। তাকে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ –

অসিয়ত কারোর জন্যে ক্ষতিকর হবে না, এটাই আল্লাহ্‌র উপদেশ।

তা হলে অসিয়ত কার্যকর করা হবে যদি তা ন্যায়নীতিভিত্তিক হয়, জুলুমমূলক না হয়। আল্লাহ সে কথা এরই পরবর্তী আয়াতে বলে দিয়েছেন।

সাক্ষী ও অসী যখন জানবে যে, অসিয়তে জুলুম রয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْاِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

অবশ্য কারোর যদি এই আশংকা বোধ হয় যে, অসিয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তখন যদি সে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোন দোষ হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে ইসহাক, হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মামর কাতাদাহ থেকে উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে খবর জানিয়েছে যে, এ আয়াতে বলা হয়েছে—এমন এক ব্যক্তি বা অসিয়তকারীর কথা, সে অসিয়তে জুলুম ও পক্ষপাতিত্ব করেছে, তা হলে কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি তাতে পরিবর্তন সাধন করে ন্যায়পরতা ও প্রকৃত হক প্রতিষ্ঠিত করবে। আবূ জাফর আর-রাযী রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন الجنف। অর্থ ভুল এবং الاثم। অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করে জুলুম বা অন্যায় করা। ইবনে আবূ নুজাইহ মুজাহিদ এবং ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা থেকে উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতে সেই অসিয়তকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তার পুত্রের পুত্রের জন্যে অসিয়ত করে তার বংশের সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

আল-মুতামির ইবনে সুলায়মান তাঁর পিতা এবং তিনি আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে দূরবর্তী লোকদের জন্যে অসিয়ত করেছে কিন্তু নিকটবর্তী লোকদের জন্যে করেনি। বলেছেন, তার অসিয়তকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। তার দুই ভাগ নিকটবর্তীদের জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ দূরবর্তীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি সেই ব্যক্তি পর্যায়ে, যে দূরবর্তীদের জন্যে অসিয়ত করে। বলেছেন, তাদের নিকট থেকে তা কেড়ে নিয়ে নিকটবর্তীদের দেয়া হবে। তবে দূরবর্তীদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি থাকলে তাকে অবশ্যই দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, اَلْجَنَفُ। অর্থ, সত্য থেকে তার বিপরীত দিকে ঝুকে পড়া। আমরা রুবাই ইবনে আনাসের একথা উদ্ধৃত করেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ الجنف। অর্থ الخطا। ভুল। তার অর্থ ভুলবশত সত্য থেকে তার বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়া। আর ইচ্ছা করে সত্য থেকে ভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া হল الاثم। -এ এক সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা। আল-হাসান এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন নিকটাত্মীয় থাকা সত্ত্বেও অনাত্মীয় নিঃসম্পর্ক লোকের জন্যে অসিয়ত করা বলে। এরূপ কাজই جنف এবং সত্য থেকে বিপরীত দিকে ঝুকে পড়া। কেননা তাঁর মতে অসিয়ত অংশ মীরাসের পায় না এমন লোকদের জন্যে হতে হবে। তায়ূস তার দুটি অর্থ করেছেন। একটি দূরবর্তীদের জন্যে অসিয়ত। তা হলে তা নিকটবর্তীদের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়—তার কন্যার পুত্রের জন্যে অসিয়ত করা তার কন্যার উদ্দেশ্যে। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। কাজেই 'যে লোক অসিয়তকারী থেকে কোন পক্ষপাতিত্ব কিংবা ইচ্ছামূলক গুনাহের ভয় পাবে' আল্লাহ্‌র এই কথাটি এর পূর্বে উল্লিখিত অসিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ

হয়ে যাবে তা জরুরী নয়। কেননা এ একটা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কথা, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। এটা দিয়েই কথা শুরু হয়েছে, বলা যেতে পারে পূর্ব কথার সাথে সম্পর্কিত নয়। সর্ব প্রকারের অসিয়তেই এ কথাটি প্রযোজ্য যদি তাতে ইনসাফ পরিপন্থী ও জুলুম কিছু থাকে, তা হলে তাকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারসম্পন্ন করতে হবে। অবশ্য এর মধ্যেই শামিল হয়ে গেছে সে অসিয়তও যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে করা পূর্বে ওয়াজিব ছিল। পূর্বে তা কার্যকর ছিল এখন নেই। এ আয়াত শামিল করেছেন তা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের অসিয়তকে। তাই সব লোকের মধ্যে যে অসিয়তকারীর অসিয়তেই পরম সত্য থেকে ভিন্ন দিকে ঝোঁক ও জুলুমমুখী দেখতে পাওয়া যাবে বা তার ভয় হবে, তারই কর্তব্য হবে, তাকে ন্যায় ও ইনসাফের দিকে নিয়ে যাওয়া, কল্যাণের ব্যবস্থা করা। তা বিশেষভাবে শুধু সাক্ষী অসী ও শাসকেরই দায়িত্ব নয়। সব মানুষেরই দায়িত্ব। কেননা ব্যাপারটি আমর বিল মারুফ ও নিহী আনিল মুনকার পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়, 'যে ভয় পাবে অসিয়তকারী থেকে পক্ষপাতিত্বের বা গুনাহের, সে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধন বা মীমাংসা করে দেবে' এই কথার তাৎপর্য কি? ভয় তো বলা হয় ভবিষ্যতে যে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা বোধ করা হয়, তাকে। অতীতের ব্যাপারে ভয়ের কথা আসে না। এখানে তো অসিয়ত অতীতে ঘটে যাওয়া ব্যাপার?

জবাবে বলা যাবে, অসিয়তকারীর অবস্থা দেখে এ ধারণা প্রবল হওয়া সম্ভব যে, সে জুলুম করতে উদ্যত হয়েছে, ওয়ারিসকে সে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। কাজেই এই ভয় যাদের হবে, তাদেরই কর্তব্য হবে, তাকে সে জুলুম ও বঞ্চনা থেকে বিরত রাখা। তার দ্বারা ন্যায়পূর্ণ কাজ করানো। জুলুমের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তাকে ভীত করা অথবা অসিয়তকারী ও ওয়ারিসদের মধ্যে সুষ্ঠু মীমাংসা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা। কেউ কেউ خَافَ অর্থ করেছেন عَلِمَ জানতে পেরেছে—জানতে পেরেছে যে, তার অসিয়তের জুলুম ও বঞ্চনা রয়েছে। তা হলে তাকে ইনসাফের দিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হবে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 'তার উপর গুনাহ নেই, তা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে দেয়া তার কর্তব্য' এ কথা তো বলেন নি। তাতে কোন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়ার কথাও বলা হয়নি। পরস্পর বিবাদমান লোকদের মধ্যে মীমাংসার পথ হচ্ছে, তাদের প্রত্যেককেই তার পাওনার একটা অংশ ত্যাগ করতে বলা। এরূপ অবস্থায় মীমাংসাকারীর মনে এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠতে পারে যে, তা করা তার মনে জেগে উঠা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে। প্রকৃত অবস্থা জানতে পারা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই কারণে বিবদমানদের মধ্যে মীমাংসার কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কিছুটা সুবিধা দিয়েছেন। ধারণাকারীর ধারণা দূর করেছেন। কেননা তা হওয়া নিষিদ্ধ, এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তার কোন গুনাহ্ হবে না।' তাই এ অবস্থায় প্রযোজ্য এই ধরনের অন্যান্য কাজেও সওয়াব হওয়ার কথা তো আল্লাহ বলেই দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ

اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

লোকদের গোপন কান-পরামর্শের অনেকটিতেই কোন কল্যাণ নেই। তবে যারা কোন দান বা ভালো কাজ কিংবা লোকদের মধ্যে মীমাংসাকরণের উদ্দেশ্য তা করবে, তা করবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া আশায়, তাদেরকে আমরা বিরাট সওয়াব দেব।

অসিয়তে জুলুম ও সত্য-পরিপন্থী কাজ করা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে কতিপয় হাদীসে। আবদুল বাকী ইবনে কানে, আহমদ ইবনুল হাসান, আবদুস সামাদ ইবনে হাসসান, সুফিয়ান সওরী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلْاِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ -

অসিয়তের মাধ্যমে কারোর ক্ষতি সাধন কবীরা গুনাহ।

পরে তিনি এ আয়াতাংশ পাঠ করেছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا -

এসব হচ্ছে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। এতএব তোমরা সে সীমা লঙ্ঘন করবে না।

আবদুল বাকী কাসিম ইবনে যাকারিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল মাইস, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, উমর ইবনুল মুগীরা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু ইকরামা—ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'অসিয়তে কারোর ক্ষতি করা কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য'। আবদুল বাকী, তাহের ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-কাযী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবদুর রাযযাক, মামর আশয়াস শহর ইবনে হাওশর, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصَى خَافَ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

এক ব্যক্তি হয়ত সত্তর বৎসর ধরে জান্নাতী হওয়ার উপযোগী আমল করল কিন্তু জীবনশেষে সে যে অসিয়ত করল, তাতে সে ভয় পেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের আমল করে বসল। ফলে সে জান্নাতে না গিয়ে জাহান্নামে চলে গেল। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি হয়ত জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী আমল করল জীবনে সত্তর বৎসর ধরে। কিন্তু সে

অসিয়ত করতে গিয়ে পরম ন্যায়পরতা অবলম্বন করল। ফলে সে উত্তম আমল করে জীবন শেষ করল এবং পরিণামে সে জান্নাতে চলে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবাদাতা ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস, নসর ইবনে আলী আল-হাদ্দানী, আল-আশয়াস ইবনে জাবির শহর ইবনে হাওশব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আবূ হুরায়রা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْءَةَ لَيَعْمَلاَنِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِىْ الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَاءَ عَلَىَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ هٰهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ -

একজন পুরুষ ও একজন মেয়েলোক ষাট বৎসর ধরে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজ করতে থাকল। পরে তাদের উভয়ের মৃত্যু উপস্থিত হল। তখন তারা অসিয়ত করতে গিয়ে লোকদের ক্ষতি সাধন করল। ফলে তাদের জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে আবূ হুরায়রার নিকট পাঠ করা হল কুরআনের আয়াত ঃ যে অসিয়ত করা হয় তা কিংবা যে ঋণ অ-পরিশোধিত রয়েছে, তা যথাযথ আদায়ের পরই (সম্পত্তি বণ্টন হবে); কিন্তু তাতে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

এ আয়াতটি ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এ অতীব বিরাট সাফল্য' পর্যন্ত পাঠ করা হল।

এ হাদীস এবং পূর্বোদ্ধ অপরাপর হাদীস প্রমাণ করছে যে, যে লোকই অসিয়তে অসিয়তকারীর কোন জুলুম বা অ-ইনসাফমূলক পদক্ষেপের কথা জানতে পারবে, তারই কর্তব্য হল, তাকে ন্যায়পরতা ও সুবিচারের দিকে ফিরিয়ে দেয়া—যদি তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আয়াতে بَيْنَهُمْ 'তাদের পরস্পরে' বলে কাদের পরস্পরের কথা বলা হয়েছে ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ যখন অসিয়তকারী উল্লেখ করেছেন, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, এখানে অবশ্যই একজন আছে, যার জন্যে সে অসিয়ত করেছে। আর আছে ওয়ারিসান। এদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ হতে পারে। উক্ত 'তাদের পরস্পরে' বাক্যাংশে তাদের কথাই বলা হয়েছে। কেননা আয়াতের সম্বোধন হচ্ছে তাদের পরস্পরে মীমাংসা করে দেয়ার প্রসঙ্গে।

কেউ কেউ বলেছেন, সম্বোধনের সূচনায় যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ হয়েছে 'তাদের পরস্পরে' বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত এই তত্ত্ব জানিয়েছে যে, 'অসী', শাসক সরকার, উত্তরাধিকারী এবং অন্য যে-লোকই অসিয়তে

ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জুলুম বা অবিচারের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে জানতে পারবে, তার-ই কর্তব্য হল, তাকে সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে ফিরেয়ে দেয়া। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'অসিয়তের কথা জানার পর যে লোক তা পরিবর্তন করবে' ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জুলুম ও অবিচারপূর্ণ অসিয়ত প্রসঙ্গে নয়। এ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় ঠিক করা এবং বিজয়ী প্রভাবশালী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করা জায়েয বলে নিঃসন্দেহে জানা গেল। কেননা অন্যায়ের প্রতি ঝোঁক তো বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতেই বুঝতে হবে। সেখানেই ভয় পাওয়ার প্রশ্ন। সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে সংশোধন ও মীমাংসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ার অনুমতিও প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও তাতে কিছুটা বাড়াবাড়ি বা সত্য থেকে কমতি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সে কাজ করতে হবে সংশ্লিষ্ট লোকদের অনুমতিক্রমে।

সিয়াম (রোযা) ফরয

আল্লাহ্র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তা ফরয করা ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে এই আশায় যে, সম্ভবত তোমরা তাকওয়া সম্পন্ন হবে।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা আমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করেছেন কেননা আল্লাহ্র কথা— كُتِبَ عَلَيْكُمْ 'তোমাদের উপর লিখে দেয়া হয়েছে'-এর অর্থ 'তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে।' যেমন তাঁর কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ -

তোমাদের উপর সশস্ত্র যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

নামায মুমিনদের লিখিত সময় ভিত্তিতে।

অর্থাৎ সময়ের ভিত্তিতে নামায ফরয। الصِّيَامُ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلاِمْسَاكُ বিরত রাখা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا -

আমি রহমানের জন্যে চুপ থাকার—কথা বলা থেকে বিরত থাকা—মানত করেছি। অতএব আজকের দিন আমি কোন মানুষের সাথে কখ্খনই কথা বলব না।

কথা বলা থেকে বিরত থাকাকে صَوْم শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অশ্বকে ঘাস খাওয়া থেকে বিরত রাখা হলে আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ خَيْلٌ صِيَامٌ রোযা রাখা (বিরত থাকা) ঘোড়া। বলা হয় صَامَتِ الشَّمْسُ نِصْفُ النَّهَارِ 'অর্ধ দিবস কালে সূর্য রোযা রেখেছে।' অর্থাৎ চলা ও গতি থেকে থেমে রয়েছে। মূলত এ একটা হুকুম আর তার আভিধানিক অর্থেই এখানে বলা হল।

আর শরীয়াতের পরিভাষায় 'সিয়াম' হচ্ছে পানাহার ও অনুরূপ কার্য এবং স্ত্রীসঙ্গম থেকে রোযার দিনের বেলা বিরত থাকা। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়তে বা ফরয হিসেবে।

এই শব্দটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তার ব্যবহার কালে তার বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। কেননা এটা শরীয়াতের দেয়া নাম। এর এক সাথে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সে সব অর্থ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েনি। তবে তা ফরয প্রমাণিত হওয়ার ও শরীয়াতের বিধান রূপে স্থিরকৃত হওয়ার পর তার প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হয়েছে স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর توقيف নির্ধারণের মাধ্যমে। তিনি এই অর্থ নির্ধারণ করে উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ –

যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে।

—এর তিনটি অর্থ হতে পারে। তিনটিরই প্রত্যেকটি আগের কালের বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল-হাসান, শবী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ 'আমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল বলে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে।' তাদের প্রতি রমযান মাস কিংবা অনুরূপ সংখ্যক দিনসমূহে রোযা পালন ফরয ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তা পরিবর্তন করে, ঘুরিয়ে দেয়, দিনের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস, রুবাই ইবনে আনাস ও সূফী বলেছেন, আগে রোযা ছিল এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকার পর্যন্ত এবং ঘুমের পরে পানাহার ও সঙ্গম হালাল ছিল না। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়।

অন্যরা বলেছেন, তার অর্থ আমাদের উপর কিছু দিনের রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তাদের উপরও কিছু দিনের রোযা ফরয করা হয়েছিল। দিনের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে সমান, এমন কথা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তাতে কম-বেশি হওয়া অসঙ্গত নয়।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোক' বলে আহলি কিতাব লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সিয়ামের উপর দিয়ে তিনটি অবস্থা

অতিবাহিত হয়েছে। নবী করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা চালু করেন। আর সেই সাথে চালু করেন আশুরার রোযা। পরে আল্লাহ তা'আলা নিজে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে' আয়াতটি নাযিল করেন। অতঃপর পূর্বোদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের কথাটি উল্লেখ করেন।

আবূ বকর বলেছেন, 'যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল' আল্লাহ্র এ কথাটিতে দিনের সংখ্যা বোঝাবার মতো কিছু নেই। সিয়ামের পরিচিতি নিয়ম-কানুনও কিছু বলে দেয়া হয়নি, সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি, শব্দ ছিল অস্পষ্ট। পূর্বের লোকদের রোযার সময়টা ও সংখ্যাটা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্যে ফরয করা রোযার নিয়ম-পরিচিতি জানতে পারতাম, ঘুমের পরে কোন্ কাজ নিষিদ্ধ তা-ও জানা যেত। ফলে আমাদের পূর্ববর্তীদের রোযার পরিচিতি জানবার জন্যে শব্দের বাহ্যিক অর্থ ব্যবহারের কোন উপায়ই আমাদের জন্যে ছিল না। তাই এর পরেই আল্লাহ বলেছেন ঃ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ 'গণ্য কতিপয় দিন।' কম সংখ্যক বা বেশি সংখ্যক দিন বোঝাবার জন্যে এরূপ বলা খুবই সঙ্গত। পরে আয়াতের ধারাবাহিকতায় যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্যে হেদায়েত ও সত্য পথ প্রদর্শক সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে। অতএব তোমাদের মধ্যকার যে লোক এই মাস পাবে, সে যেন এই মাস ভরে সিয়াম পালন করে।

এ আয়াতে রোযার দিনের সংখ্যা ও সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই মাস কাল ধরে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইবনে আবূ লাইলা থেকে এই তাৎপর্যেরই বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইবনে আব্বাস ও আতার বর্ণনা এই পাওয়া গেছে যে, 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন'-এর তাৎপর্য হল প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা। রমযান সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা-ই ছিল। পরে এ আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-

রমযান মাসে তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোই হবে তার সময়।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে রোগী ও বিদেশ যাত্রীর পক্ষে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। রোযা তার জন্যে ক্ষতির কারণ হোক, আর না-ই হোক। কিন্তু আমরা জানি, রোযা রাখা রোগীর জন্যে ক্ষতিকর না হলে তার জন্যে এই রুখসত নয়। তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি নেই।

এই পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, রোগীর যদি চক্ষুর ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ার বা জ্বর তীব্র হয়ে উঠার ভয় হয়, তাহলে সে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। পরে তা কাযা করবে। ইমাম মালিক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'রোযা যাকে কষ্ট দিচ্ছে সে ভাঙবে ও কাযা করবে। সেজন্যে কোন কাফফারা দিতে হবে না।' আমি যা শুনেছি তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে এ অবস্থায় রোযা তার জন্যে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। রোযা রাখলে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহলে তখন তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি আছে, পরে সে তা কাযা করবে।

ইমাম মালিক ও অন্যান্য শরীয়াতবিদ বলেছেন, গর্ভধারী মহিলার পক্ষে রোযা রাখা যদি কষ্টকর হয়, তাহলে সে রোযা ভাঙবে, পরে কাযা করবে। তাঁদের মতে সে যে কোন রোগই হোক, তাতে রোযা ভাঙা জায়েয। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, যে-কোন রোগে কেউ আক্রান্ত হলে, তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা হালাল, সাধ্য না হলে রোযা রাখবে না। কিন্তু যদি রোযা রাখার সাধ্য থাকে তা কষ্ট হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রোগীর রোগ যদি স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে, সে বৃদ্ধি যদি সহ্য করা সম্ভব হয়, তা হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তাহলে জানা গেল যে, রোগীর জন্যে রোযা ভাঙ্গার রুখসত নির্ভর করে রোযার দরুন রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার উপর। যদি ক্ষতির ভয় না হয়, তাহলে রোযা রাখাই তার কর্তব্য।

এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, রোগীর রোযা ভাঙ্গার রুখসত সম্পর্কিত হচ্ছে ক্ষতির আশংকার সাথে। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইর নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ -

আল্লাহ তা'আলা দূরযাত্রীর উপর থেকে অর্ধেক নামায এবং রোযা সরিয়ে নিয়েছেন। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার উপর থেকেও রোযা সরিয়ে নিয়েছেন।

অথচ জানা আছে যে, এই শেষোক্ত গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার রোযা না রাখার রুখসত তাদের নিজেদের কিংবা তাদের সন্তানদের ক্ষতির আশংকার উপর নির্ভরশীল। এ থেকে বোঝা গেল, এই ধরনের ব্যাপারে রোযা না রাখার জায়েয হওয়া ক্ষতির আশংকার সাথে সংশ্লিষ্ট। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতা সুস্থ ও রোগহীনা হওয়া সত্ত্বেও শুধু ক্ষতির কারণেই রোযা না রাখা তাদের জন্যে মুবাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির দূরযাত্রীর জন্যে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ করেছেন। কিন্তু সফরের কোন সীমা অভিধানে নির্দিষ্ট নয়। তার কম দূরত্ব ও বেশি দূরত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। অবস্থা যখন এই তখন ফিকাহবিদগণ যে সফরে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ তার একটা পরিমাণ শরীয়াতে নির্দিষ্ট রয়েছে বলে মনে করেন। যদিও সে পরিমাণটা কত, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তিন দিন তিন রাত্রির দূরত্বে

যাওয়াকে সফর বলা হয়। অন্যান্যরা বলেছেন, দুই দিনের দূরত্বের কথা। কিন্তু অভিধানে এই পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। কেননা সময় দিয়ে তার কম মাত্রা এমন নির্দিষ্ট করা যে, তার কম হলে সফর হবে না, সম্ভব নয়। কেননা তা মূলত অভ্যাস থেকে গৃহীত। আর অভ্যাস দ্বারা যা নির্দিষ্ট করা হয়, তার কম-সে কম মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না।

বলা হয়েছে, 'সফর' আরবী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আরবদের এরূপ কথন থেকেঃ سَفَرَاتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا 'মেয়েলোকটি তার মুখমণ্ডল উদ্ঘাটন করেছে, উন্মুক্ত করেছে।' বা সকাল বেলা যখন চুতর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তখন বলা হয় ঃ اَسْفَرَ الصُّبْحُ। 'প্রভাত বেলা উদ্ভাসিত হয়েছে।' বলা হয় ঃ سَفَرَتِ الرِّيْحُ السَّحَابَ 'বাতাস মেঘকে সরিয়ে নিয়েছে।' اَلْمُسْفِرَةُ অর্থ, اَلْمُكَنْسَةُ। অনেখানি জায়গা জুড়ে থাকা। কেননা তা পৃথিবী থেকে মাটির ধূলি-কণা আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যায়। وَاَسْفَرَ وَجْهُهُ 'তার মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করল' বলা হয় তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও অনুরূপ অর্থ দেয় ঃ

وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ –

মুখমণ্ডলসমূহ আজকের দিনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।

এই প্রেক্ষিতে দূরবর্তী স্থানের লক্ষ্যে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া ও সেই লক্ষ্যে চলতে থাকাকে 'সফর' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা এই সফর ব্যপদেশেই মুসাফিরের চরিত্র ও আচার-আচরণ উদ্ঘাটিত হয়। বোঝা যায় তার প্রকৃত অবস্থা। আর জানাই আছে যে, যেমন বিশ্লেষণ করেছি সে দৃষ্টিতে 'সফর'-এর তাৎপর্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বা একদিন দুদিনের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে না। বরং সেজন্যে একটু লম্বা সময়ের প্রয়োজন, বেশী দূরত্বের যাত্রা হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দূরযাত্রীর চরিত্র জানা যাবে না। এ দৃষ্টিতে সাধারণ অভ্যাসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হলে আমরা জানতে পারি যে, নিকট দূরত্বকে 'সফর' নাম দেয়া যায় না, এই নাম দেয়া যায় দূরের দূরত্বকে।

তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তিনটি সফর-ই সঠিক। সেই সফর কয়টিতেই শরীয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিন দিনের ও তার চাইতে কম দিনকে গণ্য করা যায় না এ জন্যে যে, তার উপর 'সফর' নাম প্রয়োগ করা হয়নি। তাতে তওকীফ-ও নেই, তার নির্ধারণেও ঐকমত্য হয়নি। নবী করীম (স) থেকে যে কয়টি হাদীস এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তার দাবি হচ্ছে, শরীয়ত অনুমোদিত সফর হওয়ার তিন-কে গণ্য করতে হবে। এ পর্যায়ের একটি হাদীস ইবনে উমর বর্ণিত। নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিনদিনের সফর করতে নিষেধ করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনাকারিগণ পার্থক্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের কতক বলেছেন, তিন দিন। কতক বলেছেন, দুই দিন। আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে নবী করীম (স)থেকে বর্ণিত হাদীসে এই ধরনের বিভিন্ন শব্দ এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এরূপ বিভিন্নতা রয়েছে। সুফিয়ান আজলান সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হল ঃ

لَاتُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرَمٍ -

মেয়েলোক তিনদিনের ঊর্ধ্ব সময়ের সফর করবে না মহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া।

কাসীর ইবনে যায়দ সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ আল-মুকবেরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ الَاتَخْرُجِ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةِ لَيْلَةٍ اِلَّا مَعَ ذِيْ مُحْرَمٍ -

হে মুমিন নারী সমাজ, কোন মেয়েলোক মুহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এক রাত্রি পথের যাত্রায় বের হবে না।

এমনিভাবে আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ মূলত একই হাদীস। বর্ণনাকারিগণ হাদীসের শব্দে পার্থক্য করেছেন। নবী করীম (স) বিভিন্ন অবস্থায় এরূপ বিভিন্ন কথা বলেছেন, তা প্রমাণিত নয়। তাই বেশী সময় বর্ণনাকারী হাদীসটি গ্রহণ করাই শ্রেয় ঃ আর তা হচ্ছে তিন। কেননা এই শব্দটির ব্যবহারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তার কম সংখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে। বর্ণনাকারীদের এই বিভিন্নতা ও শব্দগত পার্থক্যের কারণে তা প্রমাণিত নয় বলেই মনে করতে হবে। আর ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহেও পরস্পর পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু তা প্রমাণিত। আর তাতে তিন-এরই উল্লেখ রয়েছে। আর আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসসমূহ সে সবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রমাণিত মনে করলে তার অধিক মাত্রায় অবস্থাই পরস্পর বিরোধী প্রমাণিত হবে। ফলে তা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। মনে হবে, এসব হাদীস বর্ণিত-ই হয়নি। এক্ষণে 'তিন' গণ্যকরণে আমাদের জন্যে শুধু ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস কয়টিই থেকে যায়। তাতে পরস্পর বিরোধিতা নেই।

যদি বলা হয়, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসসমূহও পরস্পর বিরোধিতাশূন্য। তাই এ পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীসকেই আমরা প্রমাণিত ও তওকীফ পর্যায়ের ধরব না কেন ? তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মেয়ে লোক একদিন বা দুই দিনের কিংবা তিনি দিনের সফরেও যাবে না মুহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ?

জবাবে বলা যাবে, যখন-ই বলা হবে ঃ তিন দিনের কম, তখনই 'তিন' কথাটি অর্থহীন হয়ে যাবে। তার বর্ণিত হওয়া ও না-হওয়া এমন পর্যায়ে পড়ে যাবে যে, 'তিন'-এর বর্ণনাকারী হাদীস অ-ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। আর তা শুধু 'তিন'-এর কম' শব্দটি ব্যবহারের কারণে। আর 'তিন'-এর অংশ ব্যবহার ও অপর অংশের নিরর্থকতা ছাড়া যখন কিছুই নেই, তখন তিন-এর হাদীস ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা এটি বেশি মাত্রার দিন। উপরন্তু 'তিন' ব্যবহার করা সম্ভব একদিন বা দুই দিন বর্ণনাকারী হাদীসে ফায়দা প্রমাণ সহকারে। আর তা এভাবে যে, যখন 'তিন'-এর সফরের ইচ্ছা করবে, তখন একদিন বা দুইদিন সে 'তিন' থেকে বাইরে পড়বে না। তা-ও মুহররম পুরুষসহই সম্পন্ন হবে। কেউ হয়ত ধারণা করতে পারে যে, 'তিন' যখন সীমা হিসেবে নির্ধারিত হল, তখন এক বা দুই দিনের সফর মুহররম সঙ্গী ছাড়াই করা যেতে পারে। যদি তিন দিনের

সফরের ইচ্ছা করে, আর তা মুহররম ছাড়াই করা নিষিদ্ধ, তখন তার কম সময়ের সফর তো অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে, যখনই তার ইচ্ছা করা হবে।

মুহররম ছাড়া সফরে বের হওয়া নিষেধের ব্যাপারে 'তিন' যখন নির্ধারিত হল, তখন এই তিন দিনের দূরত্বের সফরে বের হলে রমযানের রোযা না রাখা মুবাহ পর্যায়ে অবশ্যই গণ্য হবে। তার দুটি কারণ। একটি মেয়েলোকের ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে যখন তিন গণ্য করা হয়েছে, তখন এই তিন রোযা না রাখার ক্ষেত্রেও অবশ্যই গণ্য হবে। আর একদিন বা দুই দিনের যে পরিমাণের কথা বলা হয়েছে, রোযা না-রাখার ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় কারণ—তিন-এর সাথে শরীয়াতের হুকুম জড়িত, তার কমের সাথে জড়িত নয়। ফলে এই তিন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম। তার কম-এর সাথে কোন হুকুম সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে দিনের একটি ঘণ্টা কালের জন্যে বের হওয়ার পর্যায়ে পড়ে গেল। নিজ বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্যে এক দিন এক রাত্রি সময় কাল ধরে মোজার উপর মসেহ্ রাখার রুখসত দান নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। আর মুসাফিরের জন্যে তিন দিন ও তার রাতগুলোর সময় পর্যন্ত। আর এ কথা জানা যে, তা সব মুসাফিরের জন্যে শরীয়াতের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে এসেছে। কেননা যে কোন বিষয়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ তার হুকুম সবকেই পরিব্যাপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। পরিমাণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণের এটাই দাবি। এ প্রেক্ষিতে মুসাফির সে-ই, যার সফর তিন দিনের জন্যে হবে। তিন দিনের কম মেয়াদের সফর যদি শরীয়াতে গণ্য হয়, তা হলে অন্যান্য মুসাফিরের অবস্থা এই হবে যে, তাদের জন্যে কোন হুকুম বলা হয়নি। আর কোন প্রকাশনার দাবির সব কিছুকে আয়ত্তাধীন করে না ব্যবহৃত শব্দ। তা প্রকাশের আওয়াতার বাইরে ঠেলে দেয়।

অন্য দিক দিয়ে কথা হচ্ছে, 'মুসাফির' একটা সাধারণ নাম। তার উপর 'আলিফ' ও 'লাম' ব্যবহৃত হওয়ার কারণে। অতএব সব ধরনের মুসাফির-এর জন্যেই এই হুকুম প্রযোজ্য। তার বাইরে পড়লে সে মুসাফির গণ্যই হবে না। তার সফর সম্পর্কে শরীয়াতের কোন হুকুম ধার্য নয়। আর এই কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এ কথার যে, যে সফরের সাথে শরীয়াতের হুকুম সম্পর্কিত, তা হচ্ছে তিন-এর সফর। তার কম-এর সফর হলে তার সাথে রোযা না-থাকা সংক্রান্ত কোন হুকুমের সম্পর্ক নেই। তাতে নামাযের কসর-ও করা যাবে না।

অপর দিক দিয়ে বলতে হয়, এই ধরনের পরিমাণ নির্ধারণ নিছক 'কিয়াস'-এর ভিত্তিতে করা সম্ভব হয় না। তা প্রমাণের একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ঐকমত্য ও তওকীফ—রাসূল কর্তৃক নির্ধারণ। কিন্তু তিন দিন-এর কমে কোন ঐকমত্য বা তওকীফ নেই। তাই তিন-এর উপর স্থিতি গ্রহণই সমীচীন। সে ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, এই সময়ের সফরে রোযা না-রাখা জায়েয। তা ছাড়া রোযা ফরয হওয়াটাই মূল ভিত্তি। রোযা ভাঙ্গার রুখসতের মেয়াদ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কাজেই মতপার্থক্য হলে ফরয ছেড়ে দেয়া কখনই জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি সে বিষয়ে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। আর সে 'ইজমা' হয়েছে তিন-এর উপর। কেননা ফরয কাজে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্তই জরুরী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিন দিনের কমের সফরে রোযা ভাঙ্গা যায় না। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও (রাখবে না), তারা যেন মিসকীনকে খাবার দিয়ে তার 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আদায় করে।

আগের কালে ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আল-মসউদী আমর ইবনে মুররা আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সিয়াম তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। পরে আল্লাহ 'তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে' নাযিল করেছেন। এর শেষ কথাটাই হয়েছে ঃ 'যারা তা রাখতে সমর্থ হয়েও (রাখবে না), তারা মিসকীনের খাবার দিয়ে তার বিনিময় দেবে।' ফলে, হুকুমটা এরূপ দাঁড়াল যে, যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে আর যার ইচ্ছা সে রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। পরে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ "রমযান মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে"; আর এর শেষে রয়েছে ঃ 'যে এই মাসটি দেখতে পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে।' এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রোযাকে নিজ ঘরে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তি উপর কার্যকর করে রাখলেন এবং রোগী ও মুসাফিরের জন্যে না রাখার রুখসত দিলেন। আর যে বেশি বয়সের লোক রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না, তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে উমর ইবনে আব্বাস (রা) সালমা ইবনুল আকওয়া, আল কামা, জুহরী ও ইকরামা থেকে 'যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখবে না, তারা মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেবে' আয়াত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বব্যবস্থা এই ছিল যে, যার ইচ্ছা রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা ভাঙ্গবে। তবে সে ফিদিয়া দেবে প্রতিদিন একজন মিসকীনের খাবার। পরে নাযিল হল ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে এই মাস পাবে, সে যেন সে মাসের রোযা রাখে।

এ পর্যায়ে আরও বর্ণনা রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইসরাইল আবূ ইসহাক হরস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيْضٌ اَوْمُسَافِرٌ فَلْيَفْطُرْ وَلْيُطْعِمْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا صَاعًا –

যার নিকট রমযান মাস আসবে এ অবস্থায় যে, সে রোগাক্রান্ত কিংবা মুসাফির, সে যেন রোযা না রাখে; বরং সে যেন প্রত্যেক দিন এক সা' পরিমাণ খাবার মিসকীনকে দেয়।

এই কথাটিই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা তা পারে না, তাদের উপর একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া স্বরূপ দেয়া কর্তব্য।

এর আর একটি দিক হল, মনসুর মুজাহিদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَيِّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পাঠ করছিলেন। বললেন, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, যে পূর্বে যুবক থাকা কালে রোযা রাখতে সমর্থ ছিল, এক্ষণে তাকে বার্ধক্য পেয়েছে, এখন দুর্বলতার কারণে রোযা রাখতে পারছে না, খাবার না খেয়ে থাকতে পারছে না, সে বাধ্য হয়ে রোযা ভাঙ্গছে। সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে এক অর্ধ সা' পরিমাণ খাবার দেবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা)-ও এ আয়াত পড়েছিলেন। খালিদুর হাযা ইকরামা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে যে, তিনিও এ আয়াত পড়ছিলেন। সকলেই বলেছেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি।

হাজ্জাজ আবূ ইসহাক-হারস-আলী সূত্রে এ আয়াত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্পর্কে এ আয়াত এসেছে।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবী ও তাবেঈনের এক সংখ্যক লোক যারা সংখ্যায় অনেক বেশি—বলেছেন ঃ শুরুতে রোযা ফরয হয় ইখতিয়ারী ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী, রোযা রাখা বা ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার ছিল। পরে তা সামর্থ্যবানদের ক্ষেত্রে মনসূখ হয়ে যায় এ আয়াত দ্বারা ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক এ মাস পাবে সে যেন সে মাসের রোযা রাখে।

অপর লোকেরাও বলেছেন, উক্ত আয়াত মনসূখ হয়ে যায়নি, বরং তা রোগী ও মুসাফির-এর বেলায় পুরাপুরি কার্যকর আছে। তারা রোযা ভাঙ্গবে, তবে কাযা করবে, তাদের সেজন্যে 'ফিদিয়া'ও দিতে হবে, কাযাও করতে হবে। ইবনে আব্বাস, আয়েশা (রা), ইকরামা ও সায়ীদুবনুল মুসাইয়্যিবও এ আয়াত পাঠ করতেন। এ আয়াতের শব্দসমূহ কয়েকটি অর্থ দেয়। তার কয়েকটি ইবনে আব্বাস বলেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা রোযা রাখতে সমর্থ ছিল, পরে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদের উচিত বিনিময়ে মিসকীনকে খাদ্যদান। অপর অর্থ হচ্ছে, তারা রোযা রাখতে পারে খুবই কষ্ট সহকারে, এক্ষণে খুবই কঠিন হওয়ার দরুন রাখতে পারছে না, তাই তাদের কর্তব্য খাবার খাওয়ানো। অপর অর্থ, তারা রোযা রাখতে সামর্থ্যবান না হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর তার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাই না রাখার দরুন রোযা রাখার দায়িত্বের স্থলাভিষিক্ত হবে 'ফিদিয়া' দান। লক্ষণীয়, পানি দ্বারা 'তাহারাত' অর্জনেরই হুকুম দেয়া হয়েছে যে তায়াম্মুম করছে, তার উপরও। কিন্তু পানি না পাওয়ার বা ব্যবহার করতে না পারার দরুন মাটি সে পানির স্থলাভিষিক্ত হবে। অন্যাথায় তায়াম্মুম অযূর বদল হতে পারে না। নামায পড়ার দায়িত্ব নিদ্রামগ্ন ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উপরও অর্পিত।

কাযা করে তারা সে দায়িত্ব পালন করবে। তরক করেছে বলে তা জরুরী, সে হিসেবে নয়। রোযা রাখতে অক্ষমতা ও কাযা করতে পারবে তার আশা না থাকায় আল্লাহ্ ফিদিয়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এটাও আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই অর্পিত দায়িত্ব। কেননা 'ফিদিয়া' অন্যের স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে দুই ধরনের পাঠ ব্যবহৃত রয়েছে। তবে উত্তম পাঠ এটিই ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এটি অবশ্যই মনসূখ হয়ে গেছে বলে ধরতে হবে। সাহাবিগণ থেকে আমরা যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি, তার ভিত্তিতেই কথা। তাঁরা রোযা ফরয হওয়ার ধারণাটাও বর্ণনা করেছেন, বলেছেন শুরুতে তা কিভাবে ছিল। তাদের মধ্যে রোযা রাখতে সক্ষম লোকের ইখতিয়ার ছিল রোযা রাখার ও না-রাখার—না রাখায় ফিদিয়া দেয়া ফরয ছিল। এটা কোন 'রায়' দেয়ার ব্যাপার নয়। কেননা তা সেই অবস্থার বর্ণনা যা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জেনেছেন যে, তা নবী করীম (স) কর্তৃক তাদের জন্যে 'তওকীফ' সম্বোধনের বক্তব্যে উজ্জলতর প্রমাণ রয়েছে এ বিষয়ের যে, আমাদের নিকট আগের লোকদের থেকে কোন বর্ণনা যদি না-ও থাকত, তবু তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে যথেষ্ট হতো। আর তা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ -

যে লোক রোগী বা মুসাফির হবে, তার রোযা রাখার সময় হবে অন্য দিনসমূহ।

এ আয়াতে শুরুতেই রোগী ও মসাফিরের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের জন্যে কাযা করা ফরয করেছেন যদি তারা রোযা না রাখে। এর পরে বলেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ -

যারা সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখবে না, তাদের কর্তব্য একজন মিস্‌কীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া।

কাজেই এ আয়াতে রোগী ও মুসাফিরের কথা বলা হয়েছে—এ কথা মনে করা সঙ্গত নয়। কেননা এদের সম্পর্কে পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে এদের উল্লেখ সহকারে কথা বলে দেয়া হয়েছে, তাদের কর্তব্য জানিয়ে দেয়া হয়েছে নাম উল্লেখসহ। এরপর আবার ইঙ্গিতে তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়েছে মনে করা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা আরবী নিয়মে عطف স্থলে পরেরটা পূর্বেরটা থেকে ভিন্নতর কিছু হতে হবে। কোন জিনিস নিজের থেকেই عطف হতে পারে না। এখানে বক্তব্য হচ্ছে সে সব নিজ বাড়িতে উপস্থিত ও রোযা রাখতে সামর্থ্যবান লোকদের সম্পর্কে। এ আয়াতে বলা হয়েছে সেই রোগী সম্পর্কে, যে রোযার ক্ষতির ভয় পায়। কাজেই তাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে একথা মনে করা যায় কিভাবে ? তাকে না-রাখার রুখসত দেয়া হয়েছে সামর্থ্য না থাকার দরুন, ক্ষতির ভয়ের কারণে। কথার ধারাবাহিকতায় পরে যে আয়াত এসেছে, তা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। তা হচ্ছে ঃ

وَاَنْ تَصُوْمُوْ خَيْرٌ لَّكُمْ -

রোযা তোমরা রাখবে, তা-ই তোমাদের জন্যে কল্যাণময়।

কিন্তু যে রোগী রোযা রাখলে নিজের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে ভীত, রোযা তার জন্যে কল্যাণময় হতে পারে না। বরং এই অবস্থায়ই তাকে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ-ও বোঝা যায় যে, রোগী ও মুসাফিরকে ফিদিয়া দিতে বলা হয়নি। এ দুজনের ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য নয়। ফিদিয়া তাকে বলা হয় যা অন্যের স্থানে দাঁড়ায়। রোগী ও মুসাফিরের জন্যে তো রোযা কাযা করার হুকুম রয়েছে। 'কাযা'ই মূল ফরযের স্থলাভিষিক্ত। এক্ষেত্রে খাবার দেয়া ফিদিয়া নয়। এ থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা তা করতে সক্ষম তাদের একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য বলে রোগী ও মুসাফিরকে ফিদিয়া দিতে বলা হয়নি। তাদের বেলায় এ আয়াত মনসূখ—যেমন পূর্বে বলেছি। এ আয়াত বোঝায় যে, রোযা রাখাই আসল ফরয। তাকে ফিদিয়ায় পরিণত করা রোযার বদল হিসেবে মাত্র। কেননা ফিদিয়া তো তা-ই, যা অন্য কিছুর স্থলাভিষিক্ত হয়। খাবার খাওয়ানো মূলতই যদি ফরয হতো রোযা মতো ইখতিয়ার হিসেবে, তা হলে তার বদলে কিছু হতো না। যেমন কসমের কাফফারায় তিনটি জিনিসের মধ্যে যে-কোন একটি দ্বারা কাফফারা—তা অন্য কিছুর বদল হয় না। ফিদিয়াও হয় না অপর কিছুর বদল। যাঁরা বলেছেন, এ আয়াতে বয়োবৃদ্ধদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁদের কথা গ্রহণ করা হলে আয়াতটি মনসূখ মনে করতে হয় না। কিন্তু একটি সর্বনাম ضَمِير উহ্য ধরে নিতে হয়। তা হলে অর্থ দাঁড়ায় ঃ

> আর সেই সব লোকের উপর যারা পূর্বে তা পালন করতে সক্ষম ছিল এক্ষণে বার্ধক্য ও সেই সাথে কাযা করতে পারবে এই আশা না থাকার কারণে তা রাখতে অক্ষম হয়ে গেছে ...

কিন্তু এরূপ করা জায়েয নয়। তবে দুভাবে তা হতে পারে। হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত হতে হবে অথবা توقيف এর মাধ্যমে তা করা হবে। কিন্তু এরূপ অর্থ করতে গেলে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থকে অস্বীকার করতে হয়। বাহ্যত এখানে এমন কিছু নেই, যা তা বোঝাতে পারে। সেই সাথে এ কথাটির মূল ফায়দাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা ফরয বাধ্যতামূলক হওয়ার পর যারা তা পালন করতে সক্ষম ছিল আর যাদের উপর রোযা রাখা পরে ফরয হয়েছে এক্ষণে বার্ধক্যের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছে, এদের সকলের জন্যে অভিন্ন হুকুম হয়ে দাঁড়ায়। আর তার অর্থ এরূপ হয়ে পড়ে যে, বয়োবৃদ্ধ রোযা রাখতে অক্ষম—কাযা করতে পারার আশা নেই, তাদেরকে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য। এতে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ আয়াতটির মূল ফায়দাটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা পরে সামর্থ্য না থাকার কোন ফায়দা বা তাৎপর্য এরূপ অর্থ করণে থাকে না।

যারা يُطِيْقُوْنَهُ কে يُطَوَّقُوْنَهُ পড়েছেন, তাদের পাঠ অনুযায়ী বৃদ্ধ—কাযা-নিরাশ লোকের জন্যেই ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা يُطَوَّقُوْنَهُ এর অর্থ হয়, তাদের উপর রোযা রাখার দায়িত্ব অর্পিত; তা করতে কঠিন কঠোর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। তাদের জন্যেই ফিদিয়া রোযার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এরূপ পাঠের অর্থ যদি আমরা যেমন বলেছি তেমনই হয়, তাহলে তা মনসূখ হয়নি বুঝতে হবে, বরং তা পুরাপুরি চালু

ও প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর। কেননা তার অর্থে শুধু সেই লোকদের বোঝাবে যারা বয়োবৃদ্ধ, কাযা করতেও অক্ষম। আর তাদের জন্যেই ফিদিয়া দেয়ার হুকুম হয়েছে।

'শায়খুলফানী'—থুরথুরে বুড়ো সম্পর্কিত আলোচনা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, শায়খুল কবীর হচ্ছে সেই থুরতুরে বুড়ো, যে রোযা রাখতে সক্ষম নয় বলে রোযা ভাঙ্গতে পারে এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিদিন অর্ধ সা' গম বা আটা খাবার দেয়া হবে, এ ছাড়া তার উপর অন্য কিছুর দায়িত্ব নেই।

সওরী বলেছেন, হ্যাঁ খাওয়াবে, তবে তার পরিমাণের উল্লেখ নেই। মুজানী ইমাম শাফেয়ীর মত বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক রোযার দিনের বদলে এক 'মুদ্দ'[১] পরিমাণ খাবার দিতে হবে। রবী'আতা মালিক বলেছেন, আমি খাওয়াবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে খাওয়ালে ভাল।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির ব্যাখ্যায় আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। তাঁর পাঠ অনুযায়ী আয়াতটির রূপ হচ্ছে ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ এবং এতে বয়োবৃদ্ধ লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে। আয়াতে যদি এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকত, তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সেরূপ কখনই দিতেন না। তাঁর থেকে এই ব্যাখ্যার বর্ণনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও তাঁর বর্ণনা চালাতেন না। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কেবলমাত্র বয়োবৃদ্ধ বা থুরথুরে বুড়োর পক্ষেই রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়ার আদেশ হয়েছে মনে করতে হবে। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনিও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সেই থুরথুরে বুড়োর কথাই বলেছেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا -

যে-লোক মরে গেছে এ অবস্থায় যে তার উপর রোযা না-রাখার বোঝা রয়েছে, তার অভিভাবক যেন তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের হিসেবে একজন করে মিসকীন খাওয়ায় (এটা তার কর্তব্য)।

মৃতের উপর রোযার দায়িত্ব থাকলেই যদি তাই করতে হয়, তাহলে থুরথুরে বুড়োর পক্ষ থেকে তো অবশ্যই করতে হবে। কেননা এ ধরনের বুড়োরা তো রোযা রাখতেই পারে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, বুড়ো কেন তার মত হবে না, যে রোগী হওয়ার কারণে রমযান মাসে রোযা রাখতে পারেনি ? পরে সে ভালো হয়নি, মরে গেছে, কাযাও তার উপর বর্তে নি ?

১. A half bushel —আট গ্যালন পাত্রে যত ধরে তার অর্ধেক।

জবাবে তাকে বলা হবে, রোগীকে তো অন্য সময় বাদ পড়ে যাওয়া রোযাগুলো কাযা করতে হবে, রোগীর জন্যে রোযা ফরযের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে এই বলে ঃ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।' তাই সেই 'অন্য সময়' না আসা পর্যন্ত রোগীর কিছুই করণীয় নেই। সেই সময়টাই যখন আসেনি, তার উপর কোন কর্তব্যও চাপে নি। যেমন যে লোক রমযান মাস পায়নি। কিন্তু থুরথুরে বুড়ো অন্য সময় কাযা করবে, সে আশা তো আর নেই। তাই তার প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে ফিদিয়া দেয়ার কর্তব্যটাই বাধ্যতামূলক হবে। এ কারণেই তো ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

থুরথুরে বুড়ো সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কথাও বলেছি। এ পর্যায়ে কারো কোন ভিন্ন মত পাওয়া যায় নি। ফলে সে মতটির উপর ইজমা হয়েছে, বলতে হবে, যে বিষয়ে কারোর কোন ভিন্ন মত পাওয়া যায়নি।

ফিদিয়ার পরিমাণ বলা হয়েছে অর্ধ সা' গম। তা হাদীস থেকে জানা গেছে। আবদুল বাকী ইবনে কানে আখু খাত্তাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদুল মুসতামলী-ইসহাকুল আজরাক, শরীক, আবূ লায়লা, নাফে, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يَقْضِهِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ لِمِسْكِيْنٍ -

যে লোক মরে গেল রমযানের রোযা না রেখে, সে কাযাও করেনি, তার পক্ষ থেকে যেন প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' খাবার খাওয়ায়।

রমযান মাসে রোযা ভেঙ্গে যে মরে গেছে, তার জন্যে ফিদিয়া দেয়া প্রমাণিত হল, থুরথরে বুড়োর জন্যেও তাই প্রমাণিত হবে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি—কথাটি থুরথুরে বুড়ো ও অন্যান্যদের জন্যে সাধারণ ও সমানভাবে সকলের জন্যে প্রযোজ্য। কেননা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উপরও রোযা অভিন্নভাবে ফরয, ফলে তার মৃত্যুর পর বলা যেতে পারে যে, সে রোযা না রেখেই মরে গেছে। শব্দের নির্বিশেষ অর্থ তাকেও শামিল করে। আর অপর দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়াতে যে ফিদিয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে এই পরিমাণই বুঝিয়েছে। সে ফিদিয়া এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকেই দিতে হবে। কাজেই তার উপর এই পরিমাণ ধার্য হওয়া আবশ্যক। অতপর একটি দিক থেকে যে রোযা কাযা না করে মরে গেছে, তার বেলায় যখন তা প্রমাণিত হয়েছে, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির ফিদিয়ার পরিমাণও তাই হওয়া আবশ্যক। কেননা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার দুটি কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইবনে আব্বাস, জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলে করীমের শরীক কায়স ইবনুস সায়েব, আয়েশা, আবূ হুরায়রা (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা বর্ণিত

হয়েছে যে, প্রত্যেকটি দিনের রোযার বদলে অর্ধ সা' গম (সমপরিমাণ যে-কোন খাদ্য) দেবে। নবী করীম (স) কা'ব ইবনে উজরাতার প্রতি ছয়জন মিসকীনকে—প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' গম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, রোযার ফিদিয়া হিসেবে 'মুদ্দ'-এর পরিবর্তে অর্ধ সা' পরিমাণ নির্ধারণ করাই উত্তম। কেননা এখানে মৌলিকভাবে ইখতিয়ার রয়েছে রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়ার মধ্যে যে-কোন একটি করার। ইবনে উমর ও তাবেয়ীনের এক জামা'আত থেকে প্রতিদিনের জন্যে এক 'মুদ্দ' পরিমাণ দেয়া উত্তম বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বেরটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, তা রাসূলে করীম (স) এবং অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত। চিন্তা-বিচেনা করলেও তা-ই বোঝা যায়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এর শেষে লাগানো ه সর্বনাম কিসের ইঙ্গিত করছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা রোযা-কে ইঙ্গিত করছে (অর্থাৎ যারা রোযা রাখতে সমর্থ)। আর অন্যরা বলেছেন, ফিদিয়াকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু প্রথমটাই ঠিক। কেননা সেই রোযা পূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে 'ফিদিয়া' শব্দ এর পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। সর্বনাম তো পূর্বে উল্লিখিতকেই ইঙ্গিত করতে পারে। আর অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, اَلْفِدْيَةُ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, অথচ সর্বনামটি পুরুষ বাচক। এ থেকে 'জবরিয়া' পন্থীদের মত বাতিল প্রমাণিত হয়। তারা বলে, আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপর এমন কাজ করার দায়িত্ব চাপান, যা করার সাধ্য তাদের নেই। তারা কাজ করতে ক্ষমতাবান নয় তা সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে। কাজ করার তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই।[১] কেননা আল্লাহই তা করার পূর্বে তা করতে সক্ষম বলে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে। বলেছেন ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ 'যারা তা করতে সক্ষম হয়েও করে না তাদের উপর ফিদিয়া ধার্য।' এ আয়াতে রোযা না রেখেও তা করতে পারে বলা হয়েছে। তাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে ফিদিয়ার দিকে। ব্যবহৃত শব্দ তা বোঝাচ্ছেও। কেননা সর্বনাম ফিদিয়াকেই বোঝায়। রোযা ওয়ালাকে তা করতে সক্ষম বানিয়ে দিয়েছে, যদিও সে তা করেনি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ –

রমযান মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের হেদায়েতের বিধান ও হেদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী রূপে।

এ আয়াতটি জবরিয়াদের মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। ওরা বলে যে, আল্লাহ কাফিরদের হেদায়েত করেনি। কেননা আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন শরীয়াত পালনে বাধ্য সমস্ত মানুষের জন্যে হেদায়েত। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

১. এই মতটিকেই জবরিয়া মত বলা হয়।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَ يْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعُمٰى عَلَى الْهُدٰى -

আর সামুদ গোত্র, আমরা তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছি। কিন্তু পরে তারা গুমরাহীকে হেদায়েতের উপর অধিক পছন্দ করে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র এই কথাটিও ঃ

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌلَّهٗ -

যে লোক কোন কল্যাণকর কাজ নিজের থেকে করবে, তা তার-ই জন্যে মঙ্গলকর হবে।

এটা হতে পারে যে, কথার শুরুটা তার পূর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। কেননা তা ফায়দা দানের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। সম্বোধনের শুরু তা দিয়ে করা সঠিক হবে। তখন নফল ইবাদতের উৎসাহ দানকারী হবে। এ-ও সঙ্গত যে, ফিদিয়ার খাবার বেশি বেশি দিয়ে অধিক নফল সওয়াবের কাজ করবে। যদিও ধার্যকৃত খাদ্যের পরিমাণ অর্ধ সা'। এর অধিক এক সা' বা দুই সা' দিলে তা তারই জন্যে কল্যাণের কারণ হবে। কায়স ইবনুস-সায়েব থেকেও এ তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ প্রত্যেকটি লোকের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন দুই 'মুদ্দ' খাবার খাওয়াতে হবে। অতএব তোমরা আমার পক্ষে থেকে তিন জনকে খাবার দাও। এর লক্ষ্য এমন এক ব্যক্তি হবে যার উপর রোযা বা খাবার দেয়া ইখতিয়ার কার্যকর হয়েছে, সঙ্গত নয়। কেননা সে দুটির যে কোনটি আলাদাভাবে করা হবে, তা-ই তার জন্যে ফরয, নফল নয় মনে করতে হবে। কাজেই উক্ত দুটি কাজের যে কোন একটি অর্থ হবে, তা মনে করা সঙ্গত হবে না। হ্যাঁ, রোযা ও খাবার দেয়া উভয়টিই এক সাথে লক্ষ্য হতে পারে। তার একটি হবে ফরয; অপরটি নফল। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ 'তোমরা রোযা রাখবে, এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতের প্রথম কথা তার সম্পর্কে যে স্বাস্থ্যবান, নিজ বাড়িতে উপস্থিত এবং রোযা রাখতে সক্ষম। যে রোগী নয়, মুসাফিরও নয়, গর্ভবতী নয়, নয় স্তন দানকারিণী। তা এজন্যে যে, রোগীর পক্ষে রোযা না-রাখা জায়েয। কেননা সে রোযার ক্ষতিকে ভয় করে। যার অবস্থা এরূপ তার পক্ষে রোযা রাখা ভালো হয় না। রোযা রেখে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাও তাই। রোযা তাদেরকেও ক্ষতি করতে পারে। অথবা তা তাদের সন্তানদের জন্যেও ক্ষতিকর হতে পারে। তা যা-ই হোক, রোযা না রাখাই তাদের জন্যে কল্যাণকর। বরং রোযা থাকাই তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা তাদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি না করলে তাদের রোযা থাকাই কর্তব্য। তখন রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আল্লাহ্‌র এ কথাটি এবং وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ কথাটি সম্বোধনের শুরুতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রতিই আরোপিত হয়েছে। তবে وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ কথাটি

মুসাফিরদের বলা হতে পারে। যদিও রোযা ও খাবার দেয়ার ইখতিয়ার প্রাপ্ত নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদেরকেও বলা হয়ে থাকতে পারে। তা হলেই এই সকলের জন্যেই রোযা থাকা কল্যাণকর বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণত বহু বিদেশ সফরকারীর পক্ষেই রোযা থাকা সম্ভব, তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য স্বীকার্য যে, তাতে তাদের কষ্ট হতে পারে। তবে এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সফরে রোযা রাখা তা ভাঙ্গা থেকে অনেক ভালো। তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, এক দিনের নফল রোযা রাখা অর্ধ সা' সাদকা দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। কেননা এটা ফরয রোযার ব্যাপার। লক্ষণীয় যে, ফরয রোযায়ই তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, হয় সে রোযা রাখবে, না হয় অর্ধ সা' পরিমাণ সাদকা দেবে। এতেও রোযা রাখাই উত্তম প্রমাণিত হয়। নফল রোযার ব্যাপারেও অনুরূপ হুকুম হবে, পছন্দনীয়।

গর্ভবতী ও স্তন দানকারী

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, জুফর, সওরী, আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, গর্ভবতী নারী ও স্তন দানকারী মাতা যদি নিজেদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি হবে রোযা রাখলে মনে করে, তা হলে তারা তা রাখবে না। পরে কাযা করবে। এদের জন্যে তাদেরকে কোন কাফফারা দিতে হবে না। ইমাম মালিক দুগ্ধদানকারী মাতা সম্পর্কে বলেছেন, রোযা থাকলে তার সন্তানের ক্ষতি হবে বলে যে ভয় পায়, শিশুও অন্য কারো দুধ না খায়, তা হলে সে রোযা রাখবে না, পরে কাযা করবে ও সেই সাথে প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীনকে এক 'মুদ্দ' করে খাবার খাওয়াবে। আর গর্ভবতী অনুরূপ কারণে রোযা না রাখলে তাকে খাবার খাওয়াতে হবে না; লাইস ইবনে সাদও এই মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, ওরা দুজন নিজেদের ক্ষতি হওয়ার ভয় পেলে ওরা ঠিক রোগীর মত গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তারা দুজন তাদের সন্তানদের ক্ষতির আশংকা বোধ করলে তারা রোযা ভাঙ্গবে। তবে তাদের দুজনকেই তা কাযা করতে হবে, কাফফারাও দিতে হবে। রোযা রাখতে সক্ষম না হলে তারা যেন রোগী। তাদের রোযা কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

البويطى। গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা এসেছে, গর্ভবতীকে রোযা ভাঙ্গার দরুন খাবার খাওয়াতে হবে না। আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে তিনটি দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন, রোযা ভাঙ্গলে তাদের দুজনকেই তার 'কাযা' করতে হবে। তবে তাদের ফিদিয়া দিতে হবে না। ইবরাহীম, হাসান ও আতা প্রমুখ তাবেয়ীন এই মত-ই গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তাদের ফিদিয়া দিতে হবে, রোযা কাযা করতে হবে না। ইবনে উমর (রা) ও মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে, রোযা কাযাও করতে হবে।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ

আল-ইয়ামানী আবূ উবায়দ আল-কাসে ইবনে সালাম ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম, আইয়ূব আবূ কালাবাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পরে বলেছেন, যিনি আমাকে এই হাদীস শুনিয়েছেন, তুমি কি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও ? পরে তিনি আমাকে পথ জানিয়ে দিলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বললেন, আমাকে আমার নিকটবর্তী আনাস ইবনে মালিক এই হাদীস বলেছেন। বললেন, আমার এক প্রতিবেশীর উট নিয়ে তাতে বসে রাসূলের করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর পাশে বসলাম। তিনি তখন খাবার খাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি খাবার খেতে আহ্বান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি তোমাকে বলব, আল্লাহ মুসাফির-এর অর্ধেক নামায ও রোযা হ্রাস করে দিয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতারও। এ কথা বলার পর হাঁপাইতেছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আমাকে যখন তিনি খাবার খেতে ডাকলেন তখন তাঁর খাবার থেকে খাওয়া কি আমার উচিত ছিল না ?

আবূ বকর বলেছেন, মুসাফিরের নামায চার রাক'আতের অর্ধেক। এ কথা ঠিক। কিন্তু গর্ভবতী ও স্তনদায়ী মাতার অর্ধেক নামায পড়ার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। উপরোদ্ধৃত হাদীসে আমাদের পক্ষের প্রমাণ আছে এদিক দিয়ে যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ীর রোযা প্রত্যাহার করাটা ঠিক মুসাফিরের রোযা প্রত্যাহারের মতই ব্যাপার। মুসাফিরের রোযা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, ঠিক সেই কথাই রয়েছে দুগ্ধদায়ী মাতা ও গর্ভবতী সম্পর্কে। কেননা বর্ণনাধারায় তাকে এমনভাবে সংযোজিত করা হয়েছে যে, মাঝখানে অন্য কোন জিনিসের উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা প্রত্যাহারকরণ মুসাফিরের রোযা প্রত্যাহার করার মতই। এ দুয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আর এ তো জানা-ই আছে যে, মূসাফিরের রোযা প্রত্যাহারের অর্থ হচ্ছে, না-থাকা রোযা কাযা করতে হবে কোন ফিদিয়া দেয়া ছাড়া-ই। ফলে তা অনিবার্যভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার মতোই হল। আর তা থেকেই বোঝা গেল যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার মধ্যে তখন কোন পার্থক্য থাকে না, যখন তারা দুজনই রোযার কারণে নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ক্ষতি হওয়া আশঙ্কা বোধ করে। স্বয়ং নবী করীম (স) এ দুজনার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। উপরন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা কাযা করতে পারবে—এই আশা হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুজনার জন্যে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ, তখন তারা দুজন অবশ্যম্ভাবীরূপে রোগী ও মুসাফিরের মতো হয়ে গেল।

রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—উভয়ই কর্তব্য বলে যাঁরা মনে করে এবং وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ – আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, তা কিন্তু সহীহ নয়। কেননা ও আয়াত থেকে তাদের দাবি সত্য প্রমানিত হয় না। তা এজন্যে যে, আমরা ইতিপূর্বে সাহাবিগণের এক জামা'আতের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি যে, তা নিজ বাড়িতে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ফরয এবং তার ইখতিয়ার ছিল রোযা রাখা ও না রেখে ফিদিয়া দেয়ার। এ পর্যায়ে যা যা প্রমাণিত হয়, তা-ও আমরা বলেছি। এ পর্যায়ের কথা নিছক কোন 'রায়' নয়। তা হচ্ছে تَوْقِيف রাসূল কর্তৃক নির্দিষ্ট। অতএব

গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার সম্পর্কে তারা যা বলেছে, তা সঙ্গত হতে পারে না। অতএব তার ব্যাখ্যা আমরা যা বলেছি, তা-ই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। আয়াতাংশ দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, এ আয়াতকে তাদের মতের দলীল হিসেবে পেশ করা সঠিক কাজ নয়। কেননা সে কথাটি এই কথার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ 'রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।' জানা আছে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে তাদেরকে, যারা আয়াতের শুরু অংশে শামিল রয়েছে। আর তা গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার প্রসঙ্গে বলা হয়নি। কেননা তারা দুজন যখন রোযার ক্ষতির ভয় পায়, তখন রোযা রাখা তাদের জন্যে কল্যাণকর নয়। বরং তা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। আর যদি তাদের নিজেদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে তাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গাই জায়েয নয়। এ কথায় এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল রয়েছে এই বিষয়ের যে, উক্ত আয়াতে তাদের কথা বলা হয়নি। যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতাকে এ আয়াতের আওতায় নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, তাদের ফিদিয়া দান ও কাযা দুটাই করতে হবে, তাদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ এই খাবারের নাম রেখেছেন 'ফিদিয়া'। আর ফিদিয়া অন্য কোন জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয়, এটা করলেই সেটার দায়িত্ব যথেষ্টভাবে পালিত হয়ে যায়। এ কারণে রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—উভয়টার একত্রিত হওয়া সঙ্গত নয়। কাযা ওয়াজিব হলে তা যে-কাজ করা হয়নি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। অতএব এ ক্ষেত্রে খাবার খাওয়ানো ফিদিয়া হবে না, আর যদি ফিদিয়াটা সহীহ্ হয়, তা হলে কাযা করা জরুরী হবে না। কেননা ফিদিয়াই তো তার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।

যদি বলা হয়, না-রাখা রোযার কাযা ও খাবার খাওয়ানো দুটোই না-রাখা রোযার স্থলাভিষিক্ত হওয়া কেন নিষিদ্ধ হবে ? কোন্ জিনিস নিষেধ করছে ?

জবাবে বলা হবে, দুটো একত্রিত হয়ে না-রাখা রোযার স্থলাভিষিক্ত হলে খাবার খাওয়ানোটা ফিদিয়ার কতকাংশ হবে, সম্পূর্ণ ফিদিয়া হবে না। অথচ আল্লাহ্‌র রাখা নাম হল ফিদিয়া। এর ফলে তোমার ব্যাখ্যাটা আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হয়েছে যে কারণে, তা হল; ফিদিয়া দেয়া। আমরা পূর্বের ফিকাহবিদদের এই মত উল্লেখ করেছি যে, ফিদিয়া দেয়া বা রোযা রাখা এ দুটির একটি করা ওয়াজিব। এক সাথে দুটি নয়। তাহলে তাকে এ দাবির পক্ষে দলীল হিসেবে কি করে পেশ করা যায় যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতাকে এক সাথে দুটো কাজই করতে হবে—রোযাও রাখতে হবে আর ফিদিয়াও দিতে হবে ?

অন্যদিক দিয়ে একথা জানাই আছে যে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ-এ 'রোযা না-থাকা' কথাটি উহ্য আছে। যেন বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না-রাখে, তাদের জন্যে মিসকীনকে খাবার ফিদিয়া হিসেবে দেয়া ওয়াজিব।

আল্লাহ্ যখন শুধু ফিদিয়ারই উল্লেখ করেছেন ওয়াজিব হিসেবে, তখন তা ছাড়া বা তার সাথে অন্যে কিছু ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তা করা হলে আল্লাহ্‌র ঘোষণার উপর অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে। কেননা نص -এর উপর অনুরূপ আর একটি نص ছাড়া কিছু বাড়ানো যেতে পারে না। কিন্তু তারা দুজন থুড়থুড়ে বুড়োর মত নয়। সে যে রোযা রাখতে পারবে, তার তো কোন আশা-ই করা যেতে পারে না। সে তার রোযা পালন থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ ও অক্ষম হয়ে গেছে। অতএব তার না-রাখা রোযা কাযা করার কথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর যে খাবার দেয়া তার কর্তব্য, তা তার জন্যে ফিদিয়া। কেননা তা তার রোযার স্থানে বিকল্প হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা পরে কাযা করতে পারবে বলে আশা করা যায়। অতএব তারা দুজন রোগীও মুসাফিরের মতো। ইবনে আব্বাসের পক্ষে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসেবে পেশ করার সুযোগ রয়েছে। কেননা তিনি শুধু ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন, রোযা কাযা করার কথা বলেন না। তা সত্ত্বেও গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা যদি তাদের সন্তানের ক্ষতি হওয়ার ভয় পায়, নিজেদের ক্ষতির ভয় নয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা রোযা রাখতে সক্ষম। তাহলে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থে তারা দুজনই শামিল। ইবনে আব্বাস এ কথাই বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা, ইবনে ইসমাঈল, আবান, কাতাদাহ্ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ইকরামা তাঁকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস তাকে হাদীস শুনিয়েছেন এই আয়াত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পর্যায়ে। বলেছেন, এ আয়াত গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার জন্যে ফিদিয়া প্রমাণ করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইবনুল মুসান্না, ইবনে আবূ আদী সাঈদ, কাতাদাহ্, উজরাতা সাইদ ইবনে জুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে এ আয়াত পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, থুড়থুড়ে বুড়োর ও সে মেয়ে লোকদের জন্যে রুখসত প্রমাণ করেছে। রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও তারা তা ভাঙ্গতে পারে ও প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয় পেলে তারা রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীন খাওয়াবে। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস আয়াতের বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এবং ফিদিয়া ওয়াজিব বলেছেন, রোযা কাযা করা নয়। যদি তারা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয়ে রোযা ভাঙ্গে, রোযা রাখতে নিজেরা সক্ষম হয়েও—আয়াতটির হুকুম তাদের দুজনকে শামিল করে।

আবূ বকর বলেছেন, যে লোক এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা এ মত প্রকাশ করেছে যে, ইবনে আব্বাস প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, রোযা রাখতে সক্ষম সব লোকের জন্যেই এ হুকুম, রোযা রাখা বা ফিদিয়া দেয়া—দুটির যে কোন একটি করার

ইখতিয়ার সকলেরই রয়েছে। এ কথায় একজন সুস্থ্য—রোযা রাখতে সক্ষম—ব্যক্তিকেও শামিল করে। তাই গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর মধ্যে গণ্য হওয়া সঙ্গত নয়। কেননা তাদেরকে তো এই ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। কেননা তারা দুজন হয় ভয় পেয়ে গেছে। তাই তাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গা একমাত্র কাজ, কোন ইখতিয়ার ছাড়াই। অথবা রোযা রাখায় তাদের কোন ভয়-ই রোধ হয়নি বলে তাঁদের কোন ইখতিয়ারেরও প্রশ্ন নেই। আয়াতটি এই শ্রেণীর লোককে একটি হুকুমের অধীন শামিল করবে তা বাহ্যিকভাবে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বোঝায়—তা সঙ্গত নয়। আর দুই শ্রেণীর এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে খাবার দেয়া ও রোযা রাখার ইখতিয়ার এবং অপর শ্রেণীর জন্যে ফরয হিসেবে রোযা—কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই অথবা শুধু ফিদিয়া দেয়া কোন ইখতিয়ার ছাড়াই প্রমাণ করাও সঙ্গত নয়। আয়াত তো তাদের দুশ্রেণীর লোকদেরকে একই দিক দিয়ে শামিল করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতটি গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাকে শামিল করে না, আয়াতটিতে তাদের সম্পর্কে কথা বলা হয়নি।

আয়াতের ধারাবাহিকতায় وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ আয়াতটিও উপরের কথাটিকেই সত্য প্রমাণ করে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয়ে রোযা না রাখলে আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্যে কোন হুকুম নেই, কেননা রোযা তাদের জন্যে কল্যাণময় হয় না। আমরা উপরে আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরী থেকে বর্ণিত যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তাও ঐ কথাই বোঝায়। তাতে রাসূলে করীম (স) রোগী, মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাকে রোযা সংক্রান্ত হুকুমে সমান ও অভিন্ন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ 'রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে' আয়াতেও তা-ই বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা পূর্বে আগের মনীষীদের এই কথা উল্লেখ করেছি যে, প্রথমে প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা ফরয ছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথাটির দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, রমযান মাসের কুরআন নাযিল হওয়া সংক্রান্ত এ আয়াতটি 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীর উপর ফরয করা হয়েছিল,' এবং তাঁর কথা 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ' এ দুটির ব্যাখ্যা দিয়েছে। ফলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন রমযান মাসেরই। এক্ষণে 'কতিপয় দিনের রোযা' কথাটি 'রমযান মাস' এই আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে ধরে নিলে তা হলে এক সাথে প্রথম আয়াত থেকে দুটি হুকুম মনসূখ মনে করতে হয়। একটি 'কয়েকটি দিন' যা রমযান মাসের নয়। আর দ্বিতীয় রোযা রাখা ও খাবার দেয়ার মধ্যে—যে-কোন একটি করার ইখতিয়ার যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—আগের ফিকাহবিদদের মত হিসেবে। আর 'রমযান মাস' 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন'-এর ব্যাখ্যা হয়ে থাকে, তা হলে তা অবশ্যই ফরয রোযার হুকুম নাযিল হওয়ার পর হবে, —যাতে রোযা থাকা বা ফিদিয়া দেয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল প্রাথমিক অবস্থায়। তা হলে এ হুকুমটি স্থিতিশীল ও প্রমাণিত হয়ে গেল। তার পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে কাজ ও দৃঢ়তা

লাভের পূর্বেই। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটিই সহীহ্। কেননা আগের ফিকাহবিদদের এই বর্ণনা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে যে, রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়া—এ দুটির যে কোন একটি করার ইখতিয়ার রমযান মাসেই কার্যকর ছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'যে লোক এই মাসটি পাবে সে যেন অবশ্যই সে মাস ভরে রোযা রাখে' এই কথাটি দ্বারা।

যদি বলা হয়, আয়াতটির তাৎপর্যেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন' অর্থ রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ের দিন। কেননা কথাটি রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ারের উল্লেখের সঙ্গে মিলিয়ে ও পাশাপাশি বলা হয়েছে। 'কতিপয় নির্দিষ্ট দিন' যদি মোটামুটিভাবে ফরয রোযার দিন হিসেবে বলা হয়ে থাকত, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তাহলে ফরয প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ারের কথা বলার কোন অর্থ হতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, একটা ফরযের কথা মোটামুটিভাবে বলা—যার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং যা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল—নিষিদ্ধ নয়। যখনই তার ব্যাখ্যা এসে যাবে, যা বলা উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করে তোলা হবে, তখন তার হুকুমটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তখন বক্তব্যটা এরূপ দাঁড়াবে ঃ

'কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন, তার সময়টা নির্দিষ্ট করে বলে দিলেও তার পরিমাণ (বা সংখ্যা) জানিয়ে দিলে তখন লোকেরা—যাদেরকে কথাটি বলা হয়েছে—রোযাও 'না' রেখে ফিদিয়া দেয়ার মাঝে ইখতিয়ার সম্পন্ন হবে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا –

তুমি তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত নিয়ে নাও, তুমি তদ্দারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।

এ আয়াতে 'মাল' একটা সাধারণ ও অনির্দিষ্ট কথা। এদিক দিয়ে যে কোন মালের প্রসঙ্গে এই হুকুমটা কার্যকর করা যেতে পারে। আর আয়াতের শব্দ الصدقة। অস্পষ্ট ও মোটামুটি কথা। তার ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। পরে যখন এই 'সাদকা' শব্দের ব্যাখ্যা এসে যাবে, তখন মালের নামের সাধারণত্ব সেই সাদকার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। এর বহু কয়টি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কথা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ হয়ত শেষে নাযিল হতে থাকবে, যদি পাঠকালে তা প্রথমেই আসে। এ অবস্থায় আয়াতটির মূল বক্তব্য ও তার অর্থের বিন্যাস এই হবে ঃ

কতিপয় নির্দিষ্ট দিন, তা রমযান মাসেরই। তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে বা হবে বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময়কাল হবে অন্য দিনে। আর যারা তা রাখতে অক্ষম, তাদের একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য।

তাহলে এটা একটা প্রমাণিত হুকুম হয়ে যায়। কালের একটা সময়ের উপর স্থিতিশীল হয়ে দাঁড়ায়। এর পর নাযিল হয় ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

যে এই মাসটা পাবে, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে।

ফলে রোযা না-রেখে ফিদিয়া দেয়া এবং রোযা রাখার মধ্যকার ইখতিয়ার মনসূখ হয়ে যায়, যেমন পূর্বে বলেছি—আল্লাহ্র কথা ঃ 'মূসা যখন তার লোকদেরকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ করেছেন। 'শব্দ ও বিন্যাসে' শেষে এসেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি—তা পাঠের শেষে এলেও নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে আগে। আর দ্বিতীয়—এখানে দুটি কথার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে واو দিয়ে। তা কিন্তু বিন্যাস বোঝায় না। বরং বুঝতে হবে, সবই যেন একত্রে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'কতিয় নির্দিষ্ট দিন' 'রমযান মাস' পর্যন্ত উপরোক্ত গাভী সংক্রান্ত কাহিনীর মতোই। 'আর যে লোক এই মাস পারে, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে'—এ কয়েকটি হুকুম নিহিত রয়েছে। একটি—যে লোক মাসটি পাবে, রোযা রাখা তার জন্যে ফরয। যে পাবে না তার জন্যে নয়। এমতাবস্থায় কুরআনে যদি শুধু বলা হতো ঃ 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয বলা হয়েছে .... রমযান মাসের, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে'—তা হলেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যেত। তা হলেই শরীয়াত পালনে বাধ্য সব মানুষের জন্যে রোযা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত, কিন্তু তার পরে যখন বলা হল ঃ 'যে এই মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে'—তখন এর দ্বারা বলে দেয়া হল যে, রমযান মাসের রোযা কেবল কিছু লোকের জন্যে ফরয, অপর কিছু লোকের জন্যে নয়। অর্থাৎ যারা মাসটিকে পাবে তারাই রোযা রাখবে, যারা পারে না তারা রাখবে না।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ 'যে লোক সে মাসটি পাবে'-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যে লোক পেল—অর্থাৎ এই মাসে নিজ বাড়িতে উপস্থি থাকবে—মুসাফির হবে না যেমন উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে 'মুকীম' ও 'মুসাফির' বলা হয়। তাতে রোযা বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক হবে নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদের জন্যে। যারা মুসাফির, বিদেশ প্রবাসী, তাদের জন্যে নয়। যদি এতটুকুই বলা হতো তাহলে রোযা সীমিত হয়ে থাকত বাড়ীতে থাকা লোকদের মধ্যে, মুসাফিরদের মধ্যে রোযার কোন প্রশ্ন হতো না। কেননা আয়াতে তাদের কথা বলা হয়নি। ফলে তাদের না রোযা রাখার দায়িত্ব, না তাদের কাযা করার। কিন্তু পরে আল্লাহ্ যখন বললেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

তোমাদের মধ্যে যে রোগক্রান্ত বা বিদেশ সফরে থাকবে, তাদের রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।

এত রোগী ও মুসাফির সম্পর্কে বলে দেয়া হল যে, তাদের রোযা কাযা করতে হবে যদি তারা না রেখে থাকে। এই তাৎপর্য তখনকার فَمَنْ شَهِدَ-এর অর্থ যদি হয়

বাড়িতে উপস্থিত ও অবস্থানকারী বলা হয়। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, যে লোক এই মাসের আগমন জানতে পারবে অথবা যে লোক রোযার মাসের রোযা রাখা কর্তব্য বুঝবে, কেননা পাগল তা বুঝে না, অতএব তার উপর রোযা ফরয নয়। তা হলে এ আয়াতে মাস দর্শন বা মাসে বাড়িতে উপস্থিত থাকাই হল রোযা রাখার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কারণ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ

বোবা, কালা, অন্ধ।

বলা হয়েছে সে সব লোককে যারা ঈমানের আহ্বান শুনেও তা গ্রহণ করে না, সত্য দেখেও মেনে নেয় না, সত্য পথ সম্মুখে উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখতে পায় না।

অথবা যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

নিশ্চয়ই তাতে নসীহত রয়েছে তার জন্যে, যার হৃদয় আছে।

'হৃদয়' মানে বিবেক-বুদ্ধি। কেননা যে-লোক তার বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হয় না, তার যেন হৃদয়ই নেই। বিবেক-বুদ্ধির সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। এমনিভাবে এটা সঙ্গত যে, রমযান মাস বাড়িতে উপস্থিত থাকাই রোযা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কারণ। কেননা যে লোকের উপর রোযা ফরয হয়নি, সে যেন বর্তমানই নেই অর্থাৎ তার উপর থেকে রোযা রাখার হুকুমটাই পড়ে গেছে, সরে গেছে। আর—

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক এ মাস পেল, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে।

আয়াতটি থেকে যে আইন-বিধান পাওয়া গেল, তা হল, রমযান মাস ভরে রোযা ফরয, এই মাসের উপস্থিত থাকার অর্থ, সে রোযা রাখতে বাধ্য। পাগল ও অন্যান্য যার যার উপর তা অর্পিত নয়, তাদের জন্যে এই মাসের রোযা বাধ্যতামূলক নয়।

রমযানের সমগ্র মাস কিংবা তার কিছুদিন যে লোক পাগল থাকে

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও সওরী বলেছেন, কেউ যদি সারা রমযান মাসে পাগল হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে রোযা থাকা হয়নি বলে তা কাযা করা তার জন্যে জরুরী নয়। তবে এই রমযান মাস শেষ হওয়ার আগেই এবং কিছুদিন থাকা অবস্থায় সে যদি সুস্থ হয়, তাহলে পরে সমস্ত রোযা করাই তার কর্তব্য হবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত কোন লোক যদি পাগল হয়, অথচ সে রোযা রাখতে সক্ষম, পাগল অবস্থায় দুই বছর অতিবাহিত হয় এবং পরে সুস্থ হয় তাহলে এ বছরগুলোর রোযা তাকে কাযা করতে হবে। অবশ্য নামায কাযা করতে হবে না।

উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান জড় বুদ্ধির লোক সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায-রোযা কিছুই আদায় না করে থাকলে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর তা কাযা করার প্রয়োজন নেই। আর গাপল সম্পর্কে বলেছে, যে পাগল সুস্থ হয় কিংবা যে পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হয় এবং পরে ভালো হয়ে যায়,—আমি মনে করি, তার না-করা নামায-রোযা কাযা করা কর্তব্য। ইমাম শাফেয়ী البويطى গ্রন্থে বলেছেন, যে লোক রমযান মাসে পাগল হবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। রমযান মাসের কোন একদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি ভালো হয়ে যায়, তবুও কাযা করা তার কর্তব্য হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'যে লোক এই মাস পাবে, তার উচিত সে মাস ভরে রোযা থাকা'। সারামাস ধরে পাগল অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্যে তা কাযা করা ওয়াজিব নয় বলে ঘোষণা করছে, কেননা সে তো সে মাস পায়নি, পেলেই না তার রোযা থাকা কর্তব্য হতো, পাগলের উপর শরীয়াত পালনের দায়িত্ব নেই। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ -

তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে। নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি যতক্ষণে সে জেগে না উঠছে, বালক যতক্ষণে সে পূর্ণ বয়স্কতা না পাচ্ছে এবং পাগল, যতক্ষণে সে পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে না উঠছে।

যদি বলা হয়, উপরোদ্ধৃত আয়াতে রযমান মাস পাওয়া বলতে নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা ও বিদেশ সফরে না-থাকা বুঝিয়েছে। রমযান মাস পাওয়ার যে অর্থ করা হল শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়া—তা তো বলা হয়নি। তোমার এ কথার যথার্থতার ভিত্তি কি? এতে তো বাড়িতে থাকা বলা হয়নি?

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ দুটি অর্থই দিতে পারে। অর্থ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। এক সাথে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। রোযা রাখা কর্তব্য হওয়ার জন্যে এ দুটিই শর্ত হতে পারে। অতএব সে হিসেবেই তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে। আমরা হানাফী মাযহাবে তা-ই গ্রহণ করেছি। কেননা রোযা পালনে বাধ্য—তা না-রাখার রুখসত প্রাপ্ত নয়, এমন ব্যক্তি হতে পারে কেবল সে, যে পূর্ণ বয়স্ক ও নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী। আর শরীয়াত পালনে বাধ্য হলেই না তাকে তা পালন করতে বলা যেতে পারে। একথা যখন প্রমাণিত হল, পাগল শরীয়াত পালনের যোগ্যই থাকেনি এই রমযান মাসে। কাজেই তাকে রোযা থাকতে বলা যেতে পারে না। অতএব রোযা কাযা করাও তার কর্তব্য হবে না। রাসূলে করীম (স) উপরোদ্ধৃত কথা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত কথা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত কথায় যে رُفِعَ الْقَلَمُ 'কলম তুলে নেয়ার' কথা বলা হয়েছে তার অর্থ—সে তিন জনের উপর শরীয়াতের হুকুম পালনের দায়িত্ব নেই। উপরন্তু পাগল

হয়ে যাওয়া লোকের পাগলামী স্থায়ী হলে তার উপর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অপর একজনকে করতে হবে। ফলে তখন সে অপ্রাপ্ত বয়সের বালক সমতুল্য হয়ে যাবে। রমযানের সারা মাস পাগল থাকলে সারা মাসই তার উপর শরীয়াত পালনের কর্তব্য রহিত হয়ে থাকবে। তবে এই তাৎপর্য মূর্ছা যাওয়া অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থা বোঝায়। কেননা কেউ মূর্ছা গেলে সেই সময়ের জন্যে তার উপর কারোর পরিচালক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তা যত দীর্ঘই হোক-না-কেন। মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তি পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অভিন্ন নয়। বরং মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তিকে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। আর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির উপর কারোর নতুন অভিভাবকত্বের প্রশ্ন উঠে না।

যদি বলা হয়, মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিকেও তো শরীয়াতের কোন হুকুম পালন করতে বলা যায় না, ঠিক যেমন পাগলকে বলা যায় না। শরীয়াত পালনের দায়িত্ব تكليف এদের দুজনের উপর থেকেই সমানভাবে উঠে যায়। অতএব মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিরও রোযা কাযা করার প্রশ্ন তোলা যায় না।

জবাবে বলা যাবে, মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিকে ঠিক অবস্থায় শরীয়াত পালনের নির্দেশ দেয়া যায় না, একথা ঠিক। কিন্তু অপর একটি ভিত্তিতে তার রোযা কাযা করা কর্তব্য বলা যেতে পারে। তা হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

যে লোক রোগাক্রান্ত হবে বা হবে বিদেশ সফরে তার রোযা থাকার সময় অন্য দিনগুলোতে।

মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তি যে একজন রোগী বা রোগাক্রান্ত তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অতএব সাধারণ ভাবেই তার না-রাখা রোযা কাযা করা ওয়াজিব বলতে হবে। যদিও ঠিক মূর্ছা যাওয়ার সময়টিতে সে শরীয়াত পালনে বাধ্য ছিল না; কিন্তু সে সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তো সে শরীয়াত পালনে বাধ্য। কিন্তু পাগলকে সাধারণভাবে ঠিক 'রোগী' বলা যায় না। কাজেই যাদের উপর আল্লাহ রোযা কাযা করা কর্তব্য করেছেন, পাগল তাদের মধ্যে গণ্য নয়। তবে রমযান মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি পাগলামী থেকে ভালো হয়ে যায়, তবে ফিকাহবিদগণ মনে করেছে, না-থাকা রোযাগুলো তাকে কাযা করতে হবে। কেননা সে তখন 'যে লোক এই মাস পেল, সে যেন এ মাস ভরে রোযা থাকে' আল্লাহ্‌র এ কথার মুখোমুখী হয়ে পড়ে। সে তো মাস পেয়েছে। একটি অংশ হলেও সে তখন শরীয়াত পালনে বাধ্য। কেননা 'মাস পাওয়া' কথার অর্থ গোটা মাস পাওয়া যেমন হতে পারে, তেমনি তার কোন অংশ পাওয়া হতে পারে। তবে গোটা মাসই মাস পাওয়ার শর্ত হবে, দুটি কারণে তা সঙ্গত নয়। একটি হচ্ছে, তাতে ব্যবহৃত শব্দের পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা দেয়। কেননা যদি তা-ই হয় তাহলে গোটা মাস অতিবাহিত হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত 'মাস পেয়েছে' বলা যাবে না। আর সমস্ত মাসটির অতিবাহিত

হওয়া রোযা পালনের জন্যে শর্ত হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা মাসের যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে রোযা পালন তো সম্ভব হয়নি। কাজেই বুঝতে হবে মাস পাওয়ার জন্যে গোটা মাস পাওয়াই অর্থ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, যার উপর রমযান মাস এসে যাবে, সে-ই রোযা পালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত , তারই কর্তব্য প্রথম দিন থেকেই রোযা থাকা। কেননা সে মাসের একটা অংশ তো পেয়ে গেছে। আর সেজন্য রোযা পালনে দায়িত্বশীল হয়েছে।

যদি বলা হয়, যেমন বলেছ, মাসের একটা অংশ পেলেই সে মাসটা পেয়ে গেছে বুঝতে হবে এবং যে অংশ সে পেয়েছে সেই অংশেরই রোযা পালন করতে হবে, অন্যটা নয়, কেননা মাসের অংশ পাওয়াটাও রোযা পালনের বাধ্যবাধকতার জন্যে শর্ত। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায়, যে লোক মাসের কতক অংশ পাবে, সে সেই কতকাংশের রোযা রাখবে।

জবাবে বলা যাবে, যা ধারণা করেছ, ব্যাপারটা তা নয়। মাসের কিছু অংশ রোযা পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত—এ কথার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ দাবিই হচ্ছে সমগ্র মাসটা পাওয়া রোযা পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে। যখন এ কথার দলীল পাওয়া গেল যে, রোযা পালনের বাধ্যতার জন্যে অংশই লক্ষ্য—সম্পূর্ণটা নয়, তখন আমরা সেই অর্থেই তা গ্রহণ করলাম। সমস্ত মাস রোযা রাখার কর্তব্য পর্যায়ে শব্দের হুকুম অবশিষ্ট থেকে গেল। কেননা মাসের নাম গোটা মাসেরই নাম। তাই কথাটি এরূপ হবে; তোমাদের যে লোক মাসের খানিকটা সময়-ও পাবে, তার-ই কর্তব্য সমগ্র মাসটা ধরে রোযা রাখা।

যদি বলা হয়, পাগল যদি সুস্থ হয় এমন সময়, যখন মাসের বেশ কিছু দিন তখনও বাকী আছে, তখন অতীত দিনগুলোর রোযার কাযা করা বাধ্যতামূলক করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সে বাধ্যবাধকতা মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর ব্যাপারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার কর্তব্য হবে ঠিক মূল সেই দিনগুলোরই রোযা রাখা হিসেবে নয়। তখন রোযা রাখার হুকুম তার প্রতি না থাকলেও বা সেরূপ নির্দেশ দেয়া নিষিদ্ধ হলেও কাযা করা বাধ্যতামূলক হতে পারে। লক্ষণীয়, যে রোযা রাখতে ভুলে গেছে, যার উপর মূর্ছা চেপেছে, যে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে, এদের প্রত্যেককে বর্ণিত অবস্থায় রোযা রাখতে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সে কারণে তার কাযা করাও বাধ্যতামূলক হবে না, তার তো কোন কারণ নেই। অনুরূপভাবে যে লোক নামায পড়তে ভুলে গেছে বা নামাযের সময় নিদ্রামগ্ন থাকার দরুন পড়েনি, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। রোযা রাখার জন্যে আদেশ করা দুটি দিক দিয়ে কার্যকর হতে পারে। একটি—যখন তা ফরয, আদায় করা বাধ্যতামূলক, তখন তা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার কাযা করা। যদিও মূর্ছা যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার মুহূর্তে তার প্রতি তা পালনের নির্দেশ আরোপিত হয়নি।

রমযানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকতে বালকের পূর্ণ বয়স্কতা লাভ ও কাফির-এর মুসলিম হওয়া

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক সে মাসটি পেল, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে।

আমরা বলেছি, মাসটি পাওয়ার অর্থ, মাসের যে কোন অংশ পাওয়া। যে বালক রমযানের কোন অংশে পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করে কিংবা কোন কাফির এই সময়ে ঈমান গ্রহণ করে মুসলিম হয়, রোযা রাখার ব্যাপারে তার করণীয় পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক ইবনে আনাস তাঁর 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে এবং উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান, লাইস ও শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন, অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা তাকে রাখতে হবে। তবে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা 'কাযা' করতে হবে না। যে দিনটিতে বালক পূর্ণবয়স্কতা পেয়েছে আর যে দিনটিতে কাফির ইসলাম কবুল করেছে সেই দিনটিরও রোযা কাযা করতে হবে না। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, আমার পছন্দ তো এই যে, সে দিনটির রোযা কাযা করা উচিত।

ইমাম আল-আওজায়ী বালকের অর্ধ রমযানে পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করলে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা তার কাযা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সে তো রোযা রাখতে সক্ষম। আর কাফির ইসলাম কবুল করলে অতীত দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে না। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ঠিক সেই দিনের রোযাটা না রাখলেও বালকের পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও কাফিরের ইসলাম গ্রহণের দিন ঠিক রোযাদারের মতই পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা, 'যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন সে মাসটির রোযা রাখে' আয়াতটির অর্থ ও তাৎপর্য আমরা পূর্বে বিস্তারিত বলে এসেছি। রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়া। অপূর্ণবয়স্ক বালক তো পূর্ণবয়স্কতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত শরীয়াত পালনে বাধ্য নয়। কাজেই তার প্রতি রোযা রাখার হুকুম করা সমীচীন নয়। তা ছাড়া বালকত্ব রোযার শুদ্ধতার পরিপন্থী। রোযা রাখলেও তা যথার্থ হয় না। তাদেরকেও যদি রোযা রাখতে বলা হয়, তা হবে শিক্ষার জন্যে—রোযা রাখার অভ্যাস করার জন্যে। যেমন পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তাকে বলা হয় না—বলা যায় না যে, তোমার বালক থাকালীন নামাযসমূহ এখন কাযা কর। অনুরূপভাবে রোযা কাযা করারও প্রশ্ন নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ছোট বয়সে না-পড়া নামায ও না-রাখা রোযাসমূহ পূর্ণ বয়স্কতা পাওয়ার পর কাযা করা বাধ্যতামূলক হতে পারে না। ঠিক এভাবেই রোযার মাসের যে দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হলে বিগত বছরের রোযা কাযা করাও কর্তব্য হয়ে পড়ে। সে তা পারে

না—এমন তো নয়। এ কারণে সমগ্র মুসলমান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, বিগত বছরগুলোর বা এক বছরের রোযা কাযা করা জরুরী নয়, যদিও তা করার সাধ্য তার আছে। তাই যে মাসের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় যদি বালক পূর্ণবয়স্কতা পায় বা কাফির মুসলিম হয়, তা হলে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে না।

কাফিরও এদিক দিয়ে বালকের মতই। কেননা তাকে রোযা রাখার দায়িত্বশীল মনে করা যায় না। তার পূর্বে ঈমান গ্রহণ জরুরী শর্ত। কুফরকে অস্বীকার করা আবশ্যক। তবেই না তার রোযা রাখা সহীহ্ হতে পারে। এ কারণে সে বালকের মতই হয়ে গেল। তবে পাগল এ থেকে ভিন্ন। সে যদি মাসের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকাকালে সুস্থ হয়, তা হলে যে দিনগুলোর রোযা সে রাখতে পারে নি, তার কাযা করা তার কর্তব্য। কেননা পাগলামী রোযা সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু কুফর রোযার পরিপন্থী। এ দিক দিয়ে কাফির বালকের মতই হয়ে যায়। তবে এ দুজনের মধ্যে এদিক দিয়ে পার্থক্য আছে যে, কাফির আযাব পারে, পাগল পাবে না। রমযান মাসের কিছু অংশ থাকা অবস্থায় যে কাফির ইসলাম কবুল করল, তার অতীত রোযাসমূহ কাযা করা জরুরী নয়, তা এই আয়াতটি থেকেও প্রমাণিত হয় ঃ

قَلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ –

কাফির হয়ে যাওয়া লোকদের বল, তারা যেন বিরত থাকে। তাহলে তাদের পূর্বের কুফরী বা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَالْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ –

ইসলাম তার পূর্বের সবকিছু কেটে দেয়, ইসলাম তার পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণকারী রমযানের কিছু দিন এবং বালক তাদের দিনের অবশিষ্ট সময় খাওয়া-পান থেকে বিরত থাকবে। কেননা তারা এ সময় রোযাদার ছিল না। যদি তারা দিন শুরু হওয়ার সময় পূর্ণবয়স্কতা পেত ও মুসলিম হতো, তাহলে তারা উভয়ই রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট হতো। অতএব দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এ ব্যাপারে মূল দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর হাদীস। তিনি আশুরার দিন উঁচু স্থানের অধিবাসীদের নিকট লোক পাঠালেন, বললেন, 'যে খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকে আর যে খায়নি যে যেন রোযা রাখে'।

অপর বর্ণনায় যারা খেয়েছেন, তাদেরকে কাযা করতে বললেন এবং অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে বললেন। যদিও তারা রোযা না-রাখা লোক ছিল। তারা যদি না খেয়ে থাকত, তাহালে তাদেরকে রোযা রাখতে বলা হতো। এই চিন্তাটিকে

আমরা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। দিন অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সে যদি রোযা না-রাখা থাকে, তাহলে রোযাদারের মতই তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা দিনের শুরুতে তারা রোযা পালনের যোগ্য হলে তাদের প্রতি রোযা রাখারই হুকুম হতো। এক্ষণে যদি রোযা তার প্রতি ফরয হয়ে থাকে অথচ সে রোযা রাখেনি, এ কারণে তাকে অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকা অবস্থায় কাটাতে বলা হয়েছে। যদি তার প্রতি এখন রোযা ফরয না হতো, তাহলে অবশ্য অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হতো না।

এ কারণেই হায়য-এর স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, রোযার দিনের কোন এক সময় সে পাক হলে বা মুসাফির বাড়িতে ফিরে এলে তখন তার-ও তাই কর্তব্য। যদিও উভয়ই পূর্বে রোযাদার ছিল না। অবশিষ্ট সময় তাদেরকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা দিনের শুরুতে যদি সে পাক থাকত বা নিজের বাড়িতে থাকত, তাহলে তো তারা রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট হতো।

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, দিনের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি হায়য আসে তাহলে পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হবে না। কেননা দিনের শুরুতে হায়য হলে তাকে নিশ্চয়ই রোযা রাখতে বলা হতো না।

যদি বলা হয়, যে লোক দিনের শুরুতে বাড়িতে অবস্থানকারী ছিল, পরে সফরে যাত্রা করেছে, তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হবে না কেন ? কেননা দিনের শুরুতে সফর অবস্থা হলে তো সে রোযা থাকতে আদিষ্ট হতো না।

তাকে বলা হবে, পূর্বে আমরা রোযা ভাঙ্গার বা রোযা রাখার কোন 'ইল্লাত' ঘোষণা করিনি। আমরা ইল্লাত বানিয়েছি রোযা না-থাকা লোকের পানাহার থেকে বিরত থাকার জন্যে। রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হওয়া বা নিষিদ্ধ হওয়ার অপর এক শর্ত রয়েছে, যার উল্লেখ আমরা ইতোপূর্বে করিনি। তা আল্লাহ্র এ কথায় শামিল রয়েছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক এ মাস পাবে, সে যেন মাস ভরে রোযা রাখে।

এ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়নি—এমন কতগুলো হুকুম সমন্বিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এ আয়াত বলছে, যে লোক সকাল বেলা জানতে পারবে যে, এটা রমযান মাস, তার কর্তব্য হল, সে তার রোযা শুরু করে দেবে। কেননা যে রাতে জানলো আর যে দিনে জানলো, এ দুয়ের মধ্যে আয়াত কোন পার্থক্য করেনি। উভয় অবস্থাই আয়াতের আওতার মধ্যে রয়েছে। এ থেকে এ-ও জানা গেল যে, রমযানের রোযার নিয়্যত রাতেই করতে হবে না, না করলে কোন দোষ হবে না, জায়েয হবে। মূর্ছা-যাওয়া ও পাগল হওয়া ব্যক্তি দিনের কোন অংশে ভালো হয়ে গেলে, পূর্বে রাতে রোযার নিয়্যত নাও করে থাকলে তৎক্ষণাৎই তাদের রোযা শুরু করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা তারা রমযান মাস পেয়েছে। আর আল্লাহ রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে রমযান মাস পাওয়ারই শর্ত করেছেন।

আয়াতটিতে আরও একটি হুকুম রয়েছে। আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, রমযান মাসে যদি কেউ নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে কিংবা অপর কোন ফরয রোযার নিয়্যত করে, সে রমযানের রোযারই সওয়াব বা প্রতিফল পাবে। কেননা রমযান মাসে রোযা রাখারই তো হুকুম হয়েছে এবং সে হুকুম নিঃশর্ত, কোন বিশেষ ধরনের শর্ত দিয়ে তাকে শর্তপূর্ণ করা হয়নি। ফরযেরই যে নিয়্যত করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। রোযা—তা যে ভাবে ও যে ধরনের রাখা হোক—আয়াতের অর্পিত দায়িত্ব তাতেই পালন হয়ে যাবে। তা ছাড়া আর কিছুর কর্তব্য নেই।

আরও হুকুম আছে। রমযান মাসের দিনের শুরুতেই রোযা থাকা বাধ্যতামূলক। কোন লোক একাকীও যদি রমযান মাসের চাঁদ দেখে, তবে তার একারই তা ফরয, অন্যরা তা গ্রহণ না করলেও। তার পক্ষে রোযা না রাখা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। যদিও সেই দিনের রোযা রাখার হুকুম সকলেরই জন্যে। তাদের নিকট তা শাবান মাসের দিন হলেও চাঁদ যে দেখেছে, তার নিকট তা রমযান মাস। রূহ ইবনে উবাদাতা হিশাম ও আশয়াস হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে লোক একাকী রমযান মাসের চাঁদ দেখতে পাবে, সে একাকী রোযা রাখবে না দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সহকারে রোযা রাখবে। ইবনুল মুবারক ইবনে জুরাইজ-আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রমযান মাসের চাঁদ যে লোক দেখতে পাবে অন্যান্য লোকদের আগের সন্ধ্যায়, সে জনগণকে বাদ দিয়ে একাকী রোযা রাখবে না, রোযা শেষও করবে না তাদের পূর্বে।

এই লেখকের মনে সংশয় জেগেছে যে, ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আল-হাসান খুব সাধারণ ও নিঃশর্ত জবাব দিয়েছেন, বলেছেন, সে রোযা রাখবে না। তার মানে কি এই যে, যে-চাঁদ নিজে দেখেছে, তার মনে চাঁদ দেখতে পাওয়ার বিষয় দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই তার মনে নেই, তবুও সে রোযা রাখবে না ? আতা হয়ত রোযা না রাখা মুবাহ মনে করেছেন চাঁদ দেখা সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ হওয়ার কারণে। সে হযরত প্রকৃতপক্ষেই চাঁদ দেখতে পায়নি। সে চাঁদ বলে কল্পনা ও ধারণা করেছে মাত্র।

যে চাঁদ দেখেছে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তার-ই রোযা রাখা ফরয। কেননা চাঁদ কে একাকী দেখেছে আর কে লোকদের সঙ্গে এক সাথে দেখেছে এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্যই করা হয়নি।

এতে আরও একটি হুকুম রয়েছে। কিছু লোকে বলে, রমযান মাস শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে না জেনে নিয়ে রোযা থাকা জায়েয নয় এবং তাঁরা দলীল হিসেবে এ আয়াত পেশ করেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোকই রমযান মাস পাবে, সে-ই যেন মাসভরে রোযা রাখে।

এ আয়াত রোযা ফরয করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই, যে জানতে পেরেছে যে,

রমযান শুরু হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ مَنْ شَهِدَ অর্থ شَاهَدَ وَعَلِمَ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে ও জানতে পেরেছে। যে জানতে পারেনি, সে তার ফরয আদায় করবে না। যদি কেউ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রোযা রাখে, পরে আর সন্দেহ থাকে না, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, তখন আর সন্দেহ-সংশয়ের কোন ব্যাপার থাকে না। যেমন দারুল হরব-এ মুসলিম বন্দী যদি একটি মাস ধরে রোযা রাখে আর ঘটনাবশত সেই রমযান মাস হয়ে যায়, ফিকাহবিদদের মতে যার এরূপ অবস্থা, তার রোযা হবে না। আগের দিনের মনীষীদেরও এই মত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী থেকে এ পর্যায়ে দুটি কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি—সে রোযা হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়—তা হবে না। আওজায়ী এহেন বন্দী সম্পর্কে বলেছেন, হ্যাঁ, যদি ঠিক ঠিক ভাবে রমযান মাস হয়, তা হলে তা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী কোন মাস হলেও হবে। আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তার রোযা হয়ে যাবে বলে মত দিয়েছেন। রোযাটা ঠিক রমযান মাস ব্যাপী হোক, কি তার পরবর্তী মাসে হোক। ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। কেউ যদি আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যে রমযান মাসের সন্ধান করে, আর শেষ পর্যন্ত কোন মাস সম্পর্কে তার বিজয়ী ধারণা এই হয় যে, সেটাই রমযান মাস, পরে এই ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং সেটির রমযান মাস হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহই না থাকে, তা হলে তার রোযা হয়ে যাবে। ঠিক যেমন কেউ কোন মেঘাচ্ছন্ন দিনে নামাযের সময় জানবার জন্যে চেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে একটা সময় ঠিক করে নামায পড়ে, পরে তার উপর তার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মে, তাহলে তার এ নামায হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ যদি জানার প্রয়োজনই প্রকাশ করে, তা হলে তার রোযা হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। তা রোযা ফরয হওয়ার জন্যে শর্ত, একথা যদি পূর্বে না-ও জেনে থাকে তার বিলম্বিত হওয়াটাই প্রতিবন্ধক হয় তবু। তা জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই, যা তা প্রমাণ করে। তা জায়েয হবে না বলে যারা মত দিয়েছে, ব্যাপার যদি তা-ই হয়, তা হলে তো যারা দারুল হরব-এর অধিবাসী হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে মাসগুলো সম্পর্কে জানতে পারে না তাদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত হয়ে পড়ে। কেননা সেও রমযান মাসের আগমনের কথা জানতে পারেনি। এজন্যে তাদের কাযা করতে হবে। সে তো রমযান মাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পায়নি। তা এসেছে বলেও জানতে পারেনি।

যে লোক রমযান মাসের আগমন জানলো না, তা সত্ত্বেও রোযা রাখলো, তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে। এ কথায় সব মুসলমানই একমত। তা থেকে বোঝা গেল, রোযা জায়েয হওয়ার জন্যে রমযান মাস সম্পর্কে জানতে পারা শর্ত নয়, যেমন তা কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ও সে মাসের আগমন জানা শর্ত নয়।

যার কথা এই মাত্র বললাম, তার অবস্থা যখন এই হয়েছে রমযান মাসের কথা না জানার কারণে, তাই রোযা না থাকার দরুন তা কাযা জরুরী। যখন সে তার চক্ষু তা

দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে তখন তার রোযা থাকা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র কথা 'তোমাদের যে লোক মাসটি পেল' এর অর্থ হচ্ছে, সে মাসে লোক রোযা পালনের জন্যে দায়িত্বশীল। তাই মাসটি যে অবস্থায়ই দেখতে পেল তার জন্যে রোযা রাখা জায়েয হবে। সে তো মাসের পর্যবেক্ষক, এ কারণেই সে শরীয়াতের দায়িত্বশীল। অতএব আয়াতটি বাহ্যিক অর্থ তাকে জায়েয করে যদিও সে রমযান মাস শুরু হওয়ার বিষয়ে কিছুই জানে না।

মাসের আগমন না জানলে রোযা রাখা জায়েয হওয়াকে যারা অস্বীকার করে, তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছে রাসূলে করীম (স)-এর এই হাদীস ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে। ২৯ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে না পারলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।

তাঁরা বলেছেন, পূর্বাহ্নে চাঁদ দেখেই রোযা রাখতে আদেশ করা হয়েছে, তাই যখন সে তা দেখতে পেল না, তখন বুঝতেই হবে যে, তখনও শাবান মাস আছে। অতএব তার পক্ষে রোযা রাখা জায়েয নয়। কেননা সেদিনটি তো শাবান মাসের। আর শাবান মাসের রোযা কখনই রমযান মাসের রোযার বিকল্প হতে পারে না।

আসলে এই জিনিসও রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন পরে যদি জানতে পারে যে, সেটা রমযান মাস ছিল তবুও রাখেনি বলে কাযা করা কর্তব্য হবে, তার পথেও কোন প্রতিবন্ধক নেই। না জানার কারণেই সেটা শাবান মাস ধরে নিয়েছিল। পরে যখন জানতে পারল যে, সেটা শাবান মাস নয়, সেটাই ছিল রমযান মাস, তখন সেই মাসের ফরযটা পালনের জন্যে সে আদিষ্ট। তখন তার একমাত্র উপায় রোযা কাযা করা। এ কথাই আমরা শুরুতে বলে এসেছি। অনুরূপভাবে সেই দিনের রোযা—যেদিন বালক পূর্ণ বয়স্ক হল, কাফির মুসলিম হল—অবশ্যই বিবেচ্য হবে। যদি সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় যে, তা রযমান মাসের দিন, তা হলে সে রোযা ফরয হিসেবেই আদায় হবে। অন্যথায় তা নফল।

যদি বলা হয়, সেদিন রোযা না রাখলে তা কাযা করা ওয়াজিব। তাই বলে তা জায়েয প্রমাণ করে না যদি সেদিনের রোযা রাখে। কেননা হায়যই রোযা রাখতে দেয়নি, অতএব কাযা করা বাধ্যতামূলক। আর কাযা করা ওয়াজিব হলে তা তার জায়েয হওয়া বোঝায় না।

জবাবে বলা যাবে, রমযান মাস সম্পর্কে জানা না যাওয়াই সেদিন রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক। তাই এ তাৎপর্যই রোযা না রাখলে তার কাযা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রতিবন্ধক। যেমন পাগল ও বালক। কেননা তুমি ধারণা করেছ যে, সে মাস প্রত্যক্ষ করেনি, জানতে পারেনি, এটাই তার রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক। যে মাস প্রত্যক্ষ

করেনি, তার পক্ষে রোযা কাযা করা জরুরী নয়, যদি রোযা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ হয় কেবল মাসের প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে, যারা প্রত্যক্ষ করেনি, তাদের জন্যে তা ওয়াজিব না হয়। এই সীমায় এসে রোযা থাকলে তার জায়েয হওয়ার হুকুম এবং না থাকলে তার কাযা করার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয় না। তবে হায়য-হওয়া নারীর ব্যাপারের সাথে রোযা পালনে বাধ্য হওয়ার হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই—তার মাস দেখা ও মাস সম্পর্কে জানার দিক দিয়ে। কেননা তা জানলেও তার পক্ষে রেযা থাকা জায়েয নয়। আর তার রোযা না রাখার দরুন তা কাযা ওয়াজিব হওয়ার সঙ্গেও তার সম্পর্ক নেই। কেননা রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে তার নিজের কোন ভূমিকা নেই। এ কারণেই তার উপর কাযা করার দায়িত্ব চেপে থাকবে, তা পড়ে ও সরে যাবে না। কেননা তার রোযা রাখাই জায়েয নয়।

এতে আরও একটি দিকের হুকুম রয়েছে। কিছু লোক বলে, যে লোক বাড়িতে থাকা অবস্থায় রমযান মাস শুরু হল, পরে সে সফর শুরু করল, তার পক্ষে সে রোযাটা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, উবায়দাতা ও আবূ মজলজ থেকেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও শবী বলেছেন, সফরের চলে গিয়ে ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গতে পারে। বহু ফিকাহবিদই এই মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমোক্ত মতের ফিকাহ্‌বিদগণ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে'। এ ব্যক্তি যেহেতু মাসটা পেয়েছে, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে তার রোযা পূর্ণ করা। শব্দের বাহ্যিক অর্থেরও দাবি তাই। কিন্তু অন্যদের নিকট এর তাৎপর্য হচ্ছে, তার নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হওয়া। কেননা তার পর-পরই মুসাফির সংক্রান্ত হুকুম বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

যে লোক রোগী বা বিদেশগামী হবে, তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।

কে মাসের শুরুতে নিজ বাড়িতে ছিল, পরে সফর শুরু করেছে, আর কে মাসের শুরুতেই মুসাফির ছিল, আয়াতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, উপরোক্ত রোযা রাখার হুকুমটি বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন, তার পরে সফর কাল সম্পর্কিত নয়। উপরন্তু তারা যা বলেছে, তা-ই যদি তাৎপর্য হয়, তা হলে যে লোক মাসের শুরুতে মুসাফির ও পরে নিজ বাড়িতে উপস্থিত, তার পক্ষে রোযা না-রাখাই অনিবার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ এ কথাটি এই শেষোক্ত আয়াতে বলেছেন। কেননা সে তো মুসাফিরই ছিল। অনুরূপভাবে যে লোক মাসের শুরুতে রোগী ছিল, পরে ভালো হয়ে গেছে, তার জন্যে রোযা না-রাখাই ওয়াজিব হয়ে পড়ে বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। কেননা এদের একজনের মুসাফির ও অপর জনের রোগী পরিচিতি তো অর্জিত হয়েছে। তাই সফর থেকে ফিরে লোকটির নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী হওয়ায় এখনে তার রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। বা রোগ সেরে যাওয়ার পর তার রোযা

রাখার পথেও কোন বাধা নেই। রোযা ভাঙ্গার অনুমতি ছিল সফরে বা রোগী অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র কথা 'তোমাদের যে-লোক মাসটি পাবে' সীমাবদ্ধ হচ্ছে নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থার মধ্যে। জীবন-চরিত রচয়িতাগণ উল্লেখ করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর সফর শুরুই করেছেন রমযান মাসে। এ সফরের পূর্বে তার রোযা রাখা এবং তার পরে সফরে তা ভাঙ্গা এবং লোকদেরকেও রোযা ভাঙ্গতে আদেশ করা বহু হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত। তার সনদের উল্লেখের কোন প্রয়োজনই পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বক্তব্য বাড়িতে থাকা অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখনই রোযা রাখা বাধ্যতামূলকভাবে ফরয। তখন রোযা ভাঙ্গা যাবে না, না রেখে পারা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ দীর্ঘ আলোচনায় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এ থেকে শরীয়াতের যেসব হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়, তা সবই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এক্ষণে আমরা فَلْيَصُمْهُ শব্দের তাৎপর্য এবং তাতে নিহিত হুকুম আহকাম আলোচনা করব।

আমরা বলব, রোযা দুই প্রকারের। এক—আভিধানিক রোযা আর দ্বিতীয়—শরীয়াতের পারিভাষিক রোযা। আভিধানিক রোযার মূল হল اَلْاِمْسَاكُ নিজেকে বিরত রাখা। তা পানাহার থেকে বিরত রাখা হোক কিংবা অন্য কোন কিছু থেকে। সর্বপ্রকারের 'বিরত রাখা'ই এর অন্তর্ভুক্ত। আর আভিধারিক অর্থে তা-ই হচ্ছে صَوْمٌ বা صِيَامٌ রোযা। আল্লাহ বলেছেন ঃ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا 'আমি রহমান আল্লাহ্‌র রোযার মানত করেছি। এখানে صَوْمًا বিরত রাখা বা থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কথা বলা থেকে বিরত থাকা বুঝিয়েছেন। যেমন অপর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا (مريم : ٢٦)

আজকের দিন আমি কোন মানুষের সাথে কখখনই কথা বলব না।

লাগাম-পরা ঘোড়াকে خَيْلٌ صِيَامٌ বলা হয়। প্রাচীন আরবী কবিতায় এই কথন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা বলে ঃ صَوْمٌ النَّهَارَ 'দিন থেকে গেছে।' صَامَتِ اشَّمْسُ عِنْدَ قِيَامَ الظَّهِيْرَةَ দ্বিপ্রহরে সূর্য থেমে গেছে।' অর্থাৎ সূর্য চলা থেকে বিরত হয়ে গেছে, চলছে না। মহাকবি ইমরাইল কায়স বলেছে ঃ اِذَا صَامَ النَّهَارَ। 'দিন যখন থেমে গেছে'। এ সব হচ্ছে আভিধানিক অর্থ। আর শরীয়াতের পরিভাষায় কয়েক প্রকারের বিরত থাকা বোঝায়। তাতে এমন কতগুলো শর্ত আরোপিত হয়েছে, যা আভিধানিক অর্থে আরোপিত হয়নি। শরীয়াতী পরিভাষায় صوم সবকিছু থেকে বিরত থাকার অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নয়। কেননা কার্যত তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তা বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধিতার শূন্যতায় পড়ে যাওয়া মানুষের জন্যে

অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমন কি তার পক্ষে স্থির হওয়া সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় গতিশীল হওয়া। খাবার গ্রহণকারী হওয়া সম্ভব হয় না, তার ত্যাগকারী হওয়াও নয়। না দণ্ডায়মান হওয়া, না উপবিষ্ট হওয়া, না শয্যাশায়ী হওয়া। কিন্তু তা এক মহা অসম্ভব ব্যাপার। তাই তা বৈধ ও সঙ্গত ধরে নেয়া যায় না। তার ফলে কোন ইবাদত হওয়াই সম্ভবপর হয় না। কাজেই শরীয়াতী পরিভাষায় صوم হবে এক বিশেষ ধরনের বিরত থাকার অর্থে। সর্বপ্রকারের বিরত থাকা তার অর্থ হতে পারে না। তাই মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পানাহার ও সঙ্গম কাজ থেকে বিরত থাকার দিকটিই রোযার ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। সাধারণ ফিকাহবিদগণ সে বিরত থাকার সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশ লওয়া, ঘ্রাণ লওয়া, ইচ্ছাপূর্বক মুখ ভরে বমি করা ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকার শর্ত রয়েছে। অনেকে আবার ইনকেজশন ও ঘ্রাণ লওয়ায় রোযা ভাঙ্গে ও কাযা করা প্রয়োজন—এ কথা মনে করেন না। তবে তা বিরল মত। জমহুর ফিকাহবিদ তার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছাপূর্বক বমি করার ব্যাপারটিও তাই। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মত হচ্ছে, যা ভেতরে যায়, তাতেই রোযা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যা শরীর থেকে বাইরে আসে, তাতে রোযা ভাঙ্গে না। তায়ূস ইকরামা ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিপরীত মত পোষণ করেন। যে লোক ইচ্ছা করে বমি করেছে তার রোযা কাযা করা দরকার—এ কথা মনে করেন না। প্রবহমান বা জমাট বাঁধা যখম থেকে পেটের মধ্যে যা কিছু পৌঁছে, তাতে রোযা নষ্ট হয় কিনা, এ পর্যায়ে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কাযা করতে হবে না। হাসান ইবনে সালিহও এই মত দিয়েছেন। রোযায় রক্ত মোক্ষণ (cupping) ত্যাগ করতে হবে কিনা—এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সাধারণ ব্যাপক সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, রক্ত মোক্ষণে রোযা ভাঙ্গে না। আওজায়ী বলেছেন, ভাঙ্গে। পাথরকুচি গলধঃকরণ পর্যায়েও বিভিন্ন মত। হানাফী ফিকাহবিদ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে রোযা নষ্ট হয়। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, না, তাতে রোযা ভাঙ্গে না। দুই দাঁতের মধ্যে যে খাদ্য আটকে থাকে তা ইচ্ছা করে খেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না তাতেও বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে রোযা ভাঙ্গে না কাযাও করতে হবে না। হাসান ইবনে জিয়াদ জুফর-এর এ মত বর্ণনা করেছেন, দাঁতের মধ্যে আটকে থাকা জিনিস যদি গোশত (বা মাছ) হয় কিংবা ছাতু 'বা রুটির টুকরা' তার কিছু অংশ জিহ্বার উপর এসে গেলে পর তা যদি গিলে ফেলে সে—যে রোযাদার, তা তার স্মরণেও থাকে, তা হলে তাকে কাযা করতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না। সওরী বলেছেন, তার রোযা কাযা করাই মুস্তাহাব। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, রোযাদারের পেটের মধ্যে মাছি ঢুকে গেলেও কাযা করতে হবে। কিন্তু হানাফী ফিকাহবিদ ও মালিক বলেছেন, না, তাকে কাযা করতে হবে না। হায়য হওয়া মেয়েলোকের রোযা সহীহ হয় না।, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। নাপাক শরীর নিয়ে রোযা পালন সম্পর্কেও বিভিন্ন মত। সর্ব সাধারণ ফিকাহবিদগণের

মত হচ্ছে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। তার রোযা এই নাপাক শরীরেও পূর্ণ হয়ে যাবে। হাসান ইবনে হাই বলেছেন, তার সেই দিনের রোযা কাযা করাই মুস্তাহাব এবং বলছিলেন, সে নফল রোযা রাখবে, যদি নাপাক অবস্থায় তার সকাল হয়। হায়য সম্পন্না স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন, সে যদি রাত্রিবেলা পাক হয়ে যায় ও সকাল পর্যন্ত গোসল না করে, তাহলে তাকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে। এই সব ক্ষেত্রেই সম্মিলিত মত হচ্ছে, এসব থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে রোযা। আবার কতগুলো ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। সর্বসম্মত মত হচ্ছে, যৌন সঙ্গম, আহার ও পান করা—খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকা-ই হচ্ছে রোযা । এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ -

রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাওয়া (ও সঙ্গম করা) তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْ هُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - ثُمَّ اَتِمُّو الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্যে জায়েয করে দিয়েছেন, তা আস্বাদন কর। আর রাত্রিবেলা পানাহার কর যতক্ষণ না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক থেকে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন এ কাজ ত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতে রাত্রিকালে স্ত্রী সঙ্গম ও পানাহার মুবাহ করেছেন সন্ধ্যাকাল থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। তার পরে রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ করতে বলেছেন। এ আয়াতের মূল বক্তব্যে দিনের বেলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সে সব কাজ, যা রাত্রিবেলা মুবাহ ছিল। আর তা হচ্ছে স্ত্রী-সঙ্গম ও খাওয়া, পান করা। আয়াতের হুকুমেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই তিনটি জিনিস থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে শরীয়াতী রোযা পালন। এ তিনটি কাজ ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকে বিরত থাকা রোযা নয়, একথার কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। তবে তার প্রমাণটা স্থগিত। তার প্রমাণ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। হাদীস ও সুন্নাত এবং জাতির আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ তিনটি ছাড়াও কোন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকা শরীয়াতী রোযার মধ্যে গণ্য। পরেও এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হবে, ইনশাআল্লাহ।

শরীয়াতভিত্তিক এ রোযার বাধ্যতামূলক হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যদিও তা বিরত রাখা পর্যায়ে নয়, নয় রোযা পর্যায়ে। তা হচ্ছে ইসলাম ও পূর্ণ বয়স্কতা। কেননা অল্প বয়স্কদেরকে যে রোযা রাখতে বলা হয়নি, তা সর্বসম্মত। কাফিররা যদিও সেজন্যে আদিষ্ট, তা না করলে শাস্তিযোগ্য, তথাপি তাদেরকে যেন দুনিয়ায় শরীয়াতের হুকুম আহকাম

পালন করার নির্দেশই দেয়া হয়নি। কেননা কুফর অবস্থায় রোযা পালন করেনি বলে তাকে কাযা করতে বলা যায় না। স্ত্রীলোকের হায়য থেকে পবিত্র হওয়াও রোযা পালনের শর্ত। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি, নিজ বাড়িতে অবস্থান ও সুস্থ শরীর হওয়াও রোযার বাধ্যবাধকতার জন্যে শর্ত—এ কয়টি ক্ষেত্রে পরে কাযা করা ফরয। তবে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকার ব্যাপারটি নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। রমযান মাসে পাগল হওয়া লোকদের সম্পর্কে মনীষিগণের ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

'রোযার নিয়ত সর্বপ্রকারের রোযার সহীহ্ হওয়ার শর্ত।' তা তিন প্রকারের। প্রত্যক্ষ বা ফরয হওয়া রোযা। তা রমযান মাসের রোযা। কোন নির্দিষ্ট দিনে রাখার মানত করা রোযা, নফল রোযা, জিম্মায় চাপা রোযা। নির্দিষ্ট ভাবে ফরয হওয়া রোযা ও নফল রোযায় আগের রাত্রে নিয়ত না করলেও এবং রোযার দিনে যুহরের পূর্বে নিয়ত করলেই জায়েয হবে। জিম্মায় চাপা রোযা আগের রাত্রিতে নিয়ত না করা হলে জায়েয হবে না। জুফর বলেছেন, রমযান মাসের রোযা নিয়ত ছাড়াই জায়েয। মালিক বলেছেন, গোটা মাসের জন্যে একবার নিয়ত করাই যথেষ্ট।

আমরা বলেছি, পাথরকুচি গলধঃকরণে রোযা ভেঙ্গে যায়, তা সাধারণত খাদ্যবস্তু না হওয়া সত্ত্বেও। তা আহার্য নয়, তা ঔষধ-ও নয়। তার ভিত্তি এ আয়াতে ঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ। 'পরে তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোযাকে সম্পূর্ণ কর'-এ আয়াত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে, তা সর্ব প্রকারের খাদ্য সম্পর্কেই সাধারণ নির্দেশ। তাই পাথরকুচি গলধঃকরণ রোযাদারের জন্যে জায়েয হতে পারে না। তবে তা করলে রোযা কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, পাথরকুচি গলধঃকরণ নিষেধটি আয়াত থেকেই প্রমাণিত, অতএব তা বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে। তা রোযা রাখার সাধারণ আদেশের মধ্যেই রয়েছে পানাহার ও পাথরকুচি গলধঃকরণের নিষেধ। অন্যান্য সাধারণ খাদ্যবস্তুর মতই। আর এ কারণেই এই সব খাদ্যের ক্ষেত্রেই রোযা কাযা করা ওয়াজিব, এ কথা আয়াত থেকেই প্রমাণিত। পাথরকুচি গেলাও এর মধ্যে রয়েছে।

এই কথা নবী করীম (স)-এর কথা থেকেই প্রমাণিত। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَكَلَ اَوْشَرِبَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ -

যে রোযাদার ভুলবশত পানাহার করবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না।

এ দৃষ্টিতে ইচ্ছা করে খেলে কাযা ওয়াজিব হওয়ায় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইনজেকশন লওয়া, ভেতরের প্রবহমান বা জমে থাকা যখম থেকে পৌঁছার ব্যাপারে মত গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে। লকীত ইবনে সবরাতা বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) খুব বেশি করে নাক ধৌত করে ঝাড়তেন, কিন্তু রোযাদার হলে তা করতেন না। তিনি খুব বেশি করে নাকের ভেতরটা ধৌত করে তা ঝাড়তে বলেছেন, তবে রোযার কারণে তা করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, নাকের ভেতর থেকে গলায় বা মগজে যা পৌঁছায়, তা রোযা ভেঙ্গে দেয়। অন্যথায় রোযায় তিনি নাক বেশি করে ঝাড়তে নিষেধ

করতেন না। যদিও অ-রোযায় তিনি তা করতে আদেশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা পেটে কিছু পৌঁছলেই রোযা কাযা করতে বলেছেন এই দলীলের ভিত্তিতে। তাই তা যতটা রোধ করা সম্ভব তা অবশ্যই করতে চেষ্টা করতে হবে। তা খাদ্য পানীয় পৌঁছার পথে যাক কিংবা মানব দেহের অপর কোন ফাটলের পথে যাক—তা সবই সমান। কেননা আসল লক্ষণীয় হচ্ছে পেটে কিছু পৌঁছা ও তথায় স্থিতি গ্রহণ, যা রোধ করা স্বভাবতই সম্ভব। তবে মাছি, ধোঁয়া, ধূলা-বালি ইত্যাদি যা গলায় প্রবেশ করে, তাতেও রোযা কাযা করা জরুরী হয় না। কেননা এ সবকে প্রতিরোধ করা স্বভাবতই সম্ভব হয় না। মুখ বন্ধ করে রাখলেই যে সেগুলোর প্রবেশ বন্ধ হবে এমন কথা নয়।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা الاحليل-এ রোযা ভাঙ্গে ও তার কাযা করা দরকার, একথা মনে করে নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তিনি তাতে রোযা ভাঙ্গে, অতএব কাযা করা দরকার মনে করেন নি। কেননা তিনি মনে করেন, তা المثانة এতে পৌঁছে না। এ বিষয়ে তাঁর মত দৃঢ়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, তা المثانة -এ পৌঁছলে তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ মনে করেন, যা দেহের বহু ছিদ্র থেকে পেটে পৌঁছে যায়, তা মানবদেহে জন্মগতভাবেই রয়েছে। যে লোক ইচ্ছা করে বমি করবে, তার রোযা কাযা করা ওয়াজিব, তার কারণ আছে। ভেতর থেকে যার বমি আসবে, তার কথা আলাদা। ইচ্ছাপূর্বক বমি করলে 'কিয়াস' বলে তার রোযা ভাঙ্গে না, কাযা করতে হবে না। কেননা মূলত পানাহারেই রোযা ভাঙ্গে। আর স্ত্রী সঙ্গমেও। ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, ইচ্ছাপূর্বক বমি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রোযা ভাঙ্গে ভেতরে কিছু প্রবেশ করলে, যা বের হবে, তাতে রোযা ভাঙ্গার কথা নয়। অযূও ভাঙ্গে কিছু বের হলে, কিছু প্রবেশ করলে ভাঙ্গে না। শরীর থেকে আর যা যা বের হয় তাতেও অযূ নষ্ট হয়। কিন্তু তাতে রোযা ভাঙ্গে না, কাযাও করতে হয় না। এটা সর্বসম্মত মত। তাই বমি বের হওয়া তারই মতো ব্যাপার। যদি তা তার নিজের কাজ হয়, তবুও। তবে হাদীসের মুকাবিলায় এই কিয়াস পরিত্যক্ত। এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথা প্রমাণিত। সে কারণে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি খাটানোর অবকাশ নেই। প্রমাণিত সে হাদীসটি ঈসা ইবনে ইউনুস হিশাম ইবনে হাসসান, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَفْطِرْ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ –

যার ভেতর থেকে বমি আসবে, তার রোযা ভাঙ্গেনি, তার কাযাও করতে হবে না। আর যে ইচ্ছা করে বমি করবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, হিশাম ইবনে হাসসান ইবনে সিরীন সূত্রে বর্ণিত হাদীস অ-রক্ষিত غير محفوظ এ পর্যায়ে ভুলবশত খাওয়ার হাদীসটি সহীহ।

জবাবে বলা যাবে, ঈসা ইবনে ইউনুস এক সাথে দুটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। একটি সূত্র হিশাম ইবনে হাসসান থেকে। ঈসা ইবনে ইউনুস ষিকাহ্‌, নির্ভরযোগ্য, তাঁর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সর্বসম্মত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, হিফস ইবনে গিয়াস হিশাম সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আওজায়ী ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালীদ—মিদান ইবনে আবূ তালহা আবুদ দারদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বমি করলেন। পরে রোযা ভাঙ্গলেন। বললেন, পরে আমি সওবানের সাথে সাক্ষাৎ করি ও এই বিষয়ে তাকে বলি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ, আমি-ই তার অযূর পানি ঢেলেছিলাম। ওহব ইবনে জরীর—জরীর—ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ইয়াযিদ ইবনে আবূ হুবাইব আবূ মরযূক-হুবাইশ কুজালাতা ইবনে উবায়দ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি পানি পান করলেন। আমি বললাম, হে রাসূল! আপনি কি রোযাদার ছিলেন না ? বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি বমি করেছি। এই হাদীসের মুকাবিলায় ফিকাহ্‌বিদগণ 'কিয়াস' পরিত্যাগ করেছেন।

যদি বলা হয়, বর্ণিত হয়েছে, বমি রোযা ভাঙ্গে না। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ-মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর-সুফিয়ান-যায়দ ইবনে আসলাম-তার একজন সঙ্গী-একজন সাহাবী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ -

যে বমি করেছে, যার ইহতিলাম হয়েছে, সে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যার রক্ত মোক্ষণ হয়েছে, সে নয়।

জবাবে বলা হবে, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আবান যায়দ ইবনে আসলাম আবূ উবায়দুল্লাহ আস-সানাবিজী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَمْ يُفْطِرْ، وَمَنْ احْتَلَمَ فَلَمْ يُفْطِرْ، وَمَنِ احْتَجَمَ فَلَمْ يُفْطِرْ -

যে লোক রোযাদার হয়ে সকাল করল, পরে তাকে বমি কাবু করেছে, সে রোযা ভাঙ্গে নাই। যার ইহতিলাম (স্বপ্নে বীর্যপাত) হয়েছে, সে রোযা ভাঙ্গে নাই। যার রক্ত মোক্ষণ করা হয়েছে, সে-ও রোযা ভাঙ্গে নাই।

এই হাদীসে বলা হয়েছে, বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায় না। এই ভাষ্যের মধ্যে তা বলা না হলেও এই অর্থই তা থেকে গ্রহণ করা অনিবার্য ছিল যদিও দুটি হাদীসের একটি অপরটি দ্বারা ফেলে দেয় নি। তা এজন্যে যে, রাসূলে করীম (স) থেকে পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীস বর্ণিত হলে এবং বৈপরীত্যকে এড়িয়ে দুটিকেই কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হলে দুটোকেই ব্যবহার করা কর্তব্য। তা কোন একটিকেও অর্থহীন করে দেয়া হয় না। এই প্রেক্ষিতে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, বমি যদি মুখ ভর্তির কম পরিমাণে হয়, তা হলে তাতে

রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা তা বমি শব্দটির আওতায় আসে না। বিবেচ্য, যদি কারোর জিহ্বায় ঢেকুরের সাথে কিছু বের হয়ে আসে, তবেই তাকে বমি বলা যাবে। আবুল হাসান আল-করখী (রা) মুখভর্তির পরিমাণ নির্ধারণ পর্যায়ে বলেছেন, তা এতটা যে তা মুখে আটকে রাখা যায় না তার পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে। তখনই বলা যাবে, বমি করেছে।

রক্ত মোক্ষণ, ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, তাতে রোযাদারের রোযা ভাঙ্গে না। কেননা এ পর্যায়ে আসল কথা হচ্ছে, শরীর থেকে কিছু বের হলেই রোযা ভেঙ্গে গেছে বুঝতে হবে, তা নয়। তবে প্রস্রাব, পায়খানা, ঘাম ও দুগ্ধ ইত্যাদি শরীর থেকে বের হলেও এতে রোযা ভেঙ্গে যায় না। অনুরূপভাবে কেউ যদি আহত হয়, দেহে ক্ষত হয়, শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ করা হয়, তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে না। সে দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা হয়েছে, রক্ত মোক্ষণে حجامة রোযা ভাঙ্গবে না। এটা কিয়াসের ফসল। আর তাছাড়া যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, সব কিছু থেকে বিরত থাকাই শরীয়াতসম্মত রোযা নয়, তখন توقيف থেকে যা জানা গেছে তাকেই ভিত্তি করতে হবে, তার সাথে নিজেদের থেকে কিছু যোগ করা জায়েয হতে পারে না। তবে গোটা উম্মত যে যে বিষয়ে একমত হয়েছে, তাকেই চূড়ান্ত ধরে নিতে হবে। রোযাদারের রগ কেটে রক্ত মোক্ষণ করা জায়েয, এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি হাদীস আবদুল বাকী ইবনে কানে বর্ণনা করেছেন উবাইদ ইবনে শরীক আল-বাজ্জার-আবুল-জামাহির আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম—তাঁর পিতা—আতা ইবনে ইয়াসার-আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ لَايُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَلْاَخْتِلَامُ وَالْحِجَامَةُ –

তিনটি জিনিস রোযাদারের রোযা ভাঙ্গে না ঃ বমি, স্বপ্নে বীর্যপাত এবং রক্ত মোক্ষণ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ হিফস ইবনে উমার শুবাইয়াযিদ ইবনে আবূ যিয়াদ-মাকসাম ইবনে আব্বাস সূত্রে, রাসূলে করীম (স) একজন রোযাদার ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করেছেন। আবদুল হাদীস বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সহম ঈসা ইবনে ইউনুস—আইয়ূব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইমানী আল-মুসান্না ইবনে আবদুল্লাহ আনাস ইবনে মালিক সূত্রে। তিনি বলেছেন, রমযান মাসের আঠার তারিখ অতি প্রত্যূষে এক ব্যক্তির নিকট গেলেন, সে রক্ত মোক্ষণ করছিল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হচ্ছে—উভয়ের রোযা ভেঙ্গে গেছে। পরে তাঁর নিকট অপর এক ব্যক্তি এল। তখন তিনি তাকে রমযান মাসে রক্ত মোক্ষণ করাতে নিষেধ করলেন। পরে বললেন ঃ

اذَا تَبَيَّغَ بِاَحَدِ كُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ –

তোমাদের কারোর রক্ত টগবগ করে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলে সে যেন মোক্ষণ করিয়ে নেয়।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে হুবাইব আবূ হিসন আল-কূকী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন—আবূ মালিক-হাজ্জাজ-আল হিকাম মাকসাম ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসলে করীম (স) রোযাদার অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি তা অপছন্দ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর আবূ দাউদ-আল-কানবী সুলায়মান ইবনুল মুগীরা-সাবিত সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেছেন ঃ

مَاكُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلَّا كِرَاهِيَةَ الْجُهْدِ –

আমরা রোযাদারের জন্যে রক্ত মোক্ষণ করা ত্যাগ করতাম না। তবে কষ্টকে অপছন্দ করার দরুন তা করতাম।

যদি কেউ বলে, মকহুল সওবান সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হয়—উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে গেছে। আবূ কালাবাতা আবুল আশয়াস শাদ্দাদ ইবনে আওস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বকী নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হল। সে তখন রক্ত মোক্ষণ করছিল। সে আমার হাত ধারণ করেছিল। এটা ছিল রমযান মাসের আঠার তারিখ। তখন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ 'রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হয়, উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে গেছে .... এসব কয়টি হাদীস থেকেই রক্ত মোক্ষণকে রোযা ভঙ্গকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটির সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসদের মতেও এ হাদীস সহীহ্ নয়। কেননা বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু লোক হাদীসটি আবূ কালাবাতা আবূ আসমা সওবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর কিছু লোক বর্ণনা করেছে আবূ কালাবাতা শাদ্দাদ ইবনে আউস সূত্রে। এটা সপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও অবিন্যস্ততা প্রমাণ করে। এর ফলে হাদীসটি দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু মকহুল বর্ণিত হাদীস-এর মূল একটি গোত্রের অজ্ঞাত (مجهول) প্রধান থেকে এসেছে সওবান সূত্রে। তাছাড়া اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ। কথাটিতে নির্দিষ্ট কিছু বোঝালেও রোযা রক্ত মোক্ষণের দরুন কার্যক ভেঙ্গে গেছে—এমন কোন ইঙ্গিত নেই। কেননা এ ধরনের কথায় الحجامة। বা রক্ত মোক্ষণের উল্লেখ সে লোক দুজনের পরিচিতি হিসেবে এসেছে। যেমন বলা হয় ঃ اَفْطَرَ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ 'দাঁড়ানো ব্যক্তি ইফতার করেছে' 'বসে থাকা ব্যক্তি ইফতার করেছে।' اَفْطَرَ زَيْدٌ যায়দ ইফতার করেছে, যখন এ কথার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজের দিকে ইশারা হবে। তাহলে শুধু দাঁড়ানোটা রোযা ভাঙ্গা—এমন কোন প্রমাণ নেই। বা এর-ও কোন প্রমাণ নেই যে, যায়দ রোযা ভেঙ্গেছে। اَفْطَرَ وَالْحَاجِمُ الْمَحْجُوْمُ কথাটিও অনুরূপ। এতে দুটি লোকের প্রতি নির্দিষ্টভাবে ইশারা করা হয়েছে। তাতে রক্ত মোক্ষণের কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। এটা খুবই সঙ্গত যে, তিনি সে

দুজনকে এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, খাওয়া ইত্যাদির কারণে রোযা ভেঙ্গেছে। তারপরই এই রোযা ভাঙ্গার কথা বলেছেন, তার ইল্লাতের উল্লেখ ব্যতীতই। এ-ও তো হতে পারে যে, তিনি যে দুজনকে দেখেছেন, তারা দুজন লোকের গীবত করতে ব্যস্ত ছিল। পরে বলেছেন যে, তারা দুজন ইফতার করেছে। যেমন ইয়াযিদ ইবনে আবান আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْغَيْبَةُ تَفْطِرُ الصَّائِمُ 'গবীত রোযাদারের রোযা ভেঙ্গে দেয়।' ফিকাহবিদদের মতে এর অর্থ রোযা থেকে বের হয়ে যাওয়া নয়। তার অর্থ শুধু এতটুকু যে, তাদের রোযার সওয়াব বাতিল হয়ে গেছে। রক্ত মোক্ষক ও রক্ত মোক্ষিত—দুজনের রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা হয়ত এই তাৎপর্যের দিক দিয়ে বলেছেন। তাছাড়া আমরা উপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তাতে প্রথমে রোযা রেখে রক্ত মোক্ষণ করতে নিষেধ করা হলেও পরে সে কাজের রুখসত দেয়া হয়েছে। এ-ও হতে পারে যে, রোযাদারের রক্ত মোক্ষণ হলে সে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বিদেশ সফরকালে রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন যখন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন তার উপর ছায়াচ্ছন্ন হয়েছে। দাঁতের মধ্য থেকে কোন জিনিস মুখে এলে তা গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না বলা হয়েছে এজন্যে যে, তা কুল্লি করার জন্যে মুখে দেয়া পানির অবশিষ্ট অংশের মত। আর তা যে পেটে যাবে, তা তো জানা কথাই। তাই সেজন্যে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে মুখে অবশিষ্ট থাকা সব অংশই। যেমন কেউ রাত্রিবেলা ছাতু খেল। অসম্ভব নয়, সকাল বেলা পর্যন্ত তার কিছু কিছু অংশ তার দাঁতের মধ্যে রয়ে গেল। খেলালে তা বের করে কুল্লি করে তা সব বের করে ফেলতে কেউ হয়ত বলে নি, আর সে নিজেও তা করেনি। এ থেকে বোঝা গেল, দাঁতের মধ্য থেকে সে খাদ্যাংশের ব্যাপারে শরীয়াতের কিছু বলার নেই।

যে মাছি পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তা তো কেউ ইচ্ছা করে না। তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে না কেননা মানুষের পক্ষে সাধারণত এ থেকে কেউ রেহাই পায় না। মুখটা সব সময় বন্ধ করে রাখা সকলের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। মুখ খুলে কথা বলা ও বন্ধ রাখা—এই ভয়ে যে, 'হা' করলেই মুখে মাছি ঢুকে পড়বে ও পেটের মধ্যে চলে যাবে, তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে—সম্ভব হতে পারে না। ধূলিবালি ও ধোঁয়াও গলার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাতে রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে না। তবে যে লোক রোযা রেখে মুখের মধ্যে পানি দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাড়াচাড়া করে, তা কিন্তু ভিন্ন অবস্থা। তাতে রোযা নষ্ট হবে। কেননা এটা সাধারণ ও অভ্যাসগত ব্যাপারে মনে করা যায় না। মুখে মাছি পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপার এ রকমের নয়। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেই তা ঘটে যেতে পারে। কথা বলার সময় মুখ 'হা' করা শুধু স্বভাব-ই নয়, তা ছাড়া কথাই বলা যায় না। এই কারণে আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি সহজতা বিধান করেছেন, দ্বীন-ইসলামের কোন কঠিনতা ও অসুবিধার প্রশ্রয় দেন নি। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কোন অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি।

শরীরের নাপাকিও রোযা সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা শরীর নাপাক হয় যে কারণে, তা করার অনুমতি আল্লাহই দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

এক্ষণে তোমরা স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে স্বাদ আস্বাদন জায়েয করে দিয়েছেন, তার সন্ধান কর। আর পানাহার কর কালো তমিশ্রার মধ্য থেকে ফজরের শ্বেত আলো ফুটে উঠার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তোমরা রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ কর।

সন্ধ্যা রাত থেকে রাতের শেষ পর্যন্তকার সময়ে সঙ্গম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, রাতের শেষ ভাগে যারা সঙ্গমে লিপ্ত হবে, তা থেকে অবসর পাওয়া পর্যন্ত ফজরের উদয় হয়ে যাবে এবং তারা না-পাক শরীর হয়েই থাকবে। এই লোকদের রোযা সহীহ্ হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ই বলেছেন ঃ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ। অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত্রি পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে দাও।

হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) সকাল পর্যন্ত শরীর নাপাক অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু শরীরের এই নাপাকি স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে ছিল না। পরে সেই দিনটার রোযা পুরা পালন করতেন। বোঝা গেল, শরীরের নাপাকি সিয়াম সহীহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُوْ مَنَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ -

যে লোক নাপাক শরীরে সকাল পর্যন্ত থাকবে, সে সেই দিনের রোযা রাখবে না।

তবে পরে তিনি যখন হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত উপরোদ্ধৃত হাদীসের কথা জানলেন, তখন তিনি (হযরত আবূ হুরায়রা) বললেন ঃ

لَاعِلْمَ لِىْ بِهٰذَا اَخْبَرَ نِىْ بِهِ الْفَضَلُ بْنِ عَبَّاسٍ -

আমার বর্ণনা করা হাদীসটি সম্পর্কে আমি ভালো জানি না। ফযল ইবনে আব্বাস আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হযরত আবূ হুরায়রা তাঁর এ সংক্রান্ত ফতোয়া প্রত্যাহার করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল বাকী ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে শবাবাতা 'আমর ইবনুল হাইসম হিশাম কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সেই হাদীস বর্ণনা প্রত্যাহার করেছেন, যাতে এ কথা বর্ণনা করতেন যে, যে লোক সকাল বেলা পর্যন্ত নাপাক শরীরে থাকবে, সে সেই দিনের রোযা রাখবে না। তা ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক এতদসংক্রান্ত হাদীস যদি সহীও হতো, তাহলে তা হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী না-ও হতে পারত। তা এ ভাবে যে, সে কথাটা হতো তার সম্পর্কে যে, নাপাকির কারণ সহ সকাল করবে অর্থাৎ সকালে তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে সংযুক্ত থাকবে, সে সে দিনের রোযা রাখবে না। তা হলে দুটো হাদীস দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত হতো। আর দুটো হাদীস-ই হলে একই সাথে দুটোকেই কাজে লাগানো যেত। দুটির মধ্যে পারস্পরিক কোন পার্থক্য থাকত না।

যদি বলা হয়, হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে এক বিশেষ ব্যবস্থার প্রেক্ষিত সম্পর্কিত, তার উম্মতের জন্যে সে ব্যবস্থার সুযোগ নেই। কেননা তাঁরা দুজন যা বলেছেন, তা নবী করীম (স)-এর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস সর্ব সাধারণ মানুষের জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, হযরত আবূ হুরায়রা তাঁর বর্ণনা দ্বারা এই ব্যাপারে সর্ব সাধারণের সাথে নবী করীম (স)-এর অভিন্নতা ও পার্থক্যহীনতা মনে করেছেন। কেননা তিনি হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস যখন শুনতে পেলেন, তখন বললেন لَاعِلْمَ لِىْ بِهٰذَا এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আমাকে ফযল ইবনে আব্বাস এ খবর দিয়েছেন। তিনি একথা বলেন নি যে, এই দুই মহিলার বর্ণনা আমার বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা তাঁদের দুই জনের বর্ণনা একান্তভাবে রাসূলে করীম (স)-এর নিজ সম্পর্কিত। আর আমার বর্ণনা সমস্ত মানুষের জন্যে সাধারণভাবে। এর ফলে প্রশ্নকারীর ব্যাখ্যা অর্থহীন ও বাতিল হয়ে যায়। আর রাসূলে করীম (স) তো সর্ব ব্যাপারেই তাঁর উম্মতের সাথে সম্পূর্ণ অভিন্ন, পার্থক্যহীন শুধু সেই কয়টি ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে বিশেষ করে দিয়েছেন। সে ব্যাপারে তিনি এক ও একক। উম্মতের জন্যে সে বিশেষ ব্যবস্থা تَوقِيف একান্তভাবে আল্লাহ্র করা ব্যবস্থা। আর উম্মতের জন্যে নির্দেশ ঃ فَاتَّبِعُوْهُ 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর, মেনে নাও।' আর আল্লাহ্র কথা ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলে অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এ সব ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে রমযানের দিনে নিজেদেরকে বিরত রাখি। এ তো সেই রোযা, যার কথা আল্লাহ্ বলেছেন এই আয়াত ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ। 'অতঃপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -তে যে রোযা রাখতে বলা হয়েছে, তা যেমন আভিধানিক অর্থে রোযা, তা শরীয়াতের পারিভাষিক রোযাও। আমরা যে বিষয়ে বলেছি, যা থেকে বিরত রাখা হয় না, তা-তার শর্তের অন্তর্ভুক্ত। সেসব শর্ত পাওয়া না গেলে যে রূপ বিরত রাখাকে আমরা রোযা বলেছি, তা শরীয়াতসম্মত রোযা হবে না। আর তা হচ্ছে, মুসলিম হওয়া, পূর্ণ বয়স্ক হওয়া, নিয়ত করা এবং মেয়েলোকের তুহর অবস্থায় থাকা। এসব শর্তের কোন একটি পাওয়া না গেলে তা শরীয়াতসম্মত রোযা হবে না। নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা ও সুস্থ নিরোগ থাকা—এ দুটি শর্ত হচ্ছে রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত। রোগ হলে ও প্রবাসে থাকলে রোযা সহীহ্ হওয়ার পথে কোন বাঁধা হয় না। তা ফরয হিসেবে বাধ্যতামূলক হওয়ার পরিপন্থী মাত্র। কেননা তারা দুজন রোযা রাখলে সে রোযা অবশ্যই সহীহ্ হবে। রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে পূর্ণ বয়স্কতার শর্তের কথা আমরা বলেছি। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

তিনজন লোকের আমলনামায় কিছু লেখা হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি—যতক্ষণ যে ঘুম থেকে জেগে না উঠবে, পাগল—যতক্ষণ ভালো না হয় এবং বালক—যতক্ষণ পূর্ণ বয়স্ক না হয়।

এদের জন্যে যেমন কোন ইবাদতই বাধ্যতামূলক হয় না, তেমনি রোযাও বাধ্যতামূলক হবে না। তবে বালককে রোযা রাখতে বলা হবে শিক্ষাদান ও অভ্যস্ত করে তোলার লক্ষ্যে। যেন আল্লাহ্‌র এ আদেশ পালিত হয় ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।'

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে ঃ

مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْا هُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ –

তোমরা তোমাদের বালক-বালিকাদেরকে সাত বছর বয়সে পৌঁছলে নামায পড়তে বল। আর দশ বছর বয়সের হলে প্রয়োজন হলে সেজন্যে মারধোরও কর।

এটা এজন্যে নয় যে, তারা শরীয়াত পালনে বাধ্য, তাদের উপর শরীয়াত চেপে বসেছে। মূলত তা শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ ও অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে মাত্র। আর মুসলমান হওয়া—ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত এ জন্যে যে, তা হলেই না তার রোযা পালন সহীহ হবে। কেননা মুশরিক কাফিরের কোন ইসলামী ইবাদত পালন সহীহ্ হতে পারে না।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ –

তুমি শিরক করলে তোমার নেক আমল ছারখার হয়ে যাবে।

অতএব কাফির-মুশরিকের আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কোন কাজ সহীহ্ হতে পারে না। তা সহীহ্ হতে পারে কেবল তখন, যদি সে মুমিন হয়। আর বিবেক-বুদ্ধি-পূর্ণতা না হলে নিয়ত ও ইচ্ছাটা পরিপক্ক হতে পারে না। আর তা না হলে রোযা সহীহ্ হতে পারে না নিয়ত না হওয়ার কারণে। রাত্রিবেলা থেকে রোযার নিয়ত হলে পরে তার বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত হলে তার রোযা সহীহ হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। আমরা বলেছি, নিয়ত রোযা সহীহ হওয়ার শর্ত এ কারণে যে, শরীয়াতসম্মত রোযা হতে পারে তখন, যদি রোযাদার তার রোযা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে ইচ্ছুক হয়। আর নিয়ত ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –

কুরবানী জন্তুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌কে পায় না। বরং আল্লাহ্‌কে পায় তোমাদের তাকওয়া।

আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, তাকওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশের আনুকূল্য সন্ধান। ফরয রোযার জন্যে রোযাদারের মুত্তাকী হওয়া শর্ত। তা নিয়ত ছাড়া পাওয়া যেতে পারে

না। কেননা তাকওয়া আল্লাহ্র আদেশের আনুকূল্য সন্ধান ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যে মনে স্পষ্ট তীব্র ইচ্ছাও বাসনা জাগতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ –

লোকদেরকে কেবলমাত্র এই আদেশ-ই দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্যে খালেস করে দিয়ে।

আর দ্বীনকে তাঁরই জন্যে খালেস করা সম্ভব ইবাদত দ্বারা শুধু তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা হলে, তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার আগ্রহী হলে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়ার ইচ্ছা আদপেই না হলে। নিয়তের সাহায্যে ফরয ইবাদতসমূহ সহীহ হওয়ার প্রাসঙ্গিক মৌলনীতি হচ্ছে এগুলোই। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা নেই যে, নামায, যাকাত, হজ্জ ও কাফফারা ইত্যাদির শর্ত হচ্ছে সেজন্যে নিয়ত জাগিয়ে তোলা। কেননা ফরযসমূহ তো উদ্দেশ্যমূলক, শুধু ফরয কাজটা করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। অতএব রোযা কাজটির হুকুম এই ইল্লাতের দরুনই লক্ষ্যভুক্ত।

যদি বলা হয়, রোযা ও অন্যান্য ফরয কাজে নিয়ত শর্ত হওয়ার পক্ষে যত দলীলই পেশ করা হল, তাহারাত—পবিত্রতা অর্জনেও সেই শর্তসমূহই রয়েছে। কেননা তা-ও একটি ফরয যাবতীয় ফরযের মধ্যে।

জবাবে বলা হবে, যা ধারণা করা হয়েছে, ব্যাপারটি তা নয়। কেননা তাহারাত—শুধু তাহারাত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কোন ফরয কাজ নয়। তা অন্য উদ্দেশ্য সফল করার মানসে ফরয। তাতেই তা ফরয। আমাদেরকে বলা হয়েছে, 'তাহারাত' অর্জন না করে নামায পড়বে না। এর অর্থ, নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড় না, লজ্জা স্থান আবৃত না করে নামায পড় না। এই তাহারাত ও লজ্জাস্থান আবৃতকরণ নিজস্বভাবে কোন ফরয নয়। কাজেই এ দুটির জন্যে কোন নিয়তের প্রয়োজন হয় না। নিয়ত যখন অন্য কাজের জন্যে শর্ত, তা নিজস্বভাবে ফরয নয়, তাই তা কোনরূপ নিয়ত ছাড়াই হতে পারে, আমরা এই যা বললাম, তাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ ফরযসমূহ আলাদা হয়ে গেল, আর অন্য কাজের জন্যে শর্ত হিসেবে যা ফরয, তা-ও আলাদা হয়ে গেল। তা নিজস্বভাবে ফরয নয়। পানি দ্বারা তাহারাত অর্জন অন্য কাজের জন্যে শর্ত। তা অন্য কোন কাজের বিকল্প বা বদলও নয়। এজন্যে তাতে নিয়ত বাধ্যতামূলক নয়। এই কারণে তায়াম্মুমেও নিয়ত বাধ্যতামূলক ওয়াজিব নয়। কেননা তা অন্য কাজের বিকল্প। তাই নিয়ত তার সাথে যুক্ত না হলে তা 'তাহারাত' হবে না। কেননা তা মৌলিক ভাবে কোন তাহারাত নয়, তা অন্য একটি কাজের পরিবর্তে করা হয় মাত্র। মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, প্রত্যেকটি রোযা ব্যক্তির যিম্মায় দেয়া ফরয। অতএব তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে নিয়ত করা শর্ত। রমযান মাসের রোযার নিয়ত শর্ত হওয়ায় তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে জরুরী। ইমাম জুফর রমযান মাসের রোযাকে তাহারাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেছেন নিয়ত জরুরী না হওয়ার দিক দিয়ে। তার কারণ বলেছেন, তাহারাত ফরযরূপে ধার্যকৃত কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ফরয হওয়ার দিক দিয়ে রোযা তার সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ। সমগ্র ফিকাহবিদের মতে তা অনুরূপ ব্যাপার নয়। কেননা তাহারাত-এর 'ইল্লাত' হিসেবে যার উল্লেখ হয়েছে, তা রোযায় অনুপস্থিত। কেননা তাহারাত তো নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করাকে 'ইল্লাত' ধরা হয়েছে। রোযায় এই তাৎপর্য নেই। কেননা তা কোন নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত নয়। তা নির্দিষ্ট সময়ে স্থাপিত কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয়। এই 'ইল্লাত'টা তওয়াফের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা তা-ও নির্দিষ্ট স্থানে ফরয। কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর দিন কাবার চারপাশে তার কোন দেনাদারের পেছনে দৌড়ায়, তাহলে সে 'তওয়াফে যিয়ারত' করেছে বলা যাবে না। সেখানে ও সাফা-মারওয়ায় যদি কেউ লোকদেরকে পানি পান করায়, তাহলে তাতে তার ফরয বা ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে না। এ 'ইল্লাত'টা তওয়াফ ও সাঈ'র উপর প্রভাবশীল ও কার্যকর হবে না। তা থেকে প্রকাশিত হল যে, যেখানে তা অনুপস্থিত সেখানে তার হুকুম আরো বেশিভাবে কার্যকর হবে না। তাছাড়া তাহারাত ও রোযা এক ও অভিন্ন নয়। পূর্বে যেমন বলেছি, তাহারাত নিজস্ব কারণে ফরয নয়, তা অন্য কাজের জন্যে শর্ত মাত্র। তা-ও বিকল্প হিসেবে নয়। তাই তাতে নিয়ত শর্ত হওয়া ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ তুমি নামায পড়বে কেবল তখন যখন তুমি নাপাকি نجاست وحدث থেকে পবিত্র। তুমি নামায পড়বে লজ্জাস্থান আবৃত করে। (নাপাক দূর না করে ও লজ্জাস্থান আবৃত না করে নামায পড়বে না)। নাজাসাত ধৌত করা—গোসল করার এবং লজ্জাস্থান আবৃতকরণে নিয়ত শর্ত নয়। পানি দ্বারা তাহারাত অর্জনও এরূপ।

কিন্তু রোযা মৌলিকভাবেই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ফরয, অন্যান্য যাবতীয় ফরয-এর মতই। তাই তা সহীহ্ হওয়ার জন্যে নিয়ত জরুরী শর্ত। এতে আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে, আমরা জানি, রোযা দুই প্রকারের। একটি আভিধানিক অর্থের রোযা আর অপরটি শরীয়াতের পারিভাষিক রোযা। এদুটির একটি অপরটি থেকে আলাদা হয় নিয়তের ভিত্তিতে। সেই সাথে সে সব শর্ত সহকারে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। আর নিয়ত না পাওয়া গেলে রোযা হয়ে যাবে আভিধানিক অর্থে রোযা। তাতে শরীয়াতের কোন দিক থাকবে না। এই কারণে রমযান মাসের রোযায় নিয়তের শর্ত করা হয়েছে। রমযান ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ বিরত থাকার কাজ করে, যেমন করে রোযাদার বিরত থাকে, আর তার রোযার নিয়ত না হয়, তাহলে শরীয়াতের রোযা হবে না। নফল রোযা ও শরীয়াতভিত্তিক রোযা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে সেজন্যে আগের রাতে নিয়ত না করার দিকে দিয়ে। নিয়ত ব্যতিরেকে নফল রোযাদার যদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার কাজ করে, তাহলে রমযানের রোযাও সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। রমযান মাসে যে লোক কয়েকদিন বেহুঁশ হয়ে থাকে, ইমাম জুফর তাকে 'রোযাদার' গণ্য করেছেন। কেননা সেও তো পানাহার করেনি, বিরত থাকার কাজটি করেছে। বস্তুত এরূপ কথা যে বলে, সে একটি অত্যন্ত খারাপ কথা বলে।

পূর্বে আমরা বলেছি, রমযানের রোযায় প্রত্যেক দিন আগে রাতে বা সেদিনের সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বে নতুন করে নিয়ত করা জরুরী। তার কারণ, রমযানের রোযা নিয়ত ছাড়া সহীহ্ হয় না। মাসের নিয়ত করা জরুরী হলে দ্বিতীয় দিনও অনুরূপ

নিয়ত করা জরুরী হবে। কেননা সে দিনটি একটি রাতের কারণে রোযার বাইরে চলে গেছে। যদি বাইরে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আবার তার মধ্যে নিয়ে আসার জন্যে নিয়তের প্রয়োজন। ইমাম মালিক বলেছেন, নির্দিষ্টভাবে রোযা ফরয হওয়া প্রমাণিত না হলে তা আগের রাত্রিতে নিয়ত না করা হলে রোযা সহীহ্ হবে না। আর যা নির্দিষ্ট সময়ে ফরয, রোযাদার হিসেবে সেই সময়টাও তার জানা ছিল, তাহলে এর দরুন সিয়ামের নিয়ত না করলেও চলবে। যদি কেউ বলে ঃ আল্লাহ্‌র জন্যে আমার কর্তব্য ক্রমাগতভাবে একটি মাসকাল রোযা রাখা, আর এই বলে সে প্রথম দিনের রোযা রাখলো, তার জন্যে পরবর্তী দিনগুলোর রোযা নিয়ত ছাড়াই জায়েয হবে। লাইস ইবনে সাদও এ মতই দিয়েছেন। সওরী বলেছেন, নফল রোযার নিয়ত দিনের শেষে করলেও যথেষ্ট হবে। ইবরাহীম নখ্য়ী বলেছেন, সামনের কাজের সুফল সে পাবে। হাসান ইবনে সালিহরও সেই মত। সওরী বলেছেন, রমযান মাসের রোযার জন্যে আগের রাতের নিয়ত করা জরুরী। আওজায়ী বলেছেন, অর্ধদিনের পরে নিয়ত করলেও রমযানের রোযার জন্যে যথেষ্ট হবে। শাফেয়ী বলেছেন, রাত্রিতে নিয়ত না করলে রমযানের প্রত্যেক দিনের ফরয রোযা হবে না। তবে দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে নিয়ত করলে নফল রোযা সহীহ্ হয়ে যাবে। সমস্ত মাসের রোযার জন্যে একটি রোযাকে শামিল করার জন্যেও তো নিয়তের প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রবেশের জন্যেও নিয়তের দরকার। তাই দ্বিতীয় দিনের জন্যে নতুন করে নিয়ত করতে হবে প্রথম দিনের মতই।

যদি বলা হয়, প্রথম দিনের নিয়তই গোটা মাসের রোযার নিয়তের জন্যে যথেষ্ট। যেমন নামাযের শুরুতে একটি নিয়তের দ্বারা গোটা নামায সহীহ্ হয়ে যায়। প্রতি রাক'আতে নতুন করে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তাহলে দুটির সমন্বয়কারী অর্থ হচ্ছে, একই নামায তার বিভিন্ন রাক'আত দ্বারা ভাঙচুর হয় না, তেমনি রমযান মাসের সব রোযাও একই নিয়তের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে, দিনের বিভিন্নতায় সে নিয়ত চুরমার হয়ে যাবে না।

জবাবে বলা যাবে, গোটা মাসের রোযার জন্যে একটি নিয়ত যথেষ্ট হলে সমগ্র জীবনের রোযার জন্যেও একটি নিয়তের যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু তা বাতিল কথা। প্রত্যেক বছরের রমযান মাসের প্রথম দিনের রোযার জন্যে নতুন করে নিয়ত জরুরী। সেই নিয়তটি গোটা মাসের সবগুলো দিনের রোযার জন্যে অনুরূপভাবে যথেষ্ট হবে না, প্রত্যেক দিনের রোযার জন্যে নতুন করে নিয়তের প্রয়োজন হবে। যেমন করে সমগ্র জীবনের রোযার জন্যে এক বছরের রোযার নিয়ত যথেষ্ট হবে না। নামাযের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেননা গোটা নামাযের জন্যে একটি নিয়ত যথেষ্ট হয় এ কারণে যে, তা একবারের তাহরিমা বাঁধার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রত্যেক রাকআতের জন্যে আলাদা আলাদা তাহরিমা বাঁধার দরকার হয় না। কেননা সে নামাযের কোন অংশ বাদ দিয়ে অপর অংশ সহীহ্ হয় না। ফলে এক নামাযের সবগুলো রাক'আত সেই একই তাহরিমার অধীন পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। তার কোন রাক'আত বাদ দিয়ে নামায শেষ করলে গোটা নামাযটাই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু রমযান মাসের একটি দিনের রোযা যদি কোন

কারণে ভেঙ্গে যায়, তা হলে সমগ্র মাসের সবগুলো রোযা বাতিল হয়ে যাবে না। অন্য দিক দিয়ে বলা যায়, নামাযের প্রথম রাক'আত পড়ার পর নামাযী নামাযের বাইরে চলে যায় না, তাই নতুন করে আবার নিয়তের প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয় রাক'আতে প্রবেশ করার জন্যে। কেননা নিয়ত তো নতুন করে প্রবেশ করার জন্যে জরুরী হয়। তাই রোযার মাঝখানে রাত এসে গেলে রোযাদার রোযার বাইরে চলে যায়। তাই দ্বিতীয় দিনের রোযায় প্রবেশ করার জন্যে আবার নিয়তের প্রয়োজন। এজন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ -

এখানে রাত এল ও সূর্য অস্তমিত হলে রোযাদার রোযা ভাঙ্গবে।

প্রথম দিনের রোযা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের রোযায় প্রবেশ লাভ করার জন্যে নতুন করে নিয়ত করতে হবে। আর তা নতুন করে নিয়ত না করা হলে সহীহ হবে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ প্রত্যেক দিনের রোযার জন্যে আগের রাতে নিয়ত না করলেও রোযা হয়ে যাবে বলেছেন, যদি সেই দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বেই নিয়ত করা হয়। তার দলীল হচ্ছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোকই মাসটি পাবে, সে-ই যেন রোযা রাখে।

যে লোক মাসটি পেল, সে-ই রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট। যা করতে বলা হয়েছে, তা করলেই তার শুভ কর্মফল সে পাবে। আর হাদীসের দলীল হচ্ছে সেই বর্ণনা, যা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আশুরার দিনে মাওয়ালীদের নিকট লোক পাঠালেন এই ঘোষণা দেয়ার জন্যে যে, যে খেয়েছে সে যেন আর না খায় (খাওয়া থেকে বিরত থাকে) আর যে খায়নি, সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়টার রোযা পালন করে। এও বর্ণিত হয়েছে যে, যারা খাওয়ার কাজটা করে ফেলেছিল, তাদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ করেছেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসলিম, মুহাম্মাদ ইবনে মিসহাল, ইয়াযীদ ইবনে রুবাই, শুবা, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইবনে সালামাতা তাঁর চাচা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আশুরার দিন নবী করীম (স)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

اَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا يَوْمَكُمْ هٰذَا وَاقْضُوْا -

তোমরা কি তোমাদের আজকের দিনে রোযা রেখেছ? লোকেরা বলল ঃ না। বললেন, তাহলে তোমাদের এই দিনটিকে পূর্ণ কর এবং কাযা কর।

এ হাদীসটি থেকে দুটি অর্থ বোঝা যায়। একটি—আশুরার দিনের রোযা প্রথমে ফরয

ছিল। এ কারণেই নবী করীম (স) কাযা করার হুকুম দিয়েছিলেন, যারা তখন খাবার খেয়েছিল তাদেরকে। আর দ্বিতীয়—যারা তখন খেয়েছিল এবং যারা খায়নি তাদের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। যারা তখন খাবার খেয়েছিল, তাদের আর না খেতে আদেশ করলেন এবং বললেন, কাযা করতে হবে। আর যারা খাবার তখনও খায়নি, তাদেরকে রোযা রাখতে বলেছেন। বোঝা গেল, যা একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফরয ছিল, তা ছিল রোযা। তাতে বিগত রাতে নিয়ত করা ছিল না। বোঝা গেল, রাতে নিয়ত না করলেও রোযা হবে। কেননা বিগত রাতে নতুন করে নিয়ত করা যদি রোযার সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হতো, তাহলে দিনের বেলা রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন না। তাদের রোযা সহীহ্ না হওয়া ও তাদের উপর কাযা ফরয হওয়ার দিক দিয়ে তারা নিশ্চয়ই খাবার-খাওয়া লোকদের মতই হয়ে যেত। যা বললাম, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, নির্দিষ্টভাবে রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্যে আগের রাত থেকে নিয়ত নতুন করে করা শর্ত নয়। দিনের কোন এক সময় নতুন করে নিয়ত সম্পূর্ণ জায়েয।

যদি বলা হয়, বিগত রাতে নিয়ত না করা জায়েয হয়েছে এজন্যে যে, সেই সময়ের পূর্বে রোযা ফরয-ই ছিল না। তা ফরয এবং রাখা বাধ্যতামূলক—একথা লোকেরা জানতেই পেরেছিল দিনের বেলার একটি সময়ে। এই কারণে আগের রাতে নিয়ত না করা সত্ত্বেও রোযা জায়েয হয়েছিল। কিন্তু রোযা ফরয—একথা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পর আগের রাতে নিয়ত না করা সঙ্গত হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, রোযা সহীহ হওয়ার জন্যে আগের রাতে নতুন করে নিয়ত করা শর্ত হলে তা না করা অবস্থায় নিশ্চয়ই তা সহীহ হতো না। যেমন খাওয়া বন্ধ করা রোযা সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত, তাই খাওয়া রোযা সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক। আর যে রোযার ফরয হওয়ার হুকুম আগে জানা গেছে এবং যার ফরয হওয়ার কথা জানা গেছে দিনের বেলার কোন এক সময়ে—এদুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। নবী করীম (স) খাওয়া লোকদেরকে আর খেতে নিষেধ করলেন এবং তাদের সকলকে রোযা কাযা করতে আদেশ করলেন, কেননা খাওয়া বন্ধ করা রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত। যারা বিগত রাতে নিয়ত করেনি তাদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ করেন নি, দিনের কোন এক সময়ে রোযা শুরু করায় ও তাদের রোযা সহীহ্ হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট দিনের রোযায় আগের রাতে নিয়ত নতুন করে করা শর্ত নয়। এ ঘটনা তার দৃষ্টান্তসমূহের মূল ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে। এভাবে মানুষ নির্দিষ্ট দিনের রোযাকে নিজের উপর ফরয করে নেয়া এবং দিনের বেলা—সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে নিয়ত করলেই তার রোযা সহীহ প্রমাণিত হতে পারে।

যদি বলা হয়, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার কারণে আশুরার রোযা মনসূখ হয়ে গেছে। তা হলে মনসূখ হয়ে যাওয়াকে কি করে সেই রোযার ব্যাপারে দলীল বানানো যেতে পারে, যা ফরয রূপে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও এখন কার্যকর।

জবাবে বলা যাবে, আশুরার রোযা যদিও ফরয হিসেবে মনসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু

দ্বীনের ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তা অবশ্যই কাজ করতে পারে। কিবলা হিসেবে বায়তুল মাকদিসের কিবলাত্ব মনসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু নামাযের বিধানসমূহ তো মনসূখ হয়ে যায়নি। আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা তার মনসূখ হওয়ার দরুন নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। সে কথা হল ঃ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'অতএব তোমরা পড় কুরআনের যে অংশ পড়া তোমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়। এতে কুরআনের যে কোন অংশ পড়ার পূর্ণ ইখতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে এবং তা এখনও বাকী আছে যদিও তা রাত্রিকালীন নামাযের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে—সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগেই নিয়ত করলে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু তার পরে করলে রোযা জায়েয হবে না। কেননা কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) মাওয়ালীদের নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, যারা খাদ্য গ্রহণ করে ফেলেছে, তারা যেন আর না খায়। আর যারা খাবার খায়নি তারা এখন থেকে রোযা রাখবে, এ খাওয়া ও সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বের ব্যাপার। তার পরে খাবারের উল্লেখ দুটি কারণে হতে পারে। হয় তদ্দ্বারা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বের খাদ্য গ্রহণ বুঝিয়েছে অথবা তাদেরকে বলা হয়েছে যে, নিয়ত জায়েয হওয়াটা সম্পর্কিত হচ্ছে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে তার অস্ত হওয়ার সাথে, সেই সময়, যখন খাবারকে غدا বলা হয়। অন্যাথায় শুধু খাওয়ার কথা বলা হতো, খাদ্যের উল্লেখ হতো না যদি সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে ও পরের হুকুম অভিন্ন হতো। শব্দের এই ফায়দাটা যখন লাভ করা যায়—কেননা রাসূল (স) ব্যবহৃত কোন শব্দ ফায়দাহীন হতে পারে না—রোযার সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে ও পরের মধ্যে পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। নফল নামাযে আগের রাতে নিয়ত না করার অনুমতি হয়েছে একটি হাদীসের ভিত্তিতে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে মূসা মুসলিম ইবনে আবদুর রহমান আসসুলামী আল বলখী—উমর ইবনে হারুন-ইয়াকুব ইবনে আতা-তাঁর পিতা আতা-ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকেট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল, নবী করীম (স) সকাল বেলায়ও রোযার নিয়ত করেন নি। পরে তা শুরু করতেন ও রোযা রাখতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদের নিকট এসে বলতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাবার আছে ? যদি খাব্যর থাকত, (তাহলে তিনি তা খেতেন) নতুবা বলতেন, তাহলে এখন থেকে আমি রোযাদার।

যদি বলা হয়, রাত্র থেকে রোযার নিয়ত ঠিক করা না হলে এবং সকাল পর্যন্ত তা না করলেও দিনের একটা অংশ তিনি অ-রোযাদার হিসেবে কাটিয়েছেন। তার ফলে তিনি খাবার গ্রহণকারী হয়ে গেলেন যেন। ফলে তাঁর সেদিনের রোযা তো হল না ?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, দিনের কোন সময়ে রোযা শুরু করার ঘটনা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত আছে। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা দিনের অতীত হয়ে যাওয়া অংশকে নিয়তহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রোযা সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক মনে করেন নি। তাই নফল রোযা সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধকতায় দিনের প্রথম অংশের খাবার গ্রহণের সমতুল্য মনে করা হয় নি। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দিনে রোযার নিয়ত না থাকাকে তা শুরু করার প্রতিবন্ধক নয় বলে মনে করা হয়েছে। দিনের শুরুতে নিয়ত না হওয়াকে

খাদ্য গ্রহণের সমতুল্য মনে করা হয়নি। যেমন নফল তা তার হুকুম হয়ে যায়নি। উপরন্তু রাত্র থেকেই যদি রোযার নিয়ত করা হতো, পরে সে নিয়ত না থাকত, তা হলে তার এই নিয়ত না থাকা তার রোযার প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। আর তার স্থিতির জন্যে নিয়ত সহকারে থাকাও শর্তরূপে গণ্য হয়নি। এ কারণে কোন কোন রোযায় দিনের প্রথমাংশে নিয়ত না থাকাকে জায়েয মনে করা হয়েছে। দলীল থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। আর তা তার রোযার সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়নি। দিনের প্রথমাংশে খাওয়া ত্যাগ করল, পরে দিনের শেষভাগে খাবার খেল, তাতে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেল। খাওয়াটা নিয়ত না থাকার সমান হল না। শুরুতে খাওয়া ও তাতে স্থিত থাকা অভিন্ন হয়ে গেল। তাতে নিয়তের ব্যাপারটি বিভিন্ন হয়ে গেল। এ কারণে দুটি ভিন্ন ভিন্ন হল। আমাদের ছাড়া অন্যরা তা হতে নিষেধ হল না কিছু। দিনের প্রথমে রোযা, পরে দিনের কোন অংশে তার নিয়ত করা হলে দিনের অতীত সময়টাও রোযার হুকুমের অধীন গণ্য হবে, যেমন করে তাকে রোযা মনে করা হবে নিয়ত না করা সত্ত্বেও।

যদি বলা হয়, নিয়ত ছাড়া, নিয়তকে আনুসঙ্গিক না বানিয়ে যখন নামাযে প্রবেশ করা যায় না, তাহলে রোযার প্রবেশও নিয়ত ছাড়া হওয়া উচিত নয় ?

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়; বরং ভুল। কেননা যে লোক আগের রাত্রে রোযার নিয়ত করল, পরে সে ঘুমাল, নিদ্রিতাবস্থায়ই তার সকাল হল, তার রোযা সহীহ্ হওয়া নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। তার রোযা সম্পূর্ণ, সহীহ্, রোযায় প্রবেশ কালে তার সাথে নিয়ত যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও। যদি কেউ নামাযের নিয়ত করে, তারপর সে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায়, তার পরে এসে তাহ্রিমা বাঁধে, তাহলে নামাযে প্রবেশ মুহূর্তে নতুন করে নিয়ত না করলে তার নামায সহীহ হবে না। কিন্তু রোযায় দাখিল হওয়ার জন্যে তার তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া যখন সর্বসম্মতভাবেই শর্ত নয়, নামাযে দাখিল হওয়ার জন্যে তার তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া শর্ত, তাই রোযাকে এ দিক দিয়ে নামাযের ন্যায় মনে করা ঠিক হবে না। নামাযে দাখিল হওয়ার জন্যে তার শুরুতে তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া একান্তই জরুরী। নিয়তের ব্যাপারে নামাযকে রোযার সাথে তুলনা করা সহীহ হতে পারে না। উপরন্তু নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নফল রোযা দিনের কোন এক সময়ে শুরু করে দিতেন। ফিকাহবিদগণ এ বর্ণনাকে কবুল করেছেন, তারা এর ভিত্তিতে ফিকহী মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, নফল নামাযে তাৎক্ষণিক নিয়ত ছাড়া প্রবেশ করা সহীহ হবে না। ফলে আমরা এ থেকে জানতে পারলাম যে, রোযার নিয়ত নামাযের নিয়তের মত গণ্য হবে না, তুল্য নয়, আমরা যে দিক দিয়ে আলোচনা করলাম সে দিক থেকে। কিন্তু যে রোযা নিজ যিম্মায় ও নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াজিব করা হয়েছে, অথচ যা ফরয নয়, তাতে আগের রাত্রে নিয়ত না করা জায়েয নয়। এ কথার ভিত্তি হচ্ছে হযরত হাফসা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ 'আগের রাত্রে যে লোক নিয়ত দৃঢ় করেনি, তার রোযা হবে না।' এই কথার সাধারণ ও

ব্যাপক তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে আগের রাত্রিতেই নিয়ত করতে হবে সর্বপ্রকারের রোযার। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের রোযা ও নফল রোযায় যখন প্রমাণ পাওয়া গেছে এর ব্যতিক্রমের, তখন সেই দলীল আমরা মেনে নিয়েছি এবং মোটামুটি সর্ব প্রকারের রোযা থেকে সেই রোযাকে বিশেষীকৃত করেছি। অপর রোযাসমূহের ক্ষেত্রে আমরা উক্ত হাদীসের কথাকে প্রয়োগ করেছি। পর-পর দুই মাসের রোযা ও রমযানের রোযার কাযা তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কেননা পরপর দুই মাসের রোযা অনির্দিষ্ট, যখনই ইচ্ছা তা 'শুরু' করা যেতে পারে, যখনই শুরু করা হবে, তাই হবে তার ফরয সময়। ফলে তা যিম্মায় লওয়া সব রোযার মতই হয়ে গেল।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত থেকে যে সব হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রোযা তার জন্যে বাধ্যতামূলক, যে এ মাসটি পাবে। আর মাসটি পাওয়া তিন পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। একটি হচ্ছে রোযার মাস এসেছে একথা জানতে পারা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ شَاهَدْتُ كَذَا وَكَذَا 'আমি এই-এই পর্যবেক্ষণ করেছি।' দ্বিতীয়—নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা। যেমন কথা-বার্তায়ই বলা হয়। মুকীম ও মুসাফির, শাহেদ ও গায়েব। তৃতীয় লোকটি এমন হবে যে, তার উপর শরীয়াত পালনের দায়িত্ব চেপেছে অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। ।ايام هدود। 'নির্দিষ্ট দিনগুলোর রোযা' বলে যে দিনগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, উক্ত আয়াত তা মনসূখ করে দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বে এই দিনগুলোর রোযা ফরয ছিল, পরে তা উক্ত আয়াতের দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। সুস্থ ও নিজ বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্যে রোযা ও ফিদিয়া দেয়ার মাঝে যে-কোন একটি করার যে ইখতিয়ার ছিল, তাও বাতিল হয়ে গেছে। এ কথাও জানা গেছে যে, যে লোক একাকী নতুন চাঁদ দেখবে, তার জন্যে তার রোযা রাখা বাধ্যতামূলক। রমযানের প্রথম দিন সকালে যে লোক জানতে পারল যে, মাস শুরু হয়ে গেছে কিংবা যে লোক অসুস্থ রোগী ছিল, এক্ষণে ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু খাদ্য-পানীয় এখনও গ্রহণ করেনি; অথবা যে ছিল মুসাফির, এখনে বাড়িতে ফিরে এসেছে, তারা সকলেই নিজ নিজ রোযা রাখতে বাধ্য। কেননা তারা সকলে রমযান মাস প্রত্যক্ষকারী। একথাও জানা গেছে যে, সিয়াম ফরয কেবল ও বিশেষভাবে তারই জন্যে যে মাসটিকে প্রত্যক্ষ করেছে—যে তা করেনি, তার জন্যে নয়। যার পক্ষে শরীয়াতই এখন পর্যন্ত ফরয হয়নি কিংবা বাড়িতে অবস্থানকারী নয়, বিদেশ সফরে রয়েছে, কিংবা রমযান মাসের আগমন-সম্পর্কে জানতেই পারেনি, তার জন্যে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। এ ফায়দাটাও পাওয়া গেছে যে, এই ফরয রোযার জন্যে একটা মাস নির্দিষ্ট হতে হবে। তা আগে নিয়ে আসাও জায়েয হবে না, জায়েয হবে না তা পিছিয়ে দেয়া—যে সে মাসকে প্রত্যক্ষ করেছে তার পক্ষে। রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তে মাসের কিছু অংশ লক্ষ্য, গোটা মাস নয়। কাফির রমযানের কোন অংশে কোন দিন ইসলাম কবুল করলে, বালক পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করলে, অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখাই তার কর্তব্য। এ ফায়দাও আমাদের লাভ হয়েছে যে, যে লোক নফল রোযার নিয়ত

করেছে, তা-ই তারজন্যে যথেষ্ট। কেননা রোযা রাখার শর্তহীন আদেশ হয়েছে, কোন বিশেষ গুণ দ্বারা তাকে বিশেষিত করা হয়নি। কোন শর্তের কয়েদ লাগানো হয়নি। তাই রোযা যেভাবেই রাখা হবে, তা-ই বৈধ হবে। এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়েছে যে বলেছে, রমযান মাস আসার খবর না জেনেই যে-লোক রোযা রেখেছে, তার জন্যে সে রোযা জায়েয হবে না। যার উপর রমযান মাস এসে গেছে, সে নিজ বাড়িতে অবস্থান আছে, পরে সে বিদেশ যাত্রা শুরু করেছে, সে যেন সে দিনের রোযা না ভাঙ্গে। কেননা সে তো উক্ত আয়াতের আওতার মধ্যে এসে গেছে। আমরা উক্ত আয়াত থেকে এ সব তত্ত্ব ও মাস'আলা জানতে পেরেছি। এ আয়াতে আরও অনেক তত্ত্ব ও মাসআলা নিহিত থাকা অসম্ভব নয়, আমাদের ইলম হয়ত তা আয়ত্ত করতে পারেনি। অন্য সময় হয়ত আমরাই তা জানতে পারি অথবা অন্য লোকেরা এ আয়াতটি থেকে হয়ত আরও বহু হুকুম-আহকাম বের করবেন, তা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। আর فَلْيَصُمْهُ শব্দটি থেকে আমরা অনেক তত্ত্বই পেয়েছি, যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। বলেছি, রোযা থাকা অবস্থায় কি কি জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে, সেসব বিষয়ে সর্বসম্মত মত স্থিরকৃত হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। তার শর্তসমূহও আমরা উল্লেখ করেছি, যদিও তা মূল ও আসল রোগী সম্পর্কিত কথা নয়। রোগী ও বিদেশ যাত্রী সংক্রান্ত মাস'আলাও আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহে বলে এসেছি।

মাস পাওয়ার অবস্থা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক রমযান মাস পেল, সে যেন সেই মাসটি ধরে রোযা রাখে।

বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ –

লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল—তা লোকদের জন্যে সময় ও হজ্জ-এর তারিখের ঘোষক ও নির্ধারক।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ, হাম্মাদ, আইউব, নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনে। তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না, চাদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না। যদি (ঐ তারিখ) তোমাদের উপর মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তা হলে তার পরিমাণ ঠিক কর। হযরত ইবনে উমর (রা) শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখ হলেই চাঁদ দেখতে চেষ্টা করতেন। দেখতে পেলে পরের দিন থেকেই রোযা শুরু করতেন। যদি দেখতে না পেতেন অথচ কোন মেঘ আড়াল করেনি কিংবা কোন কুণ্ঠা তা হলে সকালে রোযা রাখতেন না। যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখতে না পেতেন বা কোন কুণ্ঠা

আড়াল করত তা হলে সকাল বেলা রোযাদার হয়েই দেখা দিতেন। বলেছেন, ইবনে উমর (রা) জনগণের সাথে একত্রিত হয়েই ইফতার করতেন এবং এ ব্যাপারে কোন হিসেব গ্রহণ করতেন না।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা থাকো.... "আল্লাহ্র লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল—তা লোকদের সময় ও হজ্জ্ব নির্ধারণের মাধ্যম"-এ কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতটির এ তাৎপর্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ একমত। আর হাদীসটি হচ্ছে রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় চাঁদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। বোঝা গেল, নতুন চাঁদ দেখাটাই হল রমযানের মাস পাওয়া। আল্লাহ্র কথাঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে' থেকেই তা প্রমাণিত। প্রমাণিত এভাবে যে, যে রাত্রে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তা পরবর্তী মাসের রাত, বিগত মাসের নয়।

রাসূলে করীম (স)-এর কথা فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ এর তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, এ কথাটিতে চন্দ্রের বিভিন্ন মনযিল বোঝানো হয়েছে। চন্দ্রের স্থান যদি মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে পড়ে গিয়ে না থাকে, বরং তা স্পষ্ট দেখা যায়, তা হলে হুকুম হবে যে, চাঁদ দেখা গিয়েছে, রোযা থাকতে হবে, রোযা ভাঙ্গা যাবে না। অন্য কোন অবস্থা হলে 'চাঁদ দেখা গেছে' বলা যাবে না। অন্যান্যরা বলেছেন, প্রথমোক্ত অবস্থায় শাবান মাস ত্রিশ দিনের ধরতে হবে। (আর ত্রিশ দিনের বেশী যেহেতু চান্দ্র মাস হয় না, তাই তার পর থেকেই রমযান মাস হবে)।

প্রথম ব্যাখ্যা গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা চন্দ্রের মনযিলের ব্যাপার তো জ্যোতির্বিদদের ব্যাপার। চন্দ্রের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান সম্পর্কে যারা জানে, রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তাদেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু তা আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা—হে নবী তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, তা লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক'—এর পরিপন্থী। আয়াতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এটা তো সকল মানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক ইবাদত। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয় যা কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই জানে সর্বসাধরণ জানে না। আর সেই বিশেষ মুষ্টিমেয় লোকদের কথায় সকলের হৃদয় সান্ত্বনা না-ও পেতে পারে।

তবে উক্ত আয়াতের শেষোক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সহীহ। সর্ব সাধারণ ফিকাহবিদদের তা-ই মত। হযরত ইবনে উমর (রা) এ হাদীসটির বর্ণনাকারী। হাদীসে তাঁর থেকে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি এ হিসেব মেনে নিতেন না। রাসূলে কথা ঃ فَاقْدُرُوْا لَهُ এই কথার আর একটি তাৎপর্য বলা হয়েছে,তা কোন ব্যাখ্যাদান নয়; বরং তা একটি হাদীসের কথা। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস আল মুয়াদ্দিব শুরাইহ ইবনে নুমান ফুলাইহ ইবনে সুলায়মান নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স)-এর নিকট রমযান মাসের উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ

لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা রমযানের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না। (শাবান মাসের ঊনত্রিশ তারিখ) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তোমরা সে মাসটিকে ত্রিশ দিনের পরিমাণ করবে।

এ হাদীসটি রাসূলের কথা فَاقْدُرُوْا لَهُ -এর ব্যাখ্য ও অর্থ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। ফলে ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা প্রত্যাহৃত হল। অপর একটি বর্ণনাও তাদের ব্যাখ্যাকে বাতিল প্রমাণ করেছে। বর্ণনাটি হাম্মাদ ইবনে সালমা-সামাক ইবনে হরব ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে এসেছে। বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ اَوْقَتَرَةٌ فَعَدُّوْا ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, রোযা রাখা বন্ধও করবে সেই চাঁদ দেখে, যদি তোমাদের ও চাঁদ দেখার মাঝে মেঘ বা কুয়াশা আড়াল হয়ে দাঁড়ায় (আর সে কারণে চাঁদ দেখতে না পার) তাহলে মাসে ত্রিশ দিন গণনা কর।

তাহলে রাসূলে করীম (স) ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর থেকেই রোযা রাখতে শুরু করে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য যদি লোকদেরও চাঁদের মাঝে মেঘ বা কুয়াশা প্রতিবন্ধক না হয়। তা সেই লোকের কথা মেনে নিতেও বাধ্য করে না, যে বলেছিল যে, আমাদের ও চাঁদের মাঝখানে কোন মেঘ আড়াল হয়ে না দাঁড়ালে আমরা অবশ্যই তা দেখতাম।

এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে, যা আরও স্পষ্ট কথা বলেছে। তা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে ফারেস ইউনূস ইবনে হুরায়রা আবূ দাউদ তায়ালিসী আবূ আওয়ানাতা সামাক ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

صُوْمُوْا رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ غَمَامَةٌ اَوْضَبَابَةٌ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ -

তোমরা রমযান মাসে রোযা রাখো তার চাঁদ দেখে। যদি তোমাদের মাঝে কোন মেঘাচ্ছন্নতা বা ধুলিস্তর কুয়াশা আড়াল হয়ে পড়ে, তা হলে তোমরা শাবান মাস ত্রিশ দিনের মেয়াদে পূর্ণ কর। আর তোমরা শাবান মাসের একদিন রোযা রেখে রমযানকে অগ্রে নিয়ে এসো না।

এ হাদীস কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে রমযান মাসে চাঁদ দেখতে না পেলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনের বানাবার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই যারা চন্দ্রের মনযিলের হিসেব

করতে বলেছেন এবং জ্যোর্তিবিদদের নিকট থেকে চাঁদের খবর জানতে বলেছেন, শরীয়াতে সে কথার কোনই মূল্য নেই, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করারও কিছু নেই। কেননা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্ট কথা বলেছে। ফিকাহবিদদের ইজমাও রয়েছে। রাসূলের কথা ঃ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে, যদি তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শাবান মাস ত্রিশদিন গণনা কর। এটাই এ ব্যাপারে ভিত্তি হয়ে আছে। হ্যাঁ, তার পূর্বে চাঁদ দেখা গেলে অন্য কথা। তবে যে কোন মাসের শেষ দিন (উনত্রিশ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেই সে মাসকে ত্রিশদিনের মাস বানানো আমাদের কর্তব্য। এটা প্রত্যেক মাসেই করা যাবে, বিশেষ করে যে মাসের সাথে শরীয়াতের কোন হুকুমের সম্পর্ক রয়েছে, সে মাসে তো তা-ই করণীয়। অবশ্য উনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা গেলে সে মাস ত্রিশদিনের কম উনত্রিশ দিনের হবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ যে লোক তার ঘর দশ মাসের ভাড়ায় দিয়েছে তা কোন কোন মাসের কারণে নয় মাস হয়ে যাবে চাঁদের কারণে—একমাস ত্রিশদিনে প্রথম মাসটি পূর্ণ হবে, মাসের শেষের তুলনায় তার কমতির পরিমাণ অনুযায়ী। কেননা প্রথম মাস চাঁদ ছাড়াই শুরু হবে। পরে সে মাসকে ত্রিশদিনে পূর্ণ করা হবে। অন্যান্য মাসও এই চাঁদের কারণে। অন্যরা তা গণ্য করবে না। তাঁরা বলেছেন, মাসের প্রথম দিনই যদি ভাড়ায় দিত তাহলে সব মাসই চাঁদ অনুযায়ী হতো।

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। আমাদের মাযহাবের ফিকাহবিদগণ একত্রিত হয়ে বলেছেন, রমযান মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে যদি আকাশে কোন প্রতিবন্ধক থাকে তবে। যদি আকাশে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তখন বহু কয়জনের সাক্ষ্য জরুরী হবে। কেননা একটি বিষয়ে বহু সংখ্যক লোক সাক্ষ্য দিলে সে বিষয়ে 'ইলম' লাভ হয়। ইমাম আবূ ইউসূফ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ ব্যাপারে পঞ্চাশ জনের সীমা নির্ধারণ করেছেন। শওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ সম্পর্কেও এ কথা, যদি আসমানে কোন আড়াল বা বাঁধা না থাকে। আকাশে কোন প্রতিবন্ধক থাকলে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সাক্ষ্য ছাড়া ইতিবাচক ভাবে কিছু গ্রহণ করা যাবে না। অধিকার প্রমানের জন্যেও এই রকম দুজনের সাক্ষ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। মালিক, সওরী, আওজায়ী, লাইস, আল-হাসান ইবনে হাই ও উবায়দুল্লাহ বলেছেন, রমযান ও শওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কম গ্রহণযোগ্য নয়। মুজানী শাফেয়ীর মত বর্ণনা করেছেন, রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যদি একজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেয়, তা হলে আমি মনে করি, তা কবুল করা উচিত। কেননা এ পর্যায়ে একটি হাদীস এসেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সতর্কতার নীতি ও 'কিয়াস' হচ্ছে দুজন

সাক্ষীর কম গৃহীত হওয়া উচিত নয়। তবে শওয়ালের চাঁদ-দেখা প্রমাণের জন্যে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী অবশ্যই পেতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বহু সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখার শর্ত করেছেন, আকাশ যদি উন্মুক্ত থাকে, তা হলে। তবেই না 'ইলম' হাসিল হতে পারে তাদের দেয়া সংবাদ থেকে। এটা ফরয এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক ও সাধারণ। জনগণকে চাঁদের সন্ধানে লিপ্ত হতে আদেশও করা হয়েছে। তাই বহু লোক চাঁদ দেখতে চেষ্টিত হবে, আকাশেও কোন আড়াল বা প্রতিবন্ধক নেই, সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্যোগ চাঁদ দেখার দিকেই নিবদ্ধ কিন্তু খুব সংখ্যক লোক চাঁদ দেখতে পেল, অবশিষ্টরা দেখল না, তাদের দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ বাধাও কিছু নেই। এরূপ অবস্থায় চাঁদ দেখার কথা বলল অল্প সংখ্যক লোক, সকলে বলল না। তা বিশ্বাস্য হতে পারে না। সহজেই বলা যায়, তারা ভুল করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা চাঁদ দেখেনি। তারা হয়ত কোন কাল্পনিক জিনিস দেখে তাকে চাঁদ মনে করে বসেছে অথবা ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলছে। এটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। এ এক নির্ভুল মৌল নীতি। তা সত্য বলে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি অবশ্যই মেনে নেবে। শরীয়াতের ব্যাপার এরই উপর ভিত্তিশীল। এ ক্ষেত্রে ভুল করা হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। নাস্তিক আল্লাহ্‌দ্রোহীরা সংশয় সৃষ্টি করতে পারে, সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, যারা কম বিশ্বাসী তারা প্রতারিত হতে পারে।

এ কারণে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, শরীয়াতের যেসব ব্যাপার জনগণের সাথে সম্পর্কিত, তার ব্যাপক প্রচারই তার প্রমাণের একমাত্র উপায়। তাতে বিশ্বাস্য ইলম অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা প্রমাণিত হওয়া উচিত নয়। যেমন পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণে অযূ ফরয হওয়া, নারী স্পর্শে উযূ ফরয হওয়া, অগ্নিদগ্ধ কিছু খেলে অযূ ফরয হওয়া এবং বিসমিল্লাহ না বলে অযূ করা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার যখন এক সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে। তখন এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমটা তওকীফ পর্যায়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এ বিষয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট বাণী পৌঁছেছে এবং তার উপর সকল মানুষকে থামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, আর সকলেই যখন তা জেনে নিয়েছে, তখন তার বর্ণনা ত্যাগ করা এবং একজনের বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। কেননা তারা সকলেই তা বর্ণনার জন্যে আদিষ্ট। তাদের প্রতি যা বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সকলেরই উপর হুজ্জাত—অকাট্য দলীল। যেখানে সে হুজ্জাত—দলীল উপস্থাপন প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করা আদৌ সঙ্গত নয়। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এ সব ব্যাপারে এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে তওকীফ হয়নি। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তাঁর থেকে একটা কথা এসেছে, যার বহু কয়টি অর্থ হতে পারে। তার বর্ণনাকারী একক ব্যক্তিগণ সেটিকে তাদের ধারণা অনুযায়ী প্রয়োগ করেছে। অন্যভাবে প্রয়োগ করেনি। যেমন পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণে অযূ করা জরুরী হওয়া। হতে পারে তাঁর আসল বক্তব্য শুধু হাত ধৌতকরণ। যেমন রাসূলে করীম (স)-এর অপর একটি কথা এই মর্মে রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهَا فِى الْاِنَاءِ فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَايَتْ يَدُهُ -

তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে, তখন তার হাত তিনবার ধুবে পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে। কেননা তার হাত রাত্রিবেলা কোথায় কোথায় বিচরণ করেছে, তা তো জানা নেই।

উসূলিল ফিকাহ্-এ এর মৌল আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ মৌলনীতি হারানোর ফলে এক শ্রেণীর লোকদের উপর সংশয় প্রবল হয়ে উঠেছে রাসূলের কথা গুরুত্ব সহকারে ধারণ করার দরুন। তারা বলেছে, রাসূলের কথা একজন ব্যক্তির উপর যথাযথভাবে অকাট্য দলীল, মুসলিম উম্মতের জন্যে তাকে খলীফা বানানো হয়েছে আর উম্মত তা গোপন করেছে। ফলে তারা হেদায়েতের পথ হারিয়ে ফেলেছে, অন্যদেরকেও গুমরাহ করেছে। ইসলামী শরীয়াতের বড় বড় কতগুলো বিধান তারা প্রত্যাখান করেছে। এতে তারা এমন কতগুলো জিনিসের দাবি করেছে যার বাস্তবতা কিছুই নেই। স্থিতিও নেই। দলবদ্ধভাবে তার বর্ণনা করার দিক দিয়েও নয়। একক বর্ণনার দিক দিয়েও নয়। ফলে তারা নাস্তিক ও ইসলাম বিরোধী মতের ধারক লোকদের জন্যে শরীয়াতে এমন কিছুর দাবি করার পথ সুগম করে দিয়েছে, যা আসলে শরীয়াতের জিনিস নয়। ইসমাঈলী ও যিন্দীক লোকদের জন্যে গোপন করা জিনিসকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখার সাহসী বানিয়ে দিয়েছে। যেমন 'ইমামত'-এর ব্যাপার। তা অত্যন্ত বিরাট ও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, জনগণের মনে তার বিশেষ স্থান রয়েছে। তারা তাকে গোপন রাখা জায়েয বলে ঘোষণা করেছে। তারা তাদের জন্যে নতুন শরীয়াত রচনা করেছে। বলেছে, তা গোপন জিনিস। তারা এর এমন এমন ব্যাখ্যা দিয়েছে, যে সম্পর্কে তারা দাবি করেছে যে, এটাই ইমামের দেয়া ব্যাখ্যা। এর ফলে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং তাদেরকে 'খজমীয়া' মাযহাবে দাখিল করে দিয়েছে, দাখিল করেছে সাবেয়ীনের মধ্যে। তাদের কথা যারা যারা কবুল করেছে, তারা যেমন যেমন দাবি করেছে, তেমনই তারা করেছে। তাদের মুখে নতি স্বীকার করে তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করেছে। আমরা জানি, এই গোপনতাকে বৈধ মনে করা হলে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত স্থিতিশীল থাকতে পারে না। তাঁর মুজিযাসমূহ সহীহ মানা হয় না। সব নবী রাসূলেরই অবস্থা একই রকম হয়ে যায়—তাদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন। ইমামত গোপন করা যদি জায়েয-ই হয় তাহলে সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণও বৈধ হয়ে যায়। কেননা যে জিনিস গোপন রাখা যায়, তার নামে ভিত্তিহীন খবর রটনাও অবশ্যই বৈধ হয়ে যায়। তখন নবীর মুজিযা সংক্রান্ত সংবাদদাতাগণ-ও যে মিথ্যার আশ্রয় নেন নি, তা জোর করে বলা যায় না। তারাও তো মিথ্যা বলতে পারেন, যেমন করে ওরা ইমামের নামে অকাট্য দলীল মিথ্যামিথ্যি প্রচার করছে।

অন্য এক দিক দিয়ে নবী করীম (স)-এর মুজিযা বর্ণনাকারিগণ এই জনগোষ্ঠিকে গুমরাহ-ফিরকা ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, ওরা কাফির হয়ে গেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে

নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর ইমামের ব্যাপারটি গোপন রেখে। তাদের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচজন কি ছয়জন ব্যক্তি মুরতাদ হয়নি। এই সংখ্যা সংক্রান্ত খবর অবশ্য বিশ্বাস্য নয়। তাদের দ্বারা মুজিযাও প্রমাণিত হয় না। তাদের মতে বিপুল সংখ্যক লোকের দেয়া খবর অ-গ্রহণযোগ্য। কেননা তাদের ধারণা, এই বিপুল সংখ্য লোক-ও তো একত্রিত হয়ে মিথ্যা বলতে পারে। ফলে বর্ণনা সহীহ্ হওয়া স্বল্প সংখ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবেই নবী করীম (স) এর মুজিযা অস্বীকার ও তাঁর নবুয়ত বাতিল ঘোষণা করা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, আযান, ইকামত, রুকূর তাকবীরে ও দুই ঈদের তাকবীরসমূহে হাত উপরে তোলা ও আইয়্যামে তাশরীকে হাত তোলা সাধারণভাবেই প্রচলিত হয়ে পড়েছে। অথচ এ ব্যাপারে মতপার্থক্যও যথেষ্ট রয়েছে। এ বিষয়ে যিনিই নবী করীম (স) থেকে কোন কথা বর্ণনা করেছেন, তা 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ অবস্থায় দুটির যে কোন কারণ দেখা যাবে। হয় তাতে রাসূলে করীম (স) থেকে সকলের জন্যে—তার ব্যাপক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও—কোন 'তওকীফ' হয়নি।—এতে কিন্তু সেই মৌল নীতিটি বাতিল হয়ে যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে যা প্রয়োজন, তা অবশ্যই সাধারণ ভিত্তিক ও ব্যাপক হবে। তাহলে এ বিষয়ে নবী করীম (স) থেকে উম্মতের উপর 'তওকীফ' হওয়া জরুরী। অথবা হয়ত নবী করীম (স) থেকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্যে 'তওকীফ' ছিল; কিন্তু তা যখন একক সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণিত হল, তখন তার বর্ণনা করা হল না। এতেও তো সেই মৌল নীতি ধ্বংস হয়ে যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, সাধারণ্যে ব্যাপক হয়ে থাকা জিনিসের বর্ণনা সর্বসাধারণের পক্ষ থেকেই হতে হবে।

জবাবে বলা যাবে, এ ধরনের প্রশ্ন তারই পক্ষে করা সম্ভব, মাস'আলাটি প্রসঙ্গে আমাদের কথার ভিত্তিকে যে লোক আয়ত্ত করতে পারেনি। আমরা বলেছি, যা সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক, সকলে যে ফরয পালন করে চলেছে, তা ত্যাগ করা জায়েয নয়, তার বিরোধিতা করাও নয়। যেমন ইমামত-এর ব্যাপার। সে সব ফরয, যা পালন করা সকলেরই জন্যে বাধ্যতামূলক। তবে যা ফরয নয়, জনগণ তাতে ইখতিয়ার সম্পন্ন, যতটা ইচ্ছা করবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম নীতি কি, তাই নিয়েই ফিকাহবিদদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। নবী করীম (স) তার মধ্যে উত্তম নীতির উপর কোন 'তওকীফ' আসেনি। এতে তো তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়েই আমি আযান, ইক্বামত, দুই ঈদের ও তাশরীকের তকবীরের উল্লেখ করেছি। এ ধরনের আরও যেসব ব্যাপার রয়েছে, যাতে আমরা করা না-করার ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়ে আছি। এর মধ্যে উত্তম কোনটা, তা নিয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ কারণে কোন কোন খবর একক সূত্রে আসা জায়েয হয়েছে। ব্যাপারটির এ তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে যে, এ সবই রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইখতিয়ার দান হিসেবে। তা সে রকমের নয়, যার উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা ত্যাগ ও অতিক্রম করে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। যদিও তা ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচলিত। আমরা নতুন চাঁদ দেখার

ব্যাপারে যে হাদীসের উল্লেখ করেছি—যখন আকাশে প্রতিবন্ধক কিছু নেই তা সেই মৌল নীতি ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচলিত, তার মুতাওয়াতির বর্ণনা হলেই 'ইলম' পাওয়া যায়। আর আকাশে প্রতিবন্ধক থাকলে চাঁদ সকলের পক্ষে দেখা সম্ভব না-ও হতে পারে। এও হতে পারে যে, লোকদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনই বা দুজনই তা দেখতে পেল মেঘের আড়াল থেকে। অন্য লোকদের দেখার আগেই হয়ত তা মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। এ কারণে এ বিষয়ে 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করা যাবে। দুজনের কথাও মেনে নেয়া যাবে। দৃঢ় লাভ হওয়া তাতে শর্ত করা হয়নি।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ রমযানের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করার নীতি গ্রহণ করেছেন। তার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ ইবনে সালমা, সামাক ইবনে হরব, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছন। তা হচ্ছে, একবার সাহাবীগণ রমযানের হিলাল সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেন, তারাবীহ-ও পড়বে না, রোযাও রাখবে না। এ সময় 'হররা' থেকে একজন বেদুইন এসে উপস্থিত। সে সাক্ষ্য দিল, সে রমযানের চাঁদ দেখেছে। তখন তাঁরা তাকে নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দাও? বলল, হ্যাঁ। সেই সাথে সে নতুন চাঁদ দেখারও সাক্ষ্য দিল। তখন নবী করীম (স) হযরত বিলাল (রা)-কে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, 'কিয়ামে লাইল' করতে হবে, রোযাও রাখতে হবে। আবূ দাউদ বলেছে, 'কিয়ামে লাইল' বাক্যটি শুধু হাম্মাদ ইবনে সালমা (জনৈক বর্ণনাকারী)-ই বলেছেন (অন্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এই শব্দ নেই), মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ, ইবনে খালিদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আস্-সামারকান্দী (তাঁর বর্ণিত হাদীসের প্রতি আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে অহব, ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিম আবূ বকর ইবনে নাফে, তার পিতা, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখতে চেষ্টা করছিল। আমি রাসূলে করীম (স)-কে খবর দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তখন তিনি নিজে রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও তাদের রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত রমযানের রোযা হচ্ছে ফরয। দ্বীনের দিক দিয়েই তা বাধ্যতামূলক। তাতে যদি ব্যাপক প্রস্তুতি ব্যাহত হয়, তা হলে 'খবরে ওয়াহিদ'কে শরীয়াতের ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত 'খবরে ওয়াহিদ'-এর মতোই মনে করতে হবে। তাতে খবরের ব্যাপক বিস্তৃতি শর্ত হতে পারে না। এ কারণে তারা একজন মেয়েলোক, দাস ও 'কযফ' অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেয়া খবরও কবুল করেছেন। তবে তাতে বর্ণনাকারীর عدل হওয়ার শর্ত রয়েছে। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অনেক বর্ণনাই 'কিয়াস' বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কবুল করা হয়। শওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে তারা দুজন عدل সাক্ষীর সাক্ষ্যই গ্রহণ করতেন, তার কম গ্রহণ করতেন না। তারা এমন যে, শরীয়াতের বিধানে তাদের

সাক্ষ্যই গৃহীত হয়ে থাকে। এর দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহীম আবূ ইয়াহইয়া আল-বাজ্জার, সাঈদ ইবনে সুলায়মান, উবাদ, আবূ মালিক আল-আশজায়ী, হুসায়ন ইবনুল হরস, আল জদলী, জুদায়লাতা কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার আমীর (শাসনকর্তা) ভাষণ দিলেন। পরে বললেন, রাসূলে করীম (স) আমাদের প্রতি এই ফরমান দিয়েছেন যে, আমরা চাঁদ দেখেই হজ্জ ও কুরবানী করব। যদি দেখতে না পাই, তখন যদি দুইজন عدل সাক্ষীও সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সেই দুই জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা হজ্জ ও কুরবানীর অনুষ্ঠান পালন করব। পরে আমি মক্কার আমীরের এই কথা সম্পর্কে হুসায়ন ইবনুল হরসকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি জানি না। পরে আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে বললেন, তিনি আল-হরস ইবনে হাতিব মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব-এর ভাই। পরে মক্কার আমীর জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি জানে, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে সাক্ষ্য দেবে যে, এটা রাসূলের কথা ? তখন এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে দেখালেন। হুসায়ন বললেন, আমি আমার পাশে বসা শায়খকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমীর কাকে ইঙ্গিত করে দেখালেন ? বললেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং সত্যই বললেন। তিনি আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে তার তুলনায় বেশীই জানতেন। তিনিও সেই কথাই বললেন যে, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে তা-ই করার আদেশ করেছেন।

তাঁর কথা ঃ 'আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা 'হিলাল' দেখে (হজ্জ ও কুরবানীর) ইবাদত অনুষ্ঠান করব। এ হচ্ছে ঈদের নামায ও কুরবানীর দিনের পশু যবেহ করা। কেননা এখানে 'নুসুক' نسك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, রমযানের রোযার কথা নয়। এ শব্দটি রোযাকে আদৌ শামিল করে না। অবশ্য সালাত ও যবেহ-এর মধ্যে শামিল হয়। যেমন কুরআনের আয়াত ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ এতে نُسُكٌ -কে সিয়াম থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। نسك শব্দ ঈদের নামায শামিল করে, তা বরা ইবনে আজিব (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الذَّبْحُ -

রাসূলে করীম (স) কুরবানীর দিন বলেছেন, আমাদের আজকের দিন সর্বপ্রথম নুসুক হচ্ছে ঈদের নামায। তার পরে পশু যবেহ করা।

এতে নামাযকে 'নুসুক' বলা হয়েছে। পশু যবেহ করাকে 'নুসুক' বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিতে ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ -

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার 'নুকুস' আমার বেঁচে থাকা ও মৃত্যু বরণ করা আল্লাহ্র জন্যে ....

اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

এ কথাতেও কিংবা সাদকা, অথবা নুসুক।

এ থেকে প্রমাণিত হল রাসূলে করীম (স) আমাদের প্রতি আদেশ করেছেন যে, দুজন عدل সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা হজ্জ ও কুরবানীর অনুষ্ঠান করব—এ কথার মধ্যে ঈদুল ফিতর-এর নামায ও কুরবানীর দিনের পশু যবেহ করা শামিল রয়েছে। অতএব তাতে দুজন সাক্ষীর কমের সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না।

অন্য দিক দিয়ে, ফরয কাজ করার দ্বারা তাকে প্রকাশ করা, তা না করে প্রকাশ করার তুলনায় অনেক ভালো। অতএব তোমরা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা বন্ধ করে তার প্রকাশ ঘটাও। কেননা যে দিন রোযা নেই, সেদিন খাওয়া থেকে বিরত থাকা রোযার দিন খাদ্য গ্রহণের তুলনায় অনেক ভালো।

যদি বলা হয়, এতে প্রকাশমানতাকে তরক করা হয়। কেননা এটা সম্ভব যে, ফিতরের দিন হবে, একজন সাক্ষীও তার সাক্ষ্য দিয়েছে। এক্ষণে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে এবং দুই ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ ঘটানোকে গণ্য করা হবে, তাহলে ফিতরের দিন তোমার রোযাদার হওয়া থেকে তুমি বাঁচতে পার না। তাতে যেমন নিষিদ্ধ কাজ ঘটানো হবে, তেমনি তা সতর্কতার নীতিরও পরিপন্থী হবে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, সেদিন রোযা রাখা আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ কেবল তখন, যদি আমরা জানতে পারি যে, সেটি ফিতরের দিন। যদি আমাদের নিকট ফিতরের দিন বলে প্রমাণিতই না হয়, তাহলে সেদিন রোযা রাখা আমাদের জন্যে তো নিষিদ্ধ হয়নি। সেদিন ফিতরের দিন প্রমাণিত না হলে আমরা দাঁড়িয়ে যাই রোযা রাখা ও না-রাখার মাঝে, তাহলে তা না রাখা অপেক্ষা রাখাই অধিক সতর্কতার কাজ। কেননা তা ফিতরের দিন প্রমাণিত হতে পারে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যে, যার সাক্ষ্যে মানুষের হক নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ সন্দেহের দিন রমযানের রোযা রাখা নিষিদ্ধ প্রমাণ করে। কেননা যার মনে সন্দেহ রয়েছে, সে তো রমযান মাস পায়নি, প্রত্যক্ষ করেনি। সে তো জানে না যে, রমযানের মাস শুরু হয়েছে। তাই রমযানের রোযা রাখা তার জন্যে জায়েয নয়, নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ 'তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। সেদিন তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর'। যে দিনটিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, নতুন চাঁদ দেখা যাবে না, সে দিনটি শাবান মাসের গণ্য হবে। ফলে শাবান মাসে রমযান মাসের রোযা রাখা যায় না। কেননা সে মাস এখানো আসেনি, ভবিষ্যতে আসবে। একথা অপর একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদীসটি আবদুল

বাকী ইবনে কানে ফজল ইবনে মুখাল্লাদ আল-মুয়াদ্দিব মুহাম্মাদ ইবনে নাসেহ বাকীয়া, আলী, আল-কুরাশী মুহাম্মাদ ইবনে আজ্লান, সাহিল মাওলা তাওয়ামা, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

نَهَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ الدَّادَاةِ ، وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ لاَيَدْرَى مِنْ شَعْبَانَ هُوَاَمْ مِنْ رَمَضَانَ -

দা'দার দিন—যেদিন হবে সন্দেহের যে, সেটা শাবান মাসের দিন, না রমযান মাসের দিন তা নিশ্চিত করে জানা যাবে না—রোযা রাখতে রাসূলে করীম (স) নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবূ খালিদুল আহমার, আমর ইবনে কায়স-আবূ ইসহাক, সিলাতু সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, চাঁদের ব্যাপারে সন্দেহের এক দিন আমরা আম্মারের নিকট ছিলাম। তখন একটি হাদীস আনা হল। পরে কোন লোককে তা দিয়ে দেয়া হল, পরে আম্মার বললেন ঃ আজকের দিন যে লোক রোযা রেখেছে, সে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ (স)-কে অমান্য করেছে।

আবদুল বাকী আলী ইবনে মুহাম্মাদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবূ সালমা, আবূ হুরায়রা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَلاَتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْهِ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يُّوْا فِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই তা বন্ধ করবে। আর রমযানের রোযার আগে একদিন বা দুদিনের রোযা রাখবে না। তবে তোমাদের কারোর রোযা রাখার ধারাবাহিকতায় একটি রোযা পড়ে গেলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসসমূহের তাৎপর্য কুরআনের এ আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

তোমাদের যে লোক মাসটি পেল, সে যেন মাসকাল ধরে রোযা রাখে।

তবে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ সেদিন নফল রোযা রাখায় কোন দোষ দেখতে পাননি। কেননা নবী করীম (স) যখন ফায়সালা দিয়েছেন যে, সেদিনটি শাবান মাসের, তখন সেদিনের রোযা নফল হিসেবে রাখতে কোন দোষ থাকতে পারে না।

দিনের বেলা রমযানের নতুন চাঁদ দেখা গেলে কি করা যাবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, 'দিনের বেলা নতুন

চাঁদ দেখা গেলে বুঝতে হবে চাঁদ পরবর্তী রাত্রির। তা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগে দেখা গেল, না তার পরে—তাতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান ইবনে আফফান, আনাস ইবনে মালিক (রা) আবূ অয়েল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা ও জারি ইবনে জায়দ প্রমুখ থেকেও অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। একটি হচ্ছে, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখা গেলে সেটিকে বিগত রাত্রের চাঁদ ধরতে হবে। আর তার পরে দেখা গেলে পরবর্তী রাত্রের—যা পরে আসবে—চাঁদ মনে করতে হবে। আবূ ইউসূফ, সওরী এ মত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সওরী রকীম ইবনে রুবাই—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি সুলায়মান ইবনে রবীআতার সাথে ব্যবলাঞ্জর ছিলাম। সেখানে নতুন চাঁদ দেখলাম উজ্জ্বল সকাল বেলা। আমি তাকে সে কথা জানালাম, তিনি এসে গেলেন। তিনি একটি গাছের তলায় দাঁড়ালেন। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। তিনি নিজেই যখন চাঁদটি দেখতে পেলেন তখন তিনি লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গতে ও বন্ধ করার আদেশ করলেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

তোমরা খাও পান কর সেই সময় পর্যন্ত, যখন রাত্রি শেষে অন্ধকারের বুক থেকে উজ্জ্বল আলো স্পষ্ট হয়ে আসে। তারপর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ কর।

এই ব্যক্তি রমযানের শেষে রোযার জন্যে আদিষ্ট ছিল—এ-ই হল উক্ত আয়াতের তাৎপর্য। কাজেই 'পরে রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এই সম্বোনের মধ্যে একথা শামিল থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা আল্লাহ তাঁর এ কথায় কোন বিশেষ অবস্থাকে বিশেষী করেন নি অন্যান্য অবস্থা থেকে। এ আদেশ তো সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য, তার পরে নতুন চাঁদ দেখুক, আর না-ই দেখুক, তা সম্পূর্ণ অভিন্ন।

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখা যায়; সর্বাবস্থায়ই রোযা সম্পূর্ণ করার এই আদেশ অব্যাহত থাকে। বরং শব্দের তাৎপর্যেই তা শামিল রয়েছে। অনুরূপভাবে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বেই তা দেখা হোক। কেননা তা শব্দের সাধারণত্বের মধ্যে দাখিল রয়েছে। নবী করীম (স)-এর এই কথাটি—'তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রোযা বন্ধ কর চাঁদ দেখেও' তা-ই প্রমাণ করে। জানা আছে যে, এর অর্থ চাঁদ দেখার পরে রোযা রাখা। দুভাবে তা প্রমাণ করে। একটি—রোযা রাখার আদেশ বিগত দিনের জন্যে তো হতে পারে না। আর দ্বিতীয়—মুসলিমগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, শাবান মাসের শেষদিনের রাত্রে চাঁদ দেখা গেলে পরবর্তী দিনগুলোতে রোযা রাখা তার জন্যে ফরয। প্রমাণিত হল যে, রাসূলের 'তা দেখে তোমরা রোযা রাখ' কথাটি চাঁদ দেখার পরবর্তী সময়ে প্রযোজ্য।

কাজেই যে লোক দিনের বেলা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখল শাবান মাসের শেষ দিনে, তার জন্যে পরবর্তী দিন থেকে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক, বিগত দিনের নয়। কেননা রাসূলের কথাটি চাঁদ দেখার পরে রোযা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবী করীম (স) এ-ও বলেছেন ঃ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ কর। তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর। 'এ থেকে প্রতিটি মাস ত্রিশ দিনের গণনা করা কর্তব্য হয় যে মাসের শেষ দিন চাঁদ অদৃশ্য থাকবে। দিনের বেলা যে চাঁদ দেখা গেছে, তা যেমন বিগত রাতের চাঁদ হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরবর্তী রাতের চাঁদ। তাহলে এ সম্ভাবনাও আছে যে, চাঁদটি বিগত রাতে আমাদের নিকট অদৃশ্য হয়েছিল। তাহলে মাসটিকে ত্রিশ দিনের গণনা করতে হবে নবী করীম (স)-এর ফায়সালা অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' বাহ্যিকভাবে কথাটির দাবি এই হয় যে, চাঁদ যখনই দেখা যাবে, তখনই রোযা ভাঙ্গতে ও বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। আমরা তা বিশেষী করে নিয়েছি তা থেকে। সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখায় সাধারণ হুকুমটা বহাল থেকে গেছে।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স)-এর কথার অর্থ হচ্ছে রাত্রিবেলা দেখা। তার প্রমাণ, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখলে তখনই রোযা ভাঙ্গা ওয়াজিব নয়। কেননা তা দিনের বেলা দেখা গেছে, রাত্রে নয়। সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে দেখলেও সেই হুকুমই কার্যকর। কেননা তখনও এই তাৎপর্যই থাকে। উপরন্তু কথাটি থেকে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে, শাওয়াল মাসের সেই দিন চাঁদ দেখার পর। তার পূর্বে তো রমযান মাস। কেননা এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, নবী করীম (স) অগ্রে দেখার কথা বলেছেন, পেছনে দেখার কথা বলেন নি। কেননা দেখার পূর্বে যে সময়টা অতীত হয়ে গেছে, তখন রোযা ভাঙ্গার জন্যে আদেশ দেয়া যেতে পারে না। তা হলে তা শওয়ালের এই দিনে দেখার পর ইফতার করতে হবে। তার পূর্বে তো রমযান মাস। তাহলে মাসটি উনত্রিশ দিনের হয়ে যাবে। আর একটি দিনের কিছু সময়। নবী করীম (স) তো বলে দিয়েছেন যে, মাস হবে ত্রিশ কিংবা উনত্রিশ—এই দুটি সংখ্যার দিনে। তাঁর কথা ঃ اَلشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ 'মাস উনত্রিশ দিনে।' বলেছেন ঃ اَلشَّهْرُ ثَلَاثُوْنَ মাস ত্রিশ দিনে। মুসলিম উম্মত এই কথার তাৎপর্য বুঝতে সম্পূর্ণ অভিন্ন যে, মাস এই দুই সংখ্যার মধ্যে যে কোন এক সংখ্যার হতে পারে। যে সব মাসের সাথে শরীয়াতের হুকুম জড়িত, তা এ দুটি সংখ্যার যে কোন একটি পূর্ণতায় হবে। উনত্রিশ ও একদিনের কিছু সময় কখনই মাস হবে না। কম ও বেশী হয় ভগ্নাংশের কারণে; কিন্তু ইসলামী মাসসমূহে তা হয় না। তা হতো রোমানদের মাসসমূহে এবং একমাসে আটাশ দিন ও একদিনের এক-চতুর্থাংশে এক মাস হতো। আর তা হল ফেব্রুয়ারী মাস। তবে

Leapyear[১] পূর্ণ ২৯ দিনে হয়। রোমানদের কোন কোন মাস ৩১ দিনেও হয়, আবার কোন কোন মাস হয় ত্রিশ দিনে। কিন্তু ইসলামী মাসসমূহে তা কখনই হয় না। ইসলামী হিসেবে মাস যখন ত্রিশ বা উনত্রিশ দিনে হওয়াই চূড়ান্ত কথা, তখন এ থেকে জানা গেল যে, রাসূলের কথা ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' কথাটির অর্থই হচ্ছে এই যে, চাঁদ অবশ্যই রাত্রি বেলা দেখা যাবে। দিনের বেলা দেখা গেলে তা গণ্য করা যাবে না। কেননা তাতে দিনের কোন অংশ এ মাসে এবং কোন অংশ অন্য মাসের ধরতে হয়। কিন্তু আরবী মাস তা হতে পারে না। তাছাড়া এই যে, বললেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা বন্ধ কর, তাতে সেই কথাই, যাতে বলা হয়েছে ঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর, তা দিনের বেলা দেখার অর্থ, আগের রাতে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল, দেখা যায়নি। সেই কারণেই তা গত রাতের না আগামী রাতের, তা ঠিক করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায়ই ত্রিশ দিনের মাস গুণতে হয়। উপরন্তু নবী করীম (স)-এর প্রমাণিত কথা হল ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা বন্ধ কর। তোমাদের ও চাঁদের মাঝে কোন মেঘ বা কুয়াশার আড়াল এসে পড়লে ত্রিশ দিনের মাস গণনা কর। হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অতএব যে চাঁদের ও আমাদের মাঝে আড়াল দাঁড়িয়েছে, তা দেখা যায়নি বলে ধরতে হবে। বুঝতে হবে মেঘের আড়াল না থাকলেও চাঁদ দেখা যেত না। যদিও আমরা জানি যে, মেঘের আড়াল না থাকলে চাঁদ অবশ্যই দেখা যেত। অন্যথায় রাসূলের কথা ঃ 'তোমাদের ও চাঁদের মাঝে কোন মেঘ বা কুয়াশার আড়াল দাঁড়ালে তোমরা ত্রিশদিন গণনা কর' এর কোনই অর্থ হতে পারে না। কেননা আমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘের আড়াল হয়ে দাঁড়ানো পর্যায়ে জানতে পারা যদি অসম্ভব হত, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি 'তোমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘ আড়াল হয়ে দাঁড়ালে তোমরা ত্রিশ দিনের মাস গণনা কর—এ কথা কখনই বলতেন না। তাহলে ত্রিশ দিনের মাস গণনার জন্যে তা একটি শর্ত বানিয়ে দিয়েছে, যদিও সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হওয়ার নৈরাশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত। তা যখন এরূপ, তখন নবী করীম (স)-এর এই কথার দাবি হচ্ছে, আমরা যখন জানব যে, আমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘের আবরণ আছে, না থাকলে আমরা তা অবশ্যই দেখতাম, তাই আমাদেরকে চাঁদ না দেখার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হচ্ছে, কেননা বিগত রাত্রে তা দেখা যায়নি। যদিও দিনের বেলায় তা আমরা দেখেছি। কাজেই এই দিনটি আগের দিনের মনে করতে হবে। আর সেদিনটি হবে বিগত মাসের, পরবর্তী মাসের নয়। কেননা আগের রাত্রে তো চাঁদ দেখা যায়নি। আমাদের ও চাঁদ দেখার মাঝে মেঘের আড়াল হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থার তুলনায় দুর্বলতর। কেননা তা আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে। আর এটা বিগত রাতের, তা আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে না। শুধু এতটুকুই আমাদের জ্ঞানের আওতাধীন যে, আমরা তা বিগত রাতে দেখিনি, তার ও আমাদের মাঝে মেঘ বা অন্য কিছুর আড়াল হয়ে না থাকা সত্ত্বেও।

১. ইংরেজী পঞ্জিকার প্রতি চতুর্থ বৎসরান্তরিক মাস। এই বৎসরগুলোতে ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনের হয়।—অনুবাদক

রমযানের রোযা কাযা করা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ -

আর যে রোগী হবে কিংবা হবে বিদেশ প্রবাসে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সহজতা চান, কঠিনতা তিনি তোমাদের উপর আরোপ করতে চান না। আর যেন তোমরা মেয়াদটাকে পূর্ণ কর।

শায়খ আবূ বকর বলেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটি রমযানের রোযা বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা জায়েয প্রমাণ করে। তার তিনটি কারণ। একটি—তাঁর কথা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্য দিনগুলোতে তার সময়কাল হবে।' কথাটি রোযা কাযা করা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দিনেও অনির্দিষ্টভাবে করা জায়েয ঘোষণা করে। ব্যক্তি না-রাখা রোযাসমূহ পরবর্তী যে-কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন বা একটানা ও ধারাবাহিকভাবে 'কাযা' করার অনুমতি দেয়া। কেউ যদি মনে করে যে, না-রাখা রোযাসমূহ একটানা ও ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, তা হলে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থেরই বিরোধিতা করবে। তার দুটি কারণ। একটি—তাতে এমন একটি বিশেষত্বকে বাড়িয়ে ধরা হবে, যা কুরআনের শব্দে নেই। আর কুরআনের আয়াতে কিছু বাড়ানো জায়েয নয়। বাড়াতে হলে তা অনুরূপ কোন অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে বাড়াতে হয়। হজ্জ-এ তিন দিনের রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে, আর সাতটি রোযা রাখতে বলা হয়েছে বাড়িতে ফিরে আসার পর। তাতে পরপর ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্নভাবে রাখার জরুরী করা হয়নি। কেননা তা মূল আয়াতেই উল্লেখ করা হয়নি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—রোযা 'কাযা' করাকে বিশেষী কৃত করা হবে অনির্দিষ্ট দিনগুলোতে। অথচ যা সাধারণভাবে—কোনরূপ শর্ত ছাড়াই—আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে, তার বিশেষীকরণ কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আল্লাহ বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধান করতে চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে তিনি চান না। তাই যা সহজতর, বাহ্যত তা করাই কর্তব্য এবং জায়েয। যদি একটানা রোযা রাখা শর্ত করা হয়, তা হলে এই সহজতা অস্বীকৃত হয়। সেখানে কঠোরতাকে স্থান দেয়া হয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আর তৃতীয় কারণ আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ 'আর তোমরা যেন রোযার মোট দিনগুলো পূর্ণ কর।' অর্থাৎ যে দিনগুলোতে রোযা রাখা হয়নি সেই সংখ্যার দিনগুলো দিনগুলোর সেই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। দহাক ও আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলামও এই মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের নিকট সেই দিনগুলোকে পূর্ণত্বে দাবি করেছেন, রোযা না-রাখায় যে

দিনগুলো অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাতে বাড়তি কোন শর্তের সংযোজন কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কারোর তা করার অধিকার নেই। কেননা তাতে আয়াতের বাড়তি অর্থ করা হয়। কয়েকটি স্থানেই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, তা করা সম্পূর্ণ বাতিল, অধিকারবিহীন কাজ।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আনাস ইবনে মালিক ও আবূ হুরায়রা (রা) এবং মুজাহিদ, তায়ূস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, ইচ্ছা করলে রমযানের না রাখা রোযাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে 'কাযা' করতে পার, আর ইচ্ছা করলে একটানা ও এক সাথে কাযা করতে পার।

শরীক আবূ ইসহাক আল-হরস আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রমযানের না-রাখা রোযাসমূহ একটান ভাবে কাযা কর। আর বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলেও চলবে। হাজ্জাজ আবূ ইসহাক আল হরস-আলী সূত্রে রমযানের রোযা কাযা করা পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করা উচিত নয়। তবে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হলে তা জায়েয পর্যায়ে গণ্য হবে। শরীক এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, যেমন কাযা করেছে, সে কাযা তেমনভাবেই আদায় কর। আমাশ ইবরাহীম-এর এই মত বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের কাযা রোযা একটানা ও ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে। মালিক হুমাইদ ইবনে কায়স আল-মক্কী বলেছেন, আমি মুজাহিদের সাথে এক সাথে কাবার তওয়াফ করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি রমযানের না-রাখা রোযাসমূহ রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা কি ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে ? বললাম, না। তখন মুজাহিদ আমার বক্ষের উপর হাত মেরে বললেন, উবাই ইবনে কাব-এর পাঠ অনুযায়ী সে রোযা একটানাভাবেই রাখতে হবে। উরওয়া ইবনুয যুবায়রও সেই ধারাবাহিকতার কথাই বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, চাইলে ধারাবাহিক একটানাও থাকতে পারে, চাইলে বিচ্ছিন্নভাবেও পারে। মালিক, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, তা ধারাবাহিক ও পর পর রাখতে হবে, তা-ই আমার পছন্দ। বিচ্ছিন্নভাবে রাখলেও আদায় হয়ে যাবে। বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদদের ইজমা হয়েছে এই কথায় যে, বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আয়াত থেকে যা প্রমাণিত হয় তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

হাম্মাদ ইবনে সালামাতা ইবনে হরব-হারুন ইবনে উম্মে হানী বা হানী-কন্যার পুত্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) পানি পান করার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকল, তা তাকে পান করতে দিলেন। আমি তা পান করলাম। বললাম, হে রাসূল! আমি আজ রোযাদার ছিলাম। কিন্তু আপনার পানির অবশিষ্ট পান প্রত্যাখ্যান করা আমি পছন্দ করিনি, তাই পান করলাম। রাসূল (স) বললেন ঃ এ রোযা যদি রমযানের কাযা হয়ে থাকে, তা হলে আজকের স্থলে আর একদিন রোযা রাখ। আর যদি নফল রোযা হয়ে থাকে তা হলে ইচ্ছা করলে এর কাযা করতে পারে, ইচ্ছা না করলে কাযা করো না। এতে নবী করীম

(স) সে দিনের স্থানে আর একদিন কাযা করতে বলেছেন। নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে বলেন নি, যদি এ রোযা রমযানের কাযা রোযা হয়ে থাকে। এ থেকে দুটি তাৎপর্য বোঝা গেল। একটি—একটানা ও ধারাবাহিকভাবে রোযা কাযা করা ওয়াজিব-ফরয নয়। আর দ্বিতীয়, বিচ্ছিন্নভাবে রাখা অপেক্ষা একটানা ধারাবাহিক রাখা সর্বোত্তম নয়। কেননা তা যদি সর্বোত্তম হতো তা হলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন এবং তা করারই নির্দেশ দিতেন। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও বোঝা যায়, রমযানের আসল রোযাও ধারাবাহিক ও একটানা নয়। তা শুধু পর-পর—এক দিনের পাশে আর একদিন—রাখা হয়, তা সহীহ হওয়ার জন্যে একটানা ধারাবাহিক রাখার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা রমযানের রোযা যদি ধারাবাহিক হতো একটি দিনের রোযা ভাঙ্গা হয়ে থাকলে তা তেমনি ধারাবাহিকভাবেই আদায় করতে হতো। কেননা কেউ যদি পর পর ধারাবাহিক দুই মাসের মধ্যে একটি দিনের রোযা ভাঙ্গে, তাকে আবার শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ কসমের কাফফারা বাবদ যে, রোযার বিধান করেছেন তা এই ধারাবাহিক ও একটানা আদায় করতে হয়। সেই শর্তটাকে তুমি রমযানের রোযা কাযা করার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছ। তাতে কুরআনের মূল বিধানের উপর অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে।

জবাবে বলা হবে, এটা প্রমাণিত যে আবদুল্লাহ্র পাঠে مُتَتَابِعَاتٍ 'ধারাবাহিক পর-পর একটানা শব্দটি আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুন ইবনে আওন-ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কসমের কাফফারার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন, আমাদের পাঠে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُّتَتَابِعَاتٍ রয়েছে। জাফর-আর-রাযী রুবাই ইবনে আনাস-আবুল আলীয়া সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, আমার পিতা فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُّتَتَابِعَاتٍ পড়তেন। আমি আগেই বলেছি, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কথা উসলুল ফিকাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ বলেছে , فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ না-রাখা রোযাগুলো রাখার সময়-কাল অন্যান্য দিন। আর ব্যাপারটি আমাদের নিকট ছিল সব এক সাথে তাৎক্ষণিভাবে। তাই সম্ভাব্য অবস্থার প্রথম সুযোগেই এবং কোনরূপ বিলম্ব না করেই না-রাখা রোযাসমূহ রাখা কর্তব্য। আর সেদিক দিয়ে এক দিনের পর একদিন বিলম্বহীনভাবে তা আদায় করা কর্তব্য হয়, তা ফরযও হয়েছিল ধারাবাহিক—এক দিনের পর একদিন রাখা হিসেবে। প্রথম দিনই রোযা রাখা সম্ভব হয়ে থাকলে, তা রাখবে। পরে রোগাক্রান্ত হলে রোযা ভাঙ্গবে। তা হলে তাৎক্ষণিক ও ধারাবাহিকভাবে রাখার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক হয় না। যে দিন রোযা ভেঙ্গেছে, সে দিন থেকে আবার নতুন করে শুরু করারও প্রশ্ন হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ধারাবাহিক ও পরপর রোযা রাখাটার বাধ্যতামূলক হওয়া কোনরূপ ফাঁক-অবকাশ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করার আদেশের সাথে সম্পর্কিত। ধারাবাহিক ও পরপর রাখা অপর একটি গুণবাচক ব্যাপার।

রমযানের রোযার কাযা বিলম্বে করা জায়েয

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগাক্রান্ত হবে কিংবা বিদেশ-সফরে থাকবে, তার রোযা রাখার সময়কাল অন্যান্য দিনে।

'আয়াতে' না-রাখা রোযা কাযা করার দিনগুলোকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। এই ভিত্তিতে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, না-রাখা রোযাগুলো যে-কোন সময়ে রাখতে পারে। বছর শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে তাঁদের থেকে বর্ণিত কোন কথা সংরক্ষিত হয়নি। তবে আমার মত হচ্ছে, পরবর্তী রমযান শুরু হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা জায়েয নয়। ফিকাহবিদদের মতের ভিত্তিতেই আমার এই মত। কেননা তাঁদের নিকট ব্যাপারাটি হচ্ছে, যার সময় নির্দিষ্ট নয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই করা উচিত। উসূলুল ফিকাহ গ্রন্থে তা বিস্তারিত বলেছি। ব্যাপার যখন এই, তখন রমযানের রোযা কাযা করার বছরের সময়ও নির্দিষ্ট নয় বলে দ্বিতীয় ফিতরের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা কখনই জায়েয হতে পারে না। ফরয রোযা কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার শেষ সময়টা জানা নেই বলে দ্বিতীয় ফিতরের দিন থেকেও তা বিলম্বিত করা হবে, তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। যেমন অজ্ঞাত ফরয আদায় করতে আদিষ্ট ব্যক্তির ইবাদত কাজে পরিণত করা, পরে সে বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে তা তরক করার কারণে সে জন্যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা জায়েয হতে পারে না। এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ব্যাপার যখন এই, আর এ-ও আমরা জানি যে, রমযানের না-রাখা রোযার কাযা সম্ভাব্য সময় থেকেও বিলম্বিত করা তাঁদের মতে জায়েয। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তার বিলম্বিতকরণ বছর অতিবাহনের সময়ের মধ্যে নির্ধারিত। তা যুহর-এর সময়ের অবস্থায় পড়ে গেছে। যখন তার প্রথম সময় ও শেষ সময়—দুটিই জানা আছে, তখন এর মধ্যে যে কোন সময় নামায পড়লেই হয়ে যাবে। তা এমন সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা না-জায়েয, যখন নামায পড়লে তা আদায় হবে না। কেননা তার শেষ সময় সেটা, যার বেশি দেরী করলে আর সময় থাকে না।

আগের কালের ফিকাহবিদদের অনেকেই বছরের মধ্যে যে কোন সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয মনে করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, 'আমার উপর রমযান মাসের রোযা বাকী থাকলে তা পরবর্তী শাবান মাস আসার আগে তার কাযা করতে আমি সক্ষম হই না। ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, দশ (মাসের) মধ্যে রমযানের রোযার কাযা করায় কোন দোষ নেই। সাঈদুবনে যুবায়র-ও তা-ই বলেছেন। আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, রমযানের রোযা কাযা কর, যখন তুমি চাও। আগের কালের এই ফিকাহবিদগণ সম্ভাব্য প্রথম সময় থেকে তার কাযা বিলম্বিত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন।

পরবর্তী রমযানের আগমন হওয়া পর্যন্ত রোযা কাযা করাকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, দ্বিতীয়টি নিজের থেকে রোযা রাখবে, পরে আগেরটা কাযা করবে। সেজন্যে কোন 'ফিদিয়া' দিতে হবে না। মালিক, সওরী, শফেয়ী, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, প্রথমটির কাযা করতে অক্ষম হলে কাযার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দিন একজন করে মিসকীন খাওয়াবে। সওরী ও আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে অর্ধ সা' ওজনের গম দিলে হবে। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক দিন এক 'মুদ্দ' করে খাবার দেবে। আর কোন রোগ বা সফরের কারণে যদি অক্ষম হয়ে না থাকে, তাহলে সেজন্যে খাবার খাওয়াতে হবে না। আওজায়ী বলেছেন, প্রথমটির কাযা করতে অক্ষম হলেও দ্বিতীয়টি থাকার সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে ও শেষ পর্যন্ত মরে গেলে প্রথমটি বাবদ প্রত্যেক দিনের বদলে দুই 'মুদ্দ' করে খাবার দিতে হবে। তা পারেনি, এজন্যে এক মুদ্দ। আর রোযার জন্যে এক 'মুদ্দ' আর দ্বিতীয় রোযার জন্যে প্রত্যেক দিনের বদলে এক-এক 'মুদ্দ' করে দিতে হবে। আওজায়ীর পূর্বে যাদের মতের উল্লেখ করেছি, তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হলে, পরে মরে গেলে রোযা রাখতে না পারার দরুন তার পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো ওয়াজিব নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-হাজরামী, ইবরাহীম ইবনে ইসহাক, জবী, কায়স, আল-আসওয়াদ ইবনে কায়স তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিলহজ্জ মাসে বিগত রমযানের রোযা কাযা করায় নবী করীম (স) কোন দোষ দেখতেন না।

আবদুল বাকী বিশর ইবনে মূসা ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক ইবনে লাহইয়াতা আল-হরস ইবনে ইয়াযীদ আবূ তমীমুল জায়শানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ত্রিপলীতে আমরা এক মজলিসে একত্র হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন হুবাইব ইবনে মাকাল আল গিফারী ও আমর ইবনুল আস—রাসূলের দুজন সাহাবী। মজলিসে আমর বললেন, আমি রমযানের রোযা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখি। গিফারী বললেন, না, রমযানে আমরা বিচ্ছিন্নতা আনি না। তখন আমর বললেন, রমযানের রোযা কাযা করায় আমরা বিচ্ছিন্নতা আনি না। আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'কাযার সময় অন্যান্য দিনগুলো।'

আবদুল্লাহ ইবনে আবদে রাব্বিহি আগলানী ঈসা ইবনে আহমাদ আল-আসকালানী বকীয়া সুলায়মান ইবনে আরকাম আল-হাসান আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল! রমযানের কয়েকটি রোযা আমাকে কাযা করতে হবে। আমি কি তা বিচ্ছিন্নভাবে রাখব ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, ভেবে দেখ, তোমার উপর যদি কোন ঋণের বোঝা থাকে, তা যদি তুমি কিস্তিতে আদায় কর, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে না ? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তা হবে। তা হলে আল্লাহ তো ক্ষমা করা ও ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি অধিকারী।'

এ ধরনের সব হাদীসই রমযানের রোযা কাযা সম্ভাব্য প্রথম সময় থেকে বিলম্বিত করা জায়েয প্রমাণ করে। সাহাবিগণের বহু সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা মনে করেন, রমযানের রোযার কাযা পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করলে কাযার সাথে সাথে ফিদিয়াও দিতে হবে—দেয়া ওয়াজিব। তাদের মধ্যে ইবনে আব্বাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আমর ইবনে মায়নূন ইবনে মিহ্‌রানতাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি পর-পর দুই রমযানে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম (এ জন্যে রোযা রাখতে পারিনি)। ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দুই রমযান পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোগাক্রান্ত ছিলে, না মাঝখানে নিরাময় হয়েছ ? বলল, না মাঝখানে নিরাময় হয়েছি। জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি একই রোগ ছিল ? বলল, না। বললেন, তাহলে ওকে ছেড়ে দাও, সুস্থ হয়ে আসুক। লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট চলে গেল ও কথাবার্তা সম্পর্কে তাদের জানাল। তারা বলল, তুমি আবার যাও, বল যে, হ্যাঁ, সেই একই রোগ ছিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তুমি দুই রমযানের রোযা রাখবে এবং ত্রিশ জন মিসকীনকে খাওয়াবে।

রুহ্ ইবনে উবাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রমযানের রোযা কাযা করতে গাফিলতি করেছে, এমনকি পরবর্তী রমযানও এসে গেছে। বললেন, যে রমযানটা উপস্থিত, সেটির রোযা রাখবে। আর পূর্বেরটির বাবদ প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে এক 'মুদ্দ' গম খাবার দেবে। আর কাযা করতে হবে না। এ মতটির সার কথা পূর্বের রমযানের রোযার বদলে খাবার খাওয়াবে, কাযা করতে হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও ইবনে আব্বাসের কথার মতই বর্ণিত হয়েছে (দুজনের মত এক)। ইবনে উমর থেকে এ পর্যায়ে অপর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালমাতা আইয়ূব-হুমাইদ-আবূ ইয়াজীদুল মাদানী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তখন সে তার ভাইকে বলল, আমার উপর আল্লাহ্‌র একটা ঋণ রয়েছে। আর লোকদেরও একটি ঋণ আমার উপর আছে। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র এই ঋণটি আদায় করে দিতে শুরু করবে। পরে জনগণের ঋণটা আদায় করবে। আমার উপর দুই রমযানের রোযা রয়েছে, আমি রাখিনি। হযরত ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দুটি ছাগল দিতে হবে গলায় রশি বাঁধা অবস্থায়। পরে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও তাই বললেন। বললেন, 'আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন, তোমার ভাইর পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকীন খাওয়াও।' আইয়ূব বলেছেন, তাঁরা মনে করেছেন, লোকটি দুই রমযানের মাঝে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। ত্বাহাভী ইবনে আবূ উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে আকসামকে বলতে শুনেছি, সাহাবীদের নিকট থেকে ছয়জন মিসকীনকে খাবার দেয়া ওয়াজিব, এই মত পেয়েছি। সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের বিপরীত মতের কাউকে আমি পাইনি। হ্যাঁ কাযার পূর্বে যদি কেউ মরে যায়, তা তার পক্ষ থেকে তা খাওয়ালে যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্‌র কথা فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ প্রমাণ করে যে, না-রাখা রোযাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলেও এবং তা বিলম্বে করলেও জায়েয হবে। তাকে সে জন্যে 'ফিদিয়া'ও দিতে হবে না। কেননা কাযা করার সাথে সাথে ফিদিয়া দিতে হলে কুরআনের অকাট্য দলীলের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হবে। কিন্তু কোন অকাট্য দলীলের উপর অনুরূপ অকাট্য দলীল ছাড়া কোন কিছু বাড়ানো জায়েয হতে পারে না। ফিকাহবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, পরবর্তী বছরের শেষ পর্যন্ত কাযাকে বিলম্বিত করলেও সে জন্যে কোনরূপ ফিদিয়া দিতে হবে না। কুরআনের আয়াত তো অনুরূপ সংখ্যক রোযা কাযা করতে বলেছে ফিদিয়া দিতে বলে নি। আর এ কথা জানাই আছে যে, পরবর্তী বছর অনুরূপ সংখ্যক রোযা কাযা করাই কর্তব্য। আয়াতের আওতা ভুক্ত সব ব্যাপারেই সেই একই নীতি কার্যকর হবে, ফিদিয়া দিতে হবে না। অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে কাযা এবং ফিদিয়া দুটোকেই বাধ্যতামূলক করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তা-ও একইভাবে আয়াতের আওতার মধ্যে শামিল। এমনিভাবে কোন কোন চোরের হাত দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করার অপরাধে কেটে দেয়া হবে, আর কারও কাটা হবে তার কম পরিমাণে চুরি করার অপরাধে, এটা জায়েয হতে পারে না। তাই فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-এর অর্থ গ্রহণ করা হবে শুধু কাযা করার, ফিদিয়া দেয়ার নয়, আর কতকের ক্ষেত্রে রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—দুটিকেই কর্তব্য বলা হবে, তাও হতে পারে না।

অন্য এক দিক দিয়ে বলতে হবে, কোন জিনিসের কি কাফফারা, তা কেবল মাত্র توقيف এর পথেই নির্ধারণ করা সম্ভব, অথবা বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু এখানে এ দুটোর কোন একটিও নেই। তাই শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে ফিদিয়া প্রমাণ করা জায়েয হতে পারে না। উপরন্তু 'ফিদিয়া' তো কোন কোন জিনিসের বিকল্প হয়ে থাকে। তা-ই হয় তার জন্যে যথেষ্ট। যার উপর কাযা ফরয নয়, কেবল তার জন্যেই ফিদিয়া দেয়া ফরয বলা যেতে পারে। যেমন থুড়থুড়ে বুড়ো, আর যে লোক রোযা কাযা না করেই মরে গেছে, তার জন্যে। কিন্তু কাযা ও ফিদিয়া দুটোকেই একত্রে বাধ্যতামূলক করা নিষিদ্ধ, যেমন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতার প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই বলে এসেছি। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর মত সর্বাধিক প্রকাশমান যে, শুধু ফিদিয়া দিতে কাযা করতে হবে না। যারা দুটোকে একত্রে করার মত দিয়েছেন, তাঁদের সে মত গ্রহণীয় নয়। নবী করীম (স) থেকে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে হাদীসটি ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি, তাতে বলা হয়েছে যে, রোযার কাযা বিলম্বিত করা হলে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হয় না। তার দুটি কারণ। একটি—বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলে ফিদিয়া দিতে হবে, তা বলা হয়নি। বিলম্বিত হলে যদি ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন। আর দ্বিতীয় কারণ রোযা না রাখাকে ঋণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর একথা জানা-ই আছে, ঋণ ফেরত দিতে বিলম্ব হলে মূল প্রাপ্যটা ছাড়া আর কিছুই দিতে হয় না। তার সাথে যার তুলনা করা হয়েছে, না-থাকা রোযার কাযা করা, তাতেও যে কয়টি রাখা হয়নি, ঠিক সে কয়টিরই কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, আমরা যখন একমত হয়েছি যে, পরবর্তী বছর পর্যন্ত কাযাকে বিলম্বিত করা নিষিদ্ধ, তাই যদি বিলম্বিত করা হয়, তাহলে তাকে অপরাধী মনে করতে হবে। আর এ অপরাধ স্কালনের জন্যে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হবেই। যেমন, যদি কেউ তা কাযা না করে মরে যায়, তাহলে এ ত্রুটির জন্যে ফিদিয়া দিতে হয়।

জবাবে বলা হবে, অপরাধ বা ত্রুটি হলেই ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। যে লোক 'কাযা'টা ঠিকমত করতে পারেনি, ফিদিয়া কেবল তাকেই দিতে হয়। তার দলীল হচ্ছে, যদি কেউ রমযানে দিনের বেলা ইচ্ছা করে খাবার খায় তাহলে সে অপরাধী। সে বছরই যদি সেই রোযাটি কাযা করা হয়, তাহলে ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বোঝা গেল, অপরাধ হওয়াটা ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ নয়। কুম-এর অধিবাসী আলী ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, দাউদ আল-ইসফাহানী বলেছেন, রমযানের কোন একটি রোযা যদি কেউ কোন ওযরের দরুন ভাঙ্গে তাহলে পরবর্তী মাস শওয়ালেই তার কাযা করা কর্তব্য। যদি সে কাযা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে, সে অপরাধী হবে, আগের ও পরের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য থেকে এ মতটি ভিন্ন এবং ইজমার বাইরের মত। আর আল্লাহ্র কথা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-এর বাহ্যিক তাৎপর্যেরও বিরোধী। আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ-এর বিপরীত। নবী করীম (স) থেকে আমাদের উদ্ধৃত হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। আমি একদা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে তাকে বলেছিলাম—আপনি এরূপ কথা বললেন কেন? জবাবে বললেন, বলেছি এজন্যে যে, পরবর্তী দিনে যদি লোকটি রোযা না রাখে এবং মরে যায়, তাহলে সে অপরাধী ও গুনাহগার হবে, সমস্ত ইল্মধারী লোকেরাই একথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, তার সেই পরবর্তী দিন-ই রোযাটা কাযা করা কর্তব্য। কেননা তার এই রোযা কাযা করার সময় যদি বেশী প্রশস্ত বা দীর্ঘ হয়, তাহলে সেই রাতেই লোকটি মরে গেলে সে অপরাধী হতো না।

আমি বললাম, কোন ব্যক্তির উপর তার দাস মুক্তকরণ যদি কর্তব্য ও ওয়াজিব হয়, তখন যদি সে এমন একটি দাস পেল যে সমমূল্যে বিক্রয় হচ্ছে, তাহলে তার পক্ষে সে দাসটি বাদ দিয়ে অপর দাসটি ক্রয় করা কি জায়েয হবে?..... এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

তিনি বললেন না, জায়েয হবে না। কেন জায়েয হবে না জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, কেননা তার কর্তব্য হয়েছে প্রথম দাসটি মুক্ত করা, যা সে আগেই নির্দিষ্ট করেছে। যখন সে আর একটি দাস পেয়ে গেছে, তখন তার ব্যাপারে ফরযটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে তার জন্যে। প্রথম দাসটির ব্যাপারে যখন ফরযটা বাধ্যতামূলক ছিল, তখন তাকে বাদ দিয়ে অপর একটি দাস মুক্ত করা—যদি সে তা পায়—তার পক্ষে জায়েয হতে পারে না। আমি বললাম, যদি সে সেটি বাদে অপর একটি দাস ক্রয় করে এবং সেটিকে মুক্ত করে, সে প্রথমটিও পেয়ে আছে, তাহলে? বলেন, তা তার জন্যে জায়েয হবে না, যথেষ্ট হবে না তার নিকট যদি একটা দাস থাকে, তাহলে সেটাকে মুক্ত করাই তার কর্তব্য। তার জন্যে

সেটি ছাড়া অন্য একটি ক্রয় করা কি জায়েয হবে ? বললেন, না। বললাম, তা এজন্যে যে, তার নিকট যে দাসটি আছে, সেটাকে মুক্ত করাই তার কর্তব্য, সেটি ছাড়া অন্য কোনটি নয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ বললাম, তার নিকট সে দাসটি যদি মরে যায়, তাহলে দাস মুক্তির দায়িত্ব তার উপর থেকে কি বাতিল হয়ে যাবে ? যেমন কোন নির্দিষ্ট দাস মুক্ত করার মানত করলে পর সেটি মরে গেলে তার মানত শেষ হয়ে যায়, তেমন ? বললেন, না, তার কর্তব্য অপর একটি দাস মুক্ত করা। এ বিষয়ে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। বললাম, এমনিভাবে ইজমার ভিত্তিতে যার উপর দাসমুক্ত করা ওয়াজিব, তার সেটি ছাড়া অন্যটি মুক্ত করা উচিত। বললেন, তুমি কাদের ইজমার কথা বলছ ? আপনি একটু আগে যে ইজমার কথা বলেছেন, তা কাদের ইজমা ? ইজমার কথাও বলা যায় না। বললাম, তাহলে দ্বিতীয় যে ইজমার কথা আমি বলেছি, তার কথাও বলা যায় না। এভাবে কথা শেষ হয়ে গেল।

আবূ বকর বলেছেন, শওয়ালের দ্বিতীয় দিনই কাযা করা নির্দিষ্টভাবে ফরয বলে দাউদ যে দাবি করেছেন, যে দাস মুক্ত করা ওয়াজিব সেটি পেলে সেটি ছাড়া অন্যটাকে মুক্ত করা সব মুসলিমেরই ইজমার পরিপন্থী। আর ইলম ধারকদের সম্পর্কে যে দাবি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় দিন থেকেও কাযা বিলম্বিত করে যে মরে গেল, সে ত্রুটিকারী ও অপরাধী, এর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যাকে বছরের শেষ পর্যন্ত কাযা বিলম্বিত করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তার মরে যাওয়ার কারণে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা পরবর্তী রমযানের আগমন হওয়া পর্যন্তই তার পরবর্তী বছরের সময়-কাল। বিলম্বিত করার বিপুল ও প্রশস্ত ক্ষেত্র রয়েছে ঠিক নামাযের সময়ের মত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করার অবকাশ নামাযীদের জন্যে রয়েছে। তাই নামায বিলম্বিত করলে গুনাহগার হতে হবে না। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মরে গেলেও নয়। রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলেও সেই হুকুম।

যদি বলা হয়, বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কাযা না করে মরে গেলে যদি অপরাধী না হয়, তাহলে তার ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক হতো না।

জবাবে বলা যায়, ফিদিয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারটি এ জন্যে নয় যে, তার অপরাধী হওয়ার কথা জানা গেছে। কেননা থুড়থুড়ে বুড়োর পক্ষে ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক, যদিও রোযা না রেখে ও তা কাযা না করে সে কোন অপরাধ করে নি। দাউদের ইজমা সম্পর্কিত কথা কোন রূপরেখা-ই পেশ করে না কেননা, ইজমা তো তেমনিভাবে পেশ হতে হবে, যেমন করে অকাট্য দলীলসমূহ পেশ হয়ে থাকে কিংবা যেমন করে মতপার্থক্যের কথা বলা হয়ে থাকে। যদি একথা বোঝাতে চাওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোকসমষ্টির বক্তব্য তাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ করার পর তাদের পরস্পরের বিরোধিতা না করা অবস্থায় ইজমাকারী কারোর পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, তাহলে সেটা তাদের ব্যাপার। তা সত্ত্বেও ইজমার বর্ণনা হয় না, সাধারণভাবে এরূপ বলা সঙ্গত নয়। কেননা অনেক ইজমার ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির

কথা ও মত বর্ণনা করা হয়। ঠিক তখনই তাদের ইজমা সংক্রান্ত কথা যথার্থভাবে বর্ণিত হতে পারে। এমন ইজমাও আছে, যাতে একটি জনসমষ্টির বক্তব্য —যা ব্যাপকভাবে বিস্তারিত ও প্রকাশিত, অন্যদের তা শ্রবণ সহকারে বর্ণনা করা হয়। তাতে বিরোধিতার প্রকাশ করা হয় না। এটাও ইজমা, যার বর্ণনা প্রচার করা হয়। কেননা অন্যদের প্রতিবাদ ও বিপরীত মত প্রকাশ করা না হলে তা আনুকূল্য ও সমর্থনের স্থলাভিষিক্ত হয়। বিশেষ ধরনের ইজমা এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। ফিকাহবিদগণ তা একত্রে বর্ণনা করেন। আর এক প্রকারের ইজমা রয়েছে, যাতে সাধারণ ও বিশেষ—সকল শ্রেণীর লোকই শরীক থাকে। যেমন সকলেরই মতে যিনা-ব্যভিচার ও সূদ সম্পূর্ণ হারাম। এই মতে কোন পার্থক্যের প্রশ্নই উঠে না কারোর দিক থেকে। নাপাকি থেকে পাক হওয়ার জন্যে গোসল ফরয, পাঁচ ওয়াকতের নামায ফরয ও এই ধরনের অন্যান্য জিনিস। এসব ব্যাপারে সব মুসলমানের পূর্ণ ঐকমত্য আগের থেকেই জানা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দিক থেকে তার বর্ণনা ও এই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ ও প্রচার না হলেও দোষ নেই। সকলেরই এই বিশ্বাস যেমন, সকলেই তা পালনও করে। ইজমা বলতে যদি এই জিনিস বোঝানো হয়, তাহলে এই সুযোগ আছে যে, তা বর্ণনা করা হয় না বলে দাবি করা হবে। অবশ্য এ ধরনের ইজমারও বর্ণনা করার প্রচুর অবকাশ রয়েছে বলা চলে। যেমন নামাযী লোকদের নামায সম্পর্কিত ধারণা ও তাঁর বাস্তব পালন। এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ও ধারণা এবং তাদের তা শক্তভাবে পালন করার কথা বর্ণনা করা হয়। তারা সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। যেমন কোন ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করা, বলা যে, সে একজন মুসলমান, এ কথা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। শুধু তা-ই নয় বরং তা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ –

তোমরা যদি তাদেরকে মুমিনরূপে জান, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না।

সফরে সিয়াম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ – يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ –

তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগাক্রান্ত হবে কিংবা হবে বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময়কাল অন্যান্য দিনে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধানে ইচ্ছুক, কঠোরতা বিধানের ইচ্ছুক নন।

এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে, সফরে রোযা না-রাখার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ এ অনুমতি দিয়ে আমার জন্যে সহজতার বিধান করেছেন। তবে সফরে রোযা ভঙ্গ

করা—না-রাখাও ফরয করে দেন নি। দিলে তাঁর পরবর্তী কথা ঃ 'তিনি তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে ইচ্ছুক' কথাটির কোন ফায়দা হতো না, নিরর্থক হয়ে যেত। তাতে বোঝা গেল, বিদেশ প্রবাসী ব্যক্তির ইখতিয়ার রয়েছে, সে রোযা রাখতেও পারে, আবার না-রাখতেও পারে। এ ঠিক কুরআন পাঠের আদেশের মত। বলেছেন, فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'তুমি পড় কুরআনের যা পড়াই তোমার পক্ষে সহজ হয়। যেমন فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 'কুরবানীর যে পশু যবেহর ক্ষেত্রে সহজে পৌছতে পারে'-এ সব আয়াতেই يسر সহজতার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রমাণ হচ্ছে এই ইখতিয়ারের। আবদুর রহীম আল-জজরী তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَانَعِيْبُ عَلٰى مَنْ صَامَ وَلَا عَلٰى مَنْ اَفْطَرَ -

সফরে যে রোযা রাখল তার উপর দোষ আরোপ করবো না, তার উপরও নয়, যে রোযা ভাঙ্গল—রাখল না।

কেননা "আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে ইচ্ছুক, কঠোরতার বিধান করতে ইচ্ছুক নন" বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস জানিয়ে দিলেন যে, আয়াতে যে সহজতার বিধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, তার অর্থ—সফরে রোযা রাখা না-রাখার ইখতিয়ার দান। আয়াতে যদি এই ভাষাটা না থাকত, তাহলে তার এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই দেয়া হতো না। উপরন্তু আল্লাহ্র কথা ঃ 'যে লোক এ রমযান মাস নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকবে, সে যেন অবশ্যই মাস ভরে রোযা রাখে' এর পরই সংযোজিত করা হয়েছে এ কথাটি ঃ 'তোমাদের যে লোক রোগাক্রান্ত হবে বা হবে প্রবাসী, তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলো। এতে রমযানের রোযা রাখা রোগী ও মুসাফিরের জন্যে না ফরয করা হয়েছে, না রোযা না-রাখা। মুসাফিরও তো রমযান মাসের প্রত্যক্ষদর্শী। তা দুভাবে। এক—সে জানতে পারে যে, রমযানের মাস এসে গেছে। আর দ্বিতীয় এই যে, সে শরীয়াত পালনে বাধ্য ব্যক্তি। বোঝা গেল, রমযান মাসে যাদেরকে রাখতে বলা হয়েছে, সে-ও তাদেরই একজন। তবে তা সত্ত্বেও তাকে রোযা না-রাখার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর 'তোমাদের যে লোক রোগী বা বিদেশ প্রবাসী হবে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, যদি রোযা না রাখে, তাহলে অন্য দিনগুলোতে তা রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ - (البقره : ١٩٦)

যে লোক হবে রোগী কিংবা যার মাথায় কোন কষ্টের রোগ হবে, তাকে রোযা রেখে ফিদিয়া দিতে হবে।

এর অর্থ যে মাথা মুণ্ডন করাতে পারবে না, সে রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে। তা একথাও বোযায় যে, এ বিষয়ে মুসলমানদের ঐকমত্য নিহিত আছে যে, রোগী রোযা

ভাঙ্গে, তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখার কথাটি এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ব্যাপার যখন এই, তখন মুসাফিরের জন্যেও তা শর্ত। কেননা দুটো বিষয়েই বলা হয়েছে, একটির পর অন্যটি। রোযা না-রাখা যদি শর্ত হয় অন্য সময়ে রোযা রাখার, তাহলে মুসাফির সফরে রোযা রাখলেও তাকে কাযা করতে হবে বলা আয়াতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কথা বলার শামিল। সাহাবী ও তাঁদের পরে তাবেয়ীগণ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ একমত হয়েছেন এ ব্যাপারে যে, মুসাফির রোযা রাখলে তা জায়েয হবে। তবে হযরত আবূ হুরায়রা এসবের বিরুদ্ধে বলেছেন যে, সফরে যে রোযা রাখবে, সে রোযা তাকে কাযা করতে হবে। কতিপয় বিরল ব্যক্তি তা সমর্থনও করেছেন। তবে তাদের এই বিরোধিতা গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। নবী করীম (স) থেকে এক ব্যাপক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা দৃঢ় জ্ঞান দান করে। তা হল তিনি সফরে রোযা রেখেছেন। সফরে রোযা রাখা মুবাহ, একথাও তাঁর থেকে বর্ণিত। সেই পর্যায়ের একটি হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হল হামযাতা ইবনে আমর আল-আসলামী রাসূলে করীম (স)-কে বলেছেন, আমি সফরে রোযা রাখি। শুনে তিনি বললেন ঃ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ 'তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখ আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গো'। ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদুল খুদরী, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবুদ-দারদা ও সালামাতা ইবনুল মুহবিক প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি নবী করীম (স) সফরে রোযা রেখেছেন—একথার বিবরণ বর্ণনা করেছেন।

যে লোকেরা বলেছেন যে, হ্যাঁ, মুসাফির রোযা রাখতে পারে, তবে তার কাযা করা ওয়াজিব, তাঁর দলীল একথা ঃ 'যে লোক রোগী কিংবা বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন'-এর বাহ্যিক অর্থ। তাঁরা বলেছেন, 'ইদ্দত' উভয় অবস্থায়ই বাধ্যতামূলক। আয়াতে যে রোযা রাখল আর যে তা ভাঙ্গল, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কাব ইবনে আসিম আল-আশআরী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ। 'সফরে রোযা রাখা কোন নেক বা সওয়াবের কাজ নয়।' আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাজরামী, ইবরাহীম ইবনে মুনযির আল-হাজামী, আবদুল্লাহ ইবনে মূসা আততায়মী, উসামা ইবনে জায়েদ, জুহরী আবূ সালামাতা, ইবনে আবদুর রহমান—তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَلصَّائِمُ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ 'সফরে যে রোযা রাখে, সে নিজ বাড়িতে থেকে রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তির মত। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক নামায ও রোযা এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা তুলে রেখেছেন।

মূল আয়াতটিতে তাদের পক্ষের কোন দলীল নেই। বরং তা মুসাফির-এর রোযা রাখার পক্ষে রায় দেয়। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা বাখ্যা দিয়েছি। আর নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'সফরে রোযা রাখা কোন নেক কাজ নয়' বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বিশেষ অবস্থা বাহির্ভূত কথা। এ কথাটি একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর বর্ণিত হাদীসে বিবৃত হয়েছে, হাদীসটি আবূ দাঊদ, আবুল অলীদ তায়ালসী, শুবা, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জরারাতা, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনুল হাসান, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে ছায়ায় বসা ও তার উপর লোকদের ভিড় দেখতে পান। তখন বললেন। সফরে রোযা রাখা কোন নেক কাজ নয়। কথাটি নবী করীম (স) লোকটির বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। কেউ কেউ এ কথার কারণও নির্ধারণ করেছেন, কেউ কেউ তা বাদ দিয়েছেন। রাসূলের শুধু কথাটির বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন রমযান মাসে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে একসাথে রোযা রেখেছেন, পরে তিনি তাদেরকে বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের শত্রুদের খুব নিকটে এসে গেছ। এ সময় রোযা না-রাখা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ হবে। অতএব 'তোমরা রোযা রেখো না,' এটা ছিল রাসূলে করীম (স)-এর সুউচ্চ দুঃসাহসিকতার অতিশয় বলিষ্ট মন-মানসিকতার ব্যাপার। আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ এর পূর্বেও তুমি আমাকে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে রোযা রাখতেই দেখলে এবং তার পরেও। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে সালিহ, ইবনে অহব, মুয়াবীআতা, রবীয়াতা ইবনে ইয়াযীদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন কযআতা থেকে। তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদকে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। এরপর পূর্ণ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসে রোযা না-রাখার জন্যে রাসূলের আদেশের 'ইল্লাত' বা কারণটির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—রোযা না-রাখলে তারা তাদের শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অধিক সক্ষম হবে। এটা এজন্যে যে, জিহাদ করা তাদের জন্যে ফরয ছিল। কিন্তু সফরে রোযা রাখাটা সেরূপ ফরয ছিল না। ছিল বিশেষ মর্যাদা ও সওয়াবের কাজ। সেজন্যে কোন ফরয ত্যাগ (বা ক্ষতিগ্রস্ত) করা তাদের জন্যে জায়েয ছিল না।

আবূ সালামাতা ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামাতা কিন্তু তাঁর পিতার নিকট হাদীস শুনতে পান নি। তাহলে মুতাওয়াতির হাদীস একটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের জন্যে ত্যাগ করা যেতে পারে ? এ হাদীসটি তো বহু হাদীসবিদ লোকের নিকট প্রমাণিতও নয়। তা সত্ত্বেও হাদীস কোন কারণের উপর ভিত্তিশীল হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যুদ্ধেরত থাকা অবস্থা। একথা জানা যে, রোযা রেখে যুদ্ধ করা দুরূহ কাজ। কাজেই এই বিশেষ অবস্থার মধ্যে রোযা না রাখার অনুমতি বিশেষভাবে দেয়া হয়েছিল। কেননা তা রাসূলের কথার বিপরীত। আর

তাতে জিহাদ ত্যাগ করার কারণ ঘটাতে পারে। আর মুসাফিরের অর্ধেক নামায এবং রোযা আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতার রোযা বাদ দেয়ার পর্যায়ে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার তাৎপর্য হচ্ছে, রমযান মাস আসার কারণে ফরযটা তাদের উপর নির্দিষ্ট হয়ে চাপেনি। তারা এ মাসে রোযা না রাখতেও পারে। ত সত্ত্বেও রোযা যদি কেউ রাখে-ই, তবে জায়েয হবে না, এমন কথাও প্রমাণিত নয়। যেমন গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা যদি রোযা রাখে, তবে তা-ও জায়েয হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সফরে রোযা রাখা না-রাখার চেয়ে উত্তম। মালিক ও সওরী বলেছেন, সফরে রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয় আমাদের নিকট। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সফরে রোযা রাখলে তা জায়েয় ও যথেষ্ট হবে। এ ছাড়া রোযার মূল হুকুমের আয়াতটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত। তার শেষে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ 'তোমাদের রোযা রাখাটা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণময়।

আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের সকলের জন্যেই এ কথা। কেননা কথাগুলো একটির সাথে সংযোজিত করে পরেরটি বলা হয়েছে। তাই অপর কোন দলীল ব্যাতিরেকে কারোর জন্যে বিশেষীকরণ করা যায় না। কাজেই মুসাফিরের পক্ষে রোযা রাখা না-রাখার চেয়ে অনেক উত্তম।

যদি বলা হয়, উক্ত কথাটি পূর্ববর্তীদের জন্যে নয়, পরবর্তী লোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তারা হচ্ছে ঃ 'যারা তার সামর্থ্যবান, তারা একজন মিসকীনকে খাবার দেবে।'

জবাবে বলা যাবে, 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে' কথাটির সম্বোধন সকলের প্রতি। সফরে যারা, নিজ বাড়িতে যারা, তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর' কথাটিরও সম্বোধন সেই সকলেরই প্রতি। আয়াতের শুরুর সম্বোধনে যারা শামিল, আয়াতের শেষের সম্বোধনে তারা সকলে শামিল হবে, একটা তো স্বাভাবিক। তাদের কতককে বাদ দেয়া কোন পর্যায়েই জায়েয হতে পারে না।

উপরন্তু রোযা ফরয বলে সফরে রোযা রাখাও জায়েয, আমরা এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত বলেছি। আর যা এরূপ, তা অবশ্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ কল্যাণময় কাজে দ্রুত এগিয়ে যেতে বলেছেন فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ বলে। তিনি কিছু সংখ্যক লোকের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ -

তারা কল্যাণময় কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল।

তাই কল্যাণময় কাজে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা এবং সে কাজকে অগ্রবর্তী করা পশ্চাদবর্তী করার তুলনায় উত্তম হওয়া অতীব আবশ্যক। তা ছাড়া ফরযসমূহ তার জন্যে

নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা তাকে অন্য সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা অপেক্ষা অনেক উত্তম। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّحُجَّ فَالْيُعَجِّلْ -

যে লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করেছে, তার তা অবিলম্বে করে ফেলা দরকার।

এতে নবী করীম (স) বিলম্ব না করে হজ্জ আদায় করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে করণীয় সব ফরয কাজের বেলায়ই এ কথা সত্য। তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই তা করা উচিত, সে সময় থেকে সরিয়ে নেয়া উত্তম হাতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উকবা ইবনে মকরম, আবূ কুতায়বা, আবদুস সামাদ ইবনে হুবায়ব ইবনে আবদুল্লাহ আল-আজদী হুবাইব ইবনে আবদুল্লাহ্ সিনান, ইবনে সালামাতা ইবনুল মুহবিক আল হ্যালী তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ يَأْوِى اِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ -

যার বাহন আছে, পরিতৃপ্তিতে আশ্রয় নিতে পারে, তার রমযান যেখানেই তাকে পাবে সেখানেই রোযা রাখা উচিত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, নসর, ইবনুল মুহাজির, আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস, আবদুস সামাদ ইব্নে হুবাইব, তাঁর পিতা, সিনান ইবনে সালামাতা, সালামাতা ইবনে মুহাবিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِىْ السَّفَرِ .....

রমযান যাকে সফরে পাবে...

এর তাৎপর্য হল—সফরে তার রোযা রাখা উচিত। এ হল অতীব উত্তম হওয়ার দলীলসমূহের বক্তব্য। তবে রোযা না-রাখাটা নিশ্চয়ই ওয়াজিব নয়। কেননা সফরে রোযা রাখা যে ওয়াজিব নয়, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। উসমান ইবনে আবুল আস, আস-সফাফী ও আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, সফরে রোযা রাখা রোযা না-রাখার তুলনায় অধিক উত্তম।

সফরের রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলা

সফরে যে লোক রোযা রাখল, পরে কোন ওযর ব্যতীতই রোযা ভাঙ্গল বা রোযা বন্ধ করল, তার এ কাজটি সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাকে না-রাখা রোযাগুলো কাযা করতে হবে, কোন কাফফারা দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ সকাল পর্যন্ত রোযাদার থাকল, পরে সফর যাত্রা

শুরু করে সে রোযা ভাঙ্গল কিংবা মুসাফির অবস্থায় রোযা রেখে পরে বাড়িতে ফিরে এসে রোযা ভাঙ্গতে থাকে, রাখে না—তাকেও এসব কারণেই রোযা কাযা করতে হবে। তবে কাফফারা কিছু দিতে হবে না। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, সফরে যে লোক রোযা রেখেছে সে যদি রোযা রাখা বন্ধ করে, তা হলে তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে, তার কাফফারাও দিতে হবে। মুররা বলেছেন, কাফফারা দিতে হবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, তাকে কাফফারা দিতে হবে। বলেছেন, নিজ বাড়িতে সকাল পর্যন্ত রোযা থেকে পরে সফরে যাত্রা করে সে রোযা ভাঙ্গলে—না রাখলে তাকে শুধু কাযা-ই করতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, মুসাফির রোযা না-রাখলে বা ভাঙ্গলে কাফফারা দিতে হবে না। লাইস বলেছেন, ফাক্ফারা দিত হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে মূল কথা হল, রমযানের কাফফারা সে বিষয়ে সংশয়ে নিক্ষেপ করে। তখন তা 'হদ্দ'-এর মত হয়ে যায়। তার দলীল হচ্ছে, তাতে এক বিশেষ গুনাহ হয়ে যায়, যেমন শরীয়াতে 'হদ্দ'সমূহ। যখন 'হদ্দ' ছিল, সংশয় তা ফেলে দেয়, রমযানের কাফফারা তারই স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে। একথা যখন প্রমাণিত হল, তখন আমরা বলব, সফরে থাকা অবস্থায় যখনই রোযা ভাঙ্গে—রোযা রাখা বন্ধ করে, এই অবস্থাটার অস্তিত্ব কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। কেননা সফরে রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখাকে মুবাহ্ করে দেয়। ফলে তা বিয়ের আক্দ ও ডান হাতের মালিকা (দাসীর মালিকত্ব) নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গম মুবাহ্ করে দেয়। যদিও হায়েয সম্পন্না স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম মুবাহ করে না। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, মূলত সঙ্গম মুবাহকারী কারণের অস্তিত্ব 'হদ্দ' কার্যকর হওয়ার পরিপন্থি। যদিও ঠিক সেই সঙ্গমকেই মুবাহ বানায় না। সফরও তদ্রূপ। তা যদি রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখাকে রোযায় প্রবেশ করার মুবাহ্ না-ও বানায়, তা কাফফারা ওয়াজিব হতে দেয় না। কেননা মূলত তাকে রোযা ভাঙ্গা—না-রাখাকে মুবাহ্ বানানোর কারণ বানানো হয়েছে। এ কারণেই আমরা বলেছি, মুসাফির থাকা অবস্থায় রোযা ভাঙ্গলে বা না রাখলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) সফরে রোযায় প্রবেশ করার পর সফরে রোযা ভেঙ্গেছেন, রোযা রাখেন নি। তা করেছেন লোকদেরকে এই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে, সফরে রোযা ভাঙ্গা বা রাখা বন্ধ করা যায়। তা হলে যে কথিত ক্ষেত্রে এই নীতি, তাতে রোযা ভঙ্গকারী বা যে রোযা রাখে নি, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব মনে করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এর আর-ও একটি কারণ রয়েছে। তা হচ্ছে সফরে রোযা রাখা যদি জরুরীই না হয়ে থাকে, তা হলে রমযানের কাযা কিংবা মানতের, অথবা কাফফারার রোযাদারের মতো হয়ে গেল। তাই তা ভঙ্গকারী বা যে রোযা রাখবে না তার উপর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা তার জন্যে শুরুতেই রোযা না-রাখার সুযোগ ছিল। তাতে প্রবেশ করার দরুন তা সম্পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা তার উপর রোযা ভাঙ্গার দরুন কাফফারা দেয়া অবশ্য কর্তব্য করে না। মুসাফিরও যদি রোযা রাখে এবং পরে ভাঙ্গে বা না-রাখে তা হলে তাকেও কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি কেউ নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী হয়ে সকাল পর্যন্ত

রোযা রাখে, পরে সফরে রওয়ানা হয় এবং তখন রোযা ভাঙ্গে তা হলেও সে—যেমন বলেছি—এমন অবস্থায় রয়েছে, যখন রোযা না-রাখা মুবাহ্। আর তা হচ্ছে সফরের অবস্থা। যেমন বিয়ের আকদ ও দাসীর মালিকত্ব সঙ্গম মুবাহ্ করে, কিন্তু হায়েয সম্পন্না স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম মুবাহ্ করে না।

যদি বলা হয়, দিনের শুরুতে যে নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী ছিল বলে রোযা না-রাখা তার জন্যে জায়েয ছিল না। কিন্তু পরে রোযা ভেঙ্গেছে বলে তার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা দিনের শুরুতে রোযা রাখা তার কর্তব্য ছিল-ই।

জবাবে বলা যাবে, না, তা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। সেই অবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব হতে পারে না। কেননা শুরুতে রোযা না রাখারই ইখতিয়ার ছিল তার। ফলে রমযানের রোযার কাযা ও কসমের কাফফারা বাবদ যে রোযা রেখেছে সে তারই মত হয়ে গেল।

যে লোক মুসাফির বলে রোযা রাখেনি, আর সেই রোযা না-রাখা অবস্থায়ই সেই দিনই সে বাড়িতে ফিরে এল, হায়য সম্পন্না মেয়েলোক রোযা না-রাখা অবস্থায় দিনের কোন এক সময়ে পাক হয়ে গেল, তার বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের নানা মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ আল-হাসান ইবনে সালিহ্ ও আওজায়ী বলেছেন, উক্ত দু জনকেই রোযা কাযা করতে হবে এবং দিনের অবশিষ্ট সময়ে তাকে ঠিক রোযাদারের মতই নিষিদ্ধ সব কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসানও সে কথাই বলেছেন। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, যে মুসাফির রোযার দিনে রোযা না-রাখা অবস্থায় নিজ বাড়িতে ফিরে এল, সে যদি সে পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকে, তা হলে সে দিনের অবশিষ্ট সময় রোযা পালন করবে এবং পরে সে দিনের কাযা করবে। মেয়েলোক যদি তার হায়য থেকে থাকে, তা হলে সে খাবার খাবে, রোযা রাখবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, মেয়েলোক পাক হল, মুসফির নিজ বাড়িতে ফিরে এল সফরে থাকাকালে রোযা না রেখে, সে খাবে, পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে না। এটা ইমাম শাফেয়ীর কথা। জাবির ইবনে ইয়াযীদ থেকে অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। সওরী আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক দিনের শুরুতে খেয়েছে, দিনের শেষেও সে খাবে। সুফিয়ান সওরী তাঁর নিজের মত-এর বিপরীত প্রকাশ করেন নি। ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বলেছেন, সকাল বেলা যদি রোযা না-রাখার নিয়ত করে থাকে, সে জানে না যে এটা রমযান মাস, সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। সেদিনই রোযার মাস বলে জানার পরও যদি সে পানাহার করে, তাহলে তাকে (কাযা করতে হবে), কাফফারা দিতে হবে না। তবে সে যদি বেপরোয়া হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ফিকাহ্‌বিদগণ যখন একমত হয়েছেন যে, রমযানের নতুন চাঁদ মেঘের কারণে না দেখতে পেয়ে পরের দিন খাবার খেল, পরে চাঁদ দেখার খবর জানল, তাহলে তাকে রোযাদারের মতই বিরত থাকতে হবে। হায়েয সম্পন্না মেয়েলোক ও মুসাফিরও তাই। এ দুজনের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক হচ্ছে—রোযা ভাঙ্গার পর তাদের উপর

দেখা দেয়া অবস্থা দিনের শুরুতে যদি বহাল থাকে, তখন তারা রোযা রাখতেই আদিষ্ট ছিল। পরে অবস্থার পরিবর্তনে তারা হল রোযা না-রাখা লোক, তারা বিরত থাকতে আদিষ্ট। নবী করীম (স) আশুরার দিন খাবার গ্রহণকারী লোকদেরকে পরে পানাহার থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছিলেন। যদিও তাদের উপর তার কাযা করা ফরয ছিল, এ কথা থেকেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে তা একটি মূল হয়ে দাঁড়াল। ইমাম মালিক বলেছেন, রোযা না-রাখার দুসাহসিকতা সহকারে যদি খাবার খায়, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে, এ কথার কোন তাৎপর্যই নেই। কেননা এ কাফফারা বিশেষভাবে দেয়া ওয়াজিব হয় রোযা ভেঙ্গে ফেললে। এ খাবার গ্রহণকারী খেয়ে তার রোযা বিনষ্ট করেনি। অতএব তার উপর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না।

মুসাফির যদি রমযানের রোযা অন্য কারোর পক্ষে থেকে রাখে

মুসাফির প্রবাসী অন্য কারোর উপর ধার্য ফরয রোযা যদি রমযান মাসে রাখে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যার পক্ষ থেকে রোযা রাখার নিয়ত হবে, রোযা তার পক্ষ থেকেই হবে। যদি তা নফল স্বরূপ রাখা হয়, তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। একটি—তা রমযানের রোযা হবে। আর দ্বিতীয়—তা নফল রোযা হিসেবেই গণ্য হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, উভয় দিক দিয়েই তা রমযানের রোযা গণ্য হবে। সব হানাফী ফিকাহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, লোকটি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে রোযা রাখে আর নিয়ত করে অন্যের পক্ষ থেকে ফরয রোযা আদায়ের অথবা নফল রোযার, তা রমযানের রোযা হিসেবেই গণ্য হবে এবং তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। সওরী ও আওজায়ী বলেছেন, যদি কোন মেয়েলোক রমযানে রোযা রাখে নফল হিসেবে, তা রমযান মাসের রোযা হিসেবে তার পক্ষ থেকে গণ্য হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, শত্রুদেশে যদি কেউ রোযা রাখে, সে জানে না যে, তা রমযান মাস, তাহলেও তার ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে। মালিক ও লাইস বলেছেন, রমযানের প্রথমে যে রোযা রাখবে, তা যে রমযান মাস তা না জেনেই তার রমযানের রোযা আদায় হবে না। শাফেয়ী বলেছেন, রমযান মাসে অন্য কারোর জন্যে ঋণ বা কাযা হিসেবে রোযা রাখলে তা রমযানের রোযা গণ্য হবে না। অন্যের জন্যেও হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা শুরুতেই নিজ বাড়িতে থেকে রমযান মাসে নফল রোযা রাখা সম্পর্কে কথা বলব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হানাফী ফিকাহবিদদের কথা যথার্থতা স্বীকারের কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে—আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে .... 'তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ' পর্যন্ত। এতে বিশেষ কোন রোযার কথা বলা হয়নি। নফল বা ফরয সব রোযাই এর মধ্যে শামিল হতে পারে। এ সব রোযাই ফরয আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হবে। কেননা রোযাদার নফল বা অন্য কারোর ফরয রোযা রাখলে তা তো রোযাই হবে, যার রোযা বলে নিয়ত হবে, তারই

পক্ষ থেকে আদায় হবে রমযান মাস ছাড়া। অথবা তা বেহুদা বা অর্থহীন হবে, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই হবে না। সে যেন রোযাই রাখে নাই। অথবা তা হবে রমযানের রোযা হিসেবে। যার পক্ষ থেকে তা আদায় করার নিয়ত হবে, তা যখন তার দিক থেকেই সঙ্ঘটিত হবে অথবা তা অর্থহীন হবে, এ রোযা তার জন্যে কল্যাণকর হওয়ার প্রতি-বন্ধক হবে। বরং তা রমযান মাসের হওয়াটাই তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, তাহলে তা অবশ্যই অর্থহীনও হবে না, রমযান ছাড়া অন্য যার দিক থেকেই নিয়ত করা হবে, তার পক্ষ থেকেও হবে না। এ কথাটি প্রমাণ করছে আল্লাহ্‌র এ কথাটিও ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে, সে যেন রোযা রাখে।' এরই ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ যে রোগী হবে, কিংবা হবে সফরে, তার রোযা রাখার সময় কাল অন্যান্য দিন'। এ কথা ছাড়া মুসাফির ও রোগীর রোযা কাযা ফরয করা হয়েছে, যদি তারা রোযা না-রেখে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী যে লোক রোযা রাখবে, ভাঙ্গবে না, তার রোযা কাযা করতে হবে না। আয়াতেই এ কথা নিহিত রয়েছে। আদেশপ্রাপ্ত সব লোকের রোযাই সিদ্ধ হবে। তবে রোগী ও মুসাফিরদের মধ্যে যারা রোযা রাখবে না, তাদের কথা ভিন্ন। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে'ও তা-ই বোঝায়। এসব কথার বাহ্যিক অর্থ রোযাকে সঙ্গত করে দেয়, তা যেভাবেই রাখা হোক-না কেন। তা নফল রোযা হোক, কি অন্য কিছু। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, রমযানের রোযা তো সময়ভিত্তিক নির্ধারিত রোযা। যেমন কুরবানীর দিন তওয়াফে যিয়ারত। তা যেভাবেই আদায় করা হোক, তা ফরয হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। তা অন্য কারোর পক্ষ থেকে নিয়ত করা হলে সে নিয়ত অনুযায়ী হবে না। কেননা তা ফরয হিসেবে আদায় না হলে যার পক্ষ থেকে তা করার নিয়ত হবে তার পক্ষ থেকেই হবে। অন্যান্য সমস্ত দিনের রোযার মত, যার পক্ষ থেকে রাখার নিয়ত হবে, তার পক্ষ থেকেই হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, যুহরের নামায তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করতে হয়, যদি ততটুকু সময় বাকী থাকে যতটুকু সময় যুহরের নামায পড়তে লাগে। তা নফলের নিয়তে পড়লে জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, যুহরের নামাযের সময় বিস্তীর্ণ প্রশস্ত, কোন একটা মুহূর্ত তার জন্যে নির্দিষ্ট নয়। সময়ের প্রথম দিক ও শেষের দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সময়ের শুরুতে যদি নফল পড়া হয় তাহলে তাতে ফরয আদায় হয়ে যাবে না। শেষে নফল পড়লেও নয়। উপরন্তু সময়ের শেষ ভাগে পড়া তার নামাযকে নফল বা অন্য কারোর ফরয হিসেবে পড়ার নিয়ত করে, তাহলে নিয়ত অনুযায়ীই তা আদায় হবে। অথচ আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, ঠিক নির্দিষ্ট রমযানের রোযা অন্য কারোর পক্ষ থেকে আদায় হবে না। এ থেকে বোঝা গেল, তা সুনির্দিষ্ট, তাতে অন্য কারোর রোযা জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ। আর সেই গোটা সময়টাই যেহেতু ফরয আদায়ের জন্যে সম্পূর্ণ জরুরী, তা তার আগে ধরা যায় না, তাকে বিলম্বিতও করা যায় না। যুহরেরও এটা সময় আছে। সময়ের মধ্যে বিলম্বিত করা হলে তা করা তার জন্যে জায়েয হবে।

যদি বলা হয় নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَانَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّانَوٰى –

সমস্ত আমলই নিয়ত অনুযায়ী কার্যকর হবে। যে যার নিয়ত করবে, কাজটা সেইভাবেই গৃহীত হবে।

এতে রমযানের রোযা নফল রোযার নিয়তে রাখা জায়েয না হওয়াই প্রমাণিত হয়।

জবাবে বলা হবে, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়' কে দলীল হিসেবে পেশ করাই সহীহ্ নয়। কেননা তাতে কতগুলো অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে—জায়েয হওয়া বা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া, যদিও শব্দে তা উল্লিখিত নয়। এ বিষয়ে যখনই মতপার্থক্য করা হবে, তা প্রমাণের জন্যে দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। অতএব তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। রাসূলের কথা, 'যে জিনিসের নিয়ত করবে তার জন্যে তা-ই হবে' নিয়ে আমরা যদি বিতর্কে লিপ্ত হই, তাহলে এ ব্যাপারে সঙ্গতিপূর্ণ কথা এই হবে যে, নফল বা অন্য কারোর ফরয-এর নিয়ত করা হলে তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, রমযানের রোযা ছাড়া নফল বা অন্য কারোর ফরয আদায় হবে না। আর সে বলেছে, রমযানের রোযাও হবে না। যার পক্ষ থেকে রোযা রাখার নিয়ত তার পক্ষ থেকেও হবে না। এতে সকলের ঐকমত্যে জানা গেল যে, রাসূলের কথা ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তা যার নিয়ত সে করেছে' টি বাহ্যিকভাবে এ ধরনের বিষয় ব্যবহৃত হয় না। সকলের মত অনুযায়ী বলা যায়, কথাটি তার আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয় না। কেননা কথাটির দাবি তো এই হয় যে, যে লোক রোযার নিয়ত করবে, সে রোযাদার হবে, যে নামাযের নিয়ত করবে, সে নামাযী হবে। এর কোন একটি কাজ না করলেও। একথা তো জানাই আছে যে, শুধু নিয়ত করলেই নামায হয়ে যায় না, তা না করা পর্যন্ত। রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ফরয ও যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীও তেমনি। তা থেকে প্রমাণিত হল, উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত শব্দগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোন হুকুম প্রমাণ করতে পারে না। সেজন্যে একটি নিদর্শন অবশ্যই থাকতে হবে। ফলে বিপরীত মত প্রমাণের উদ্দেশ্যে হাদীসের বাক্য দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। তার দুটি কারণ। একটি—বক্তব্যটিতে একটা তাৎপর্য উহ্য রয়েছে। দলীল হিসেবে কোন কিছু প্রমাণের জন্যে তার প্রতিষ্ঠা জরুরী। তাহলে একথার নিয়ত সে করেছে রাসূলের এ কথাটি প্রমাণ করে যে, রমযানের নফলের নিয়ত করে রোযা রাখলেও হবে। আর তার রোযা যখন কার্যত হবে, তখন তা ফরয হিসেবে আদায় হবে। কেননা আমরা একমত হয়েছি এই কথায় যে, যখন ফরয হিসেবে হবে না, তখন যার নিয়ত করা হয়েছে, তাও হবে না। তাহলে এ কথাটির ফায়সালাতেই যার নিয়ত করবে, তাই অর্জিত হবে। অন্যথায় গোটা কথাটাই অর্থহীন ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। রাসূলের কথাটি থেকেই বোঝা যায় যে, নিয়ত যার দাবি করে ফরয, কিংবা ফযীলত, সওয়াব বা অনুরূপ কিছু, তা-ই সে পাওয়ার অধিকারী হবে। কাজটা সজ্ঘটিত হওয়াই চাওয়া হয়েছে, তা মনে করা সঙ্গত নয়। কেননা কাজ ফলবতী হবে নিয়ত হোক আর নাই হোক। নিয়ত ইচ্ছানুরূপ হুকুম কার্যকর

করে মাত্র। ফরযের বা ফযীলতের কিংবা হামদ অথবা নিন্দা নিয়ত অনুযায়ী তার সওয়াব পাওয়ার অধিকার হবে। তা যখন এই রূপই, তখন তার দুটি অর্থের যে কোন একটি অবশ্যই হবে। হয়, রোযা জায়েয হওয়ার বা বাতিল হওয়ার কথা প্রমাণে ব্যবহৃত শব্দের কার্যকরতা গণ্য করা হবে না এবং তা বাদে অন্য কোন দলীল চাওয়া জরুরী হবে। অথবা তার বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী কথাটি ব্যবহৃত হবে, সওয়াব বা হামদ কিংবা নিন্দা সম্পর্কিত ফায়দা লাভ হবে। সেটিকে সে অনুযায়ী ব্যবহার করা যখন জরুরী হবে, অথচ তার নিবদ্ধ হয়েছে কোনরূপ নৈকট্য লাভের উপর, তখন তা লাভ হওয়া জরুরী হবে। অতঃপর এ ব্যাপার তার কম-সে কম অবস্থা—ফরযের নিয়তকারীর সওয়াবের মতো তার সওয়াব না হওয়া তার তুলনায় কম হবে। সওয়াব কম হওয়ায় তা ফরয হিসেবে আদায় হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। একথার দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এই কথাটি ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ فَيُكْتَبُ لَهٗ نِصْفُهَا، رُبْعُهَا، خُمْسُهَا، عُشْرُهَا -

এক ব্যক্তি নামায পড়ে, কিন্তু তার জন্যে লেখা হয় তার অর্ধেক, চার ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক, দশ ভাগের এক ভাগ।

এ থেকে জানা গেল যে, নামায জায়েয ও সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও তার সওয়াব কম হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা বলেছি, শব্দের হুকুম সওয়াব, আযাব কিংবা হামদ ও নিন্দার সাথে সম্পর্কিত। তা রাসূলের এ কথাটিতে প্রমাণ করে ঃ

وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ، وَرَسُوْلُهٗ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই, যার নিয়ত সে করেছে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত হবে দুনিয়ার দিকে তা পাওয়ার আশায় কিংবা কোন নারীর দিকে তাকে বিয়ে করার জন্যে, তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে যেদিকে সে হিজরত করেছে।

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, যার উপর হজ্জ ফরয, সে যদি নফলের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধে, তা হলেও তার ফরয হজ্জ আদায় হবে। নফলের নিয়ত অর্থহীন হয়ে যাবে। তা ফরয গণ্য হবে। যদিও তিনি বলেছেন যে, ফরয হজ্জের জন্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তা এমন নয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা আদায় করতে হবে, নতুবা আদায় হবে না। এই কথাটির সাথে রমযান মাসে নফল রোযা জায়েয হওয়ার দূরতম সম্পর্ক-ও নেই। কেননা রমযানের রোযার জন্যে সময় নির্দিষ্ট। সেই নির্দিষ্ট সময় তা আদায় না

করলে আদায় হবে না। তাই সেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেও আদায় করা যায় না সময়ের পরেও আদায় করা যায় না। তাই রাসূলের কথা ঃ আমলের মূল্যায়ন নিয়ত অনুযায়ী হবে। যে লোক যার নিয়ত করবে, তার জন্যে তা-ই হবে এর বাহ্যিক অর্থ অগ্রহণীয়। তাতে নির্ভুল দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে না যা মূল বক্তব্যের সমর্থক হবে। আর এই হাদীসটির বাহ্যিক যে অর্থের তারা দাবি করে, তা গণ্য করা কর্তব্য হবে।

আমাদের মূল কথা—পূর্বেই বলেছি—এই হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করাই সঙ্গত নয়। এর প্রকৃত তাৎপর্য ও বক্তব্যের দাবি আমরা পূর্বেই স্পষ্ট করে বলেছি। বলেছি যে, সে রোযা ফরয হিসেবেই কার্যকর হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দলীল অবশ্যই গৃহীত হবে। এ হাদীস তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। মুসাফির যদি রমযান মাসে ফরয রোযা রাখে ইমাম আবূ হানীফার মতে তা যার পক্ষ থেকেই রাখার নিয়ত হবে, তার পক্ষ থেকেই হবে। কেননা মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখাটাই দাবিকৃত নয়। তার তো ইখতিয়ার রয়েছে রোযা রাখার বা না—রাখার। তার ব্যাপারে রমযান ছাড়া অন্যান্য সব দিন সমান। সেই সব দিনের রোযা যার পক্ষ থেকেই রাখার নিয়ত হবে, তা যখন জায়েয, সফরে থাকা ব্যক্তির জন্যে রমযান মাসও সেরূপই। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নফলের নিয়ত করলে তা নফল হিসেবেই আদায় হবে। এ কথাটি হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে বলা। দুটি বর্ণনার মধ্যে তা অধিক গ্রহণীয় বর্ণনা।

যদি বলা হয়, যে রোগীর রোযা না-রাখা জায়েয, সে যদি রোযা রাখে, তবে তা জায়েয হওয়া উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক হয় রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। এ ভাবে যে নিয়ত করেছে নফলের, কিংবা তার উপর ধার্য ফরযের পূর্বোল্লিখিত ইল্লাতের কারণে, যা মুসাফির পর্যায়ে উল্লেখ করেছ।

জবাবে বলা যাবে, না তা বাধ্যতামূলক নয়, মুসাফির পর্যায়ে যে কারণের উল্লেখ করেছি তা এখানে নেই বলে। তা এজন্যে যে, মুসাফির সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যা-ই বলেছি, তা জরুরী তাৎপর্য হিসেবেই বলেছি। সে রোযা রাখা ও না-রাখার ইখতিয়ার সম্পূর্ণ তার—কোনটিতেই তার কোন ক্ষতি নেই। রমযান ছাড়া অন্য সময়ই তার অবস্থা অধিক সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু রোগী সে রকমের নয়। কেননা তার জন্যে রোযা না-রাখার অনুমতি কেবল তখনই হতে পারে, যদি রোগ বৃদ্ধির ও ক্ষতির আশংকা হয়। অন্যথায় রোযা না-রাখার অনুমতি তার জন্যে নেই। তার দুটি অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। হয় রোযা তার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে না। তাহলে তার রোযা রাখাই কর্তব্য। অথবা রোযার রাখায় তার ক্ষতি হবে। তা হলে তার রোযা রাখা জয়েযই নয়। অবস্থা যখন এই, তখন রোযা রাখার কাজটি তার জন্যে বাঞ্ছনীয় হবে। অথবা তা ত্যাগ করা—না রাখা বাঞ্ছনীয় হবে। তাতে কিন্তু তার কোন ইখতিয়ারের প্রশ্ন হয় না। তাই যখনই সে রোযা রাখবে, তখনই তা ফরয রোযা গণ্য হবে। কেননা তার পক্ষে রোযা না রাখা মুবাহ ছিল কেবলমাত্র ক্ষতির ভয়ের কারণে। তাই যখনই সে রোযা রাখল, তখন বোঝা গেল, তার ক্ষতির আশংকা নেই। সে সুস্থ সবল মানুষের মতই রোযা রাখতে সক্ষম প্রমাণিত হল। তাই তার রোযা রমযান মাসের রোযা হয়ে যাবে, যে ভাবেই সে রোযা রাখুক না-কেন।

রমযানের রোযা কাযা'র সংখ্যা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ اَيَّامٍ اُخَرَ -

তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা সফরে থাকলে তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন।

বিশর ইবনুল অলীদ আবূ ইউসূফ, হিশাম ও মুহাম্মাদ-এর মত হানাফী ফিকাহবিদদের কোনরূপ ভিন্নমত ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন শহর বা জনপদের লোকেরা যদি উনত্রিশ দিন রোযা রেখে থাকে চাঁদ দেখে, আর সেখানেই এক ব্যক্তি রোগক্রান্ত থাকার কারণে রোযা না রেখে থাকে, তা হলে সুস্থ হওয়ার পর সেই উনত্রিশ দিনের রোযা সে কাযা করবে। আর জনগণ যদি ত্রিশ রোযাই রেখে থাকে উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখতে না পাওয়ার ফলে, অপর জনপদের লোকেরা যদি উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখে রোযা শেষ করে থাকে, পরে তারা অপর জনপদের ত্রিশ রোযা রাখার খবর জানতে পারে, তাহলে তাদের সকলের কর্তব্য হবে একটি রোযা কাযা করা। আর রোযা না-রাখা রোগীকে পরে সেই ত্রিশ রোযারই কাযা করতে হবে। মালিক ইবনে আনাস-এর সঙ্গীরা তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন, সে রোযা কাযা করবে চাঁদ অনুযায়ী। আশহুব তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একটি লোক একাধারে দুই বছর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত রয়েছে, পরে সে কোন রোযার কাযা না করেই মরে গেছে, এখন কি করা হবে ? জবাবে তিনি বলেছেন, তার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ্দ' পরিমাণ খাবার দিতে হবে।

সওরী বলেছেন, একজন লোক সারা রমযান মাস রোগী হয়ে থাকল। আর মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের। রোগী ভালো হয়ে সেই উনত্রিশটি রোযাই কাযা করবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, কেউ যদি রমযান মাসে অসুস্থ থাকে, মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সেই একটি রোযাও রাখল না, পরে একটি মাসে সে রোযা কাযা করতে শুরু করল। এই মাসটি হল উনত্রিশ দিনের। তার রমযান মাসে না-থাকা রোযা এই মাস কাযা করলেই পূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও তা ত্রিশ দিনেরই হোক না-কেন। কেননা এখানে এক মাসের বদলে আর এক মাস এসে গেছে। কাযা যদি কোন মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু করে তাহলে তাকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। রমযান মাস উনত্রিশ দিনের হলেও। কেননা উনত্রিশ দিনে তো একটা মাস হয়ে যায় তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিলে।

আবূ বকর বলেছেন, মাস যদি উনত্রিশ বা ত্রিশ দিনের হয়, পরে রোগী ব্যক্তি কাযা রোযা করার ইচ্ছা করল, সে রোযার মাসের যে দিনগুলোতে রোযা রাখেনি সেই সংখ্যক দিন সে রোযা রাখবে কাযা বাবদ। তা মাসের শুরুতেই কাযা শুরু করুক, কি মাঝখান থেকেই শুরু করুক। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী

হলে কিংবা সফরে থাকলে তার রোযা রাখার মেয়াদ অন্যান্য দিনে।' এর অর্থ, রোযা না-রাখা দিন যে কয়টি, সেই কয়টি দিন অন্য সময় রোযা রাখবে। নবী করীম (স)-এর এ কথাটি থেকেও তা-ই বোঝায়; যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তা হলে মাস ত্রিশ দিনের ধরবে। অর্থাৎ অত অসংখ্য দিন, আল্লাহ্ যখন রোযা না-রাখার দিনগুলোর সময় অন্যান্য দিনে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তখন তার বেশি দিন কাযা রোযা রাখা জায়েয নয়। তার কম-ও করা যাবে না। যে মাসে কাযা রোযা রাখবে, সে মাসটা কম দিনের হোক কিংবা পূর্ণ হোক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

যদি বলা হয়, রোযা রাখেনি, তা যদি একটি মাস হয়, আর নবী করীম (স) বলেছেন, উনত্রিশ দিনেও একটি মাস হতে পারে, হতে পারে ত্রিশ দিনেও। তাই যে মাস-ই হোক, সে কাযা করবে মাত্র সেই দিনগুলোর, যে দিনগুলো সে রোযা রাখেনি। কেননা একটি মাস অপর একটি মাসের বদল।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ তো فَشَهْرٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্যান্য দিনের একটি মাস'-তো বলেন নি, বলেছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'কাযা করা দিনগুলোর সংখ্যা অন্যান্য দিন থেকে গুণতে হবে। রোযা না-রাখা দিনগুলো পূর্ণ করাই দায়িত্ব। আয়াতের এই বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করাই কর্তব্য। তা থেকে অর্থকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া—ভিন্নরূপ অর্থ করা—যা বলা হয়নি, তা বলতে চেষ্টা করা জায়েয হতে পারে না। وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 'এবং যেন তোমরা সময় কালটা পূর্ণ কর'—আল্লাহ্‌র এ কথাটি থেকেও তাই বোঝায়। এ কথাটিতেও সে সংখ্যাই পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। তাই রোযা না-রাখা মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তা হলে অন্য সময় থেকে সেই ত্রিশ দিনই পূর্ণ করতে হবে। যদি উনত্রিশ দিনের একটি মাসে সীমাবদ্ধ হয়, তা হলে মেয়াদটা পূর্ণ হল না। তাতে যারা 'এক মাসের বদলে এক মাস' বলে তাদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয়। সংখ্যার হিসেবটা বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া রমযান মাসের কিছু দিন রোযা রাখা না হলে কাযা করবে সেই দিন কয়টি, এ কথার উপর সকলেরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ ব্যাপারটিও উপরোক্ত কথাকেই সত্য প্রমাণ করে। আর সমস্ত রমযান মাস রোযা রাখা না হলে সেই দিনগুলোই সংখ্যা গণনার ভিত্তিতে কাযা করতে হবে। কোন জনপদের লোক যদি চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে, আর অপর কোন জনপদের লোকেরা সেই চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ দিনের রোযা রাখল, হানাফী ফিকাহবিদগণ যারা উনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তাদের জন্যে আর একটি দিনের কাযা করা জরুরী মনে করেছেন। কেননা 'ইদ্দত' পূর্ণ করার নির্দেশ আল্লাহ্ই দিয়েছেন। মাসের মেয়াদটা পূর্ণ করাই দায়িত্ব। অপর এক জনপদের লোকেরা ত্রিশ দিনের 'ইদ্দত' পালন করেছে, অতএব অপর লোকদেরও সেই ত্রিশ দিনই রোযা রাখতে হবে। কেননা 'ইদ্দত' পূর্ণ করার নির্দেশ তো সকলের প্রতি, এক দলের বা এক জনপদের লোকদের প্রতি নয়, অপর জনপদের লোকেরা তার বাইরে নয়। তা সর্বসাধারণ মুসালমানদের জন্যে নির্দেশ। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে মাসটি পাবে সে-ই যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে' এটাও তারই একটা দলীল। আর

'মাস পাওয়া' বলে বুঝিয়েছেন রমযানের মাস শুরু হওয়া সম্পর্কে জানতে পারা। কেননা রমযান মাসের আগমন সম্পর্কে যে জানলই না, তার উপর রোযা রাখা ফরয নয়। তাই নিঃসন্দেহে যখন জানা গেল যে, মাসটি ত্রিশ দিনের, তারা চাঁদ দেখেই ত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে তখন যারা ঊনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তাদের আর একটি দিনের কাযা করে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে।

যদি বলা হয় যে, তা যারা মাসের শুরুতেই জানবে, এই হুকুম তাদের জন্যে। তা হলে বলা হবে, হ্যাঁ, তা যারা জানবে মাসের শুরুতে তাদের জন্যে, আর যারা জানবে মাস ফুরিয়ে যাওয়ার পর, তাদের জন্যেও। যে লোক দারুল হরব-এ থাকার কারণে রমযান মাসে আগমন সম্পর্কে জানতে পারল না, তা জানল সে মাস গত হয়ে যাওয়ার পর, তার তো কর্তব্য সেই পূর্ণ মাসটির রোযা কাযা করা। এ থেকে বোঝা গেল যে, পূর্ণ মাসের রোযা রাখার নির্দেশে নির্বিশেষে সকলেই শামিল। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' থেকেও সেই কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা শেষে বলা হয়েছে ঃ 'ঊনত্রিশ তারিখ মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পেলে মাসটিকে ত্রিশ দিনের গণনা কর।' তাই যারা ঊনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তারা মেঘের আড়াল হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে পারে নি বলে মনে করতে হবে। তাই তাদেরকে ত্রিশটি রোযা পূর্ণ করতে হবে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স)-এর কথা হল ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখতে শুরু কর, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ কর।' তাই প্রত্যেক দেশ ও নগরীর লোকদের চন্দ্র দর্শন গণ্য করতে হবে। অন্যান্য শহরে বা দেশে চাঁদ দেখা গেছে, কিংবা যায় নি, তা নিয়ে সে দেশ ও শহরের লোকদের কোন দায়িত্ব নেই। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই নিজস্বভাবে চাঁদ দেখেছে ও দেখবে, তাই রোযা রাখা শুরু করা ও তা রাখা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের লোকদের নিজস্ব চন্দ্র দর্শন অনুযায়ী আমল করাই কর্তব্য ও ফরয। তা ছাড়া সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজস্বভাবে চন্দ্র দেখার ভিত্তিতে রোযা রাখা শুরু করবে ও রোযা রাখা বন্ধ করবে। সারা দুনিয়ার লোকেরা চাঁদ দেখল কি দেখল না, তার কোন দায়িত্ব সে দেশের লোকদের উপর বর্তাবে না। প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজস্ব চন্দ্র দর্শন অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য, এটাই চূড়ান্ত কথা।

এর জবাবে বলা যাবে, রাসূলের করীম (স)-এর কথা ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর, চাঁদ দেখেই তা বন্ধ কর' তো নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের প্রতি, কোন বিশেষ দেশ বা শহরের লোকদের জন্যে বিশেষীকৃত নয়। আর প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন এক দেশের লোকদের চাঁদ দেখা যেমন সেই দেশের লোকদের রোযা রাখার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক তেমনি অন্য দেশের লোকদের চাঁদ দেখাও তাদের জন্যে রোযা রাখার কারণ হিসেবে বাধ্যতামূলক। তাই এক দেশের লোকেরা চাঁদ দেখেই রোযা ঊনত্রিশটা করেছে আর অপর দেশের লোকেরা চাঁদ দেখেই ত্রিশটা রোযা রেখেছে, তখন ঊনত্রিশটি রোযা রাখা লোকদের কর্তব্য আর একটি রোযা কাযা করা। কেননা চাঁদ তো ত্রিশ দিনের দেখা

গেছে বলে তারা ত্রিশটি রোযা রেখেছে। ফলে সকলের জন্যেই ত্রিশটি রোযা রাখা ফরয হয়েছে। যারা বলেন যে, প্রত্যেক দেশের লোকদের চন্দ্র দেখা সেই দেশের লোকদের রোযা রাখা বা না-রাখার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক এবং এই কথায় সকলেই একমত, হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে একটি শর্তের ভিত্তিতে। আর তা হল উভয় দেশের বা সব দেশের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে রোযার দিনের সংখ্যায় কোন পার্থক্য হবে না। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তো প্রত্যেক দেশের জনগণ তত সংখ্যক দিনের রোযা রাখবে রোযার দিন বলে যত সংখ্যক দিনের কথা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ও সহজ। যা জানা সম্ভব ও সহজ নয়, তার দায়িত্বও তাদের নেই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ভিন্ন কথা জানা যাবে—জানা যাবে যে, রোযা উনত্রিশ দিনের নয়, ত্রিশ দিনের তখন তাদের একটি দিনের রোযা কম পড়ে গেল। তাই উনত্রিশ তারিখের রোযা রাখা লোকদেরকে ত্রিশদিনের রোযা রাখতে হবে।[১] কেননা পরে যখন জানা গেল যে, মাস উনত্রিশ দিনের নয়, ত্রিশ দিনের তখন তাদেরকে ত্রিশ দিনের রোযা পূর্ণ করতে হবে। তাদের পূর্ণ জানা ছিল, তা ক্ষণে ভুল হয়ে গেছে।

এ পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিপরীত মতের লোকেরা সে হাদীসটিকে দলীল রূপে পেশ করেছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, ইসমাঈল ইবনে জাফর, মুহাম্মাদ ইবনে আবূ হারমালাতা কুরাইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কুরাইব বর্ণনা করেছেন, উম্মুল ফযল বিনতুল হরস তাঁকে (কুরাইবকে) মুআবিয়ার নিকট সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। বললেন, আমি সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে তার প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। তখন রমযান মাসের চাঁদ দেখা গেল, আমি তখন সিরিয়ায় উপস্থিতও। আমি জুম'আর দিনের রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিনগত সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখলাম। মাসের শেষের দিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। তখন ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি চাঁদের উল্লেখ করলেন, বললেন, তোমরা সিরিয়ায় কবে রমযানের চাঁদ দেখেছিলে? বললাম, জুম'আর দিনের রাত্রে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছিলে? বললাম হ্যাঁ, আমি ছাড়া অন্যান্য মানুষও দেখেছে। তারা রোযা রেখেছে, আমীর মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন। হযরত আব্বাস বললেন, কিন্তু আমরা (মদীনায়) চাঁদ দেখেছি শনিবারে রাত্রে (অর্থাৎ শুক্রবার দিনগত রাতে) তাহলে আমাদের তো আর একটি দিনের রোযা রাখতে হবে, তাহলে আমরা ত্রিশদিনের রোযা পূর্ণ করতে বাধ্য। অথবা তার কম দিনে যদি আমরা চাঁদ দেখি, তাহলে অন্য কথা হবে। আমি বললাম, মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও তার রোযা রাখা কি যথেষ্ট ভিত্তি নয়? বললেন, না। রাসূলে করীম (স) এই করার জন্যেই আমাদেরকে আদেশ করেছেন।

---

১. কথাটি সম্পূর্ণ উল্টা বলে মনে হয়। উনত্রিশ তারিখ যারা চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ করল তাদের রোযা উনত্রিশটি হল চাঁদ দেখতে পারার কারণে। যারা সেদিন চাঁদ দেখলনা—যে কারণেই হোক—তারাই রোযা ত্রিশটি রেখেছে। এক্ষণে চাঁদ দেখতে পেয়ে যারা উনত্রিশটি রাখল তারা কেন ত্রিশটি পূরণ করতে বাধ্য হবে?—অনুবাদক

কিন্তু এই হাদীস সে কথা প্রমাণ করে না। কেননা এতে নবী করীম (স)-এর জবাব পূর্ণভাবে বলা হয়নি। ঠিক এই প্রশ্নটাই তাঁকে করা হয়েছিল এবং তিনি তার জবাবও দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস শুধু এতটুকুই বললেন যে, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে এরূপই আদেশ করেছেন। হতে পারে, তিনি এ পর্যায়ে রাসূলের কথা ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' এরই ব্যাখ্যা যেমন তাঁরা বলেছেন সেরূপই মনে রেখেছেন। বরং এ থেকে আমাদের কথাই প্রমাণ করে, যেমন পূর্বে বলেছি। অতএব এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা সঙ্গত নয়, বিশেষ করে, যে বিষয়ে আমাদের মত-পার্থক্য রয়েছে।

হাসানুল বসরী থেকেও উল্লেখ করা হয়েছে এই হাদীসটি, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়ায, মুয়ায, আশয়াস, হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি কোন এক দেশের (শহরের) অধিবাসী ছিল। সে সোমবার দিন রোযা রাখল। তখন দুজন লোক সাক্ষ্য দিল যে, তারা রোববারে চাঁদ দেখেছে, বলেছেন, সে ব্যক্তি সেই দিনটির রোযার কাযা করবে না। তার নিজের দেশ বা শহরবাসীরাও না। হ্যাঁ, যদি জানা যায় যে, কোন শহর বা দেশের লোকেরা রোববারদিন রোযা রেখেছে, তাহলে তারাও সেই একদিনের কাযা করবে, কিন্তু উপরোদ্ধৃত হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা বা অন্যদের দেখার ভিত্তিতে রোযা রেখেছে। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দুই দেশ বা শহরের লোকেরা অপরদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নয়, নিজেদের দেখার ভিত্তিতে রোযা রেখেছেন।

বিপরীত মতের লোকেরা এ ব্যাপারে অপর একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দ, হাম্মাদ, আইয়ূব, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ -

তোমরা যেদিন রোযা রাখা বন্ধ করবে সেদিন তোমাদের ঈদুল ফিতরের দিন। যেদিন তোমরা কুরবানী করবে, সেদিন তোমাদের ঈদুল আযহা, প্রত্যেক আরফা'রই একটা অবস্থান স্থান, প্রত্যেকটি মিনা পশু যবেহ করার স্থান । মক্কার প্রত্যেকটি পর্বতঘাঁটি পশু যবেহ করার স্থান। আর প্রত্যেকটি সমাবেশই একটি অবস্থান স্থান।

আবূ খায়সামাতা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মাদানী, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, উসমান ইবনে মুহাম্মাদ, আল-মুকবেরী, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

'রোযা' যেদিন তোমরা রোযা রাখবে, যেদিন তোমরা রোযা রাখা বন্ধ করবে সেদিন ঈদুল ফিতর। ঈদুল আযহা সে দিন, সে দিন তোমরা কুরবানী করবে।

এর উপর ভিত্তি করে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, হাদীসের এ কথাগুলো প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর রোযা সেই দিন, যে দিন সকলে রোযা রাখবে। তাদের ঈদুল ফিতর সে দিন, সে দিন তারা রোযা রাখা বন্ধ করেন। এ কথা দ্বারা হয়ত সে কথা বলতে চেয়েছেন, যা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তা সত্ত্বেও এ কথা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জনপদকে বিশেষভাবে বোঝায়নি। কম সংখ্যক লোক যদি রোযা রাখে যা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক, তা হলে বেশী সংখ্যক লোক রোযা রাখলে তা সকলের জন্যেই বাধ্যতামূলক হবে। তাহলে তা-ই হবে সকলের রোযা। যারা কম সংখ্যক দিন রোযা রেখেছে, বেশী সংখ্যক লোকদের রাখা রোযার সমান সংখ্যক রোযা রাখা তাদের কর্তব্য হবে। তাই অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে।

এ হাদীসটি সহীহ কিনা, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের মতে হাদীসটি সহীহ। অপর লোকেরা বলেছেন সহীহ নয়। হাদীসটির অর্থ নির্ধারণেও নানা কথা বলা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, সমস্ত লোক যেদিন রোযা রাখার ব্যাপারে একমত হবে, সেই দিনই হবে তাদের রোযা। যদি তাতে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে নিজেদের মতের পক্ষের দলীল পেশ করা আবশ্যক হবে। কেননা হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের কিছু সংখ্যক লোক যেদিন রোযা রাখবে, সেদিনই তোমাদের রোযা। বলা হয়েছে, যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে, সেদিনই তোমাদের রোযা। তাতে সকলেরই রোযা রাখা আবশ্যক হয়। অন্যরা বলেছেন, উক্ত হাদীসে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রমাণের ভিত্তিতে ইবাদত পালনে বাধ্য। অন্যের নিকট যে প্রমাণ রয়েছে, তার দ্বারা সে চালিত হতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি রযমান মাস মনে করে রোযা রাখবে সে পালন করল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব। অপরের নিকট যা আছে, তা পালনের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক ব্যক্তিকে শরীয়াত পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন তার নিজের যা কিছু আছে তার ভিত্তিতে। অপরের যা কিছু আছে তার ভিত্তিতে দেন নি। যে অনুপস্থিত তাকেও এই সম্বোধনে শরীয়াত পালনে দায়িত্বশীল বানান নি। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ –

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান। তিনি তোমাদের প্রতি কঠোরতার বিধান করতে চান না।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্, মুজাহিদ ও দহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ সহজতা হচ্ছে সফরে রোযা না-রাখা। আর কঠোরতা হচ্ছে সফরের রোযা রাখা এবং রোগে ভোগার মধ্যে রোযা রাখা। সফরে রোযা না-রাখা বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা সম্ভবত তার জন্যে, যার পক্ষে রোযা রাখা কষ্টকর এবং ক্ষতিদায়ক। যেমন নবী করীম

(স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফরে এক ব্যক্তিকে ছায়াচ্ছন্ন দেখতে পেলেন, জানলেন যে, সে রোযাদার। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ সফরে রোযা রাখা খুব একটা পূণ্যের কাজ নয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমাদের রোযা রাখা চান যতটা সহজসাধ্য হবে। যা কষ্টদায়ক হবে, তা রাখা চান না। কেননা নবী করীম (স) নিজে সফরে রোযা রেখেছেন, সফরে রোযা রাখা মুবাহ ঘোষণা করেছেন তার জন্যে, যাকে রোযা ক্ষতি করে না, কষ্ট দেয় না। আর একথা জানা আছে যে, নবী করীম (স) তো আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী ছিলেন, পালনকারী ছিলেন সেই কাজের আল্লাহ তাঁর নিকট যে কাজ চান। এ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, কঠোরতার বিধান করতে চান না' কথাটি সফরে রোযা জায়েয হওয়ার পরিপন্থী নয়। তা বোঝায়, সফরে রোযা যার জন্যে ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক, আল্লাহ তাকে এই ক্ষতি করতে ও কষ্ট দিতে চান না। বরং তার পক্ষে রোযা রাখাই মাকরূহ। এ-ও বোঝা যায় যে, সফরে যে লোক রোযা রাখবে, তার রোযা রাখার ফরয আদায় হয়ে যাবে। তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে না। কেননা কাযা করা ওয়াজিব বলা হলে তা তার জন্যে অবশ্যই কষ্টদায়ক হবে। আর আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ اليسر। ইখতিয়ার দান — التخيير। —বোঝায়। যেমন ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। রোযা রাখার ব্যাপারে যখন কেহ ইখতিয়ারসম্পন্ন হবে এবং সেই সুযোগে সে রোযা রাখবে না তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে না। এ-ও বোঝা যায় যে, রোগী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা—আর রোযা রাখা যার যার পক্ষে ক্ষতিকর হবে বা বালক, তাদের সকলেরই পক্ষে রোযা না-রাখা জায়েয। জেননা রোযার ক্ষতি ও কষ্টের সম্ভাবনা এক ধরনের কষ্ট। আর আল্লাহ্ নিজে কাউকে কষ্ট দেবেন না—এটাই তাঁর ঘোষণা। তিনি আমাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতার পক্ষপাতী নন। এরই দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই হাদীস যাতে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا -

নবী করীম (স)-কে যখনই দুটির মধ্যে যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে অধিক সহজটিই তিনি গ্রহণ করেছেন।

এই দিক দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি একটি মৌল নীতি নির্ধারক, মৌলনীতি হচ্ছে 'যা-ই মানুষের ক্ষতি সাধন করে, মানুষকে কষ্ট দেয়, তার রোগ টেনে আনে; কিংবা রোগ বৃদ্ধি করে, তা পালন করার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত নয়।' কেননা তা আল্লাহ্র কাঙ্খিত সহজতার পরিপন্থী। যেমন, যে লোক হজ্জের জন্যে পায়ে হেটে চলে যেতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনীয় পাথেয় ও যানবাহন পায় না, আয়াতটি বলছে যে, হজ্জ করার দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা তার উপর নেই। কেননা তা-ও তার জন্যে কষ্টদায়ক। আর তা 'সহজতার বিপরীত।' এ আয়াত থেকে একথাও বোঝা যায় যে, যে লোক রমযানের রোযা কাযা করতে সমর্থ হয়েও ত্রুটি করবে, তাকে সেজন্যে কোন ফিদিয়া দিতে হবে

না। কেননা কঠোরতা প্রমাণিত হয়, সহজতা অস্বীকৃত হয়। এ-ও বোঝা যায় যে; যাবতীয় ফরয ও নফল কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে কিংবা মুবাহ করা হয়েছে এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তাতে কঠোরতা ও নির্মম কষ্ট থাকবে না। এ-ও বোঝা যায় যে, রমযানের রোযা না থেকে থাকলে তা বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা যাবে। কেননা এ কাযা করার কথাটি فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ এর পরপরই বলা হয়েছে। এ থেকে উক্ত কথাটি বোঝা যায় দুটি দিক দিয়ে। একটি—আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, কঠোরতার বিধান করতে চান না'। বান্দাকে রমযানের রোযা কাযা করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছে, একাধারে ও একটানাভাবে কাযা করবে; কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাযা করবে, এটা তার ইচ্ছা। আর দ্বিতীয়, সহজতার অর্থের দিক দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাযা করাটাই সামঞ্জস্যশীল। তাতে সম্ভাব্য কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। একটার পর একটা—একটিও না ভেঙ্গে কাযা করা বাধ্যতামূলক হলে কঠোরতার সৃষ্টি করা হতো। আর রমযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করতে শুরু করা ওয়াজিব—দেরী করা ঠিক নয় বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে তাদের মত বাতিল প্রমাণ হয়ে গেছে। কেননা তাতে সহজতার তাৎপর্য অস্বীকৃত হয় ও কঠোরতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়।

'জবরীয়া' মতের লোকদের কথা এবং যারা বলে যে, বান্দারা যে কাজ করতে সক্ষম নয়, আল্লাহ্ তাদের উপর সেই কাজ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন, তাদের মত উক্ত আয়াতের আলোকে সম্পূর্ণ বাতিল মনে করতে হবে। কেননা বান্দা যে কাজ করতে সমর্থ নয়, সেই কাজের দায়িত্ব তার উপর চাপানো—যা করার ক্ষমতাই নেই তা করতে বলা কঠোরতার উপর কঠোরতা আরোপ। অথচ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে তাঁর বান্দাদের জন্যে কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করাকে নিজের থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের কথা আর-ও একটি দিক দিয়ে বাতিল প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে, যে লোক নিজেকে কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেকে নির্মমভাবে কষ্ট দেয়, যেমন রোযা রেখে কঠিন কষ্টের মধ্যে নিজেকে ফেলে, আল্লাহ্ তার নিকট সে কাজ চান না। বান্দা তা করুক, আল্লাহ তা আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি তাতে বান্দার প্রতি একবিন্দু খুশী হবেন না। উক্ত আয়াতের এটাই বক্তব্য।

কিন্তু 'জবরীয়া' গোষ্ঠী মনে করে যে, বান্দা যত কুফর ও নাফরমানীর কাজ-ই করুক, আল্লাহ তা-ই তাদের নিকট চান। কিন্তু এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বান্দা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করুক, তা তিনি কিছুতেই চাইতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র উক্ত আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, যেন তারা তাঁর হামদ করে, তাঁর শোকর আদায় করে। তারা তাঁর প্রতি কুফর করে পরিণামে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য হোক, তা তিনি কিছুতেই চাইতে পারেন না। কেননা এটা যে চাইবে, সে সহজতা চাইতে পারে না। সে কঠোরতা চায় বলে বোঝা যাবে। সেজন্যে সে হামদ ও শোকর পেতে পারে না। আয়াতটি এসব দিক দিয়ে 'জবরীয়া' মতের লোকদের কথাকে মিথ্যা, বাতিল ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে। কেননা ওরা আল্লাহ্‌র প্রতি

এমন 'সিফাত' বা 'গুণ' আরোপ করেছে, যা তাঁর নেই বলে তিনি নিজে ঘোষণা দিয়েছেন। সে 'গুণ' তার জন্যে শোভন নয় বলে তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ -

এবং যেন তোমরা ইদ্দতটি পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র তকবীর কর যেমন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, 'যেন তোমরা 'ইদ্দত' পূর্ণ কর'—এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হল, রমযানের নতুন চাঁদ যদি দেখা না যায়, তা হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ ধরতে হবে। এই কথাটি রাসূলের একথার ভিত্তিতে বলা যে, তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে এবং রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। যদি ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে তোমরা ত্রিশ দিনের ইদ্দত পূর্ণকর। অর্থাৎ চাঁদ অদৃশ্য থেকে গেলে ত্রিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এ থেকে রমযানের কাযা একসাথে কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখার ইখতিয়ারও বোঝায়। শুধু সংখ্যাটি পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা আছে। কেননা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই মেয়াদটা পূরণ করাই কর্তব্য। আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে রোযা রেখেও মেয়াদ পূর্ণ হতে পারে; একটা পরপর রেখেও মেয়াদ পূর্ণ করা যেতে পারে। আর তাৎক্ষণিকভাবেই কাযা শুরু করতে হবে, তাও ওয়াজিব নয়। কেননা মূল মেয়াদটা পূর্ণ করাই যখন লক্ষ্য, তখন যেভাবে রোযা রেখেই পূর্ণ করা হোক, তা-ই গৃহীত হবে। তা তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করা হোক বা কিছুদিন পর ভেঙ্গে ভেঙ্গে করা হোক, কি এক সাথে ও একটানাভাবে রাখা হোক, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। মোট সংখ্যক রোযা রাখা হলেই হল। উপরন্তু রোযা বিলম্বে কাযা করলে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। না-রাখা রোযাগুলো কাযা করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই, কেননা আল্লাহ্ চান ইদ্দত পূর্ণ হওয়া। আর তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তার উপর ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক বললে কুরআনের মূল দলীলের উপর কথা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যা চাওয়া হয়নি তা-ই প্রমাণ করা হয়। যে লোক রমযান মাসে ত্রিশ দিন রোযা রাখেনি তার পক্ষে ঊনত্রিশ দিনের এক মাসব্যাপী রোযা রাখা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ্ 'ইদ্দত পূর্ণ' করতে বলেছেন, ঊনত্রিশ দিনে ইদ্দত পূর্ণ হয় না। একদিন কম থেকে যায়, 'ইদ্দত পূর্ণ কর' কথাটি সংখ্যাগত পূর্ণতার দাবি রাখে। কম সংখ্যক দিনের একমাস রোযা রাখলে জায়েয হবে বলে যারা দাবি করেছেন, তাদের দাবি আয়াতের হুকুমের বিপরীত।

এ-ও বোঝা যায় যে, এক জনপদের লোকেরা যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঊনত্রিশটি রোযা রাখে এবং অপর জনপদের লোকেরা যদি চাঁদ দেখেই ত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে ঊনত্রিশটি যারা রেখেছে তাদেরকে আর একটি রোযা কাযা করতে হবে আল্লাহ্‌র 'এবং যেন তোমরা ইদ্দত পূর্ণ কর' আদেশের কারণে।[১] কেননা রমযান মাস ত্রিশ দিনের বোঝা

১. আগেই বলেছি, চাঁদ দেখেই যদি ঊনত্রিশটি রোযা রাখে, চাঁদ দেখে রাখা শুরু করে ও চাঁদ দেখে রোযা বন্ধ করে, তাহলে রোযা ঊনত্রিশটি বুঝতে হবে। তার কাযা করতে হবে কেন?

গেছে সেই জনপদের লোকদের জন্যে। অতএব উনত্রিশটি রোযা রাখা লোকদের জন্যে ত্রিশ সংখ্যাপূর্ণ করা কর্তব্য। কেননা একই জনপদের—দেশের কতক লোক উনত্রিশটি আর অপর কতক লোক ত্রিশটি রোযা রাখবে—এই ব্যবস্থা তো দেন নি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং যেন তোমরা তকবীর কর আল্লাহ্‌র যে জিনিসের উপর তকবীর করতে তিনি তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন।'

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা যখন শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর এ তকবীর করতে থাকবে ঈদের শেষ পর্যন্ত। তা এজন্য যে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং যেন তোমরা ইদ্দত পূর্ণ কর ও আল্লাহ্‌র তকবীর কর সেই জিনিসের উপর যার হেদায়েত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন'। ইমাম জুহরী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন তকবীর বলতেন ঈদের নামাযের জন্যে যাওয়ার পথে এবং নামায শেষ হলে তাকবীর বলাও বন্ধ করে দিতেন। হযরত আলী, কাতাদাতা, ইবনে উমর, সাঈদ, ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া, আল-কাসিম, খারেজাতা ইবনে জায়দ, নাফে ইবনে যুবায়র, ইবনে মুতঈম প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ঈদের দিনের তকবীর বলতেন নামাযের জন্যে যাওয়ার সময়। জায়েদ ইবনুল মুতামির আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈদুল আযহার দিন তার খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ তাকবীর বলছিলেন। এভাবেই তিনি 'জাবানাতা' নামক স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন।

ইবনে আবূ যিব শুবা মওলা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে ঈদের নামাযের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি শুনতে পেলেন, লোকেরা তাকবীর বলছে। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, লোকদের অবস্থা কি ? ইমাম কি তাকবীর করেছেন ? আমি বলছিলাম, না, তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি শুষ্ক হয়ে গেছে ?

এ হাদীসে ইবনে আব্বাস নামায পড়তে যাওয়ার পথে তাকবীর বলাকে অপসন্দ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আয়াতে যে তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, নামাযের খুতবায় ইমাম যে তাকবীর করেন, তা। তখন জনগণেরও উচিত ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীস ঃ 'মুসলমানরা যখন শওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন ঈদ শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতে থাকা তাদের কর্তব্য। এতে খুব জোরে বা উচ্চস্বরে তাকবীর করতে হবে এমন কোন প্রমাণ নেই। মনে মনে তাকবীর বলাকেই তিনি মনে করেছেন হয়ত।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন যখন নামাযের জন্যে যেতে থাকতেন, তখন তিনি তাকবীর বলতেন। বলতেন উচ্চস্বরে। আর বলতে বলতেই নামাযের স্থানে পৌছে যেতেন। জায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। কুরআনের তাকবীর বলার আগে ঈদুল ফিতরের তাকবীর বলে পালন করতে হবে বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন।

আল-মুয়াল্লা আবূ ইউসূফ ও আবূ হানীফার মত বর্ণনা করে বলেছেন, ঈদুল আযহায় যে লোক ঈদের নামাযে যাবে, সে তাকবীর বলবে এবং উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। ঈদুল ফিতরে তাকবীর বলবে না। আবূ ইউসূফ বলেছেন, ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিতর উভয়েই তাকবীর বলবে। তাকবীর কোন সময় নির্ধারিত নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ যেন তোমরা তাকবীর কর আল্লাহ্র—যেমন তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন কথাটিতে কোন সময় নির্ধারিত নয়।

আমর বলেছেন, দুই ঈদে তাকবীর বলা সম্পর্কে আমি ইমাম মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তাকবীর করবে, আমাদের মত-ও তাই, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফার এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, দুই ঈদে পথে পথে তাকবীর বলা ফরয নয়, নামাযের স্থানেও ফরয নয়। শুধু ঈদের নামাযে তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাহাভী উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবূ ইমরান আমাদের সকল ফিকাহবিদের এই মত জানিয়েছেন যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়া কালে পথে পথে নামাযের স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলা ও বলতে থাকা তাঁদের মতে সুন্নাত। আল-মুয়াল্লাহ তাঁদের যে মতের উল্লেখ করেছেন, তা আমরা জানি না, তার সাথে আমরা পরিচিত নই। আওজায়ী ও মালিক বলেছেন, উভয় ঈদেই নামাযের স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলবে ঘর থেকে বের হয়ে। ইমাম মালিক বলেছেন, মুসল্লায় বসেও তাকবীর বলবে ইমামের আসার সময় পর্যন্ত। ইমাম উপস্থিত হলে (কিংবা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে) তাকবীর বলা বন্ধ করবে। ফিরে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ঈদুল ফিতরের রাতে ও কুরবানীর রাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা আমি পছন্দ করি, তার পরও সকাল বেলা নামাযের স্থানে যাওয়ার সময় পথে ও সে স্থানে পৌঁছার পর ইমামের দাঁড়ানোর সময় পর্যন্ত তাকবীর বলা খুবই পছন্দনীয় কাজ। অপর এক স্থানে বলেছেন, ইমামের নামায শুরু করার সময় পর্যন্ত তাকবীর বলতে থাকতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র তাকবীর অর্থ আল্লাহ্র বিরাটত্ব, মহানত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা। তা তিনটি দিক দিয়ে বাস্তবায়িত হতে পারে। মনের দৃঢ়তা ও স্থিতি, মুখের কথার মাধ্যেমে উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বাস্তব কাজ। মনের দৃঢ়তা, হচ্ছে, আল্লাহ্র তওহীদ—সার্বিক একত্ব ও অনন্যতা, তাঁর ন্যায়পরতা এবং তাঁর সম্পর্কে নির্ভুল সুস্থ পরিচিতি লাভ। সকল প্রকার শোবাহ-সন্দেহের অপনোদন ও অবসান। মুখের উচ্চারণের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র উচ্চতর গুণাবলীর দ্বিধাহীন স্বীকৃতি, তাঁর পবিত্র সুন্দর নামসমূহের স্বীকৃতি এবং তিনি নিজেই নিজের যে সব প্রশংসা প্রকাশ করেছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া। আর বাস্তব কাজ বলতে বোঝায় তাঁর ইবাদত, দৈহিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত আমল। যেমন নামায ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয যথারীতি পালন। প্রথমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত না হলে এবং তা বর্ণিত মাত্রায় না হলে দৈহিক আমল আল্লাহ্র নিকট স্বীকৃতব্য হবে না। আর এই সমস্ত কাজ-ই হতে হবে আল্লাহ্র আদেশ ও বিধান অনুযায়ী। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا -

আর যে লোক পরকাল পেতে চাইবে এবং সে জন্যে তার উপযোগী চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে ঈমানদার হওয়া অবস্থায়, এদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই গ্রহণীয় হবে।

আল্লাহ্র আদেশ ও বিধানের আনুকূল্য লাভের প্রথম শর্ত হচ্ছে পরকাল পাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ও বাসনা। এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি। আমলটা হতে হবে একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যে—এটাও বলা হয়েছে। আর 'আমল' বলতে যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা বুঝিয়েছে, যা-ই মানুষ জীবনব্যাপী করে। আর এ সব কিছুকে যুক্ত করা হয়েছে ঈমানের শর্তের সাথে। বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 'সে মুমিন হয়ে আছে।' এরপরই আল্লাহ্র ওয়াদার উল্লেখ হয়েছে, সে ওয়াদার মূল কথা হচ্ছে—এসব আমল তারই জন্যে গৃহীত হবে, যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি। তাই আল্লাহ্র নিকট দাবি করা হয়েছে, তিনি যেন আমাদেরকে এই আয়াতের উপযুক্ত পাত্র বানান। তিনি যেন আমাদেরকে সেই সেই কাজ করার তওফীক দেন, যা তার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে উপযুক্ত করে দেবে।

আল্লাহ্র তাকবীর-এ যখন এত সব তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তখন আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে, 'তওহীদের আকীদা' আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও রাসূলের প্রতি ঈমান—আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রধান শর্ত। তা বিশেষ কোন ধরনের ইবাদতের সাথে বিশেষীকৃত নয়। এ-ও জানা আছে যে, যেসব ফরয কাজ অন্যান্য কারণের সাথে সম্পর্কিত তা শুধু রমযানের রোযার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রমাণিত হল যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্র যে বিরাটত্ব প্রকাশের উল্লেখ হয়েছে, তা রমযানের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আর তন্মধ্যে উত্তম পন্থা হচ্ছে 'তাকবীর' শব্দ প্রকাশ ও উচ্চারণ করা। মানুষ মনে মনেও আল্লাহ্র 'তাকবীর' করতে ও বলতে পারে। পারে শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখার সময় তাকবীর বলতে। আর নামাযের জন্যে চলে যাওয়াও 'তাকবীর' করার অর্থ হতে পারে। আগের কালের বহু তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঈদের নামাযের মধ্যে যে তাকবীর বলা হয়, তা-ও এর অর্থ হতে পারে। শব্দে এ সব অর্থেরই সম্ভাব্যতা বর্তমান। কোনটাকে বোঝাবে, কোনটাকে বোঝাবে না, এমন কোন প্রমাণ-ই এখানে নেই। তাই এর যেটাই করা হবে তদ্দ্বারাই আয়াতের দাবি পূরণ হবে। তার দৃষ্টিকোণে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তা ওয়াজিব বা ফরয—এ কথার কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ 'এবং যেন তোমরা আল্লাহ্র তাকবীর কর' ওয়াজিব ফরয প্রমাণ করে না। তা নফলও হতে পারে। আমরা তো নফল হিসেবেও আল্লাহ্র তাকবীর করি, তাঁর তাজীম করি। তাকবীর উচ্চস্বরে প্রকাশ করা যে ওয়াজিব বা ফরয নয়, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। যদি কেউ তাকবীর বলে তবে তা তার খুব পছন্দ বলেই বলে। তা সত্ত্বেও অতি সাধারণভাবে যখনই তাকবীর

নাম করা যায়, এমন কিছু কেউ করবে, সে-ই আয়াতের দাবি অনুযায়ী কাজ করল, বুঝতে হবে।

তবে নবী করীম (স)-এর প্রাথমিক কালের অগ্রবর্তী মুসলিমগণ এবং তাবেয়ীদের তাকবীর বলা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে—ঈদুল ফিতরের দিন নামাযে যাওয়ার পথে পথে তাকবীর বলা পর্যায়ে, তা-ই সম্ভবত আয়াতের আসল বক্তব্য বলে তাঁরা মনে করেছেন। এ থেকেও প্রকাশিত হয় যে, এই তাকবীর বলা নিঃসন্দেহে অতি পছন্দনীয়—কাজ মুস্তাহাব। তবে ওয়াজিব ফরয নয়, একথা নিশ্চিত।

ইবনে আবূ ইমরান উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবে এবং হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদের মতে তা খুবই উত্তম কাজ। কেননা নবী করীম (স) থেকে জুহরীর সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে, যদিও হাদীসটির সূত্রে 'মুরসাল'—অর্থাৎ সনদে সাহাবীর নামের উল্লেখ নেই। আগেরকালের ফিকাহবিদদেরও এই মত জানা গেছে। কেননা এ মতই আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। 'ইদ্দত' অর্থাৎ রমযানের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় তাকবীর হওয়াই আয়াতের দাবি। আর সে জন্যে ঈদুল আযহা অপেক্ষা ঈদুল ফিতর-ই অধিক উপযুক্ত সময়। আর ঈদুল আযহায় তাকবীর বলা যখন তাঁরা সুন্নাত মনে করেন, তখন ঈদুল ফিতর-এও সুন্নাত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা দুই ঈদের নামাযের মধ্যে তাকবীর বলার দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। দুটিতেই নামাযের পর 'খুতবা' দেয়া হয়। সে দুটির সব সুন্নাত কাজের পরই তা করা হয়। অতএব সে দুই নামাযের জন্যে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা অবশ্যই সুন্নাত হবে।

জবরীয়া গোষ্ঠীর মত এ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। কেননা আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্র শরীয়াত পালনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট ইদ্দতের পূর্ণতা চেয়েছেন, সহজতা চেয়েছেন। চেয়েছেন, তারা যেন তাঁর তাকবীর বলে ও তাঁর হামদ করে, শোকর করে তাঁর নিয়ামত পাওয়ার দরুন। তাঁর হেদায়েত পাওয়ার কারণে। তিনিই এসব ইবাদতের পথ দেখিয়েছেন। এসব ইবাদত করেই তারা অফুরন্ত সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। তিনি সকলের নিকট থেকেই এসব ইবাদত আনুগত্য পেতে চেয়েছেন। চেয়েছেন শোকর। যদিও তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাফরমান লোকও রয়েছে। অতএব এ আয়াত প্রমাণ করেছে যে, কেউ তাঁর নাফরমানী করুক, তা তিনি চান নি। তাঁর ফরয ও আদেশসমূহ তরক করুক তা-ও তিনি চান নি। বরং চেয়েছেন, সকলেই তাঁর হুকুম পালন করুক, তাঁর আনুগত্য করুক। তাঁর শোকর আদায় করুক। মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও তাই বলে। বান্দার নিকট যা চাওয়া হয়েছে, তা যদি সে করে, তা হলেই আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ হয়, তাঁর আদেশ পালিত হয়। আল্লাহ্ যদি বান্দার নিকট নাফরমানীই চাইতেন, তাহলে তো তাঁর নাফরমানরাই তাঁর অনুগত ও তাঁর আদেশ পালনকারী সাব্যস্ত হতো। অতএব আয়াতের বক্তব্য ও বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য নেই।

রমযানের রোযার রাত্রে পানাহার ও যৌন সঙ্গম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।

পরে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

পরে তোমরা রাত্র পর্যন্ত সিয়ামকে সম্পূর্ণ কর।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম দিক দিয়ে রোযায় তা-ই ফরয ছিল। যেমন বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।

তখন প্রতি মাসের তিনদিনের রোযা ফরয ছিল। তাতে সন্ধ্যাকালীন নামাযের সময় থেকে পরের দিন পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম সম্পূর্ণ হারাম ছিল। এই বর্ণনাটি আতীয়া কর্তৃক ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বলা হয়নি যে, তা প্রথম রোযায় ছিল। আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যার নামায হয়ে গেলে মানুষ যখন ঘুমাতো, তখন তার উপর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হয়ে যেত। দহাক বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যার নামায থেকেই তাদের উপর এই সবই হারাম হয়ে যেত। মুয়ায থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের উপর তা হারাম হতো ঘুমাবার পর। ইবনে আবূ লায়লা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন, একজন আনসার ব্যক্তি কিছু খায়নি, পান করেনি, ঘুমিয়ে পড়েছে, সকাল পর্যন্ত রোযা রয়েছে। এতে রোযা রাখা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে দেখা দিল। হযরত উমর (রা) নিদ্রা যাওয়ার পর সঙ্গম করেছিলেন বলে অপরাধী মনে রাসূলের নিকট উপস্থিত হল। পরে সব কথা তিনি রাসূলের নিকট প্রকাশ করলেন। অতপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

তোমাদের জন্যে রোযার রাত্রে স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে দ্বারা রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হওয়ার গোটা বিধানই মনসূখ হয়ে গেছে।

আয়াতের اَلرَّفَثُ শব্দের অর্থ اَلجِمَاعُ স্ত্রী সঙ্গম। ইল্‌মওয়ালাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনই মতপার্থক্য নেই। অবশ্য اَلرَّفَثُ শব্দটির আরও অর্থ আছে। তা যেমন স্ত্রী সঙ্গম

বোঝায় তেমনি নির্লজ্জ অশ্লীল কথাবার্তাও বোঝায়। তবে তার ইঙ্গিতমূলক অর্থ সঙ্গম। এ শব্দটি সঙ্গমের দিকেই ইঙ্গিত করে। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ 'অতঃপর না সঙ্গম করা যাবে, না ফিসক ফুজুরী করা যাবে।' অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট গমন ও সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ বোঝায়। العجاج। বলেছেন, رفث নিরর্থক বেহুদা কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা বোঝায়। আয়াতের উত্তম অর্থ হচ্ছে, আসল স্ত্রী সঙ্গম, কেননা কথাবার্তার অশ্লীলতা মুবাহ নয়, স্ত্রীর নিকট গমন করলেই সঙ্গম হবে, তার সাথে রোযার কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বেও ছিল না। এখনও তা নয়। বরং তার অর্থ স্ত্রী সঙ্গম। তা-ই তা তখন নিষিদ্ধ ও হারাম ছিল সকলের প্রতি। শেষে নাযিল হওয়া আয়াত দ্বারা তা হালাল ও মুবাহ করা হয়েছে, আগের নিষেধ মনসূখ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ –

স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, তোমরা তাদের জন্যে ভূষণ।

অর্থাৎ পোশাক পরিধান যেমন তোমাদের জন্যে মুবাহ্, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়াও তেমনি মুবাহ।

لبس শব্দের অর্থ ستر আবরণ-ও হতে পারে। কেননা পোশাক তা-ই যা লজ্জাস্থান আবৃত করে। আল্লাহ রাত্রিকে لباس বলেছেন। কেননা তা সব কিছু আবৃত করে দেয়। অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার দরুন কিছুই দেখা যায় না। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্যে আবরণ। যাবতীয় নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে আবৃত ও অপ্রকাশিত রাখে। প্রত্যেকেই অপরের দ্বারা পবিত্র থাকতে পারে। পারস্পরিক নির্লজ্জতাকে অন্যান্য লোকের চোখের আড়ালে রাখতে পারে। আল্লাহ্র কথা ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ –

আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের আচরণ করছিলে।

আয়াতে যে অবস্থাকে সামনে রেখে কথা বলা হয়েছে, সেই অবস্থারই বর্ণনা হয়েছে এই কথাটিতে। রাত্রিকালে সঙ্গম মুবাহ করে আমাদের সংকট দূর ও হালকা করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি নিয়ামত দানের কথা বুঝিয়েছেন। এর দ্বারা রোযার রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল ও মুবাহ করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যে তিনি আমাদের নিকট শোকর দাবি করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের আচরণ করছিলে।' অর্থাৎ তোমরা রোযার রাত্রিসমূহে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম করে নিষিদ্ধ কাজ করতে বলে মনে ধারণা করতে। যেমন বলা হয়েছে ঃ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ। 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করছ।' অর্থাৎ 'পরস্পরকে হত্যা করছ।' এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজকে বিশ্বাস ভঙ্গকারী মনে করছিল। এতে নিজের

প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গকারী বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এই কাজের ক্ষতিটা নিজেরই সাধিত হতো। এ-ও হতে পারে যে, তার অর্থ হচ্ছে, নিজের নিকট অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজটি করে ঠিক বিশ্বাস ভঙ্গকারীর ন্যায় কাজ করেছে। 'খিয়ানত' অর্থ পারস্পরিক আবৃত রাখার দিক দিয়ে অধিকার ক্ষুণ্ন করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ فَتَابَ عَلَيْكُمْ 'অতপর তিনি তোমাদের প্রতি 'তওবা' করেছেন। 'এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি—তাদের নিজেদের জন্যে খিয়ানত থেকে তওবা করাকে কবুল করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমাদের বোঝা হালকা করা, তোমাদের জন্যে রুখসত ও মুবাহ্ করে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ –

আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা কক্ষণই তা গণনা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি তওবা করেছে (অনুগ্রহ করেছেন)।

অর্থাৎ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করেছেন। ভুলবশত হত্যা সংক্রান্ত হুকুমের পর পরই যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ –

যে লোক তা পাবে না, তাকে পর পরই একটানা দুই মাস রোযা থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র দিক থেকে তওবা স্বরূপ।

এটা আল্লাহ্‌র দিক থেকে বান্দার উপর অর্পিত বোঝা হালকাকরণ পর্যায়ে গণ্য। কেননা ভুলবশত হত্যাকারী ব্যক্তি এমন গুনাহ করেনি, যার জন্যে তাকে তওবা করতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَفَا عَنْكُمْ এবং তিনি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এই মাফ গুনাহের মাফী হতে পারে, যে গুনাহ্ তারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে করেছে। পরে তারা যখন নতুন করে খিয়ানত থেকে তওবা করেছে তখন তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যে কাজকে মুবাহ বানিয়ে দিয়েছেন, তার দ্বারা তিনি কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকতা ও সহজতা এনে দিয়েছেন, কেননা অভিধানে العفو। শব্দের অর্থ 'সহজতা বিধান' লেখা হয়েছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ –

সময়ের প্রথম দিকটায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং সময়ের শেষ ভাগ আল্লাহ্‌র ক্ষমা।

অর্থাৎ সময়কে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সময়ের শেষভাগে কাজ করার সুযোগ দিয়ে সহজতার বিধান করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ 'এক্ষণে তোমরা সঙ্গম করতে পার।' অর্থাৎ পূর্বে রাত্রিবেলায়ও যে সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে তা মুবাহ করা হয়েছে। المباشرة। শব্দের

অর্থ চামড়ার সাথে চামড়া মিলিত হওয়া। এখানে এ শব্দটি ইঙ্গিতমূলকভাবে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সঙ্গম বুঝিয়েছে। জয়ন ইবনে আসলাম বলেছেন। 'আল মুবাশিরাতু' বলতে পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার ও সঙ্গম করা বোঝায়। কেননা তাতে একজনের চামড়ার সাথে অন্যজনের চামড়া মিলিত হয়। আল-হাসান বলেছেন ঃ المباشرة النكاح। 'মুবাশিরাত' অর্থ 'বিয়ে', মুজাহিদ বলেছেন, যৌন সঙ্গম। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ -

এবং তোমরা তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে না মসজিদে ইতিকাফে থাকা অবস্থায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ -

এবং সন্ধান কর—পেতে চাও তা যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন।

আবদুল ওহহাব তাঁর পিতার সূত্রে ইবনে আব্বাস-এর এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ এর অর্থ সন্তান। মুজাহিদ, হাসান, দহাক ও আল-হিকামও এরূপ বলেছেন। মুয়ায ইবনে হিশাম, তাঁর পিতা, আমর ইবনে মালিক আবুল জাওয়া ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে কদর রাত্রি। কাতাদাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্র লিখে দেয়া রুখ্সত—সুযোগ-সুবিধা।

আবূ বকর বলেছেন, এখন তোমরা 'মুবাশিরাত' পরস্পর মিলমিশ কর বলে যদি যৌন সঙ্গম বুঝিয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ্র কথা ঃ 'সন্ধান কর আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখেছেন তা-এর অর্থ নিশ্চয়ই যৌন সঙ্গম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাতে একই কথা একই সম্বোধনে পুনর্বার বলায় দোষ হয়। আমাদের পক্ষে প্রত্যেকটি শব্দের নবতর যে অর্থ গ্রহণ সম্ভব হবে তাই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। একটি ফায়দার জন্যে একাধিক শব্দের ব্যবহার বৈধ নয়। আল্লাহ্র কথা ঃ 'এখন তোমরা মুবাশিরাত কর' সঙ্গম মুবাহ বুঝিয়েছে। কাজেই তার পরবর্তী 'আল্লাহ যা তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন তার সন্ধান কর' এর অর্থ অন্য কিছু হতে হবে। তাই এর অর্থ কদর রাত্রিও হতে পারে। ইবনুল জাওয়া ইবনে আব্বাস থেকে এ কথার বর্ণনা করেছেন। কিংবা হতে পারে 'সন্তান'। যেমন তা ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত। অন্যদের কাছ থেকেও এর বর্ণনা পাওয়া গেছে—পূর্বে তাদের উল্লেখ করেছি। কিংবা অর্থ হতে পারে 'রুখ্সত'। তা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের এই সব অর্থই যখন হতে পারে—সে সম্ভাব্যতা না থাকলে আগেরকালের মনীষীরা এসব অর্থ নিশ্চয়ই বলতেন না—তাই এ সব অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছণীয়। আল্লাহ্ এই সব কয়টি কথাই বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করতে হবে। তাহলে ব্যবহৃত শব্দে কদরের রাত্রি অর্থ হওয়ার সম্ভাব্যতা রয়েছে, যা রমযান মাসে পাওয়া যায়। আল্লাহ্র দেয়া রুখসতও বোঝাতে পারে। সন্তান চাওয়ার নির্দেশও হতে পারে। বান্দা এ কয়টির মধ্যে থেকে যেটাই চাইবে, সেটাই পেতে চাইলে সে সওয়াবের

অধিকারী হবে। আর সন্তানের সন্ধান করার আদেশ হলে তা হবে সেই হাদীসেরই কথা, যা নবী করমী (স) বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَانِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –

তোমরা বিয়ে করবে প্রেমময়ী অধিক সন্তানদায়িনী নারী। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অপরাপর উম্মতের উপর গৌরব প্রকাশ করব।

যেমন হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন তাঁকে একটি সন্তান দানের জন্যে। বলেছিলেন ঃ

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ –

হে আমার রব্ব! আমাকে তোমার নিকট থেকে একজন ওলী দাও, যে ইয়াকুব বংশধর থেকে আমার উত্তরাধিকারী হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا 'এবং তোমরা খাও, পান কর।' খাওয়ার নিষেধ থেকে মুক্তি দান করা হয়েছে একথা বলে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ –

নামায সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধান কর।

যেমন বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যখন তোমরা ইহরাম থেকে বের হয়ে আসবে, তখন শিকার করা তোমাদের জন্যে মুবাহ।

নিষেধের পর মুবাহ করে দেয়ার পর্যায়ে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিপুল রয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের নির্দেশটি মুবাহ্ পর্যায়ের কাজের জন্যে। তা করা ওয়াজিব নয়। মুস্তাহাব-ও নয়। আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ –

এ কাজের সুযোগ থাকবে অন্ধকারের বুক থেকে ফজরকালীন আলোর সাদা রেখার স্ফূরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ফজরের সময়কালীন অন্ধকারের বুক থেকে আলোর শ্বেত রেখা স্ফূরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম সম্পূর্ণ মুবাহ।

বর্ণিত হয়েছে—কিছু সংখ্যক লোক উক্ত আয়াত থেকে আসল কালো সূতা ও সাদা

সূতা মনে করেছিলেন এবং তার একটি অপরটি থেকে স্পষ্ট হওয়ার কথা বুঝেছিলেন। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) তাঁদের একজন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দাস, হুসায়ন ইবনে নুসায়র, আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, ইবনে ইদরীস, হুসায়ন, শবী, আদী ইবনে হাতিম সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন আমি সাদা ও কালো সূতা গ্রহণ করলাম এবং তা আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। আমি তা তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু আমার নিকট কিছুই স্পষ্ট হল না। পরে আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন, তাহলে তোমার বালিশ তো খুব লম্বা-চওড়া মনে হয়। আসলে বলা হয়েছে রাত্র ও দিনের কথা। উসমান বলেছেন, আসলে আয়াতে রাতের অন্ধকার ও দিনের শ্বেত শুভ্র রেখা বোঝানো হয়েছে।

বলেছেন, আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামী, আবূ উবায়দ, ইবনে আবূ মরিয়াম, আবূ গাসান মুহাম্মাদ ইবনে মতরফ, আবূ হাজিম, সহল ইবনে সায়াদাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র উক্ত কথাটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন مِنَ الْفَجْرِ। অংশটি নাযিল হয়নি। পরে যখন লোকেরা রোযা রাখার ইচ্ছা করল, তখন তারা সাদা সূতা ও কালো সূতা নিজেদের পায়ে বেঁধে নিত। তার পর নির্বিকার নিশ্চিতভাবে পানাহারে মশগুল হতো। তারপরে مِنَ الْفَجْرِ। অংশ নাযিল হয়। তাতে তারা জেনে গেল যে, আসলে তার অর্থ রাত ও দিন।

আবূ বকর বলেছেন, যখন এই مِنَ الْفَجْرِ। অংশ নাযিল হল তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর কারোর মনে আর কোন সংশয় বা দ্বন্দ্ব সন্দেহ থাকল না, সকলেই বুঝলেন, এ আসল সূতার কথা নয়। ফজরকালীন অন্ধকার ও আলোর ব্যাপার মাত্র। যারা প্রকৃত সূতা মনে করেছেন, যেমন হযরত আদী, তাঁরা পূর্বে ভুল বুঝেছিলেন। এই বোঝায় তাঁদের কোন দোষ নেই। কেননা আসলে الخيط। বলতে তো সূতাই বোঝায়। কিন্তু আয়াতে শব্দটি প্রত্যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, পরোক্ষ ও ইঙ্গিতমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-ও হতে পারে যে, কুরায়শদের ভাষায় এবং আয়াতটির নাযিল হওয়ার সময় যাঁরাই রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলেরই ভাষায় সূতা বুঝিয়েছে। আদী ইবনে হাতিম এবং অন্যান্য যাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল, তাঁরা সে ভাষা জানতেন না। কেননা সব আরবরা সব ভাষাই বুঝবেন, এমন কথা নেই। তা সত্ত্বেও হতে পারে, তাঁরা خيط-এর প্রকৃত অর্থ সূতা এবং দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকারের পরোক্ষ অর্থ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেটিকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে যখন তাঁরা নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্‌র কথার আসল তাৎপর্য। আর তার পরই مِنَ الْفَجْرِ। অংশ নাযিল হয়েছিল। ফলে সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে গেল। আর শব্দের অর্থ হিসেবে স্থির হল রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের সময়েও এই শব্দ বলে রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো-ই বোঝা যেত। কুরআনের পূর্ববর্তী ভাষায়ও এই অর্থের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আবূ উবায়দাতা মামর ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ الخيط الابيض। অর্থ, সকাল প্রভাত কাল এবং الخيط الاسود। অর্থ রাত। আর الخيط। অর্থ রঙ বা বর্ণ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, রাতকে সাদা সূতার সাথে তুলনা করা হল কিভাবে ? রাত তো সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে। আমরা জানি সকালকে সূতার সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্যে যে, তা দিগন্তে বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রশস্ত। কিন্তু রাত ও সূতার পারস্পরিক কোন সাদৃশ্য নেই।

জবাবে বলা যাবে, কালো সূতা সেই কালো, যা সে স্থানে রক্ষিত, যা তাতে সাদা সূতার প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ছিল। তা সেই স্থানে সে সাদা সূতার সমান, যা তার পরে প্রকাশিত হয়। এ কারণে তার নাম দেয়া হয়েছে কালো সূতা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রোযাদারের প্রতি পানাহার হারাম হওয়ার সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ হাম্মাদ ইবনে জায়দ আবদুল্লাহ ইবনে সওয়াদাতা আল-কুশায়রী তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি সমুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) -কে খুতবায় বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْاُفُقِ الَّذِيْ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيرَ -

বিলালের আযান এবং দিগন্তের শ্বেত শুভ্রতা বিস্তীর্ণ হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে নিষেধ করবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা মুলাজিম ইবনে আমার আবদুল্লাহ ইবনে নুমান-কায়স ইবনে তালক তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ -

তোমরা শেষ রাতে পানাহার কর, উচ্চ হয়ে আসা আলোক রেখা তোমাদেরকে কস্মিন কালেও পথ দেখাবে না। অতএব তোমরা লাল বর্ণ সম্মুখে আসা পর্যন্ত পানাহার চালাতে থাক।

এই হাদীসে الاحمر। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর শ্বেত ফজর দিগন্তে দেখা দেয় লাল বর্ণের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে এবং সেই লাল বর্ণ দেখা দেয়ার সময় রোযাদারের প্রতি পানাহার হারাম হয়ে যায়, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) থেকে আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّمَا هُوَ بِيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ -

তা আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকার।

এ বর্ণনায় লাল বর্ণের উল্লেখ নেই। যদি বলা হয়, হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ,বলেছেন ঃ

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نَهَارًا اِلاَّ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ -

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে একত্রে সেহরী খেয়েছি, তখন দিন, তবে সূর্যের উদয় হয়নি।

এর জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটি হুযায়ফা থেকে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এটি একটি খবরে ওয়াহিদ। তা নিয়ে কুরআনের উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না। আল্লাহ্‌র কথা হল ঃ 'যতক্ষণ না শুভ্র রেখা কালো রেখা থেকে স্ফুরিত হবে ফজরের সময়ে। কাজেই রোযা রাখা ও পানাহার থেকে বিরত হওয়া উচিত ফজরের সময়কালীন শুভ্রতা প্রকাশিত হওয়ার সময়। আর হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস যদি প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ধরা হয়, তাহলে কুরআন যা নিষিদ্ধ করেছে, তা-ই মুবাহ হয়ে যাবে। নবী করীম (স) আদী ইবনে হাতিম বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, তা দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকার। তাহলে রোযায় দিনের বেলায় কি করে পানাহার করা যেতে পারে? অথচ আল্লাহ্ কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত তা হারাম ঘোষণা করেছে। হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস যদি বর্ণনা সূত্রের দিক দিয়ে প্রমাণিতও হয়, তবু ঠিক সেই সময় পানাহার করা জায়েয প্রমাণিত হয় না। কেননা হাদীসে নবী করীম (স) খেয়েছেন, তা তো বলা হয়নি। তিনি নিজে সেই সময় খেয়েছেন বলে খবর দিয়েছে মাত্র। নবী করীম (স)-এর সঙ্গে থাকার কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সে বিষয়ে অবহিত-ও ছিলেন এবং তাঁকে তা করতে অনুমতিও দিয়েছে। নবী করীম (স) তা জানতেন এবং তিনি তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন নি, একথা যদি প্রমাণও হয়, তাহলে বলতে হবে, সেই সময়টা ছিল শেষ রাতে ফজর উদয় হওয়ার নিকটবর্তী আর সেটিকেই তিনি দিন বলেছেন যেমন মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আমর ইবনে মুহাম্মাদ নাকেদ—হাম্মাদ ইবনে খালিদ আল-খাইয়াত-মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ্, ইউনুস ইবনে সায়ফ, হারস ইবনে যিয়াদ, আবূ রহম-ইরবায ইবনে মারিয়াতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কোন এক রমযানে নবী করীম (স) সেহরী খাওয়ার জন্যে আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'বরকতওয়ালা সকালের খাবার খেতে আস। এ হাদীসে সেহরীকে সকাল বেলার খাবার বলেছেন। কেননা সকাল বেলাটা তো অতি নিকটেই ছিল। অনুরূপভাবে হযরত হুযায়ফাও হয়ত সেহরীকে দিনের খাবার বলেছেন। কেননা দিন তো খুব একটা দূরে ছিল না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা ইতিপূর্বে যে আয়াত পাঠ করেছি এবং নবী করীম (স)-এর যে 'তওকীফ'-এর উল্লেখ করেছি, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, রোযা শুরু

করার প্রথম সময় হচ্ছে দ্বিতীয় ফজর সুবহে সাদিক—উদয় হওয়ার সময় যখন উচ্চতর দিগন্তে তা ভেসে উঠে। সুদীর্ঘ ফজর মধ্য আকাশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে। তখনও রাত। আরবরা তাকে ذنب السرحان বলে।

ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে সন্দেহভাজন ব্যক্তির করণীয় ব্যাপারে মনীষিগণ নানা কথা বলেছেন। আবূ ইউসূফ املاء গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, ফজরের উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সেহরী খাওয়া ছেড়ে দেয়া উচিৎ। এটাই আমার পছন্দ। তখন যদি সেহরী শেষ করে, তাহলে তার রোযা সম্পূর্ণ হবে। মূলত এটাই সব ফিকাহবিদের কথা। বলেছেন, তখনও যদি খায়, তা হলে তাকে রোযা কাযা করতে হবে তা নয়। ইবনে সামায়াতা আবূ ইউসূফ থেকে ইমাম আবূ হানীফার এই মত বর্ণনা করেছেন যে, সন্দেহভাজন হয়ে যদি খাবার খায়, তাহলে তাকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, না, সন্দেহ করে খেলেও রোযা কাযা করতে হবে না। আল-হাসান ইবনে যিয়দ আবূ হানীফার এই মত বর্ণনা করেছেন ঃ 'যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, এবং যেখান থেকে সূর্যের উদয় হয় সেই স্থানটি দেখতে পাওয়া যায়, আর সেখানে প্রতিবন্ধক-ও কিছু না থাকে, তাহলে সেখানে ফজর স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার সময় পর্যন্ত পানাহার করবে। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন এ আয়াতে ঃ 'তোমরা খাও, পান কর, যতক্ষণ না তোমাদের সম্মুখে ফজরের শ্বেত শুভ্র রেখা কালো রেখা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।' ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, এমন স্থানে যদি কেউ থাকে, যেখান থেকে ফজর দেখা যায় না, কিংবা রাত্র চন্দ্রোজ্জ্বল বলে ফজর সম্পর্কে সন্দিহান হয়, তাহলে তখন খাবে না। তখন খাবার খেলে সে খারাপই করল। তার জোরদার মত যদি হয় এরূপ যে, সে খেয়েছে, আর ফজর-ও উদয় হয়েছে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে। অন্যথায় কাযা করতে হবে না। সফরে থাকুক; কিংবা নিজ বাড়িতে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। জুফর ও আবূ ইউসূফ-ও এ কথাই বলেছেন। আর আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। সূর্যের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তখনও এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে বলে তাঁরা মত দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, মূলের বর্ণনা ও املاء -এর বর্ণনায় ফজর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে পানাহার করা 'মাকরূহ' এ পর্যায়ে যা বলা হয়েছে, তা আল-হাসান ইবনে যিয়দের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন মনে করতে হবে। কেননা তার শেষ দুটি বর্ণনায় যা অস্পষ্ট ও মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, তাই হাসান ইবনে যিয়দের বর্ণনায় ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিতাবের বাহ্যিক অর্থেরও তা অনুকূল। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রোযায় ফজর উদয় হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করার জন্যে দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তাদের একজন এসে বলল, ফজর উদয় হয়েছে। আর অপরজন বলল, এখনও ফজর উদয় হয়নি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিচ্ছ। এই বলে তিনি সেহরী খেলেন। ইবনে উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপার কেবলমাত্র সেই স্থানের জন্যে প্রযোজ্য যেখানে ফজর উদয় হওয়ার বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারা সম্ভব। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ –

এ আয়াত অনুযায়ী ফজর স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত পানাহার চলতে পারে। তা মুবাহ।

التبين। অর্থ প্রকৃত ইলম লাভ। একথা জানা-ই আছে যে, এ আদেশ কার্যকর হতে পারে কেবল মাত্র সেখানে, যেখানে ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে প্রকৃত ইল্‌ম লাভ করা সম্ভব। কিন্তু রাত্র যদি চন্দ্রোজ্জ্বল হয়; কিংবা হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রাত; অথবা এমন স্থানে হয় যেখানে ফজরের উদয় স্থুল পর্যবেক্ষণই করা যায় না, সেখানে রোযার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। কেননা সেখানে ফজরের উদয় সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। অতএব দ্বীনি কাজের নির্ভুলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এর দলীল শুবা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি ইয়াযিদ ইবনে আবূ মরিয়ম আসসলুলী, আবুল জাওজা আস্‌সাদী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলে করীম (স) থেকে কোন্ কথা স্মরণ করতে পারছেন ? বললেন, তিনি বলেছেন ঃ

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ، فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ –

যাতে তোমার মনে সংশয় জাগে তা ত্যাগ করে যাতে তোমার কোন সংশয় নেই তা-ই গ্রহণ কর। কেননা অস্বস্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা বিধানকারী সংশয়মুক্ত এবং মিথ্যা সংশয়পূর্ণ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে ইউনুস, আবু শিহাব, ইবনে আওন, আওন, শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি নুমান ইবনে বশীরকে বলতে শুনেছি—তারপর আর কাউকে এ কথা বলতে শুনি নাই—তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ وَسَاَضْرِبُ فِيْ ذٰلِكَ مَثَلًا : اِنَّ اللّٰهَ حَمَى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَا حَرَّمَ، وَاِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُخَالِطَهُ، وَاِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَجْسُرَ –

হালাল স্পষ্ট প্রতিভাত, হারামও তাই। এ দুয়ের মাঝখানে বহু বিষয় রয়েছে যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও অস্পষ্ট। এ কথা বোঝাবার জন্যে আমি একটি দৃষ্টান্ত দেব। তা হচ্ছে, আল্লাহ একটি সংরক্ষিত এলাকা রক্ষা করেন। আর আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা

হচ্ছে যা তিনি হারাম করে দিয়েছেন, তা। যে লোক সংরক্ষিত এলাকার পাশে পাশে চলে, তার পক্ষে সংরক্ষিত এলাকার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ার খুব বেশি আশংকা রয়েছে। আর যে লোক সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাবে, তার দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, ইবরাহীম, ইবনে মূসা আর রাযী, ঈসা, জাকারিয়া, আমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি নুমান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে উক্ত হাদীসের কথাগুলো বলতে শুনেছি। তাতে একটু পার্থক্য সহকারে এই কথাটি ছিল ঃ

وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ لَايَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِيْنَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ -

হালাল ও হারামের মাঝে বহু কতগুলো বিষয় সাদৃশ্যপূর্ণ (সংশয়পূর্ণ) রয়েছে। তা বহু লোকই জানে না। তাই যে লোক এই সংশয়পূর্ণ ব্যাপারগুলো থেকে দূরে থাকবে সে তার ইজ্জত-সম্মান ও তার দ্বীনদারীকে রক্ষা করতে পারবে, আর যে লোক সংশয়পূর্ণ কাজ করবে, সে হারামের মধ্যে পড়ে যাবে।

এই সব কয়টি হাদীসই মুমিনকে সংশয়পূর্ণ কাজ করতে নিষেধ করছে। তা মুবাহও হতে পারে। হতে পারে নিষিদ্ধ। অতএব দুটিরই ব্যবহার হওয়া উচিৎ। কাজেই যে লোক সন্দেহে পড়ল, তার পক্ষে ফজরের প্রথম উদয় মুহূর্ত স্পষ্ট দেখার কোন উপায়ই থাকতে পারে না। ফলে সে নিজের দ্বীনদারীও রক্ষা করতে পারে না। পারে না স্বীয় সম্মান রক্ষা করতে। কেননা সে সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে সরে থাকেনি। আল্লাহ্র সংরক্ষিত এলাকায়—নিষিদ্ধ কাজে পড়ে—যেতে পারে। এই কারণে আল্লাহ্র কথা ঃ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ কে আমরা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যার পক্ষে ফজর উদয়ের প্রথম অবস্থা অবলোকন করা সম্ভবপর। আমাদের হানাফী আলিমদের মাযহাব এটাই। উল্লিখিত দলীল সমূহই তাদের প্রমাণাদি। মালিক-ইবনে আনাস বলেছেন, ফজরকালের ব্যাপারে সন্দেহ হলে খাওয়া আমি পছন্দ করি না। যদি খায়, তাহলে তার সেদিনের রোযার কাযা করতে হবে। সওরী বলেছেন, সন্দেহে পড়েও মানুষ সেহরী খাবে ফজর উদয় ও স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, ফজর উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গিয়ে যদি খায়, তাতে তার কোন দোষ হবে না, কাযাও করতে হবে না।

যে লোক বলেছেন যে, সন্দেহে পড়েও লোক সেহরী খাবে, ফজর উদয় হওয়ার সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতার হিসেব না করেই, সে মূল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। কেননা কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর উদয় হওয়া

সম্পর্কে তাকে জানাবার কেউ নেই, তার পক্ষে সন্দেহে পড়ে খাওয়া জায়েয হতে পারে না। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, সে এমন সময় সেহরী খাবে, যখন রীতিমত সকাল হয়ে গেছে। যে লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে রয়েছে, ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে সে সেখানে থেকে কিছুই জানতে পারে না, তার সন্দেহে পড়ে পানাহারে উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়। তা যদি জায়েয মনে করা হয় এবং সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়, তাহলে সর্বস্থানেই সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়া ও পানাহারে উদ্যোগী হওয়া তার কর্তব্য হয়ে পড়ে। ফলে স্ত্রী সঙ্গম ধরনের কঠিন নিষিদ্ধ কাজে বা এ ধরনের অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও অসম্ভব থাকে না। আর তা করা হলে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিরোধিতা করা হবে। তিনি তো সর্ব প্রকারের সংশয়পূর্ণ কাজ এড়িয়ে যেতে বলেছেন, সন্দেহের কাজ পরিহার ও দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ কাজ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তাছাড়া তাতে মুসলমানদের ইজমারও বিরোধিতা করা হবে। কেননা একজন পুরুষ অপরিচিত—তার স্ত্রী রূপে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত নয় এমন নারীর সাথে সঙ্গম করা বা তার স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রেখে কোন নারীর সাথে সঙ্গম করতে উদ্যোগী হওয়া সম্পূর্ণ না-জায়েয—এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে একবিন্দু মতপার্থক্য নেই। যে লোক তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে একজনকে তিন তালাক দেয়, পড়ে সে ভুলে যায় কাকে তালাক দিয়েছে, তা হলে তখন কোন একজন স্ত্রীর সাথেও সঙ্গম করতে উদ্যোগী হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ সম্পূর্ণ একমত। তবে যে স্ত্রী সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান হবে যে, তাকে সে তালাক দেয়নি, তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে।

ফজর উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হয়েও যে লোক খাবার খাবে, তার রোযা কাযা করা হবে ওয়াজিব, এ কথাটি সন্দেহপূর্ণ কাজে উদ্যোগী হওয়া ঠিক নয়, এই কথাটির মতই। এ সন্দেহের কারণে কাযা করা ওয়াজিব নয়। কেননা মূল ফরয আদায়ের ব্যাপারে সন্দেহের কারণে কাযা বাধ্যতামূলক করা বা জায়েয হতে পারে না। আয়াতটির এক পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

আর বলা হয়েছে ঃ وَمِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ এর দ্বারা সূর্যাস্ত ও নিদ্রার পর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হওয়ার বিধান মনসূখ হয়ে গেছে। এ থেকে কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। কেননা প্রথম দিকের নিষেধ তো কেবলমাত্র হাদীস থেকেই প্রমাণিত ছিল, কুরআন দ্বারা নয়। পরে কুরআনের তা মুবাহ ঘোষিত হওয়ার ফলে হারাম হওয়ার বিধান মনসূখ হয়ে গেল।

এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, হাম্বলী মাযহাবে রোযা সহীহ হওয়ার পরিপন্থী হয় না। কেননা রোযার প্রথম রাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করা মুবাহ ঘোষিত হয়েছে একথা জানা থাকা সত্ত্বেও যে শেষরাতের স্ত্রী সঙ্গম কাজটি ফজর উদয়ের কালেও ঘটতে পারে, আর তাহলে সকাল বেলা তাকে অপবিত্র অবস্থায় থাকতে বাধ্য হতে হবে। তা সত্ত্বেও রোযা জায়েয হওয়ার কথা পরে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

পরে তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

আর এরপর 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখে দিয়েছেন, তা তালাস কর' বলে সন্তান চাইতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যিনি আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যা সহকারে। আয়াতের এ তাৎপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কদর রাত্রি রমযান মাসেই হয়। ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতের সেই অর্থ-ই করেছেন। কদর রাত্রি যদি রমযান মাসে না হতো তাহলে ওরূপ ব্যাখ্যাদান কিছুতেই জায়েয হতো না। আল্লাহ যে রুখসত দিয়েছেন তা গ্রহণ করা খুবই পছন্দনীয় কাজ। আগেরকালের মনীষীরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষরাত দ্বিতীয় ফজর উদয়কাল পর্যন্ত থাকে। উপরোক্ত আয়াত থেকেই প্রমাণিত যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই রাত্র থাকে, আর তার উদয় হওয়ার পর থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়।

এসব আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম ফজর উদয় স্পষ্ট প্রতিভাত ও সে বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়ার সময় পর্যন্ত মুবাহ। নিছক সন্দেহ তা নিষিদ্ধ করতে পারে না। কেননা স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার পর কোনরূপ সন্দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একথা তার জন্যে যার পক্ষে ফজর উদয় হওয়া স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার স্থানে পৌছা সম্ভব। যার পক্ষে সেখানে পৌছা সম্ভব নয়; কিংবা যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল, অথবা অনুরূপ কিছু, উক্ত সম্বোধনে সে শামিল নয়; তার কারণ আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বলে এসেছি। নিষেধের পর মুবাহ হওয়ার কথাটি আসায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তা ওয়াজিব নয়। কেননা নিষেধের পর এই শব্দের ব্যবহার হলে তা-ই হতে পারে। তার দৃষ্টান্তসমূহও আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। যেমন وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا 'ইহরামের বন্ধন থেকে তোমরা যখন বের হয়ে আসবে তখন শিকার কর', আর 'নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়'। এসব আয়াতের যে আদেশ আছে, তা পালন করা ওয়াজিব নয়, নিছক অনুমতি থাকার কথাই প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও কোন কোন পানাহার মুস্তাহাবও হতে পারে। শেষ রাতে সেহরী খাওয়া তো মুস্তাহাব বটে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম আল হব্বী, মুসাদ্দাদ, আবূ আওয়া, কাতাদাহ, আনাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً -

তোমরা সেহরী খাও। কেনন সেহরী খাওয়ায় বরকত রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মসাদ্দাদ, আবদুল্লাহ, ইবনুল মুবারক, মূসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ, তাঁর পিতা আবূ কায়শ আমর ইবনুল আস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ فَصْلًا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامُ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السُّحُوْرِ -

তোমাদের (মুসলমানদের) রোযা ও আহলি কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেহরী খাওয়া (অর্থাৎ ওরা খায় না, তোমরা খাও)।

আবদুল বাকী আহ্‌মাদ ইবনে আমর জয়বকী, আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইব, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نِعْمَ غَدَاءُ الْمُؤْمِنَ السُّحُوْرُ وَاِنَّ اللّٰهُ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ -

সেহরী মুমিনের উত্তম খাবার। আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা সেহরী খাওয়া লোকদের প্রতি দরূদ পাঠান।

এসব হাদীসে নবী করীম (স) সেহরী খাওয়াকে মুস্তাহাব—খুবই পছন্দনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ফজরের সময়ে কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখার স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠার সময় পর্যন্ত পানাহার করতে থাক' দ্বারা এই সেহরী খাওয়া বুঝিয়েছেন, মনে করাও খুবই সঙ্গত। ফলে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার কথা এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত মনে করা অবাঞ্ছনীয় নয়।

যদি বলা হয়, আয়াত খাওয়া মুবাহর রুখসতের কথা-ই প্রমাণ করে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা প্রথম রাত্রে যা খাওয়া হয়, তাই। সেহরী খাওয়া বিষয়টি তাতে গণ্য নয়। তাহলে একই আয়াত মুস্তাহাব ও মুবাহ উভয়-ই প্রমাণ করে একথা কি করে বলা যেতে পারে ?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ থেকে তা প্রমাণিত হয় না, একথা ঠিক। আমরা তা প্রমাণ করেছি প্রকাশ্য সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা। তাতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থই তা মুবাহ প্রমাণ করে।

তাতে এই প্রমাণও রয়েছে যে, حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الابْيَضُ বলে যে সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে মূল লক্ষ্যটা (বা শেষ পর্যায়টা) শামিল নয়। যে সময়টা ফজর উদয় হওয়ার ও স্পষ্ট প্রতিভাত হওযার জন্যে নির্দিষ্ট, খাওয়া মুবাহ হওয়ার পরিধিতে সেই সময়টা শামিল নয়। তা বোঝানো-ও হয়নি। পরে বলেছেনঃ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ করো।' এ কথায় রোযার শেষ পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে রাত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু রাত এই রোযার মধ্যে শামিল নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তা শামিল হয়-ও। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَبِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

নাপাক অবস্থায়ও নয়, তবে পথ অতিক্রমকারী হলে অন্য কথা—এই নিষেধ গোসল করা পর্যন্ত।

গোসল শেষ কথা। নামায মুবাহ হওয়ার জন্যে এই গোসল শামিল। অর্থাৎ গোসল হয়ে গেলেই নামায পড়া যাবে। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ -

এবং তোমাদের হাতসমূহ ধৌত কর কনুই পর্যন্ত।

অর্থাৎ কনুই সহ ধুতে হবে। وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এবং তোমাদের পাসমূহ ধৌত কর গিরা পর্যন্ত। অর্থাৎ গিরাসহ। এতে শেষ পর্যায়টি মূল কথার মধ্যে শামিল। তাতে এই মৌলনীতি পাওয়া যায় যে, শেষটা অনেক সময় গণ্য হয়, অনেক সময় গণ্য হয় না। মূল হুকুমটা শেষের উপর প্রযোজ্য কিংবা প্রযোজ্য নয়, তা দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

এর মধ্যে রাত শামিল নয়। অর্থাৎ রাত্রে রোযা থাকতে হবে না। সূর্যাস্ত হলেই যে রাত, সেই রাতের আগেই—সূর্যাস্তের পর-পরই রোযা ভাঙ্গতে হবে। এর পূর্বে রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম মুবাহ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এসব থেকে বিরত হয়ে যাওয়াই হচ্ছে নির্দেশিত রোযা পালনের অর্থ। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শরীয়াতসম্মত রোযা এ সব তাৎপর্যে পূর্ণ। তার কোন কোনটি হচ্ছে বিরত থাকার বিষয়, কতগুলো হচ্ছে রোযার শর্ত। এই শর্ত পূরণ হলেই পানাহার বর্জন শরীয়াতসম্মত রোযায় পরিণত হতে পারে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' প্রমাণ করে যে, কোন ওযর ছাড়াই যে রোযা রাখেনি, অতঃপর তার পানাহার করা জায়েয নয়। বরং রোযাদার যে সব কাজ থেকে বিরত থাকে, তারও উচিত সেসব কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা এই বিরত থাকাটাও এক প্রকারের রোযা-ই। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) আওয়ালী অধিবাসীদের নিকট আশুরার দিন লোক পাঠিয়েছিলেন। এই কথার ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে যে, যারা খাবার খেয়েছে, তারা যেন সেদিনের অবশিষ্ট সময় রোযা রাখে। আর যারা এখনও খায়নি, তারা যেন তাদের রোযা পূর্ণ করে। এতে খাওয়ার পরও পরবর্তী পানাহার থেকে বিরত থাকাকে রোযা নামে অভিহিত করেছেন।

যদি বলা হয়, শরীয়াতসম্মত রোযা না হলে শব্দ তা শামিল করে না। কেননা 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এ কথাটির লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়াতসম্মত রোযা বোঝানো, আভিধানিক অর্থের রোযা নয়।

জবাবে বলা যাবে আমাদের নিকট তা শরীয়াতসম্মত রোযা হিসেবেই গৃহীত। নবী করীম (স) তা রাখতে আদেশ করেছেন, যদিও সেই দিনের রোযাটির কাযা করা ওয়াজি। আর যার কাযা করা ওয়াজিব, তা মুস্তাহাব রোযা না হয়ে যায় না। সেজন্যে অবশ্যই সওয়াব পাওয়ার অধিকার জন্মিবে। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, যে লোক সকাল

বেলা পর্যন্ত রোযার নিয়ত করেনি তার কর্তব্য হচ্ছে রোযা সম্পূর্ণ করা। তা করা হলে তা ফরয রোযা হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পানাহার বা যৌন সঙ্গম ইত্যাদি রোযা সহীহ্ হওয়ার পরিপন্থী কার্যকলাপ যদি না করে, তবে।

যদি বলা হয়, রোযা পূর্ণ করার আদেশের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে, তার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। পূর্ণতা বিধান হতে পারে সেই কাজের যার মধ্যে শরীক হওয়া সহীহ্ হবে। সে তাতে প্রবেশ করেনি বলেই তার প্রতি তা পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, রোযাদারকে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, সকাল বেলা পর্যন্ত যদি তা থেকে বিরত থাকে, তা হলে সে রোযায় প্রবেশ করেছে বুঝতে হবে। তার কারণ হিসেবে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিরত থাকাটাও অনেক সময় শরীয়াত সম্মত রোযা হয়ে যায়। যদিও তার কাযা করা ফরয নয়। নফলও নয়। এ-ও বোঝা যায় যে, তা রোযা বটে, যদিও তার নিয়ত করা হয়নি। এই মত সকল ফিকাহবিদের নিকট গৃহীত। রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ে রোযাদার যে সব কাজ থেকে বিরত থাকে সকাল বেলা পর্যন্ত সে সব কাজ থেকে যদি বিরত থাকে, রোযার নিয়ত না করেই, তার জন্যে নফলের নিয়ত করে রোযা শুরু করতে পারে। তার জন্যে তা জায়েয ও যথেষ্ট হবে। যদি তার পূর্বে শেষ হওয়া সময়টা শরীয়াতসম্মত রোযা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সেখানে সে পরে নতুন করে নিয়ত করলে তার এই কাজটা রোযা গণ্য হবে। লক্ষণীয়, পান ও আহারের পর যদি নফল রোযার সংকল্প গ্রহণ করে তা তার জন্যে সহীহ্ হবে না। উপরে যে-বিশ্লেষণ দিয়ে এলাম, তার আলোকে বলা যায়, 'অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর কথাটি দিনের কোন এক সময় রমযানের রোযার নিয়ত করা জায়েয।

নফল রোযা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক

আল্লাহ্‌র কথা হল ঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর'। এ আয়াতে প্রমাণ করে যে, যদি কেউ নফল রোযা রাখতে শুরু করে, তাহলে সে রোযা সম্পূর্ণ করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক। কেননা 'রোযার' রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথাটি যে, যে রাতের পর সকাল বেলা থেকে রোযা রাখার সংকল্প গ্রহণ করে, সেই সব রাতই এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। আর কেবলমাত্র রমযানের রোযার রাত্রের জন্যেই এই হুকুম, একথা মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, না, তা উক্ত ধরনের সব রাত্রিকেই শামিল কর। কোন দলীল ব্যতীত সাধারণকে বিশেষীকৃত করা যায় না। ব্যবহৃত শব্দ থেকে যখন বোঝা যায় যে, নফল রোযার রাত্রিতে পানাহার করা মুবাহ্ তখন বুঝতে হবে যে, তা শব্দ থেকেই বোঝা যায়। এই পরই যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।' বোঝা গেল, শুরু করা রোযাকে সম্পূর্ণ করা ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে রোযা নফল হোক; কিংবা ফরয। আল্লাহ্ তা ফরয হিসেবেই পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব নফল বা ফরয—যে রোযা-ই শুরু করা হোক, কোন গ্রহণীয় ওযর ব্যতীত তা ভাঙ্গা কারোর জন্যেই জায়েয নয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই যখন তা পূর্ণ করা

কর্তব্য, তখন বুঝতে হবে, তা ফরয। তা যদি ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাহলে তার কাযা করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য সব ফরয কাজের মতই।

যদি বলা হয়, আয়াতটি ফরয রোযার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তাই তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ তার সীমার মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি হয়ত একটি কারণ বা বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তাতে ব্যবহৃত শব্দের সাধারণত্ব তার সাধারণ প্রয়োগকে নিষেধ করে না, কেননা আমাদের মতে হুকুমটা শব্দের থেকে নিতে হবে, নাযিল হওয়ার কারণ থেকে নয়। হ্যাঁ, হুকুমটা যদি কারণের মধ্যে সীমিত হয়, তাহলে তা থেকে বিশেষভাবে সেই লোকদেরকেই বুঝতে হবে, যারা নিজেদের সাথে খিয়ানতের আচরণ করেছে। কিন্তু সকলেই যখন হুকুমটার সাধারণ হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং তা যাদের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে তাদের ও অন্যান্যদের ব্যাপারে প্রয়োগযোগ্য —যারা তাদের মত অবস্থায় নয়, তখন বোঝা গেল যে, হুকুমটা নাযিল হওয়ার উপলক্ষের মধ্যে সীমিত নয়, তা সমস্ত প্রকারের রোযা পরিব্যাপ্ত। যেমন রমযানের রোযার ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষের জন্যে সাধারণ, তখন—যেমন পূর্বে বলেছি—'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযাকে সম্পূর্ণ কর' এই কথাটি 'রোযা শুরু করলেই তা পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক' এই কথা প্রমাণের দলীল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয হবে।

অবশ্য এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, যে লোক নফল রোযা বা নফল নামায শুরু করেছে, পরে তা যদি বিপর্যস্ত হয়; কিংবা বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ দেখা দেয়, তাহলে তাকে তার 'কাযা' করতে হবে। ইমাম আওজায়ীও এ কথাই বলেছেন যে, তা ভঙ্গ হয়ে গেলে অবশ্য 'কাযা' করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, সে যখন নফল নামায পড়া শুরু করে দেয়, তখন তাকে কম হলেও অন্তত দু রাকা'আত তো পড়তেই হবে। ইমাম মালিক বলেছেন, হ্যাঁ, যদি সে নামায বাঁধাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা 'কাযা' করতে হবে। তবে কোন অপ্রতিরোধ্য কারণ যদি তাকে নামায ত্যাগ করতে বাধ্য করে, তাহলে তার কাযা করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নফল নামায শুরু করার পর তা যদি কোন কারণে বাধাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার 'কাযা' করতে হবে না। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা)-ও এই মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে বিশর ইবনে মূসা, সাঈদ ইবনে মনসুর, হুসায়ম, উসমান আলবতী, আনাস ইবনে সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি একদা রোযা রাখলাম। কিন্তু বড় কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গেলাম, পরে তা ভেঙ্গে ফেললাম। তখন ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমাকে আর একটি দিনের রোযা রাখতে আদেশ করলেন। তালহা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মুজাহিদের এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, ব্যাপারটি সাদকার মত। একটি লোক তার ধন-মাল থেকে তা বের করে। অতঃপর সে ইচ্ছা করলে দেবে, ইচ্ছা না হলে দেবে না। তবে হজ্জ ও উমরার জন্যে নফল হিসেবে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা যদি করা না হয়, তাহলে তার দুটিরই 'কাযা' করার কর্তব্য সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের কোন মতপার্থক্য নেই। এ দুটি করার সময়

লোকটি যদি বন্দী হয়ে যায়, তাহলে কাযা করা জরুরী কিনা, এ বিষয়ে লোকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদ ও তাঁদের অনুসারীরা বলেছেন, হ্যাঁ, তাকে 'কাযা' করতে হবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, কাযা করতে হবে না। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ 'অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর' থেকে কাযা করা ফরয প্রমাণিত হয়। কোন ওযরের কারণে না করতে পেরে থাকুক; কিংবা ওযর ছাড়াই না করতে পেরে থাকুক, উভয় অবস্থায়ই তা 'কাযা' করতে হবে। কেননা এ আয়াত প্রমাণ করে যে, শুরু করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যদি ওয়াজিব ফরয কাজ হয়ে থাকে আর শুরু করার পর না করা হয়ে থাকে, তাহ্‌লেও কাযা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্যই নেই। তা ওযরে না করা হোক বা ওযর ছাড়াই। আল্লাহ্‌ যে রোযা বা নামাযই ফরয করেছেন—যেমন মানত স্বরূপ করা—সর্বক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে ওয়াজিব কাজ শুরু করার পর তা পূর্ণ করার কর্তব্য সম্পর্কে আর-ও দলীল রয়েছে। যেমন এই আয়াত ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া ও সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহবানিয়াত' তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দিইনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধানে তারা নিজেরাই এই বিদআত বানিয়েছে। তা যথার্থভাবে পালন করার যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা তা-ও করেনি।

'বিদআত' রচনা কখনও কার্যত হয়, কখনও তা হয় শুরু কথার দ্বারা। এই বিদআত রচনার পরও যারা তা যথাযথভাবে পালন করা পরিহার করে, তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে আয়াতে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বিদআতী পন্থা যদি উদ্ভাবন করা হয় কিংবা তা মুখের কথার দ্বারা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া হয় তাহলেও তা পূর্ণ করা তার দায়িত্ব। কেননা তা পূর্ণ করার পূর্বেই যদি পরিত্যক্ত হয়, তাহলে বোঝা গেল যে, সে তার হক আদায় করেনি। আর নিন্দা করা হয় শুধু ওয়াজিব কাজ না করা হলে। তাহলে বোঝা গেল, তা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক, অবশ্যই করতে হবে। যেমন কোন মানত মানা হলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কেননা তা মুখের কথার দ্বারা নিজের জন্যে ফরয করে নেয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও তার দলীল হিসেবে পেশ করা হয় ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

তোমরা সেই বৃদ্ধার মত হবে না যে নিজের হাতে সূতা শক্ত করে পাকাবার পর টুকরা টুকারা করে কেটে ফেলেছে।

এ একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা। যে আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি শক্ত করে করার পর

তা ভঙ্গ করে, কিংবা আল্লাহ্‌র নামে কিড়া-কসম করে, তারপরই তা ভঙ্গ করে, ওয়াদা পূরণ করে না, তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে সেই বৃদ্ধার সাথে যে নিজের হাতে সূতা পাকিয়ে শক্ত করার পর নিজ হাতেই তা টুকরা টুকরা করে। এই কথাটি সাধারণভাবে সেই সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কোন নেক আমল করতে শুরু করে তা পূর্ণ করে না। কেননা তা শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ না করা ও ভেঙ্গে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা তা ভেঙ্গে ফেললে করা কাজ নষ্ট করা হয়। অথচ তা শুরু করার অর্থ হচ্ছে সে তা যথাযথভাবে করবে। যদি তা না করে, তাহলে সেই মেয়েলোকটির মতো হয়ে যাবে, যে তার সূতা পাকানোর পর তা টুকরা টুকরা করে। এর অর্থ, যদি কেউ আল্লাহ্‌র হক আদায়ে কোন কাজ শুরু করে তা নফল এবং বিদআত হলেও তা পূর্ণ করাই তার কর্তব্য। অন্যথায় সে সেই মেয়েলোকটির মত হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, এ আয়াতটি তো নাযিল হয়েছে তার সম্পর্কে, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, কিরা শক্ত করার পর তা কার্যত করে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ –

তোমরা যখন পারস্পরিক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হও, (তখন কার্যতঃ তা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তিতে পরিণত হয়। অতএব) আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা পূর্ণ কর।

এর পরই যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'তোমরা সেই বৃদ্ধার মত হবে না, যে নিজ হাতে সূতা পাকিয়ে তা টুকরা টুকরা করেছে।

জবাবে বলা যাবে তা বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হলেও তার সাধারণ প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দ তো সাধারণ তাৎপর্যবহ। কয়েকটি প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কথা বলেছি। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ –

তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল নিরর্থক করবে না।

আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে, রোযা কম-সে-কম পূর্ণ একটা দিন রাখাই সহীহভাবে ফরয আদায়ের জন্যে জরুরী। আর নামাযে কম-সে-কম পরিমাণ দুই র.ক'আত। আর নফল ইবাদত—যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্যে করা হয়—তা ফরয আদায়ের নিয়ত অনুযায়ীই হতে হবে। আর ফরয কাজের জন্যে যে সব শর্ত ধার্য হয়েছে, সেই শর্ত পূরণ করেই তা করতে হবে। আর মূল ফরয নামাযে এক রাক'আত গণনার যোগ্য নয়, একটি দিনের কিছু অংশ রোযা রাখা যায় না। আর নফল রোযা ঠিক ফরয রোযার মতই রাখতে হবে। ফরয রোযার যে পানাহার ও সঙ্গম কার্য থেকে বিরত থাকতে হবে, নফল রোযায়ও তা-ই করতে হবে। তাই সব নফল কাজ ফরয কাজের মতই আদায় করতে হবে। অতএব তার কোন কাজ শুরু করা হলে তারপরে তা বিনষ্ট বা অনুরূপ হয়ে গেলে তা বাতিল বা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যতটুকু করা হয়েছে, তার-ও কোন সওয়াব হবার নয়। 'তোমরা তোমাদের আমলসমূহ নিরর্থক ও নিষ্ফল করে দিও না। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও সে কাজ পূর্ণ না করে শেষ করে ফেলতে নিষেধ করছে। কেননা কাজকে বাতিল করতে

আল্লাহ্র নিষেধ স্পষ্ট অকাট্য। আর তা সম্পূর্ণ করা যখন বাধ্যতামূলক, তখন তা পূর্ণ না হয়ে থাকলে তা 'কাযা' করা কর্তব্য হবে। অপূর্ণ রাখার কারণ কোন ওযর হোক বা বিনা ওযরেই হোক। হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) نَهَى عَنِ الْبَتِيْرَاءِ 'এক রাক'আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।' অতএব নামায অবশ্যই পূর্ণ দুই রাক'আত হতে হবে। শুরু করা কাজ অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। তাই সে কাজ যদি মাঝখানে নষ্ট হয়ে যায় বা কোন ওযরে নষ্ট করা হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তবু তা কাযা করতে হবে। যেমন অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজে তা কর্তব্য। হাজ্জাজ ইবনে আমর, আল-আনসারী বর্ণিত হাদীসও তা-ই প্রমাণ করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ –

যে ভাঙ্গল বা পরিবেষ্টিত হল, সে ইহরামের বাইরে এসে গেল। অতএব পরবর্তী বছরই তার হজ্জ করা কর্তব্য।

ইকরামা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে এই কথাটি বললে তারা দুজনই বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। এভাবে নবী করীম (স) থেকে হাদীসটির সরাসরি বর্ণনাকারী তিনজন হলেন। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি তা করতে শুরু করার পর তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তাতে ফরয ও নফলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। দ্বিতীয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তা অসম্পূর্ণ রাখা হয়, তাহলে তার 'কাযা' অবশ্যই করতে হবে। আরও একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে সালিহ, আবদুল্লাহ ইবনে অহব, হায়াত ইবনে শুরাইহ, ইবনুল হাদ, জমীল, উরওয়া, ইবনুয যুবায়র, আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

أُهْدِيَ لِيْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَيْنِ فَافْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَا هَا فَافْطَرْنَا، فَقَالَ لَاعَلَيْكُمَا صَوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا اٰخَرَ –

আমাকে ও হাফসাকে একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আমরা দুজনই তখন রোযাদার ছিলাম, আমরা সে রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে রাসূলে করীম (স) উপস্থিত হলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আমরা তা খেতে আগ্রহী হলাম। সেজন্যে আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, না, তার স্থলে তোমাদের দুজনকে আর এক দিনের রোযা রাখতে হবে।

এ হাদীস থেকেও নফল রোযা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ফরয প্রমাণিত হয়। কেননা

তাঁরা দুজন রোযা কিসের ছিল তা বলেনি। তা সত্ত্বেও তাঁর কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, কানবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে শিহাব, উরওয়া, আয়েশা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ও হাফসা দুজনই নফল রোযাদার ছিলাম। সকালে আমাদেরকে একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়। আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে হাফসা রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

اَقْضِيَا يَوْمًا مَّكَانَهُ -

তদস্থলে তোমরা দুজন একটি রোযা 'কাযা' করে ফেল।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে উমাইদুল ইসবাহানী আল-আকবর আজহার ইবনে জামীল আবু হুমাম মুহাম্মাদ ইবনুয জবরকান আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল বাকী ইসহাক, আল-কানবী, মালিক, ইবনে শিহাব, জুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা)... এরপর পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ তোমরা দুজনই তদস্থলে একটি দিনের রোযা কাযা কর। মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা বলেছেন ও কয়েকটি দিক দিয়ে হাদীসটিকে ঘায়েল করেছেন। একটি হল আবদুল বাকী ইবনে কানের বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট বাশর ইবনে মূসা আল-হুমাইদী বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি সুফিয়ান জুহরী থেকে সে হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তখন জুহ্রীকে বলা হল যে, ওটা উরওয়া বর্ণিত হাদীস। তখন জুহ্রী বলেছেন, না, ওটি উরওয়া বর্ণিত হাদীস নয়। হুমাইদী বলেছেন, তা যদি জুহরী বর্ণিত হাদীস হতো, তাহলে আমি তো ভুলে যেতাম না। এই যা বলা হয়েছে, তাতে আমাদের মতে হাদীসটি বাতিল হয়ে যায় না। কেননা জুহ্রী হয়ত ওকথা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি হাদীসটি উরওয়ার নিকট থেকে শুনেন নি, উরওয়া ছাড়া অন্য লোকদের নিকট থেকে শুনেছেন। তার অবস্থা বেশীর পক্ষে হলে তা 'মুরসাল' হবে। কিন্তু আমাদের মতে 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণ অযোগ্য হয় না। আর মামর যে বলেছেন, হাদীসটি জুহ্রীর বর্ণিত হলে আমি তা ভুলে যেতাম না, এটা ধর্তব্য কথা নয়। কেননা জুহ্রীর বর্ণিত হাদীসটি ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়, অসঙ্গতও নয়। যেমন অন্য লোকদের হাদীসেও তা হতে পারে। আর বেশির পক্ষে অবস্থা এই হতে পারে যে, মামর হাদীসটি জুহরীর নিকট থেকে শুনেন নি। মামর ছাড়া অন্যরা হয়ত তা জুহ্রীর নিকট থেকে শুনেছেন, কিন্তু বর্ণনা করেছেন জুহরীর সূত্রেই। তাতে সনদের ত্রুটি হয় না। মামর তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন নি, উরওয়ার 'মাওলা' জমলি তা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ তাতেও হাদীসটিকে ঘায়েল করেন ইবনে জুরাইজ যা উল্লেখ করেছেন তা দিয়ে। তিনি জুহরীকে বললেন ঃ আপনি কি এই হাদীসটি উরওয়ার নিকট থেকে

শুনেছেন? জবাবে বললেন, বাবে আবদুল মালিক-এ এক ব্যক্তি আমাকে এই হাদীসটি বলেছেন। এই হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীসের বর্ণনায় বলেছেন, সে ব্যক্তি হচ্ছে সুলায়মান ইবনে আরকাম। অবস্থার যে কোন পরিবর্তনই হোক, তাতে ফিকাহবিদদের নিকট অগ্রাহ্য হওয়ার মত তাতে কিছুই নেই। হাদীস পারদর্শীদের আপত্তিও হাদীসটিকে বিপর্যস্ত করেনি। তাতে কোন দোষ বা ত্রুটিও দেখা দেয়নি। খসীফ ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রেও বর্ণনা করেছেন, হাফসা ও আয়েশা দুজন রোযাদার হিসেবে সকাল করলেন। তখন তাদের দুজনের জন্যে একটি খাবার উপহার দেয়া হল। তাঁরা দুজন তাঁদের রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। পরে নবী করীম (স) তাঁদের দুজনকেই তদস্থলে একটি রোযা কাযা করতে বললেন।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবনে উবাদ, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, আবূ হামযা, আল-হাসান, আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আয়েশা ও হাফসা দুজন সকাল বেলা রোযাদার ছিলেন। তখন তাঁদের দুজনকে একটা খাবার উপহার দেয়া হয়, তখন নবী করীম (স) ঘরে এলেন এমন সময় যখন তাঁরা দুজন সে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা দুজন-না রোযাদার ছিলে ? বললেন, হ্যাঁ, বললেন, তাহলে এই রোযার স্থলে তোমরা একটি রোযা কাযা করবে। আর এরকমটা করবে না। অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা আবদুল বাকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে মূসা হারমালাতা, ইবনে অহব, জরীর ইবনে হাজেম, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উরওয়াতা, আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও হাফসা সকাল বেলা পর্যন্ত নফল রোযাদার ছিলাম। তখন আমাদেরকে একটা খাবার উপহার দেয়া হয়। তা পেয়ে আমরা খুব খুশী হলাম। আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে নবী করীম (স) যখন ঘরে এলেন। হাফসা আমাকে উদ্বুদ্ধ করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, এর স্থানে একটি রোযা রাখতে হবে।

আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত জুহরী, উরওয়াতা, আয়েশাতা সূত্রেও এ রকমই একটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর নাফে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রেও এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রোযা যে নফল ছিল, তার উল্লেখ করা হয়নি।

এ পর্যায়ে এই সব হাদীসই ব্যাপক পরিচিত সম্পন্ন। এর কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা দুজন নফল রোযা রেখেছিলেন। আর কোনটিতে এই নফল-এর কথার উল্লেখ নেই। আর সব কয়টি বর্ণনায়ই রোযা কাযা করার আদেশের উল্লেখ রয়েছে।

এই ভেঙ্গে ফেলা রোযা যে কাযা করতে হবে, তা এই বর্ণনাটি থেকেও প্রমাণিত হয়। বর্ণনাটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুসাদ্দাদ, ঈসা ইবনে ইউসূফ, হিশাম ইবনে হাসসান, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ -

যার ভেতরের দিক থেকে বমি আসবে রোযাদার অবস্থায় তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি কেউ নিজে ইচ্ছা করে বমি করে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে।

এই হাদীসেও নফল রোযায় কাযা করতে বলা হয়েছে, যদি রোযাদার নিজে ইচ্ছা করে বমি করে। কেননা নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথায় নফল রোযাদার ও ফরয রোযাদারের মধ্যে কাযা করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেন নি।

বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায়, যে লোক নফল সাদকা দেয় সে যখন তা যে লোককে সে সাদকা দিয়েছে সে তার নিকট থেকে হাতে নেয়, তাহলে সে দান থেকে সে বিরত হতে পারে না। কেননা তদ্বারা আল্লাহ্র যে নৈকট্য সে অর্জন করেছে, তা বাতিল হয়ে যাবে, যা করা তার জন্যে জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যে লোক নফল নামায বা নফল রোযা শুরু করে দিয়েছে, তা পূর্ণ না করে সে সেকাজ থেকে বিরত হতে পারে না, তা তার জন্যে জায়েয নয়। কেননা তাতে সে যে কাজে এগিয়ে গেছে সেই গোটা কাজটাই বাতিল হয়ে যায়। ব্যাপারটি হাতে নিয়ে নেয়া দানের মত। তা দানকারী ফেরত নিতে পারে না।

যদি বলা হয়, তা দান গ্রহণকারী দানটা হাতে নেয়নি এমন অবস্থার মত। কেননা নামায রোযার অবশিষ্ট অংশ আদায় করা থেকে সে বিরত রয়েছে। এ যেন দানকারী দানের জিনিসটি দান গ্রহণকারীর হাতে সঁপে দেয়া থেকে বিরত থাকার অবস্থা।

জবাবে বলা যাবে, যদি তাছাড়া অন্য কিছু না হয়, তাহলে তাই হবে, যেমন তুমি বলেছ। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই কাজটি থেকে বের হয়ে গেলে যদি তা বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা না যায়, তাহলে তা পুনরায় করার তো কোন পথ থাকে না। যখনই তা আবার করা হবে, তা সেই আগে শুরু করা কাজেরই কাযা করা হবে। একটি দিনের কিছু সময় রোযা থাকা ও কিছু সময় রোযা না থাকা তো সম্ভব নয়। যে লোক দিনের প্রথম অংশে খাবার খেয়েছে, তার পক্ষে সেই দিনটির অবশিষ্ট সময়টার রোযা থাকলে তাতে সহীহ্ রোযা হতে পারে না, অনুরূপভাবে যে লোক দিনের প্রথম ভাগে রোযা রাখল, পরে অবশিষ্ট সময়টায় সে রোযা ভেঙ্গে ফেলল, সে মূলত সেই দিনের রোযা রাখার হুকুমের বাইরে চলে এল। যতটুকু সময় সে রোযা রাখার কাজটা করেছে, তাকে সে বাতিল করে দিল। ঠিক যেমন একটি লোক দান করে দেয়া ও গ্রহীতার হাতে যাওয়া জিনিস যদি ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে তো সেই রোযাদারের মতই কাজ করল। কাজেই এই দান ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে তার দান গ্রহীতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যে লোক হজ্জ বা উমরার ইহ্রাম বাঁধবে, তার পরে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাযা করার আবশ্যকতা সম্পর্কে সকলেই একমত। তাতে প্রবেশ করা কথার দ্বারা ওয়াজিব করার মতই।

যদি বলা হয়, তাকে কাযা করতে হবে। কেননা ইহরাম নষ্ট হয়ে গেলে তা করে বের হয়ে এসেছে, তা তো বলা যায় না। সেটা নামায ও রোযা প্রভৃতি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ইবাদতের মত নয়। কেননা এ দুটি থেকে বের হয়ে আসা হলে দুটিই নষ্ট হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, শুরু করা হলে মূল কাজটা ফরয হওয়ার ব্যাপারে দুটিরই অভিন্ন হওয়াকে এই পার্থক্য নিষেধ করে না। এই ইহরামকারী ইহরামে প্রবেশ করার পর তা তার জন্যে হয় বাধ্যতামূলক হবে,—তাহলে তা পূর্ণ করাই কর্তব্য; না হয় তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। যদি তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তার কাযা করা ফরয হবে, তা অন্যায়ভাবে লালসা করে করুক বা নিজের কাজ দ্বারাই তা নষ্ট করুক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা যা ফরয হয়েছে, তাতে বিপর্যয় তার কাজের দরুন হয়েছে; কিংবা কোন কারণ ছাড়াই নষ্ট করুক, তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। যেমন মানত ও ইসলামের হজ্জ। যদি আমরা একমত হয়ে বলি যে, যখন-ই তা নষ্ট করা হবে, তখনই তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হবে, সেই হুকুম হবে যদি তা ইচ্ছামূলকভাবে এবং তা করা কঠিন হবে বিনা কারণে করা হয়। যেমন সব ফরয ওয়াজিব কাজ। প্রতিপক্ষের কথা হাদীসই বাতিল করে দিয়েছে। সে হাদীসটি হচ্ছে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

যে পূর্ণ করল বা থেমে গেল, সে হালাল হয়ে গেল। পরবর্তী বছরই হজ্জ করা তার কর্তব্য হবে।

এ হাদীস হজ্জ কাযা করা ফরয করে দিয়েছে, যদিও তা অন্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়ার দরুন করা যায় নি। হজ্জ ও উমরায় যখন একথা প্রমাণিত হল, সব ইবাদতেই তা ফরয হবে। কেননা তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার পূর্ণ হওয়া। তার কতকটা অপর কতকের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। আর তা নামায ও রোযার মতই। তা থেকে নিজের কাজ দ্বারা বের হয়ে আসুক, কিংবা তা ছাড়াই, তার কাযা করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যেমন অন্যান্য সব ফরয কাজেই করা হয়।

এই মতের বিরোধীরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে। সে হাদীসটি উম্মে হানী (রা) বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তাঁর পানাবশিষ্ট তাকে দিলেন, তিনি তা অমনি পান করে ফেললেন। তারপরে তিনি বললেন, আমি তো রোযাদার ছিলাম, কিন্তু আপনার পানাবশিষ্ট প্রত্যাখ্যান করাকে আমি অপছন্দ করেছি। তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমার এই রোযা যদি রমযান মাসের রোযার কাযা হয়ে থাকে, তাহলে এর স্থানে আর একটি রোযা কাযা করবে। আর যদি তা নফল রোযা হয়ে যাকে, তাহলে ইচ্ছা হলে কাযা করতেও পার, ইচ্ছা না হলে কাযা করবে না।

কিন্তু এই হাদীসটির সনদ ও মূল বক্তব্য কোনটিই ঠিক নয় (مضطرب) সনদের দোষ হচ্ছে, সামাক ইবনে হারস হাদীসটি একবার বর্ণনা করেছেন সেই ব্যক্তির নিকট থেকে যিনি উম্মে হানীর নিকট শুনেছেন। আবার কখনও উম্মে হানীর পুত্র হারুন, কখনও উম্মে হানীর কন্যার পুত্র, আবার কখনও উম্মে হানীর দুই পুত্রের নিকট থেকে—কখনও উম্মে হানীর এক পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার বলেছেন, আমার পরিবারবর্গ আমাকে জানিয়েছে। কোন হাদীসের সনদে এরূপ অস্থিরতা প্রমাণ করে যে, এর বর্ণনাকারী নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ নয়। আর মূল বক্তব্যেরও নানা রকম-ফের দেখা যায়। পূর্বে

যেমন বলেছি, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর ইবনে আবদুল হামীদ, যিয়াদ ইবনে আবূ যিয়াদ, আবদুল্লাহ ইবনুল হারস, উম্মে হানীর সূত্রে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন। তাতে উম্মে হানী বলেছেন, বিজয় বিদসে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন ফাতিমা (রা) এলেন এবং রাসূলে করীম (স)-এর বাম পাশে বসলেন। আর তাঁর ডান দিকে বসলেন উম্মে হানী। তখন অলীদাহ্ একটা পাত্র নিয়ে এল। তাতে পানীয় ছিল। আমি তা নিয়ে নিলাম এবং নবী করীম (স) তা থেকে পান করলেন। পরে তা উম্মে হানী নিয়ে তা থেকে পান করেন। পরে তিনি বললেন, হে রাসূল! আমি তো রোযাদার ছিলাম, এই পানীয় পান করে আমি ভেঙ্গে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি কোন রোযা করেছিলে নাকি ? বললেন, হ্যাঁ। বললেন, যদি নফল রোযা হয়ে থাকে, তাহলে তা তোমাকে কোন ক্ষতি করবে না।

এ হাদীসের বলা কথা ঃ 'তাহলে তোমাকে কোন ক্ষতি করবে না' থেকে তার কাযা ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ বা অস্বীকার করা হয়নি। কেননা এ রকমের কথা তো আমরা সাধারণত বলেই থাকি। 'তার ক্ষতি করবে না' কথাটি থেকে এ-ও তো বোঝা যেতে পারে যে, তার ক্ষতি করবে না এজন্যে যে, রোযা ভাঙ্গার এই কাজটা যে তার করা উচিত ছিল না, এ কথা তাঁর জানা ছিল না। কিংবা হয়ত তাঁর জানা ছিল, কিন্তু তিনি পান করে রোযা ভেঙ্গে রাসূলের অনুসরণে পান করাকেই হয়ত তিনি উত্তম কাজ মনে করেছেন রোযাকে রক্ষা করা অপেক্ষা।

আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে ফারিস, ইউনুস ইবনে হুবায়ব, আবূ দাউদ, তায়ালিসী, শুবা কুরায়শ বংশের জাদাতা নামক ব্যক্তি—তিনি উম্মে হানীর পুত্র সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সামাক ইবনে হরবও তাঁর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, উম্মে হানীর দুই পুত্র আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুবা বলেছেন, তাদের দুজনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে জাদাতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার নিকট উম্মে হানীর কথা হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, রাসূলে করীম (স) তার নিকট এলেন। তিনি পানীয় এনে দিলেন। তিনি তা পান করলেন। পরে উম্মে হানী পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করলেন। তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমি রোযাদার ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ নফল রোযার রোযাদার নিজেরই আমানতদার; কিংবা নিজের উপর আদেশকারী। চাইলে রোযা রাখবে, চাইলে ভাঙ্গবে। তখন আমি জাদাতাকে বললাম, আপনি নিজে উম্মে হানীর মুখে এই কথা শুনেছেন ? বললেন, আমার ঘরের লোকেরা আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে। আর উম্মে হানীর মুক্ত করা গোলাম আবূ সলিহ বলেছে উম্মে হানী থেকে সামাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেই লোকটি থেকে, যে উম্মে হানীর নিকট থেকে শুনেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'নফল রোযাদারের ইখতিয়ার রয়েছে, চইলে রোযা রাখবে, চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে।' সামাক হাদীসটি উম্মে হানীর পুত্র, উম্মে হানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তার কথা হচ্ছে, রমযান মাসের রোযার কাযা হলে এর বদলে একটা রোযা থাকবে। আর নফল রোযা হলে চাইলে রোযা রাখতে পার, চাইলে ভাঙ্গতে পার। কিন্তু এসব কথায় 'কাযা করতে হবে না' এমন কোন কথা নেই। তার বক্তব্য হচ্ছে, নফল রোযাদার ইখতিয়ার সম্পন্ন, সে নিজেরই আমানতদার। নফল রোযা হলে সে তা ভাঙ্গতে

পারে। তোমাকে কাযা করতে হবে না, একথা বলা হয়নি। মূল কথার মধ্যে এরূপ পার্থক্য (اضطراب) রয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মূল কথা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আর ব্যবহৃত এই শব্দগুলো যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাতে কাযা ফরয না হওয়ার কোন কথা নেই। তাতে বড়জোর রোযা ভাঙ্গা মুবাহ প্রমাণিত হয়। আর রোযা ভাঙ্গা মুবাহ কাযা প্রত্যাহৃত হওয়া প্রমাণ করে না। আর তাঁর কথা, রোযাদার নিজের আমানতদার, আর 'রোযাদারের ইখতিয়ার আছে' ইত্যাকার কথা থেকে হয়ত বলতে চাওয়া হয়েছে যে, রোযার নিয়ত ছাড়াই সে যদি রোযাদারের মতই পানাহার থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার ইখতিয়ার আছে, নফল রোযার নিয়ত করবে, কিংবা ভাঙ্গবে। রোযাদারের মত যে বিরত থাকে, তাকেও রোযাদার বলা হয়। যেমন নবী করীম (স) আশুরার দিন বলেছিলেন ঃ 'যে খেয়েছে, সে দিনের অবশিষ্ট সময়টা রোযা রাখবে।' তাঁর বক্তব্য হল, রোযাদার যেমন বিরত থাকে তেমনি বিরত থাকা। তেমনি কথা ঃ রোযাদারের ইখতিয়ার আছে, রোযাদার নিজের আমানতদার এসব কথাই এই অর্থে। এ হাদীসের কোন কোন শব্দে যদি এরূপ কথা পাওয়া যায় যে, ইচ্ছা হলে কাযা কর, ইচ্ছা হলে করবে না, তা হলে বুঝতে হবে, এটা বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা। বর্ণনাকারী রাসূলের কথা তোমার ক্ষতি করবে না, ইচ্ছা হলে ভাঙ্গ, রোযাদারের ইখতিয়ার আছে—এসব কথায় তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। অবস্থা যখনই এই, তখন কাযা না করার কথা প্রমাণিত হয়নি, বুঝতে হবে।

তবে নবী করীম (স) থেকে কোনরূপ ব্যখ্যার সম্ভাবনা ছাড়াই কাযা ফরয না হওয়ার কথা যদি প্রমাণিত হয়, আর সেই সাথে সনদ সহীহ্ হয়, মূল কথার সুসংবদ্ধতা প্রমাণিত হয়, তবুও কাযা করার আবশ্যকতাটাই উত্তম প্রমাণিত হবে এ হাদীস থেকে। তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম, দুটি হাদীসের একটি যদি কোন কাজকে মুবাহ্ প্রমাণ করে, আর অপরটি নিষিদ্ধ প্রমাণ করে, তাহলে নিষেধ প্রমাণকারী অনুযায়ী আমল করা উত্তম। আমাদের বর্ণিত হাদীস কাযা না করার নিষেধ প্রমাণ করে। আর ওদের হাদীস তার (কাযা না করার) মুবাহ হওয়া প্রমাণ করে। তাই এ দিক দিয়ে আমাদের হাদীসই উত্তম। অপর দিক দিয়ে কাযা নিষেধকারী হাদীস মূল ভিত্তিতে উপস্থিত হয়েছে। আর কাযা ফরযকারী হাদীস তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসটি উত্তম। কেননা তা তাৎপর্যগতভাবে পরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তার তারীখ জেনে গেছে। অপর দিক থেকে বলা যায়, ফরয ত্যাগ করলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিন্তু মুবাহ্ কাজ করলে তাতে আযাব হবে না। অতএব নিষেধমূলক হাদীসের তুলনায় ফরয প্রমাণকারী হাদীস অনুযায়ী আমল করা উত্তম। রোযা ভাঙ্গা মুবাহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে উম্মে হানী সংক্রান্ত হাদীসের বিপরীত হাদীস হচ্ছে সেটি, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ, আবূ খালিদ, হিশাম, ইবনে সীরীন, আবূ হুরায়রা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ -

তোমাদের কেউ যদি খাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়, তা হলে গ্রহণ করা ও যাওয়া উচিত। যদি রোযা ভঙ্গকারী হয়, তা হলে সে খাবার খাবে। আর যদি রোযাদার হয় তাহলে সে নামায পড়বে।

আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হিফ্‌স ইবনে গিয়াসও বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দাদ, সুফিয়ান, আবূজজিনাদ, আরাজ, আবূ হুরায়রা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার জন্যে আহুত হলে, সে যদি রোযাদার হয়, তাহলে সে বলবে, আমি রোযাদার। এ দুটি হাদীস রোযাদারকে বিনা ওযরে রোযা ভাঙ্গতে নিষেধ করে। এতে নবী করীম (স) নফল রোযাদার ও ফরয রোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। লক্ষণীয়, তিনি প্রথমোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হলে সে যেন নামায পড়ে। নামায রোযা ভঙ্গের বিপরীত। রোযাদার ও রোযা ভঙ্গকারীর মধ্যে পার্থক্যও করেছেন। তাই রোযাদারের পক্ষে রোযা ভাঙ্গা যদি জায়েয হতো তাহলে তিনি বলতেন ঃ তার খাওয়া উচিত।'

যদি বলা হয়, নামায পড়ার কথা বলে তিনি আসলে দো'আ করার কথা বলেছেন। আর দো'আ করা তো খাওয়ার পরিপন্থী নয়।

জবাবে বলা যাবে, নামায পড়তে বলা হয়েছে, তা তো প্রচলিত ও পরিচিত নামায। কথা বলার দ্বারা তো তা-ই বোঝায়। যে নামাযের রুকূ সিজদা আছে তার অর্থ দো'আ বলা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কোন দলীল থাকলে তা বলা যেতে পারে বটে, যদি 'দো'আ'-ই বলা হতো তাহলে তার দলীল উপস্থিত থাকত। তবে সে রোযা ভাঙ্গবে না যখন রোযা ভঙ্গকারী ও রোযাদারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

হাদীসে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তার বলা উচিত যে আমি রোযাদার' একথা বোঝায় যে, রোযা তাকে খাবার খেতে নিষেধ করে। অথচ আমরা আগেই জেনেছি যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দাওয়াত কবুল করা মুসলমানের হক। যেমন সালাম দেয়া ও জবাব দেয়া। রোগীকে দেখতে যাওয়া জানাযায় শরীক হওয়া ইত্যাদি। দাওয়াত কবুল করতে যদি তাকে কেউ বাধা দেয়, বলেছেন, তখন সে বলবে ঃ 'আমি রোযাদার'। এ থেকে বোঝা যায় যে, ওযর ছাড়া কোন রোযা-ই ভাঙ্গা যেতে পারে না, তা নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়, আবূদ-দারদা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজন নফল রোযা ভাঙ্গায় কোন দোষ দেখতে পেতেন না। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, এক রাক'আত নামায পড়লেন। পরে তা থেকে ফিরে গেলেন। অপর এক ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করল। এক সময় বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো মাত্র এক রাক'আত নামায পড়েছেন? বললেন, ও তো নফল নামায। ইচ্ছা হলে বেশি পড়তে পার, ইচ্ছা হলে কম।

এর জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বে ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) থেকে নফল রোযা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ফরয হওয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। আবূদ দারদা ও জাবির (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কাযা করাকে অস্বীকার করা হয়নি। তাতে শুধু রোযা

ভাঙ্গা মুবাহ্ বলা হয়েছে। আর হযরত উমর (রা) সংক্রান্ত হাদীসের বক্তব্য এ-ও হতে পারে যে, পড়া কর্তব্য মনে করে যে লোক নামায শুরু করল, পরে তার মনে হল, তা তার কর্তব্যভুক্ত নয়, তখন তা নফল হয়ে যাবে, তা ভেঙ্গে ফেলা তার জন্যে জায়েয, তার কাযা করা কর্তব্য নয়, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ এক রাক'আত নামায কখনই জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'কুরআন থেকে যা সহজে পড়া যায় তাই পড়' থেকে তো এক রাক'আত জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়।

জবাবে বলা যাবে, উক্ত আয়াত নামাযে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে ইখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে। নামাযের রাক'আত পর্যায়ে ইখতিয়ার থাকার কথা বলা হয়নি। কুরআন পাঠে ইখতিয়ার থাকলে এ দ্বারা নামাযের সব রুকন-এ ইখতিয়ার থাকার কথা প্রমাণিত হয় না। অতএব তাতে রাক'আতের বিষয়ে কোন হুকুম নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কুরবানীর জন্তু ধ্বংস করে ফেললে তার বদলে আর একটি করবানী করতে হবে। তাই নৈকট্য লাভের সব ইবাদতেই অনুরূপ করা বাধ্যতামূলক।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ 'অতঃপর রোযা রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর' আল্লাহ্‌র এ কথাটি থেকে শরীয়াতের বহু কয়টি আইন জানা যায়। যেমন, যদি কেউ বাড়িতে সকাল পর্যন্ত রোযা থাকে, পরে সফরে যায়, সেই দিনের রোযা ভাঙ্গা তার জন্যে জায়েয নয়। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ থেকেই তা প্রমাণিত। রোযা শুরু করার পর কে সফরে রওয়ানা হয়েছে আর কে নিজ বাড়িতে থেকে গেছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য উক্ত আয়াতে করা হয়নি। উক্ত আয়াত থেকে এ-ও জানা যায় যে, ফজর উদয় হওয়ার পর যে লোক খাবার খাবে তখনও রাত আছে মনে করে, কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই খাবার খেল, যদিও সে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছে, পরে স্পষ্ট হল যে, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে। কেননা উক্ত অবস্থায় রোযা সম্পূর্ণ হয়নি। কেননা রোযা তো হয় পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকার দ্বারা। কিন্তু সে তো বিরত থাকেনি। এ কারণে সে রোযাদার থাকতে পারেনি।

এ পর্যায়ে নানা মতের উল্লেখ হয়েছে। মুজাহিদ, জাবির ইবনে যায়দ, ও আল-হিকাম বলেছেন, তার রোযা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে তার কাযা করতে হবে না। যে লোক রাত্র আছে মনে করে সেহরী খাবে (অথচ তখন রাত্র নেই) তার জন্যেও এই হুকুম। মুজাহিদ বলেছেন, সূর্য ডুবে গেছে মনে করে যদি কেউ ইফতার করে, পরে সূর্য ডুবেনি বলে জানতে পারে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে। সেহরী খাওয়া লোক এবং সূর্য অস্ত হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই খাওয়া লোকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যতক্ষণ ফজর কালে সাদা রেখা কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে না যায়' তাই যার নিকট তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়নি, তার জন্যে তখনও সেহরী খাওয়া মুবাহ্। তাকে সে রোযা কাযাও করতে হবে না। কেননা ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার পূর্বেই সে খাবার খেয়েছে। কিন্তু যে লোক সূর্য ডুবেছে ধারণা করে ইফতার করেছে, তার রোযা তো নিশ্চিত, সূর্যের অস্ত যাওয়া স্পষ্ট প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত তার ইফতার করা জায়েয হতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, সাঈদ

ইবনে যুবায়র, সব হানাফী ফিকাহবিদ, মালিক, সওরী ও শাফেয়ী বলেছেন, রোযা কাযা করতে হবে উভয় অবস্থাতেই। তবে ইমাম মালিক বলেছেন, নফল রোযা চলে যাবে, ফরয রোযা কাযা করতে হবে। আমাশ, জায়দ ইবনে অহব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) নিজে এবং অন্যান্য সব লোক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করেছেন এমন সময় সূর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন তিনি বললেন, এটায় আমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা ও রোযা কাযা করব না। তার থেকে এ-ও বর্ণনা হয়েছে, উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, খুব সহজ, আমরা একটি রোযা কাযা করে নেব। কুরআনের হুকুম ঃ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর'-এর বাহ্যিক অর্থ, রোযা বাতিল হলেই তা কাযা করতে হবে । কেননা সে রোযা সম্পূর্ণ করেনি। যে সময় না জেনে খেয়েছে, আর যে জেনে খেয়েছে, এ দুজনের মধ্যে আয়াতে কোন পার্থক্যের কথা বলা হয়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা খাও, পান কর যতক্ষণ না ফজরকালীন অন্ধকার থেকে আলো প্রতিভাত হয়ে উঠে' অনুযায়ী ফজর যার নিকট প্রতিভাত হয়নি, তার জন্যে তখন পর্যন্ত খাবার খাওয়া মুবাহ।

জবাবে বলা যাবে, এই খাওয়াটা দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় হবে। হয় সে ব্যক্তির খাওয়ার ব্যাপার হবে, যার পক্ষে ফজর উদয় হওয়ার স্পষ্ট হওয়া এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানতে পারা সম্ভব, সে সেই সময়টা চিনে ফজর ও তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তার অবস্থা যদি সেই রকমের হয়, তা সত্ত্বেও তার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত না হয়ে থাকে, বুঝতে হবে, এই বিষয়টি চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে ত্রুটির কারণেই তা হওয়া সম্ভব হয়েছে। আর যার অবস্থা এরূপ, তার খাবার খাওয়ার জন্যে অগ্রসর হওয়া জায়েয হবে না। তবু যদি খায়, তাহলে তার পক্ষ করা উচিত ছিল না এমন কাজ সে করে বসেছে। কেননা সে সংশ্লিষ্ট বিষয় দৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার উপেক্ষা ও ত্রুটির কারণে রোযার ফরয তো নষ্ট হতে পারে না, সে-ও সে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। যে লোক ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি চিনে না, বোঝে না; কিংবা তার ও ব্যক্তির মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, অথবা চন্দ্রোজ্জ্বল রাত হয়, বা চোখের দুর্বলতা থাকে, এই ব্যক্তির পক্ষে নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোন কাজ করা ঠিক হতে পারে না। বরং তার দৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খাবার না খাওয়াই উচিৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যদি তা-ই করে থাকে, তাহলে তার কাযা করা থেকে সে রেহাই পেতে পারে না। রোযার ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল, তা সে করেনি, দোষ তো তারই। অনুরূপভাবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিনে সূর্য ডুবেছে মনে করে যদি কেউ খায়, তা তাকেও কাযা করতে হবে আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য অনুযায়ী।

যদি বলা হয় ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র নিকট প্রমাণিত ও স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার কোন দায়িত্ব মানুষের নেই, মানুষ যতটা পারে, ততটাই তার দায়িত্ব।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি জানা যখন সম্ভব তখন তা জানার জন্যে চেষ্টা করা বান্দার কর্তব্য। যদি তা জানার পথে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে,

তা সত্ত্বেও কেউ যদি সে বিষয়ে গাফিল হয়, তাহলে তার এই গাফিলতির অবস্থায় তার খাওয়া মুবাহ্ হতে পারে। কিন্তু খাওয়া মুবাহ্ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার কাযাও করতে হবে না। যেমন রোগী ও মুসাফির। এ ব্যাপারে এই দুই জনই মূল মানদণ্ড। কেননা এ দুজন বাস্তবিকই মাযুর। ফজর উদয় হওয়া যার নিকট সংশয়পূর্ণ হয়েছে; কিংবা তার উদয় হয়েছে বলে যার ধারণা হয়েছে, সে-ও খাওয়ার ব্যাপারে মাযুর। কিন্তু এই ওযর তার কাযা করাকে বাতিল করে না। এর দলীল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রমযান মাসের প্রথম রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন যদি নতুন চাঁদ না দেখে থাকে, আর তার ফলে পরের দিন রোযা না রাখে, পরে তারা জানতে পারল সেটি রমযানের দিন ছিল, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এই ঐকমত্যও পূর্বোক্ত কথার প্রমাণ। অনুরূপভাবে দারুল হরব-এ বন্দী মুসলমান রমযান মাস শুরু হওয়ার কথা জানতে পারেনি, এমনিই কাটিয়ে দিয়েছে, পরে তা জানতে পারল, তাকে রোযা কাযা করতে হবে। অথচ যখন রোযা রাখেনি তখন রমযান মাসের কথা জানা তার দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু এই না-জানাটা রোযা কাযা করাকে বাতিল করে দেয় না। অনুরূপভাবে ফজর উদয় হওয়া যার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকল, সূর্যের অস্ত যাওয়ার কথা জানলো না, তাকেও কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, যে ভুলক্রমে রোযায় খায়, তাকে তো কাযা করতে হয় না। তার মতো সে হবে না কি ? কেননা খাওয়ার সময় তার রোযা ফরয হওয়ার কথা তার জানা ছিল না।

জবাবে বলা হবে, এ কারণটি গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে না পাওয়ার কারণে রোযা না রাখলে তাকে তো কাযা করতে হবে, যখন সে রমযানের কথা জানতে পারবে। দারুল হরব-এ বন্দী থাকা লোক রমযান মাসের কথা জানতে পারেনি, মাস শেষ হয়ে গেছে, তাকে তো কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কেননা তার উপর রোযা ফরয হওয়ার কথা পূর্বে সে জানতে পারে নি।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক ভুলে গিয়ে খেয়েছে, কিয়াস বলে তার রোযা কাযা করা উচিত। তবে হাদীসের কারণে তারা কিয়াস বাদ দিয়েছেন, যদি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ—ভুলবশতঃ খাদ্য গ্রহণকারীর রোযা সহীহ্ হয় না। কেননা সে তো তার রোযা পূর্ণ করেনি। অথচ আল্লাহ্ রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে বলেছেন। পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকেই তো রোযা বলে। কিন্তু সে বিরত থাকে নি। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সে যদি মূলতই রোযার কথা ভুলে যায়, তাকে যে রোযা কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তার এই ভুলে যাওয়াটা কাযা ফরয না হওয়ার কারণ হতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, হারুন ইবনে আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুল উলা, আবূ উসামাতা, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, ফাতিমা বিনতুল মুনযির, আসমা বিনতে আবূ বকর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আসমা) বলেছেন, রাসূলের সময়ে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম। তারপরে সূর্য প্রকাশমান হয়ে গেল। আবূ উসামা

বলেছেন, আমি হিশামকে বললাম, লোকদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ কর। তিনি বললেন, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। 'রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এই আদেশে তার রোযাও বাতিল হয়ে যাবে যাকে জোরপূর্বক খাবার খেতে বাধ্য করা হয়েছে। কেননা সে খাওয়া থেকে কার্যত বিরত থাকেনি। যে পাগল হয়ে খাবার খেয়েছে, তার রোযাও বাতিল হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করা হলে তবেই গ্রহণ করবেন। রোযার পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ এর মধ্যে করা হলে সে রোযা পূর্ণ করেনি। অতএব তাকে কাযা করতে হবে। রোযার শেষ সময়ে যখন ইফতার করার সময় উপস্থিত হয়, সে পর্যায়ের হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর আমাদের নিকট আবূ দাঊদ, মুসাদ্দাদ, আবদুল্লাহ ইবনে দাঊদ, হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা, আসেম ইবনে ইমরান, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ এদিক থেকে যখন রাত আসে আর দিন যখন এদিক থেকে চলে যায়, সূর্য অস্ত যায়, তারপর রোযাদার ইফতার করবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, মুসাদ্দাস, আবদুল ওয়াহিদ, সুলায়মান শায়বানী, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা যখন দেখবে রাত এদিক থেকে এগিয়ে এসেছে, তখন রোযাদার ইফতার করবে। এ সময় তিনি অঙ্গুলি দিয়ে পূর্বদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا سَقَطَ الْقَرْصُ اَفْطَرَ –

সূর্য ডুবে গেলেই ইফতার করবে।

সূর্য ডুবে গেলেই যে রোযার সময় শেষ হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। তখনই রোযাদারের পক্ষে পানাহার সঙ্গম জায়েয হয়ে যায়। রোযাদারের জন্যে আর যা যা নিষিদ্ধ তা-ও। রাসূলের কথা ঃ 'সূর্য অস্ত গেলেই রোযাদার ইফতার করবে' সূর্যের অস্ত গমণের সাথে সাথে রোযাদার রোযা খুলবে, কিছু খেয়ে; কিংবা না-খেয়ে। এই কারণে নবী করীম (স) ধারাবাহিকভাবে—রোযা না খুলে—রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে সূর্যাস্তের পর-ও তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। যে মিলিয়ে (وصال) রোযা রাখে, সে একাধারে দুই বা তিন পর্যন্ত কিছু খায় না, পান করে না। কোন সময় যদি সামান্য হলেও পানাহার করে, তাহলে মিলিত রোযা ভেঙ্গে যায়।

ইবনুল হাদ আবদুল্লাহ ইবনে খুবাব, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) মিলিত রোযা (মাঝখানে ইফতার না করে) রাখতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল, আপনি কি মিলিয়ে—ইফতার না করে—রোযা রাখেন ? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মতো নও। আমাকে রাত্রে কেউ খাওয়ায়, পান করায়। তোমরা রোযা মিলিয়ে রাখলে এক সেহরী থেকে পরবর্তী সেহরী পর্যন্ত রাখবে। তিনি জানিয়েছেন যে, সেহরীতে পানাহার করলে তার মিলিয়ে ধারাবাহিক রোযা রাখা হয় না। তিনি এ-ও জানিয়েছে যে, তিনি মিলিয়ে ধারাবাহিক রোযা রাখেন না। কেননা আল্লাহই তাঁকে পানাহার করান। আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে

একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখেন ? বললেন ঃ আমি তো রাত্রিতে এমন থাকি যে, আমার রব্ব আমাকে পানাহার করান। অনেকে বলেন, মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখা রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে বিশেষভাবে মুবাহ্ ছিল। তাঁর উম্মতের জন্যে মুবাহ্ নয়। নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ই তাঁকে পানাহার করান। যার জন্যে এই ব্যবস্থা নেই সে মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখবে না ঃ

ই'তিকাফ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْا هُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ –

আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না মসজিদসমূহে ই'তিকাফ করতে থাকা অবস্থায়।

অভিধানে 'ই'তিকাফ' শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ –

এইসব মূর্তি ও চিত্র কি, যেগুলোর জন্যে তোমরা অবস্থান গ্রহণকারী হয়ে আছে।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ –

আমরা তার জন্যে অবস্থান গ্রহণকারী হয়ে থাকলাম।

পরে শরীয়াত পরিভাষা হিসেবে শব্দটি গ্রহণ করা হয়। তাতে অবস্থানসহ অন্যান্য ভাবধারাও জড়িত হয়, যা অভিধানিক অর্থে গণ্য হতো না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মসজিদে থাকা, রোযা রাখা, মৌলিকভাবেই স্ত্রী সঙ্গম পরিহার। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের নিয়ত করা। ই'তিকাফকারীর মধ্যে এসব তাৎপর্য ও অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। صِيَامٌ صَوْمٌ – পর্যায়ে আমরা যেমন বলে এসেছি, এ-ও তারই মত। বলেছি, 'সিয়াম'-এর অভিধানিক অর্থ, বিরত থাকা। পরে তার অর্থে প্রবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধিত হয়েছে। সেই ব্যাপকতাকে বাদ দিলে শরীয়াতসম্মত 'সিয়াম' হবে না। মসজিদে অবস্থানের কাজটি কেবলমাত্র পুরুষের জন্যে জায়েয, মেয়েদের জন্যে নয়। 'ই'তিকাফ' মসজিদে হতে হবে এটা শর্ত হিসেবে এসেছে কুরআনের এ আয়াত থেকে وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ 'অবস্থা এই যে, তোমরা মসজিদে অবস্থানকারী হয়ে আছ'। এ থেকে ই'তিকাফ মসজিদে হওয়ার শর্ত বের হয়েছে। মসজিদ যেহেতু নানা ধরনের, আকারের, এজন্যে কোন্ ধরনের মসজিদে ই'তিফাক জায়েয, এ নিয়ে বিভিন্ন মত দেয়া হয়েছে আগেরকালের ফিকাহবিদদের পক্ষ থেকে। আবূ অয়েল হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহকে বললেন ঃ আপনি কি সে লোকদের দেখেছেন যারা আপনার ও আশয়ারীর

ঘরের মাঝে অবস্থানকারী হয়ে রয়েছে ?..... আমি জানি যে, তিনটি মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। অথবা মসজিদুল হারামে হবে। আবদুল্লাহ্ বললেন, সম্ভবত ওরা ঠিকই করেছে, তুমি ভুল করেছ। ওরা স্মরণে রেখেছে, তুমি ভুলে গেছ। ইবরাহীম নখয়ী বর্ণনা করেছেন, হুযায়ফা বলেছেন ঃ

لَا اعْتِكَافَ اِلَّافِىْ ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى، وَمَسْجِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

তিনটি মাত্র মসজিদে ই'তিকাফে বসা যায়। তা হচ্ছে ঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী।

কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لا اعْتِكَافَ اِلَّا فِىْ مَسْجِدِ نَبِىٍّ -

নবীর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হতে পারে না।

এ কথা হযরত হুযায়ফার মাযহাবের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন। কেননা তিনটি মসজিদই নবীগণের মসজিদ। এ পর্যায়ে আর একটি কথা রয়েছে। সে কথাটি ইসরাইল আবূ ইসহাক, আল হরস, আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

لَااعْتِكَافَ اِلَّافِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَوْمَسْجِدِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ لسَّلَامُ -

মসজিদে হারাম কিংবা মসজিদে নববী ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আয়েশা (রা), ইবরাহীম, সাঈদ ইবনে যুবায়র, আবূ জাফর, উরওয়া ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত لَااعْتِكَافَ اِلَّا فِىْ مَسْجِدِ جُمُعَةٍ জুম'আর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না। আগেরকালের সব ফিকাহবিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ই'তিকাফের শর্ত হচ্ছে তা অবশ্যই মসজিদে হবে। সে মসজিদ সাধারণভাবে সব মসজিদ কি বিশেষ বিশেষ মসজিদ, এ ব্যাপারে যে মত-পার্থক্য তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে জামা'আত (জুম'আ) অনুষ্ঠিত হয় যে সব মসজিদে তার প্রত্যেকটিতেই যে ই'তিকাফ জায়েয, এ বিষয়ে বিভিন্ন ফিকাহবিদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে ইমাম মালিক থেকে সামান্য একটু কথা বলা হয়েছে। ইবনে আবদুল হিকাম সে কথাটুকুর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, জামে মসজিদ বা মসজিদের প্রশস্ত আঙ্গিনা—যেখানে নামায জায়েয—ছারা অন্য কোথায়ও কেউ ই'তিকাফ করবে না। আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ 'এবং তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফরত আছ' এর বাহ্যিক অর্থ সবরকমের মসজিদেই ই'তিকাফ জায়েয প্রমাণ করে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে কোন বিশেষীকরণ নেই। কোনটিতে বিশেষীকরণের মত কারো থাকলে তার দলীল পেশ করা উচিত। আর জুম'আর মসজিদকে বিশেষ করে বলারও কোন দলীল মূলত নেই। যেমন নবীগণের মসজিদকে বিশেষী করারও কোন দলীল নেই। আর যে কথার সমর্থনে কোন দলীল নেই, তা গণ্য হওয়ারও যোগ্য নয়।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاتُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا -

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও যাওয়ার জন্যে যানবাহন প্রস্তুত করবেন না।

এ থেকে তো উক্ত তিনটি মসজিদকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা এবং ই'তিকাফ কেবল এ তিনটি মসজিদেই হয় বলা তো দলীল ভিত্তিক কথা? সেই সাথে নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও।

মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সব মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে নামায পড়া অধিক উত্তম।

প্রমাণ করে যে, এ দুটি মসজিদকে অন্যান্য মসজিদের মুকাবিলায় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে যে, হ্যাঁ, নবী করীম (স) এই তিনটি মসজিদকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন বিশেষ একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে আর অপর দুটি মসজিদকে চিহ্নিত করেছেন অপর একটি অবস্থায়। এ মসজিদ তিনটি অন্যান্য সব মসজিদ অপেক্ষা অধিক ফযীলতপূর্ণ, এটা তারই দলীল মাত্র। আমরাও তাই বলি, যা নবী করীম (স) বলেছেন। কিন্তু এ দুটি বা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিকাফ জায়েয হবে না, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না। যেমন এ দুটি ছাড়া কোথায়ও জুম'আর জামা'আত করা জায়েয হবে না বলে প্রমাণিত হয় না। অতএব মূল আয়াত যা সাধারণ করেছে, তাকে বিশেষীকরণ করা আমাদের পক্ষে জায়েয যাতে পারে না। বিশেষ করে যখন সে বিশেষীকরণের কোন দলীলই নেই। ইমাম মালিকের যে মতটিতে এই বিশেষীকরণ এসেছে জুম'আর সাধারণ মসজিদ থেকে কয়েকটি বিশেষ মসজিদকে, তার কোন অর্থ হয় না। যেমন সব মসজিদেই জুম'আর নামায হতে পারে, কোথায়ও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে সবটাতেই ই'তিকাফ হতে পারে, কোথায়ও নিষিদ্ধ নয়। তাহলে বিশেষভাবে কোন জুম'আর মসজিদে ই'তিকাফ হবে' আর কোন কোন মসজিদে হবে না, একথা কি করে বলা যেতে পারে। তবে মেয়েদের ই'তিকাফ করার স্থান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মত-পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, 'মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরের মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও ই'তিকাফ করবে না। জুম'আর মসজিদে তারা ই'তিকাফ করবে না। ইমাম মালিক বলেছেন, জুম'আর মসজিদেও মেয়েরা ই'তিকাফ করতে পারে। তারা ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করে খুশী হওয়া উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, গোলাম, মেয়েলোক ও মুসাফির যেখানেই ইচ্ছা ই'তিকাফ করতে পারে। কেননা এদের প্রতি জুম'আ ফরয নয়।

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ، وَبَيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ –

তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে আল্লাহ্র মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্যে ভালো।

নবী করীম (স) মেয়েদের ঘরকেই তাদের জন্যে ভালো বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নামায ও ই'তিকাফে তাদের দুই অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মেয়েদের পক্ষেও যখন ই'তিকাফ করা যায়েয, তখন তা তাদের নিজেদে ঘরেই করা উচিত। কেননা নবী করীম (স) তাদের জন্যে তাদের ঘরকেই উত্তম বলেছেন। যদি মসজিদে তাদের ই'তিকাফ করা মুবাহ্ হতো, তাহলে মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম হতো। তাদের ঘর তুলনামূলকভাবে তাদের জন্যে উত্তম হতো না। কেননা মসজিদে যাদের ই'তিকাফ করা মুবাহ্ তাদের ই'তিকাফ মসজিদে হওয়াই শর্ত। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা প্রমাণ করে, বলেছেন ঃ

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِيْ دَارِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ مَسْجِدِهَا، وَصَلَاتُهَا فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِيْ مَخْدَاعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا –

মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরের কক্ষে নামায পড়া তাদের জন্যে উত্তম। আর তাদের ঘরের কক্ষে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের কুঠরির মধ্যে নামায পড়া উত্তম।

মসজিদে মেয়েদের নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরে নামায পড়া যখন তাদের জন্যে উত্তম, তখন ই'তিকাফও সেখানে করাই উত্তম হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের পক্ষে মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। তার দলীল হচ্ছে সেই হাদীসটি যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, উসমান, ইবনে আবূ শাইবা, আবূ মুআবিয়া ও ইয়ালা ইবনে উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ 'নবী করীম (স) যখন ই'তিকাফ করার নিয়ত করতেন, তখন ফজরের নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ই'তিকাফ স্থানে প্রবেশ করতেন।' তিনি বলেছেন, তিনি একবার রমযানের শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন, পরে তিনি তার ঘর নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি দরজায় করাঘাত করলেন—আমি যখন তা দেখলাম আমার জন্যেও নির্মাণ করতে বললাম। তিনি করাঘাত করলেন। আমি ছাড়া নবী করীমের অন্যান্য বেগমদেরকে তা নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি করাঘাত করলেন। ফজরের নামায পড়ার পর তিনি নির্মাণসমূহ দেখলেন। বললেন, এ গুলো কি ? এতো কোন নেক নয়। বললেন, পরে তিনি পুণরায় নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর বেগমগণকে তাদের নির্মাণ কাজের আদেশ করলেন। পরে আমি তা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত ই'তিকাফ বিলম্বিত করেছিলেন।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মসজিদে ই'তিকাফ করা মেয়েদের জন্যে মাকরূহ। কেননা যা নির্মাণ করানো হয়েছিল, তাকে রাসূলে করীম (স) কোন নেক কাজ বলে চিহ্নিত করেননি। নবী করীম (স) রমযানের সে মাসটিতে ই'তিকাফ করলেন না। এজন্যে যে নির্মাণ কাজ হয়েছে, তা তিনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর বেগমদের নির্মাণ কাজগুলোও। তাঁর মতে মেয়েদের ই'তিকাফের কোন অবকাশ থাকলে সংকল্প গ্রহণের পর তা না করে ছাড়তেন না। তাঁর বেগমদের পক্ষেও তা ত্যাগ করা সঙ্গত হতো না। কেননা এটা তো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কাজ। নবী করীম (স) মসজিদে মেয়েদের ই'তিকাফ করা পছন্দ করেননি, একথাও তা থেকে প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ই'তিকাফ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। পরে জয়নব তাঁর নিকট অনুমতি চাইনের। তাঁকেও অনুমতি দিলেন। পরে ফজরের নামায পড়ার পর মসজিদে চারটি নির্মাণ কাজ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এ গুলো কি? লোকেরা বললেন, এগুলো জয়নব, হাফসা ও আয়েশার নির্মাণ। তখন তিনি বললেন, এটা কোন নেক কাজ নয়। পরে তাঁরা আর ই'তিকাফ করেননি। এ হাদীসে মেয়েলোকদের ই'তিকাফ করার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর অনুমতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাবে বলা যায়, রাসূলে করীম (স) মেয়েদেরকে মসজিদে ই'তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন, এমন কোন কথা উক্ত হাদীসে নেই। সম্ভবত ঃ তাঁদেরকে তাদের ঘরে ই'তিকাফ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া তিনি যখন মসজিদে মেয়েদের নির্মাণসমূহ দেখলেন, তখন তিনি ই'তিকাফ করা ত্যাগ করলেন। তাঁরাও ই'তিকাফ করলেন না। বোঝা গেল, শুরুতেই তাঁদেরকে ই'তিকাফ করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তা মসজিদে করার অনুমতি ছিল না। যদি মসজিদে করার অনুমতি ছিল বলে ধরা হয়, তাহলে তা মাকরূহ হওয়ার কারণে মনসূখ হয়ে গেছে। আর রাসূলের শেষ নির্দেশ প্রথম নির্দেশের তুলনায় উত্তম ছিল।

যদি বলা হয়, তাতে অনুমতি মনসূখ হয়ে গেছে, বলা যেতে পারে না। কেননা কাজটি করতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই তার মনসূখ হয়ে যাওয়া তোমাদের মতেই জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, তারা সামান্য সময়ের ই'তিকাফ করেছেন। কেননা সে দিনের ফজর উদয় হওয়ার সময় থেকে নবী করীম (স)-এর তাদের কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা পর্যন্ত অনেক সময় ছিল। তাতে ই'তিকাফ করতে সমর্থ হওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব থাকেনি। এর ফলে পরবর্তীতে তার মনসূখ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যার উপর জুম'আ ফরয নয়, সে যেখানে ইচ্ছা ই'তিকাফ করতে পারে। তাঁর এ কথার কোন অর্থ নেই। কেননা ই'তিকাফের জুম'আর নামাযের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সকল প্রকারের মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয হওয়া বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী আমাদের সাথে একমত রয়েছেন। জুম'আ যার উপর ফরয এবং যার উপর ফরয নয়, তাদের উভয়ের ব্যাপার অভিন্ন। তাদের ই'তিকাফের স্থানের ব্যাপারে কোন পার্থক্য

হয় না। তবে মেয়েদের জন্যে মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। কেননা মসজিদে পুরুষদের সাথে তাদেরকে একত্রে অবস্থান করতে হয়। আর তা তাদের জন্যে মাকরূহ। তা ই'তিকাফ করা অবস্থায় হোক, বা অন্য অবস্থায়। তবে অন্যদের জন্যে হুকুম বিভিন্ন নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ রত' কথাটি কার উপর জুম'আ ফরয, কার উপর নয়, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ই'তিকাফ করার ব্যাপারে এ দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। কেননা ই'তিকাফ তো নফল ইবাদত, কারোর উপর তা ফরয নয়।

ই'তিকাফ-এর সময় কত, এ নিয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য হয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও শাফেয়ী বলেছেন, ই'তিকাফ একদিনের আর যা ইচ্ছা তাই। যেলোক ই'তিকাফ করা শুরু করল, (দুটি বর্ণনার একটির মতে) ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই, সে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে, ততক্ষণ ই'তিকাফকারী। তার যখন ইচ্ছা, তা শেষও করতে পারে। তবে ই'তিকাফ করার সময়ে তাকে রোযাদার থাকতে হবে। অপর বর্ণনায় ই'তিকাফকারীকে একটি দিন সম্পূর্ণ করতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদদের বর্ণনা এ ব্যাপারে বিভিন্ন। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমি শুনেছি, একজন লোক দশ দিনের কম সময়ের ই'তিকাফ করেছে, যে তা করবে, তার উপর কোন কিছু চাপবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলতেন, ই'তিকাফ হচ্ছে একদিন একরাত্রি। পরে এই মত প্রত্যাহার করেছেন। বলেছেন, দশ দিনের কমে ই'তিকাফ হয় না। উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, দশ দিনের কমে ই'তিকাফ করা আমি পছন্দ করিনা।

আবূ বকর বলেছেন, ই'তিকাফের সময়কাল নির্ধারণ তওকীফ দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথবা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে পারে। কিন্তু এ দুটোই অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও যদি কেউ সময়কাল সীমিত করে, তাহলে তা জোরপূর্বক করা হবে কোন দলীল ছাড়াই।

যদি বলা হয়, দশ দিনের সময় নির্ধারণ করা যায় একটি হাদীসের ভিত্তিতে। বর্ণনাটি হচ্ছে, নবী করীম (স) রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ করতেন। এ বর্ণনাও আছে যে, তিনি কোন কোন বছর শওয়াল মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ করেছেন। তার কম সময়ের ইতিকাফ তিনি করেছেন, তার কোন বর্ণনা নেই।

জবাবে বলা যাবে, ফিকাহ্বিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন নি যে, নবী করীম (স) যে ই'তিকাফ করেছেন, তা ওয়াজিব ছিল না। তা কারোর উপরই ওয়াজিব ফরয নয়। তাঁর ই'তিকাফই যখন ফরয ছিল না, তখন প্রথম দশ দিন নির্দিষ্ট করা অন্ততঃ তাঁর আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও তিনি কাউকে তা করতে নিষেধ করেন নি। তাই আমরা বলব দশ দিনের ই'তিকাফ করা জায়েয, তার কম যায়েয নয়, এ কথা বলার জন্যে দলীলের প্রয়োজন। আল্লাহ তো নিঃশর্তভাবে শুধু ই'তিকাফের কথারই উল্লেখ করেছেন মাত্র। সেজন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট করেন নি। সময়ের পরিমাণও বলেন নি। তাই দলীল ছাড়া তা নির্দিষ্ট ও সীমিত করা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না।

রোযা ছাড়া ই'তিকাফ জায়েয কি ?

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ -

তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করতে থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না।

পূর্বেই আমরা বলেছি, 'ই'তিকাফ' একটি শরীয়াত নির্ধারিত নাম। এ ধরনের নাম রাখা হলে তা এমন একটি অস্পষ্ট ও মোটামুটি কথা হয়, যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একান্তই আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আতা ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) এই মত বলেছেন যে, ই'তিকাফকারীর রোযা রাখা উচিত। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারীর রোযা রাখা সুন্নাত। হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। শাবী, ইবরাহীম, মুজাহিদ প্রমুখেরও এই মত। অন্যান্যরা বলেছেন, রোযা ছাড়াও ই'তিকাফ হয়। আল হিকাম আলী, আবদুল্লাহ, কাতাদাহ, হাসান, সাঈদ, আবূ মাশর, ইবরাহীম থেকে এই মতের উল্লেখ করেছেন, ই'তিকাফকারী ইচ্ছা হলে রোযা রাখবে, না হয় রাখবে না। তাউস ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, সওরী ও আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হবে না, লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, ইতিকাফ রমযান মাসে করতে হয়। রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ও ই'তিকাফ হয়। যে তা অতিক্রম করবে, তার সেই কর্তব্য, যা ই'তিকাফকারীর উপর রোযা রাখা কর্তব্য হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রোযা ছাড়াও ই'তিকাফ করা যায়।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে বলেছি, 'ই'তিকাফ' একটি নাম, অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নবী করীম (স) ই'তিকাফে যা করেছেন, তা সবই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাই তা ওয়াজিব হিসেবেই হওয়া উচিত। কেননা তাঁর কাজ যখন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, তা ওয়াজিব হবে। তবে যার দলীল পাওয়া যাবে তার কথা স্বতন্ত্র। তাই নবী করীম (স) থেকে যখন এটা প্রমাণিত যে, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না, তখন রোযা ই'তিকাফের জন্যে শর্ত হওয়া উচিত। তাই তাছাড়া ই'তিকাফ হবে না। যেমন নামাযে রাক'আত ঠিক করা, কিয়াম, রুকূ ও সিজদা ইত্যাদি। তা যখন ব্যাখ্যা হিসেবে হচ্ছে, তখন তা ওয়াজিব হিসেবেই হবে। আর সুন্নাত পাওয়া যায় সেই হাদীসে যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে ইবরাহীম, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে বুদায়ল ইবনে অরকা আল-লাইসী, আমর ইবনে দীনার, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) জাহিলিয়াতের যুগে কাবার নিকট এক রাত্রি ও এক দিনের ই'তিকাফ করা নিজের জন্যে ফরয করে। পরে ইসলামের যুগে এ বিষয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, হ্যা, ই'তিকাফ কর ও রোযা থাক।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আবান ইবনে সালিহ আল-কুরাশী, অমর ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে বুদায়ল তাঁর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-এর আদেশ তো ওয়াজিব। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, রোযা ই'তিকাফের শর্ত। হযরত আয়েশা (রা)-এর কথাও এ কথারই প্রমাণ। তিনি বলেছেন ঃ مِنْ سُنَّةِ الْمُعْتَكِفِ اَنْ يَّصُوْمَ 'ই'তিকাফকারীর জন্যে রোযা রাখাই সুন্নাত।' একটু চিন্তা করলেও এর যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যায়। মানত মানা হলে সেজন্যে রোযা যে বাধ্যতামূলক, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। ই'তিকাফের সাথে রোযার এই সম্পর্ক না থাকলে মানত মানার কারণে তা বাধ্যতামূলক হতো না। কেননা যা মূলতই ওয়াজিব নয়, তার মানত মানলে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় না। তথা ওয়াজিবও হয় না। যেমন যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে মূল জিনিস নয়, তার দ্বারা নৈকট্য হয় না। একথাও একটা প্রমাণ যে, ই'তিকাফ হচ্ছে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ। যেমন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হয়, মিনাতে থাকতে হয়। অথচ একটি স্থানে অবস্থান করলেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হবে না। তবে তার সাথে যদি অপর কোন তাৎপর্য মিলানো হয় যা আসলে নৈকট্যমূলক, তাহলে ভিন্ন কথা। তাই আরাফাতে অবস্থান ইহ্রাম সহ হতে হয় এবং মিনাতে অবস্থান প্রস্তর নিক্ষেপের সাথে জড়িত।

যদি বলা হয়, রোযা যদি ই'তিকাফের শর্ত হতো, তাহলে রাত্রিকালে ই'তিকাফ থাকত না। কেননা রোযার সাথে রাত্রের কোন সম্পর্ক নেই।

জবাবে বলা যাবে, ই'তিকাফের শর্ত হচ্ছে মসজিদে অবস্থান গ্রহণ। পরে প্রাকৃতিক হাজতের জন্যে বা জুম'আর নামাযের জন্যে বের হলেই ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায় না। তাতে মসজিদে আটকে থাকাকে ইতিকাফের শর্ত হতে বাঁধা হয়নি। রোযাও তেমনি একটি শর্ত বিশেষ এবং রাত্রিকালে রোযা না রেখেও ই'তিকাফ সহীহ হতে পারে। তাতে তার শর্ত হওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। মিনাতে পাথর নিক্ষেপের জন্যে অবস্থান নৈকট্যমূলক ইবাদত। পরবর্তি দিনের বেলা পাথর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য আগের রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করতে হয়। রাত্রিকালে ই'তিকাফ সহীহ হবে পরবর্তীদিনে রোযা রাখার জন্যে।

ই'তিকাফকারীর পক্ষে কোন্ কাজ জায়েয ?

'আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ রত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না।' মূল আয়াতে নিষিদ্ধ হচ্ছে 'মুবাশিরাত' করা। প্রকৃত 'মুবাশিরাত' হচ্ছে চামড়ার সাথে চামড়া মিলানো—তা দেহের যে কোন স্থান থেকে হোক না কেন। তা যৌন সঙ্গমের প্রতিও ইঙ্গিত করে। যেমন 'স্পর্শ' বললেও 'সঙ্গম' বোঝায়। আসলে তা হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করাও বোঝায়। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

এখনে তোমরা সঙ্গম কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখেছেন, তা পেতে চাও

এর অর্থ, সঙ্গম কর। সকলেই একমত যে, আলোচ্য আয়াতটি ই'তিকাফকারীর জন্যে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটাই আয়াতের অর্থ। তাই সঙ্গমের ইচ্ছা করাও নিষিদ্ধ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যদিও মূলত সঙ্গম নিষিদ্ধ। কেননা একটি শব্দের একটা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ হতে পারে যেমন, তেমনি পরোক্ষ অর্থও হতে পারে।

ই'তিকাফকারীর হাত দিয়ে স্পর্শ করা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাতে দোষ নেই, যদি তা প্রবল যৌন কামনা সহকারে না হয়, যদি নিজেকে বিরত রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস হয়। ই'তিকাফকারীর উচিত নয় প্রবল যৌন কামনা সহকারে স্ত্রীকে স্পর্শ করা। ই'তিকাফ—রাতে হোক, বা দিনে। যদি সেই অবস্থায় করে এবং তাতে বীর্য স্খলিত হয়, তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। বীর্য স্খলিত না হলে ই'তিকাফ বিনষ্ট হবে না, তবে কাজটি সে ভালো করে নি।

ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, স্ত্রীকে চুম্বন করলেই ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল মুজানী ইমাম শাফেয়ীর এ মত উদ্ধৃত করেছেন, দুজনের চামড়া পরস্পর মিলিত হলেই ই'তিকাফ নষ্ট হল। অপর একস্থানে বলেছেন, যে সঙ্গম দণ্ডযোগ্য, কেবল তার কারণেই ই'তিকাফ বিনষ্ট হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগেই বলে এসেছি যে, আয়াতের 'মুবাশিরাত' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে সঙ্গম। শুধু হাতে হাতে ধরা বা চুম্বন করা নয়। আবূ ইউসুফও তা-ই বলেছেন, 'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফকারী থাকা অবস্থায় 'মুবাশিরাত' করো না, এর অর্থ সঙ্গম করো না। হাসানুল বসরীর কথা হচ্ছে, 'মুবাশিরাত' অর্থ বিয়ে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, ই'তিকাফকারী স্ত্রী সঙ্গম করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। দহক বলেছেন, লোকেরা ই'তিকাফরত থাকা অবস্থায় সঙ্গম করত। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কাতাদাহ্ বলেছে, লোকেরা ই'তিকাফে বসে পরে মসজিদের বাইরে গিয়ে স্ত্রী সহবাস করে আবার মসজিদে ফিরে এসে ই'তিকাফ করত। উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাদেরকে নিষেধ করেছেন। তাঁদের এসব কথা থেকে বোঝা যায় যে, তারা 'মুবাশিরাত' শব্দের অর্থ নিয়েছেন সঙ্গম। শুধু স্পর্শ করা বা হাতে ধরা নয়। ই'তিকাফকারীর পক্ষে যৌন কামনা ব্যতিরেকে ধরাধরি করা মুবাহ। একথার প্রমাণ হচ্ছে উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে জুহরী বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলে করীম (স)-এর মাথায় চিরুনী লাগাচ্ছিলেন যখন রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করছিলেন। সে সময় নিশ্চয়ই রাসূল (স)-কে স্পর্শ করছিলেন। তা থেকে বোঝা গেল, যৌন কামনা ব্যতীত স্পর্শ নিষিদ্ধ নয় ই'তিকাফকারীর জন্যে। উপরন্তু একথা যখন প্রমাণিত হল যে, ই'তিকাফ অর্থ রোযা—সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়ার দিকদিয়ে। আর রোযা ধরাধরি ও যৌন কামনাহীন চুম্বনের প্রতিবন্ধক নয়—যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারা নিশ্চিত হয়। একথা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু প্রসিদ্ধ হাদীস।

তা থেকে বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ যৌন কামনাহীন চুম্বনের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু রোযায় যৌন সঙ্গম ও যৌনকামনপূর্ণ চুম্বন দুটিই নিষিদ্ধ। তাই ই'তিকাফেও এ দুটির হুকুম তা-ই হওয়া উচিত। রোযা থাকা অবস্থায় ধরা-ধরির ফলে বীর্য স্খলিত হলে রোযা

নষ্ট হয়ে যায়। তখন ই'তিকাফও নষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ই'তিকাফ ও রোযা দুটি একই বিশেষত্ব সম্পন্ন, দুটিতেই যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ, যদিও সুগন্ধি ব্যবহার ও পোশাকের দাবি ব্যতিরেকে।

যদি বলা হয়, ইহরামকারী যদি যৌন কামনা উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করে, তাহলে তাকে একটা জন্তু যবেহ করতে হয়, বীর্য স্খলিত না হলেও। তাহলে অনুরূপ অবস্থা হলে ই'তিকাফ কেন নষ্ট হবে না ?

জবাবে বলা যাবে, ইহরাম ই'তিকাফের মূল নয়। ইহরাম বাঁধার পর যৌন সঙ্গম ও তার আনুসঙ্গিক সুগন্ধি ব্যবহারও নিষিদ্ধ। সোবাহ্‌-সন্দেহ শিকার ও নিজের শরীর থেকে ময়লা দূরকরণও নিষিদ্ধ। কিন্তু ই'তিকাফকারীর জন্যে এগুলো নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহরাম ই'তিকাফের জন্যে মূল নয়। ইহরাম বাধলে যেসব হুকুম আহকাম পালনীয় হয়, তাতে তার মর্যাদা অনেক বড়। সেই মুহরিম—যে ইহরাম বেঁধেছে—তার জন্যে স্ত্রী সঙ্গমের সুখ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তা তো সে ধরা-ধরি, গালাগালি, মেলা-মেশা থেকেই পেয়ে গেল, যদিও তাতে বীর্য স্খলিত হয় না। তার জন্তু যবেহ করা কর্তব্য হয়। কেননা সে স্ত্রী সুখ অর্জন করেছে, যা তার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। সুগন্ধি ও পোশাক দ্বারা সুখ লাভের মতই তা হয়ে গেল, এ কারণে একটি জন্তু যবেহ করা তার কর্তব্য হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, বীর্য স্খলিত হলেও তা ই'তিকাফ নষ্ট করবে না। যেমন তার দরুন ইহরাম নষ্ট হয় না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা বলেছি তাকে ই'তিকাফ নষ্ট হওয়ার কারণ বলছি না। কাজেই কারণ দর্শানোর দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তে না। আমরা তো বলেছি, স্ত্রী-স্বামী মেলা-মেশা, ধরাধরি করার দরুন বীর্য স্খলিত হলে তবেই তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন এই লোকের রোযাও নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমরা মত দিয়েছি। ইহরাম কিন্তু কার্যত স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করলে এবং ইহরামে নিষিদ্ধ অন্যান্য কাজের দরুন নষ্ট হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। তা ই'তিকাফকে বিনষ্ট করে না। যেমন স্পর্শ, সুগন্ধি ব্যবহার ও শিকার করা—ইহরামে এ সবই নিষিদ্ধ কিন্তু তার মধ্যে পড়ে গেলে ই'তিকাফ বিনষ্ট হয় না। অতএব ইহরামে যা নিষিদ্ধ তা পাওয়া গেলেও ইহরামের স্থিত থাকা ই'তিকাফ ও রোযার তুলনায় অনেক বড়। রোযা যেসব কাজকে নিষিদ্ধ করে, তা করা হলে রোযা ভেঙ্গে যায়। যেমন পান-আহার। অনুরূপভাবে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা বলেছি, ই'তিকাফে স্বামী-স্ত্রীর গা ডলাডলি করার ফলে বীর্য স্খলিত হলে তাকে নষ্ট করে দেবে। যেমন রোযাও ভেঙ্গে দেবে। আর তা না ঘটলে ই'তিকাফ ভাঙ্গার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। যেমন প্রভাব ফেলবে না রোযা নষ্ট করায়।

ই'তিকাফকারীর ব্যাপারে কয়েকটি জিনিসে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য হয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ই'তিকাফকারী—যে লোক ওয়াজিব ই'তিকাফে বসেছে—একদিন ও একরাত মসজিদের বাইরে যাবে না। তবে প্রস্রাব-পায়খানা ও জুমা'আর নামাযে হাজির হওয়ার মত অত্যাবশ্যকীয় কাজে অবশ্যই বাইরে যেতে পারবে। রোগীকে দেখার জন্যে বাইরে যাবে না। জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যেও যাবে

না। তবে ক্রয়-বিক্রয় করা, মসজিদে কথাবার্তা বলা ও গুনাহ্ নয় এমন কাজে মশগুল হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বিবাহ-শাদীও হতে পারে। ই'তিকাফে কেবল চুপ করে থাকাই জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ীও এরূপ মত দিয়েছেন।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মতের উল্লেখ করেছেন যে, ই'তিকাফকারী ব্যবসায় ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করবে না। ই'তিকাফে মশগুল থাকাই তার কর্তব্য। তার শিল্প কর্ম ও পরিবারের জন্যে কল্যাণমূলক কাজের আদেশ করায় কোন দোষ হবে না। নিজের মাল বা অন্য কিছু বিক্রয় করা যেন তাকে ব্যস্ত করে না তোলে। হালকাভাবে হলে কোন দোষ হবে না। ই'তিকাফকারীর ই'তিকাফ হবে না যদি এই অবস্থায় যেসব জিনিস পরিহার করা দরকার তা পরিহার না করে। ই'তিকাফকারীর বিয়ে হতে দোষ নেই, যদি ঝাগড়া-ঝাটি না ঘটে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, ই'তিকাফকারী তার কোন বিপদে সহনুভূতি প্রকাশ করতে আসা ব্যক্তির জন্যে দাঁড়াবে না, মসজিদে অনুষ্ঠিত বিয়েতে যদি উঠে যেতে হয়, তাহলে তাতে উপস্থিত হবে না। তবে সে যেখানে বসা আছে সেখানেই যদি অনুষ্ঠান হয়, তাহলে উপস্থিত থাকায় দোষ হবে না বলে মনে করি। বিবাহকারীকে মুবারকবাদ দেয়ার জন্যে উঠে যাবে না। জ্ঞান চর্চার মজলিসে, জ্ঞান লেখার মজলিসে মশগুল হবে না। এটা মাকরূহ। হালকা ধরনের কেনা-বেচা করতে দোষ নেই। সুফিয়ান সওরী বলেছে, ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে যেতে পারবে, জুম'আর নামাযের জন্যে যেতে পারবে। মসজিদে যে কাজ ভালোভাবে করা যায় না, তা করার জন্যে পরিবারের কাছে নিজের ঘরে যেতে পারবে। তবে ছাদ দিয়ে ঢাকা স্থানে প্রবেশ করবে না। কিন্তু তা যদি যাতায়াতের পথ হয়, তবে ভিন্ন কথা। তার পরিবারবর্গের নিকট বসবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবারবর্গকে পরামর্শ দিতে পারে, হাঁটা চলা করতে পারে, বেচবে না, কিনবেও না। যদি ছাদ ঘেরা স্থানে যায়, তাহলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, ই'তিকাফকারী যদি কোন ঘরে প্রবেশ করে, যেটা তার যাওয়ার পথ নয় কিংবা স্ত্রী সঙ্গম করে, তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সে জানাযায় হাজির হতে পারে, রোগী দেখতে যেতে পারে। অযূ করার জন্যে বাইরে যেতে পারে। কোন রোগীর ঘরে যেতে পারে। তবে বেচা-কেনা করা মাকরূহ।

আবূ বকর বলেছেন, জুহরী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যির, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ই'তিকাফকারীর জন্যে সুন্নাত হচ্ছে, সে মসজিদ থেকে বাইরে যাবে না মানবিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্যে। সে জানাযার মিছিলে যাবে না, রোগী দেখতে যাবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে গা ডলাডলি করবে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও মুজাহিদ দুজনই বলেছেন, ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে যাবে না। বাইরের দাওয়াতে যাবে না, জানাযায়ও হাজির হবে না। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারীর রোগী দেখতে যাওয়া কর্তব্য নয়, জানাযার মিছিলে শরীক হবে না। এখানে যাঁদের মত উদ্ধৃত করা হল, এরা হল সাহাবী ও তাবেয়ীন। এরাঁ ই'তিকাফকারী সম্পর্কে এসব কথাই বলেছেন। অন্যরা এদের বিপরীত কথা বলেছেন। আবূ ইসহাক আসিম ইবনে সখরাতা,

আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারী জুম'আর নামাযে শরীক হতে পারে, রোগী দেখতে যেতে পারে, জানাযার মিছিলেও যেতে পারে। হাসান আমের ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকেও এরূপ কথা-ই বর্ণিত করেছেন, ই'তিকাফকারীর মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়ার ও কেনা-কাটা করায় কোন দোষ নেই।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, কানবী, মালিক, ইবনে শিহাব, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র, উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান, আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করাকালে তাঁর মাথা আমার নিকটে দিতেন, আমি তাঁর মাথায় চিরুনী চালাতাম, মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না। এ হাদীস থেকে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজর জন্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স)-এর কাজ তো ই'তিকাফকারীর জন্যে ব্যাখ্যা। আর তাঁর কাজে যখন ব্যাখ্যা পর্যায়ের হয়, তখন তা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে উক্ত হাদীসের আলোকে ই'তিকাফকারীর মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হল। মানবীয় প্রয়োজন বলতে পায়খানা, প্রশ্রাব মনে করা হয়েছে। ই'তিকাফের শর্ত-ই হল মসজিদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ। আল্লাহ্‌র আয়াতে ই'তিকাফ কথার সাথে মসজিদ সংলগ্ন হয়ে আছে। তাই মানবীয় প্রয়োজন, ফরয জুম'আ আদায় ছাড়া অন্য কোন কাজে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। কেননা একথা জানা-ই আছে, সে ই'তিকাফকে নিজের উপর এভাবে ধার্য করেনি যে, ওয়াজিবকে সে নফল করে দিবে ও জুম'আর নামায সে ত্যাগ করতে চায়, যা তার উপর ফরয, কাজেই জুম'আয় যাওয়াটা ই'তিকাফের অবস্থান থেকে বাইরে গণ্য হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত' কি প্রমাণ করে না যে, স্থায়ীভাবে মসজিদে অবস্থান করা ই'তিকাফের শর্ত ? কেননা আয়াতে একটা অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা তার উপর হয়। তার উপর যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া যোগ হয়েছে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে তখন। ই'তিফাক করাকালে মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া তো প্রমাণ করে না ?

জবাবে বলা যাবে, একথা দুটি কারণে ভুল। একটি, একথা জানা যে, ই'তিকাফকারীর জন্যে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে তার মসজিদে থাকা অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ই'তিকাফকালে তার ঘরে স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েয নয়, এ বিষয়ে সব ফিকাহবিদই একমত। আগের লোকদের এই মত আমরা উদ্ধৃত করেছি যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে সেই ব্যক্তির প্রসঙ্গে, যে ই'তিকাফ করা অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে তার ঘরে যায় ও স্ত্রী সঙ্গম করে। আর তা যখন এরূপ, তখন প্রমাণিত হল যে, এখানে মসজিদের উল্লেখের সাথে স্ত্রী সঙ্গমের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তা তো ই'তিকাফের শর্ত। ই'তিকাফ তাছাড়া হতেই পারে না। দ্বিতীয় কারণ হল 'ই'তিকাফ' শব্দটির আভিধানিক অর্থই হচ্ছে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ। এরপর আল্লাহ এই শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অতএব অবস্থান গ্রহণই তার অর্থ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপ। তার আরও যদি কোন অর্থ করা হয়; যা আভিধানিক অর্থে ছিল না, যেমন সিয়াম। অভিধানে তার অর্থ বিরত থাকা, না করা। পরে শরীয়াতের পরিভাষায় অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে তার শর্ত হওয়ার

অর্থ বাদ পড়ে যায়নি। কেননা তা তার এমন পরিচিতি, যা ছাড়া রোযা হতেই পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ই'তিকাফ হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করা। তাই নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজ ও জুম'আর নামায আদায় ছাড়া অন্য কোন কাজে মসজিদ থেকে বাইরে যেতেই পারবে না। যদি সে জুম'আ ফরয হয়, যদিও পূর্বোদ্ধৃত হাদীস এই কথার বিপরীত কথা বলেছে। জানাযায় উপস্থিত হওয়া ও রোগী দেখতে যাওয়া যখন ফরয প্রমাণিত নয়, তখন এ দুটি কাজের জন্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়েয হবে না।

আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, তার পিতা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করাকালে রোগী দেখতে যেতেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর উপর প্রশ্ন তোলা যায় না। জুহরীও উমরাতা, আয়েশাতা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যা উল্লেখ করলাম, তাতে সকলেই যখন একমত, ই'তিকাফকারীর জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। সব নেক আমলের ব্যাপারেও তাই। যেমন মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করা, পরিবারের কাজ করা, এ গুলোতো ভালো কাজ। রোগী দেখতে যাওয়া তেমনি হওয়া উচিত। যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে না। রোগী দেখতে যাওয়া তেমনি। কেননা পারস্পরিক হক-হকুকের দিক দিয়ে এ দুটি সমান। অতএব কুরআন, হাদীস ও যুক্তি আমাদের কথাকেই সহীহ্ প্রমাণ করে। এ পর্যায়ে আল-হায়াজুল খুরাসানীর একটি বর্ণনাকে কেউ দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। তিনি বলছেন, আন-বাসাতা ইবনে আবদুর রহমান আবদুল খালিক, আনাস সূত্রে এ হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ، وَاِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَنَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى يَعُوْدُ اِلَيْهِ -

ই'তিকাফকারী জানাযার মিছিলে যাবে, রোগী দেখতে যাবে। তবে মসজিদ থেকে যখন বের হবে, তখন ফিরে আসা পর্যন্ত তার মাথা আবৃত রাখবে।

এতে ভিন্ন মত প্রকাশ পায়। এর জবাবে বলা যাবে, এই হাদীসের সনদ অজ্ঞাত (مجهول) জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সাথে উক্ত হাদীসের মুকাবিলা হতে পারে না। যিনি বলেছেন যে, ছাদে প্রবেশ করলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে, ছাদ কে বিশেষিত করার এ কথার কোন দলীল নেই, আর শূন্য স্থানের দিক দিয়ে ছাদ ও অন্য স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বস্তুত খোলা জায়গায় বা মরুভূমিতে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হতে পারে না। ছাদ-ও সেই রকম। পণ্যও দাড়ি পাল্লা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করায় তাদের মতে কোন দোষ নেই। বিক্রয় বলতে তাঁরা বুঝেছেন, শুধু মৌখিক কথা বলা, পণ্য ও মূল্য উপস্থাপন বা আদন-প্রদান নয়। তা জায়েয এজন্যে যে, তা মুবাহ্ কাজ। মুবাহ ব্যাপারে কথা-বার্তা বলার মতই ব্যাপার। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একটি দিন রাত পর্যন্ত নির্বাক থাকতে নিষেধ করেছেন। চুপ থাকা যখন নিষিদ্ধ, তখন তার অর্থ হয়, কথা বলতে আদেশ করেছেন। তাই চুপ থাকার বিপরীত মুবাহ কথাবার্তা বলার অবকাশ রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মেরওয়াজী, আবদুর

রাযযাক, মামর, জুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, সফিয়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করছিলেন। তখন রাত্রিকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আমি তার নিকটে আসলাম। আমি তার সাথে কথা-বার্তা বলে উঠলাম ও ফিরে আসলাম। তখন তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। তাঁর (সফিয়ার) বসবাস ছিল উসামা ইবনে জায়দের ঘরে। তখন আনসার বংশের দুজন ব্যক্তির আগমণ হল। তারা নবী করীম (স)-কে দেখতে পেয়ে দ্রুত চলে গেলেন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমাদেরকে বোঝাবার জন্যে বলছি, এ হচ্ছে হাই'র কন্যা সাফিয়া। তারা দুজন বললেন, পবিত্র মহান আল্লাহ্, বললেন, শয়তান তো মানুষের দেহের রক্ত প্রবাহের সাথে সাথে চলে। আমি ভাবলাম, তোমাদের মনে এই অবস্থা দেখে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এ জন্যেই এই কথা বললাম। পরে তিনি তার ই'তিকাফে মশগুল হয়ে গেলেন। যদিও এ সময় তিনি সাফিয়ার সাথে কথা-বার্তা বলছিলেন, তিনি তার সাথে মসজিদের দুয়ার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। যারা বলেন, ই'তিকাফকারী কথা বার্তায় মশগুল হবে না, উক্ত ঘটনা তাদের কথা বাতিল প্রমাণ করে। কথাবার্তা বলবে না, মসজিদের একদিক থেকে অন্য দিকে উঠে যাবে না, এসব কথা প্রমাণবিহীন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে হরব ও মুসাদ্দাদ, হাম্মদ ইবনে যায়দ, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, তার পিতা আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) মসজিদে ই'তিকাফরত থাকা অবস্থায় জানালা পথে তার মাথা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন, আমি তাঁর মাথা ধুইয়ে দিতাম, চিরুনী চালাতাম, এই সময় আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম। এ হাদীসটি থেকে কয়েকটি হুকুম প্রকাশিত হয়। একটি হল, মসজিদে থাকা অবস্থায় মাথা দৌত করা, স্ত্রীর সাথে কিছুটা মেলা-মেশা-স্পর্শ যৌন উত্তেজনা ছাড়া-ই ই'তিকাফকারীর জন্যে জায়েয। ই'তিকাফ করাকালে মাথা ধৌত করানোও জায়েয। মাথা দৌত করা দেহের সুস্থতার উদ্দেশ্যে। বোঝা গেল, ই'তিকাফকারীর পক্ষে শারীরিক সুস্থতার জন্যে জরুরী কাজ করা জায়েয। এ-ও বোঝা গেলে যে, তার ধন-মালের ভালোর জন্যে কোন না কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও জায়েয। সেটা শরীরের সুস্থতার জন্যে জরুরী কাজের মতই। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

قِتَالُ الْمُؤْمِنَ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فِسْقٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ –

মুমিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী। তাকে গালমন্দ করা ফাসেকী, ইসলামের সীমালঙ্ঘন এবং তার ধন-মাল তেমনি হারাম, যেমন হারাম তার রক্ত।

এ-ও বোঝা গেল যে, ই'তিকাফকারী জাঁকজমক গ্রহণ করতে পারে। কেননা মাথায় চিরুনী চালানো সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি দিক। এ-ও বোঝা গেল যে, যে লোক মসজিদের মধ্যে থেকে তার মাথা বাইরে বের করে দেবে, তা কেউ ধৌত করবে, সে যেন মসজিদেই তাকে গোসল করিয়ে দিল। যদি কেউ কিড়া করে যে, সে মসজিদে অমুকের মাথা ধোবে না, যদি তার মাথা মসজিদের বাইরে রেখে দেয় এবং সে তা ধৌত করে,

তাহলে সে কিড়া ভঙ্গ করল, কিড়াকারী মসজিদের বাইরে থাকলেও। কেননা যাকে ধৌত করা, তার স্থানটিই গণনা করতে হবে, দৌতকারীর স্থান নয়। কেননা ধৌত করার কাজটি কাছাকাছি না এসে তো করা যেতে পারে না। তাই যাকে ধৌত করা হবে, তার সাথে ধৌতকারীকে মিলিত হতে হবে। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিড়া করল এই বলে যে, সে অমুককে মসজিদে মারবে না, তাতে যাকে মারার কথা তাকে মসজিদে থাকতে হবে, যে মারবে তার নয়। এ-ও বোঝা গেল যে, হায়য হয় যে মেয়েলোকের, তার হাত এবং তার খাদ্যাবশিষ্ট পবিত্র। তার হায়য তার হাত ও শরীরের প্রতিবন্ধক নয়। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ حَيْضُكِ فِيْ يَدِكِ –

তোমার হায়য তোমার হাতে তো নয়।

শাসক-বিচারকের রায় কোন্ জিনিস হালাল করে, কোন্ জিনিস হালাল করে না ?

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَاتَاْ كُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ –

এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পারস্পরিক অন্যায়ভাবে ভক্ষণ ও হরণ কর না। আর শাসক-বিচারকদের নিকট তা এজন্যে নিয়েও যেয়ো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছাপূর্বক নিতান্ত অবিচার অমূলকভাবে জেনে-শুনে ভক্ষণ করবে।

এ আয়াতটির ব্যক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোকের ধন-সম্পদ বাতিল উপায়ে খাবে না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ –

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। অর্থাৎ একে অপরকে।

যেমন নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْوَا لُكُمْ وَاَعْرَضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ –

তোমাদের ধন-মাল এবং তোমাদের সম্মান-সম্ভ্রম তোমাদের উপর হারাম —সম্মানার্হ। অর্থাৎ তোমাদের কতক লোকের ধন-মাল (পরস্পরের জন্যে হারাম)।

বাতিল পন্থায় ধন-মাল ভক্ষণ দুভাবে হতে পারে। একটি জুলুম করে গ্রহণ, চুরি করে, আত্মসাত করে, অপহরণ করে ও এই ধরনের অন্যান্য উপায়ে ধন-মাল গ্রহণ। আর দ্বিতীয়, নিষিদ্ধ ঘোষিত পন্থায় ধন-মাল গ্রহণ। যেমন জুয়া খেলা, গান গাওয়ার

পারিশ্রমিক, বাদ্য বাজানোর মজুরি, খেল-তামাসার মজুরি। বিলাপ করার মজুরি, মদ্য বিক্রয়ের মূল্য, শূকর ও স্বাধীন মানুষ বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং আর যে যে জিনিসের মালিক হওয়া জায়েয নয়—যদিও তার মালিকের মনের খুশীতেই দেয়া হোক। আয়াতে এই সকল উপায়ে ধন-মাল গ্রহণকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী কথা ঃ 'এবং তা শাসক-বিচারকদের নিকট নিয়ে যাওয়া' .... যে সব বিষয়ের মীমাংসার জন্যে শাসক-বিচারকদের নিকট উত্থাপন করা হয় এবং তারা সে বিষয়ে বাহ্যিকভাবে কোন রায় দেয়। তারা তা তার জন্যে হালাল করে দেয় একথা জানা সত্ত্বেও যে, যাকে সে মাল দেয়ার রায় দেয়া হচ্ছে, সে বাহ্যত ও মূলত তা পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, শাসক-বিচারকের রায়ে তা গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয হয়ে যায় নি। আমাদের পরস্পরের মাল বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করা সম্পর্কে কঠিন হুমকি দিয়েছেন। পরে জানিয়েছেন যে, শাসক-বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে যে মাল গ্রহণ করা হয়, তা-ও এই বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণের মধ্যে শামিল, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –

হে ঈমানদার লোকগণ! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় খাবে না। তবে তোমাদের সন্তুষ্টি ও রাজী থাকার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের হলে ভিন্ন কথা।

পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও রাজী থাকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে যা কিছু পাওয়া যায়, তা হারাম উপায়ে মাল খাওয়ার বাইরে গণ্য। তা বাতিল উপায় গণ্য করা হয় নি। তবে তা-ও জায়েয ব্যবসা হতে হবে, নিষিদ্ধ ব্যবসা নয়। আমরা এইমাত্র যে আয়াতটি উদ্ধৃত করলাম, তার মূল কথা হল, যে মাল কারোর প্রাপ্য নয়, শাসক-বিচারক তা যদি তার জন্যে হওয়ার রায় দিয়েও দেয়, তবু তা তার জন্যে মুবাহ হবে না।

এ পর্যায়ে অনুরূপ কথা সম্বলিত বহু কয়টি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে বাশর ইবনে মূসা, আল হুমায়দী, আবদুল আযীয ইবনে আবূ হাজিম, উসামাতা ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, উম্মে সালামাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সেখানে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হল, তারা মিরাস ও বিলীন বা পুরাতন হয়ে যাওয়া কিছু জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِرَأْىٍ فِيْمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ اَرَا هَا فَا قْتَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا فَاِنَّمَا يَقْتَطِعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَاْتِىْ بِهَا اَسْطَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ عُنُقِه –

আমি তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে একটি মতের ভিত্তিতে ফায়সালা করি যে বিষয়ে

আমার প্রতি কোন ওহী নাযিল হয়নি। অতএব কোন দলীলের ভিত্তিতে আমার বিবেচনা মতে কারোর জন্যে যদি কোন ফায়সালা করি, তাতে যদি কারোর জন্যে জুলুম করে কোন অংশ দেয়ার ফায়সালা করি, তাহলে তা জাহান্নামেরই একটি অংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তা তার গলার বন্ধক বানিয়ে দেয়া হবে।

এ কথা শুনে লোক দুটি কাঁদতে আরম্ভ করল। তারা প্রত্যেকেই বলে উঠল ঃ হে রাসূল, আমার প্রাপ্য অংশ ওকে দিয়ে দিলাম। তখন নবী করীম (স) বললেন, না, তোমরা দুজন এখন যাও। তোমরা দুজন 'হক' পাওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও। পরে দুজনে অংশ ভাগ করে নাও। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর জন্যে হালাল করে দাও।

এ হাদীসের অর্থ হল, যে বিষয়ে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে যে, বিচারকের হুকুমেই কোন মাল কারোর জন্যে মুবাহ করে দেয় না। অতএব তা নিয়ে নেয়া উচিৎ নয়।

এ হাদীসটিতে আরও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। একটি হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে ইজতিহাদ করেও রায় দিতেন। অবশ্য যে বিষয় ওহী নাযিল হয়নি, সেই বিষয়ে। যেমন উপরোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে আমার নিজের মতের ভিত্তিতে ফায়সালা দেই সেই বিষয়ে, যে বিষয়ে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়নি।

তা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, বিচারক বাহ্যিকভাবে যা বুঝবে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে, সে সেই অনুযায়ীই বিচার করবে। আল্লাহ্র নিকট যা গায়েব, তার ভিত্তিতে বিচার করার কোন দায়িত্ব তার নেই। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, মুজতাহিদ তার সামর্থ্যানুযায়ী ইজতিহাদ করবে, তাতেই সে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছেছে বলে মনে করতে হবে। তার ইজতিহাদ যে পর্যন্ত তাকে পৌছায়নি, সে জন্যে তার কোন দায়িত্ব নেই। লক্ষণীয় যে, খোদ নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, বাহ্যিকভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি সঠিক। গায়েবী দিকদিয়ে তার বিপরীত হলেও দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জন্যে যে জিনিসের ফায়সালা সে দিয়েছে, তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়। একথাও বোঝা যায় যে, বিচারক একজনকে কোন মাল দিয়ে দেয়ার ফায়সালা দিতে পারে—জায়েয, তাকে তা নিতেও হুকুম দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন জানে যে, সে জিনিস সে পেতে পারে না, তখন তার তা নিয়ে নেয়া উচিত নয়।

এ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, কোনরূপ অঙ্গীকার ছাড়া-ই পারস্পরিক সন্ধি করা যেতে পারে, যদিও তারা দুজন জিনিসটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়নি। এ-ও বোঝা যায় যে, জমি-ক্ষেত ইত্যাদির বন্টন অবশ্য কর্তব্য, যখন দুজনের একজন তার দাবি করবে। এ-ও বোঝা যায় যে, বিচারক বা শাসক সে বন্টনের নির্দেশ দিতে পারে। যে বিষয়ে জানা নেই, সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীনতা জায়েয হওয়ার কথাও জানা যায়। কেননা যেসব জিনিস পুরাতন হয়ে গেছে, সেগুলো সম্পর্কে না জেনেও উভয়কে পারস্পরিকভাবে হালাল করে নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো যে মিরাসের জিনিস, পুরাতন হয়ে গেছে, তার উল্লেখ না হলেও তাঁর কথার দাবি-ই তাই ছিল। কেননা যা জানা ও যা অজানা, এদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বিচারকের ছাড়াও দুই

শরীকের পক্ষে তাদের জিনিস পারস্পরিকভাবে বণ্টন করে নেয়া-ও জায়েয। যে কোন অংশ এখনও নির্দিষ্ট হয়নি, তা অন্যকে দান করলে সে তা গ্রহণ না করলে সে দান সহীহ হবে না। তার মালিকানা দাতার নিকট ফিরে যাবে। কেননা দুজনের প্রত্যেকেই অপরজনের দানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের হকটা অন্যজনকে দিয়ে দিয়েছিল। আর এক্ষেত্রে মূল বস্তু ও ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই সকলের অবস্থান অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় দায়িত্বহীনতা ও দান বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে।

যদি কেউ বলে যে, আমার মাল থেকে হাজার টাকা অমুকের জন্যে, তাহলে সেটা তার দান হয়ে যাবে। অঙ্গীকার নয়। রাসূলে করীম (স) উক্ত দুই ব্যক্তির কথাকে অঙ্গীকার গণ্য করেন নি। কেননা তা অঙ্গীকার হলে তার জন্যে সেটা জায়েয হয়ে যেত। পরে তারা সন্ধি করার বণ্টন ও হালাল করার প্রয়োজন বোধ করত না। যে বলল, আমার মাল থেকে অমুকের জন্যে হাজার টাকা, তার সম্পর্কে হানাফী ফিকাহবিদগণ সেই কথাই বলেছেন। সত্য লাভের জন্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করা জায়েয, একথাও জানা যায়। যদিও তা ঠিক 'ইয়াকীন' দৃঢ় প্রত্যয় পর্যায়ের হবে না। কেননা নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ সত্য ও অধিকার পাওয়ার জন্যে তোমরা দুজন চেষ্টা চালিয়ে যাও। বিচারকের নিকট পেশ করা ব্যাপারটি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করার জন্যে ফেরতও দিতে পারে, যদি তা-ই সে ভালো মনে করে। এ জন্যে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন ঃ

رُدُّوا الْخُصُوْمَ كَىْ يَصْطَلِحُوْا -

পারস্পরিক সুরাহ্ করার জন্যে ঝগড়া বিবাদের মামলা ফেরত দিয়ে দাও।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা, যয়নব বিনতে উম্মে সালমা, উম্মে সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালমা বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاَنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَاَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ بِشَىْءٍ فَلَا يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ -

আমি একজন বই তো নয়। আর তোমরা তোমাদের পারস্পরিক বিবাদের বিষয় আমার নিকট নিয়ে আস। আর তোমাদের কেউ হয়ত আর সঙ্গী প্রতিপক্ষের অপেক্ষা প্রমাণ পেশ করতে অধিক বাকপটু, ফলে আমি তার কাছ থেকে যা শুনতে পাই, তারই ভিত্তিতে ফায়সালা দেই। এরূপ অবস্থায় আমি যদি কারোর পক্ষে তার ভাইর 'হক' দেয়ার রায় দেই, তাহলে তা সে যেন গ্রহণ না করে। কেননা আমি তো তাকে জাহান্নামের একটা খণ্ড দেয়ার রায় দিয়েছি।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, রুবাই ইবনে নাফে, ইবনুল মুবারক-উসামা ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফে, উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বিবদমান দুই ব্যক্তি আসল। তাদের ঝগড়া ছিল তাদের মিরাসের ব্যাপার নিয়ে। তাদের মৌখিক দাবি ছাড়া কারোর কোন প্রমাণ ছিল না। তখন নবী করীম (স) বললেন, ... অতঃপর পূর্ব হাদীসের কথাগুলো বলা হয়েছে। পরে সে ব্যক্তিদ্বয় কাঁদতে লাগল এবং প্রত্যেকেই বলতে লাগল ঃ আমার অংশ তোমাকে দিলাম। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা করেছ তো করেছ। এখন তোমরা মিরাস ভাগ করে নাও, তাতে হক পাওয়ার জন্যে দুজনই চেষ্টা কর। পরে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও।

এ দুটি হাদীস-ই পূর্বোদ্ধৃত হাদীসটির মতই। সব কয়টিরই বক্তব্য হল, বিচারক কারোর পক্ষে রায় দিলেও সে যখন জানে যে, সে তা পায় না, তখন তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়।

এতে আরো অনেক তত্ত্ব রয়েছে। যয়নব বিনতে উম্মে সালমাতা বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ اَقْضِىْ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ 'আমি যা শুনি তারই ভিত্তিতে ফায়সালা দেই' থেকে প্রমাণিত হয় যে, লোক নিজের সম্পর্কে যা অঙ্গীকার করে, তার নিজের পক্ষে সে কথার স্বীকৃতি দেয়া জায়েয। কেনন নবী করীম (স) উক্ত কথাটির মাধ্যমে এই স্বীকারোক্তি করেছেন যে, তিনি যা শুনেন, তারই ভিত্তিতে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী যে বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, তা থেকে যা শুনা যায়, বিচারের রায়টা তেমনি হবে—এত স্বাভাবিক। যে বিষয়ে ফায়সালা দেবে তাতে ব্যবহৃত শব্দের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফে বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ 'তোমরা মিরাস ভাগ করে নাও, হক পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে থাক। তারপরে নিজের নিজের অংশ নিয়ে নাও।' এ হল 'কুরয়া' ফেলে অংশ নিয়ে নেয়া। বন্টনের সময় কোন ভাগ কে নেবে, তা নির্ধারণের জন্যে এরূপ করা হয়ে থাকে। এ থেকে বন্টনের সময় 'কুরয়া' ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয়। বিচারক যার জন্যে যে ফায়সালা দেবে, তাতে যার পক্ষে রায় পড়েছে সে যদি জানতে পারে যে, আসলে যার পক্ষে রায় যায়নি, জিনিসটা তার-ই প্রাপ্য, তাহলে তা নেয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মত একমত। অন্য ব্যক্তির রক্ষিত জিনিসের উপর যদি কেউ দাবি দায়ের করে, তার প্রমাণও সে দেয়, ফলে ফায়সালা তার পক্ষে চলে যায়, তবু তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা জিনিসটা মূলত তার নয়। এরূপ অবস্থায় বিচারকের রায় যদি তার পক্ষে যায়, তবু তা তার জন্যে মুবাহ্ হবে না। কেননা তা তার জন্যে পূর্বেই মুবাহ্ ছিল।

সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে কোন চুক্তির পক্ষে বা তা ভঙ্গের পক্ষে বিচারক রায় দিলে যার পক্ষে রায় গেছে সে যদি জানে যে, সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহলে বিচারকের রায়ের কি হবে, এ নিয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, বিচারক যখন কোন চুক্তির বিষয়ে বা তা ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেয় তা অবশ্যই কার্যকর হবে। তখন তা এমন একটি চুক্তি গণ্য হবে, যা দুই ব্যক্তির মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়েছে, যদিও তার সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্যই দিয়েছে। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও শাফেয়ী বলেছেন, বিচারকের রায় বাহ্যিকভাবে যেমন, অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও তেমন। আবূ ইউসূফ বলেছেন, বিচারক যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের রায় দেয়, তাহলে স্ত্রীর পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ জায়েয হবে না। অবশ্য তার স্বামীও স্ত্রীর নিকটে যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ হানীফার যে মত তা হযরত আলী, ইবনে উমর (রা) এবং শবীরও মত বলে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ আমর ইবনুল মেকদাম, তাঁর পিতা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হাই গোত্রের এক ব্যক্তি একটি মেয়েলোককে বিয়ের প্রস্তাব দেয়; কিন্তু মেয়েলোকটি মর্যাদার দিক দিয়ে তার চাইতে হীন। তখন মেয়ে লোকটি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কিন্তু পুরুষটি তাকে বিয়ে করেছে বলে দাবি করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ দুজন সাক্ষী হযরত আলী (রা)-এর নিকট পেশ করে। মেয়েলোকটি স্পষ্ট কণ্ঠে বলে যে, সে তাকে বিয়ে করেনি। হযরত আলী (রা) বললেন, এ দুজন সাক্ষী তোমাকে তার নিকট বিয়ে দিয়েছে। তখন তিনি সাক্ষীদ্বয়ের উপর বিয়ে কার্যকর করেন।

আবূ ইউসূফ বললেন, শুবা ইবনুল হাজ্জাজের প্রতি যায়দ থেকে বর্ণনা করা এই ঘটনা লিখে পাঠান, দুই ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এ সাক্ষ ছিল মিথ্যা মিথ্যি। বিচারক সেই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়। পরে দুজনের মধ্যের একজন সাক্ষী সেই মেয়ে লোকটিকে বিয়ে করে। শবী বলেছেন, এটা জায়েয। তবে হযরত ইবনে উমর (রা) একটি ক্রিতদাস সম্পর্কহীনতার সাথে বিক্রয় করেন। ক্রেতা তাকে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত করেন। তখন উসমান (রা) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে বলতে পার যে, আমি সেটি বিক্রয় করিনি। বরং ওর একটা রোগ আছে যা আমি গোপন করেছি। তিনি হলফ করতে অস্বীকার করেন। তখন উসমান (রা) সেটিকে তার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি দাসটিকে অন্য একজনের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন, তাতে ইবনে উমর (রা) ক্রিতদাস বিক্রয় জায়েয মনে করেছেন, একথা জানা সত্ত্বেও যে, এ হুকুমের ভেতরটা বাইরের থেকে ভিন্ন। উসমান (রা) যদি তার সম্পর্কে তেমন জানতেন যেমন ইবনে উমর (রা) জেনেছিলেন, তাহলে তিনি সেটি কখনই তাঁর নিকট ফেরত পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এইটা ছিল তাঁর মত যে, বিচারক যদি কোন চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তার মালিকের নিকট ফেরত পাঠানো কর্তব্য, যদিও ভেতরে তার বিপরীত থাকুক।

ইমাম আবূ হানীফার মত যে সত্য ও সহীহ তা প্রমাণ করছে একটি হাদীস। হাদীসটি হিলাল ইবনে উমাইয়্যাতার কিসসা সংক্রান্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। নবী করীম (স) তাদের দুজনার মধ্যে 'লেয়ান' (لعان) কার্যকর করেছিলেন। পরে বলেছিলেন, মেয়েলোকটি যদি এই এই গুণে তার নিকট আসে, তাহলে সে হিলাল ইবনে উমাইয়্যাতার জন্যে হালাল হবে। কিন্তু ভিন্নতর গুণে আসলে সে শরীক ইবনে সাহমার

হবে, যার সম্পর্কে তার উপর দোষারূপ করেছে। পরে মেয়েলোকটি ঘৃণিত অবস্থায় আসলে তখন নবী করীম (স) বললেন কিড়া-কসমের ব্যাপারই যদি না হতো, তাহলে আমার ও সে মেয়েলোকটির অবস্থা ভিন্নতর হতো, তাদের দুজনের মধ্যেকার লেয়ানের দরুণ সজ্ঘটিত বিচ্ছেদ বাতিল করে দেন নি। যদিও তিনি জানতেন যে, মেয়েলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং স্বামী সত্য বলেছে। ফলে এই ঘটনা চুক্তি ও তা ভঙ্গ করার ব্যাপারে নীতি নির্ধারক হয়ে গেল—বিচারক যখনই তার হুকুম দেবে। এমন কি, বিচারকের হুকুমে তা সূচিত হলেও তা-ই ঘটতো।

তার আর-ও একটি প্রমাণ হচ্ছে, বিচারক তো সাক্ষী দ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেবে ও তা কার্যকর করবে। সাক্ষী দুজন বাহিক্যভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য হলেই হল, সাক্ষীর যদি কোন চুক্তি হওয়ার বা তার ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার ভিত্তিতে রায় কার্যকর করা স্থগিত রাখলে সে গুনাহগার হবে, আল্লাহ্‌র হুকুম তরককারী হবে। কেননা তাকে বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনা করারই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গোপন ইলম—যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা অনুসরণের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয় নি। বিচারকের রায় যদি কোন চুক্তির পক্ষে পড়ে, তাহলে তা এমন চুক্তি হবে, যেন তা নতুন করে সুচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার রায় দিলে তাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যের চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। তবে চুক্তির পক্ষদ্বয় যদি এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে রাজী হয়, তাহলে চুক্তি কার্যকর হওয়া; কিংবা ভেঙ্গে যাওয়া আইনসিদ্ধ হবে। বিচারকের রায়ও কার্যকর হবে।

যদি বলা হয়, কোন ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি রায় দেয়া হয়, সে রায় কার্যকর হবে না, যদিও তার হুকুম কার্যকর করার জন্যেই সে আদিষ্ট, এ কথা জানা আছে।

জবাবে বলা যাবে, তার রায় কার্যকর হবে না এই কারণে যে, দাসত্বের একটা তাৎপর্য আছে, আদালতী রায়ের দিক দিয়ে তা প্রমাণিত হওয়া সহীহ্‌। শিরক এবং মিথ্যা যেনার অভিযোগের দণ্ডের ব্যাপারও তাই। ফলে তার সাক্ষ্যে বিচারকের রায় ভঙ্গ হওয়া জায়েয, সে রায় সজ্ঘটিত হওয়ার পর। সে ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাওয়া সহীহ্‌। সে ব্যাপারে বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করাও সঠিক। এই কারণে ও লোকদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় কার্যকর হবে না। কেননা পূর্বে যেমন বলেছি, বিচারের উপায়ে তা প্রমাণিত হওয়া সম্পূর্ণ সহীহ্‌। তবে ফিসক ও সাক্ষ্যের জেরায় তা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হলে তাতে এরূপ তাৎপর্য নেই যে, বিচারের সূত্রে তার প্রমাণিত হওয়া সহীহ্‌ হবে। আর তাতে মামলা গ্রহণ করা হবে না। তখন বিচারক যা কার্যকর করেছে তা ভেঙ্গে দেয়া যাবে না। তাই চুক্তি বাধ্যতামূলক করা হলেও নিরংকুশ মালিকানার রায় ভঙ্গকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা গ্রহণ করার সুযোগ যদি তাকে না দেয়া হয়, তাহলে তা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা আমাদের মতে বিচারক শুধু হস্তান্তর করার রায় দেয়, মালিক বানিয়ে দেয়ার নয়। কেননা মালিকত্বের রায় দিলে সে জন্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কি ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে, তার উল্লেখের প্রয়োজন হবে। যখন এ ব্যাপারে সব একমত যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে মালিকত্বের রূপ কি

হবে তা উল্লেখ ব্যতীতই, তাহলে বোঝা যাবে যে, যাকে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, তার নিকট হস্তান্তরিত করারই রায় দেয়া হয়েছে, আর হস্তান্তরের নির্দেশ কাউকে মালিকত্ব দেয়ার কারণ হতে পারে না। তাই জিনিসটি মালিকের মালিকানায় থেকে যাবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

যেন তোমরা লোকদের মাল-সম্পদের একটা অংশ গুনাহ সহকারে জেনে শুনে খেতে পার।

এ থেকে বোঝা যায়, এ কথা তার সম্পর্কে, যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে যা নিয়েছে, তা তার নয়। আর জানা না গেলে তা তার গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েয বিচারকের রায় অনুযায়ী—যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যদি এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার মৃত পিতার অমুক ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকা পাওনা আছে; কিংবা এ ঘরটি মৃত ব্যক্তি মিরাস হিসেবে রেখে গেছে, তাহলে উত্তরাধিকারীর পক্ষে তার দাবি করা এবং বিচারকের রায় অনুযায়ী তা নিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। যদিও মূল ব্যাপারের সত্যতা জানা যায় নি। সে যে তা গ্রহণ করছে, তাতে সে তা বাতিল পন্থায় নিচ্ছে, তা সে জানে না। আল্লাহ তো তাঁর কথা ঃ 'যেন তোমরা জেনে শুনে গুনাহস্বরূপ লোকদের মালের একটা অংশ ভক্ষণ করতে নিন্দা করেছেন জেনে শুনে নেয়াকে। এখানে তো সেই জানা-শুনা-ই নেই। পূর্বে যে বলেছি, চুক্তির বা চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে বিচারকের রায় কার্যকর হবে, সে বিষয়ে তো সকলেই একমত। ফিকাহবিদগণ যে বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তা হল, মতপার্থক্যের দিকগুলোর মধ্যে কোন একটি দিকের উপর যদি বিচারক রায় দেয়, তাহলে তা কর্যকর হবে। তা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ইজতিহাদের দেয়া অনুমতিক্রমে যা করা হয়েছে, তা কর্তিত হবে। যার পক্ষে রায় হয়েছে, তার জন্যে তা গ্রহণ করার অনুমতি হবে। রায় যার বিপক্ষে গেছে, তার তা নিষেধ করার অধিকার থাকবে না। যদিও উভয়ের ধারণা তার বিপরীতই হোক না কেন। যেমন প্রতিবেশী হওয়ার দরুন 'শুফায়া'র দাবি ও ওলী ছাড়া বিয়ে। এ ধরনের আরও যে সব ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -

হে নবী! লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নতুন উদিত চাঁদ সম্পর্কে। তুমি বল, তা হচ্ছে লোকদের জন্যে ও হজ্জ-এর সময় নির্ধারক।

'হিলাল' বলা হয় পশ্চিম আকাশের ভালে প্রথম যে চাঁদ দেখা হয় তাকে। কিংবা তার নিকটবর্তী। কেননা চাঁদের গত মাসের শেষে লুকিয়ে যাওয়ার পর এ সময়ই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে। হজ্জের জন্যে 'লব্বাইকা' ধ্বনি দেয়াই এই শব্দ থেকেই বোঝায়। সদ্য প্রসূত বাচ্চার জীবনের প্রকাশ ঘটানো কোন শব্দ করে বা নড়া-চড়া করে তা-ও এই শব্দ থেকে বানানো। লোকদের কেউ কেউ বলে, هَلَالٌ। হচ্ছে শব্দ উচ্চারণ করা। নতুন চাঁদ

উঠলে যে ধ্বনি দেয়া হয়, তা-ও শব্দ দিয়ে বোঝায়। কেননা তা দেখে উচ্চস্বরে চাঁদ উঠার কথা বলা হয়। তবে প্রথম কথাটাই অধিক স্পষ্ট ও অধিক প্রকাশমান। আরবরা বলে ঃ تَهَلَّلَ وَجْهُهُ তার মুখে আনন্দ ও স্ফূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাতে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না।

কিন্তু ঠিক কোন সময় هلال 'হিলাল' বলা যাবে, সে বিষয়ে আভিধানিকগণ কয়েকটি কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, মাসের প্রথম দুই রাতের চাঁদকে 'হিলাল' বলা যাবে। কেউ বলেছেন, তিন রাতের চাঁদকে বলা যাবে। তার পরে তার নাম হবে قمر —চন্দ্র। আস্সায়ী বলেছেন, এটা সূক্ষ্ম বৃত্তে আবর্তিত হওয়ার সময় পর্যন্ত 'হিলাল' বলা যাবে। কারোর মতে নতুন চাঁদ উজ্জ্বলতাময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'হিলাল' থাকে। তখন রাত কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তার ঔজ্জ্বল্য প্রবল হলে তাকে قَمَرٌ বলতে হবে। তাঁদের মতে তা সপ্তম রাত্রিতে হয়। হাজ্জাজ বলেছেন, দুই রাতের চাঁদকেই অধিকাংশ লোক 'হিলাল' বলে।

আয়াতের যে জিজ্ঞাসার কথা বলা হয়েছে, তা চাঁদের শীর্ষরেখা ও বড় হওয়ার মূলে কি তত্ত্ব ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে। তার জবাবে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পরিমাপ মাধ্যম। জনগণ রোযা, হজ্জ, স্ত্রীদের দিনক্ষণ গণনা, পাওয়া, আদায় ইত্যাদি ব্যাপারাদিতে এর খুব প্রয়োজন বোধ করে। ফলে এই চাঁদের বাড়তি-কমতি বৃহত্তর জনগণের সাধারণ কল্যাণের ব্যবস্থা। এর দ্বারাই তো মাস চেনা যায়। বছর ঠিক করা যায়। এতে আরও যে কত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

এ আয়াতটির আলোকে বছরের যে-কোন সময় ইহরাম বাঁধা জায়েয মনে হয়। কেননা সব চাঁদ সম্পর্কেই সাধারণ কথা বলা হয়েছে যে, তা হজ্জ-এর সময় নির্ধারক। কিন্তু প্রত্যেক মাসেই তো আর হজ্জ করা যায় না। তাই হজ্জ-এর পরিবর্তে 'ইহরাম' বাধা-ই তার অর্থ করতে হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ –

হজ্জের জানা কয়েকটি মাস রয়েছে।

তা আমাদের পূর্বোক্ত কথার বিপরীত নয়। কেননা 'হজ্জের জানা কয়েকটি মাস' এতে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাতে কথা বলার সুযোগ আছে। তাহল, হজ্জের বহু কয়টি মাস তো নয়। 'হজ্জ' বলতে 'হজ্জ' সংক্রান্ত কার্যাবলী। আর হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী কয়েকটি মাসে ছড়ানো হয় না। কেননা কয়েকটি মাস বলতে তো সময়ের ধারাবাহিকতা ও তার প্রবাহ বোঝায়। আর সময়ের স্রোত প্রবাহ তো আল্লাহ্র কাজ। হাজীর তাতে কিছু করার নেই। অথচ হজ্জ হচ্ছে হাজীর কাজ। তাতে প্রমাণিত হল যে, কালামে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। সে ইঙ্গিতে দুটির যে-কোন একটি বোঝাতে পারে। হয় হজ্জ সংক্রান্ত কাজ বোঝাবে, অথবা বোঝাবে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। এর একটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অপর একটি বোঝানোর ইখতিয়ার কারোরই নেই। অবশ্য তার দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। আয়াতের ব্যবহৃত শব্দেই যখন এই সম্ভাব্যতা রয়েছে, তখন আল্লাহ্র 'বল, তা

লোকদের জন্যে ও হজ্জের সময় নির্ধারক' কথাটিকে বিশেষীকরণ জায়েয হতে পারে না। কেননা যা সাধারণ ভাবধারা সম্পন্ন তাকে সম্ভাব্যতার দ্বারা বিশেষীকরণ আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি কথার অর্থ হয় হজ্জের ইহরাম বাঁধা, তাহলে অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা সহীহ না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং সে সব মাসে ইহরাম বাঁধা যে জায়েয, সেই কথাটিই রয়েছে আয়াতটিতে। তাই আমরা বলছি, এই আয়াত অনুযায়ীই অন্যান্য মাসেও ইহরাম বাঁধা জায়েয, অন্যান্য মাসেও তা জায়েয। অবশ্য তা অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা তার কোন একটিতেও অপরটিকে বিশেষীকরণ অনিবার্য হওয়ার মত কিছুই নেই। আর শব্দের বাহ্যিক যা দাবি করে, তা হচ্ছে হজ্জের কাজকর্মই আসল বক্তব্য। তার ইহরাম নয়। তবে তাতে فى 'তে' অক্ষরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে এক্ষণে অর্থ হবে, 'হজ্জ জানা মাসগুলোতে।' তাতে এই মাস কয়টিতে হজ্জ সংক্রান্ত কাজকর্ম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার অর্থ রয়েছে। অন্যান্য মাসের নয়। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে যদি কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধে তার পরে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করে এবং হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ' করে, তাহলে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে না। তাকে তা পুনরায় করতে হবে। কেননা হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করা যায় না। এই প্রেক্ষিতে 'হজ্জ কয়েকটি জ্ঞাত মাসে' এর অর্থ হবে, হজ্জের কর্মকাণ্ড জ্ঞাত মাসসমূহে অনুষ্ঠিত হতে হবে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক'—হজ্জের ইহরামের ব্যাপারে সাধারণ তাৎপর্যবহ। তা হজ্জের ওয়াজিব কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। আর 'বল, তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক কথাটিতে হজ্জের মাসসমূহের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, চাঁদ-এর কথা বলা হয়েছে মনে করা সঠিক কথা নয়। যেমন এসব চাঁদ লোকদের কাজ-কর্ম, তাদের ঋণের নির্দিষ্ট মেয়াদ, রোযা ও রোযা খোলা ইত্যাদি কেবলমাত্র হজ্জের মাসসমূহে বিশেষভাবে করতে হবে, অন্য মাসে করা যাবে না, তা-ও সঙ্গত কথা নয়। তাই সর্বপ্রকারের চাঁদ জনগণের কাজের সময় নির্ধারক সাধারণ অর্থই যখন প্রমাণিত হল, তখন হজ্জের ক্ষেত্রেও সেই হুকুম হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কেননা আয়াতে যে চাঁদের কথা বলা হয়েছে লোকদের জন্যে সময় নির্ধারক, সেই সেই চাঁদগুলোকে হজ্জের-ও সময় নির্ধারক বলা হয়েছে। তাছাড়া আমরা যদি কেবল হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রমই এই মাসগুলোতে করা যাবে মনে করি, তাহলে উক্ত আয়াতটির অর্থ তার ফায়দা প্রত্যাহার করা হবে। তার আসল হুকুমটা ফেলে দেয়া হবে। আর কোন প্রমাণ ছাড়া-ই শব্দটির বিশেষীকরণ করা হলে 'হজ্জের কতিপয় জানা মাস আছে' কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হবে। ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের যথার্থ অর্থ করাই যখন কর্তব্য, তার হুকুম ও ফায়দা গ্রহণই যখন তার দাবি, তখন সব চাঁদের ব্যাপারেই তার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তা হচ্ছে হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় নির্ধারক। এ পর্যায়ের অন্যান্য কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের জন্যে সময় নির্ধারক' থেকে মনে করা যায় যে, একই ব্যক্তির উপর যদি দুটি ইদ্দত পালন ওয়াজিব হয়, তাহলে তাতে দুটি একসাথে

অতিবাহিত করাই যথেষ্ট হবে, তার প্রত্যেকটিকে নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন হবে না। যেমন হায়য এবং অপর মেয়াদ ছাড়া মাসসমূহেরও প্রয়োজন হবে না। কেননা আল্লাহ্ দুটির কোন একটিকে বিশেষভাবে সমস্ত মানুষের সময় নির্দিষ্ট করেনি তার কতককে সহ, অপর কতককে বাদ দিয়ে, একটি মেয়াদ গত হতে থাকলে তা তো সে দুটি মেয়াদের প্রত্যেকটির সময়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا -

.... তখন তোমাদের দিক থেকে তাদের কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না, যা পূর্ণ হওয়ার জন্যে তোমরা দাবি করতে পার।

এ আয়াতে 'ইদ্দত' পালনকে স্বামীর হক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে 'ইদ্দত' সময়ের প্রবাহ, আর আল্লাহ্ নতুন চাঁদকে সমস্ত মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক বানিয়েছেন, তখন দুটি ইদ্দতের জন্যে একটি সময়কাল অতিবাহিত হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে। লক্ষণীয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক' সম্বোধনের তাৎপর্য থেকে বোঝা গিয়েছে যে, তা সমস্ত মানুষের ইজারার মুদ্দাদ হবে। তাদের সমস্ত ঋণের জন্যেও সেই সময়। তার মধ্য থেকে একটি হলেই কোন কোন চাঁদের সাথে অপর কিছু থেকে আলাদা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। ইদ্দত পর্যায়ে আয়াতের তাৎপর্যও তাই। দুই ব্যক্তির জন্যে একটি মুদ্দাত অতিবাহিত হওয়াই কাম্য।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের সময় নির্ধারক' থেকে বোঝা যায় যে, সময় মেয়াদের সূচনা হয় নতুন চাঁদ থেকে। আর 'মাসসমূহ' অন্তত তিনটি মাসের সূচনা নতুন চাঁদ থেকেই হওয়া উচিত—যদি তা তিন হয়। আর মৃত্যুজনিত ইদ্দত হলে তাহলে নতুন চাঁদ দেখে চার মাস গুনতে হবে। তাতে দিনের সংখ্যা গণনার কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে বোঝা যায়, সিয়ামের মাসও নতুন চাঁদ দেখে শুরু হবে। শেষও করা হবে তার দ্বারাই। হ্যাঁ, চাঁদ দেখা না গেলেই দিন গণনার প্রয়োজন দেখা দেবে। এ-ও বোঝা যায় যে, যে লোক তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করল মাসের প্রথমে, তাহলে তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে চারটি মাস চাঁদ দেখেই অতিবাহিত করতে হবে। ত্রিশ দিন গণনার কোন গুরুত্ব নেই। ইজারা, কসম, কিড়া ও ঋণের মেয়াদ ইত্যাদিতে শুরু যদি চাঁদ দেখে হয়, তাহলে সব কয়টি মাস অনুরূপই হতে হবে। ত্রিশ সংখ্য গণনার গুরুত্ব থাকবে না। এ কারণেই নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রোযা রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। আর শেষ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখতে না পেলে তোমরা সে মাসের ত্রিশ দিন গণনা কর।

এতে রাসূলের করীম (স) চাঁদ দেখতে না পাওয়ার দরুন দিনের সংখ্যা গণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا –

ঘরসমূহের মধ্যে সে সবের পেছনের দিক থেকে প্রবেশ করা কোন পূণ্য ও সওয়াবের কাজ নয়।

এ পর্যায়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীসটি আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মারওয়াজী, আল-হাসান ইবনে আবূ রবী আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামর, জুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আনসারগণ উমরার ইহরাম বাঁধলে তাদের ও আকাশের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক বা আড়াল করতেন না। সেটাকে তারা খারাপ মনে করতেন। উমরার জন্যে ইহরাম বেঁধে ঘর থেকে একবার বের হলে পরে আবার ঘরের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন না। কেননা তাহলে দরজার ছাদ তাদের ও আকাশের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াত। তখন তারা ঘরের পেছনের দিকদিয়ে প্রাচীর খুলে ফেলতেন। তার পরে কক্ষে প্রবেশ করে তার প্রয়োজনের জিনিস নিয়ে আসতে বলতেন, তার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর উমরার নিয়ত করে বের হয়ে পরে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। একটি লোক তাঁর পেছনে-পেছনে ঘরে প্রবেশ করলেন। লোকটি ছিলে বনু সালমা গোত্রের। তখন নবী করীম (স) اِنِّىْ اَحْمَسُ। 'আমি তারাতারি আসছি'। জুহরী বলেছেন, সাময়িক উত্তেজিত হওয়াকে লোকেরা তেমন পরোয়া করত না। তখন আনসারী বললেন, আমিও উত্তেজনা বোধ করছি। আমি তো আপনার দ্বীনে-ই রয়েছি। তখন আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

ইবনে আব্বাস, বরা (রা) কাতাদাতা ও আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে, জাহিলিয়াতের যুগে বহু লোক এমন ছিল যে, তারা ইহ্‌রাম বাঁধার পর তাদের ঘরসমূহের পেছনের দিকে সংকীর্ণ পথ বানিয়ে নিত ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে। উক্ত আয়াতটি লোকদেরকে এরূপ ধার্মিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলেছে, তারা যেন ঘরের দুয়ার পথেই যাতায়াত করে। এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে একটি রূপক কথা বলেছেন যে, লোকেরা যেন নেক কাজে সরাসরি আসে। সে সরাসরি পথ হচ্ছে তাই, যে পথে আসতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। এ পর্যায়ের সব কথা বলে দেয়াই আল্লাহ্‌র লক্ষ্য নয়। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঘর সমূহের সে ঘরের পৃষ্ঠ দেশ থেকে প্রবেশ করা বা আসা-যাওয়াই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কোন উপায় নয়। এটা আল্লাহ্‌র বিধানও নয়। কোন পছন্দনীয় কাজ-ও নয় এটা। তবু তা একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা। আল্লাহ্‌র সব ব্যাপারের সরাসরি ও মুখোমুখী হতে হেদায়েত করেছেন যত বিষয়েই তিনি আদেশ করেছেন, তাতে। তা-ই পছন্দনীয় কর্মনীতি। তাতে এ ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে যে, যে কাজকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়নি, পছন্দনীয় কাজরূপে চিহ্নিত-ও করা হয়নি, তার দ্বারা কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। তা

দ্বীনি পন্থাও নয়। সে পথে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। তাকে দ্বীন-ও মনে করা যায় না।

হাদীসে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। নবী করীম (স) একদিন-একরাত্রি পর্যন্ত চুপ থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি এক ব্যক্তিকে রৌদ্রে পুড়তে দেখে বলেছিলেন, লোকটির অবস্থা কি ? বলা হল, লোকটি সূর্যের প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছিল। তখন তাকে ছায়ায় নিয়ে আসতে বললেন। নবী করীম (স) নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক রোযা রাখতেও নিষেধ করেছেন। কেননা রাত্রে তো কোন রোযা হয় না। তখন না খেয়ে থাকাকে রোযা মনে করতে নিষেধ করেছেন। রাত্রে পানাহার না করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করতেও বারণ করেছেন। এ সবই মৌল কথা। এই ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, যে কাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্য বিধায়ক নয়, তার মানত মানলে সে মানত পুরা করা বাধাতামূলক নয়। তাকে ওয়াজিব করা হলেও তা আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কারণ হবে না। তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যার ওয়াজিব হওয়ার কোন ভিত্তি নেই, তা বাহ্যত নৈকট্য বিধায়ক হলেও তা মানতের কারণে ওয়াজিব হয়ে যাবে না। যেমন রোগী দেখতে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা, মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া, তাতে বসে থাকা ইত্যাদি।

জিহাদ ফরয

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর তাতে সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আবূ বকর বলেছেন, হিজরতের পূর্বে সসস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত, কোন মতপার্থক্যই এ ব্যাপারে নেই। তখন নির্দেশ ছিল ঃ মক্কী সূরার আয়াত ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْا حَظٍّ عَظِيْمٍ -

তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর কর উত্তম ও ভালো আচরণ দ্বারা। তুমি দেখতে পাবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের উচ্ছসিত বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে, যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই, যারা বড়ই ভাগ্যবান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ –

অতএব তুমি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও এবং তাদের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নাও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম কথা-বার্তা দ্বারা।

তাঁর কথা ঃ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ –

ওরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেই, (তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই) কেননা তোমার উপর তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ারই দায়িত্ব। শেষ হিসেবে-নিকেশ নেয়ার কাজ তো আমার।

তাঁর কথা ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا –

রহমানের বান্দাদের একটি গুণ হচ্ছে, জাহিল লোকেরা যখন তাদের সাথে কথা বলতে আসে, তখন তারা বলে 'সালাম'।

আর ইবনে দীনার ইকরাম, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং তার কতিপয় সঙ্গী-সাথীর ধন-মাল মক্কায় রয়ে গিয়েছিল হিজরতের সময়। তাঁরা রাসূলে করীম (স)-কে বললেন, হে রাসূল, আমরা মুশরিক থাকা অবস্থায় তো খুবই শক্তিশালী ছিলাম। কিন্তু ঈমান আনার পর আমরা দুর্বল হয়ে যাই। রাসূল (স) বললেন, আমি ক্ষমা করতে বলেছি। তোমরা জনগণের সাথে যুদ্ধ কর না। পরে যখন তাঁরা সকলে মদীনায় এসে গেলেন, তখন তাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়। কিন্তু তখন তারা হাত গুটিয়ে নিস্ক্রিয় থাকতে চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ নাযিল করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْاالزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ –

তুমি কি সেই লোকদের অবস্থা বিবেচনা করেছ, যাদেরকে এক সময় বলা হয়ছিল যে, তোমরা এখন তোমাদের হাতগুলোকে অস্ত্র চালানো থেকে বিরত রাখ। তার পরিবর্তে বরং নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, পরে যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হল, তখন তাদের মধ্যের কিছুলোক মানুষকে ভয় করতে লাগল।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, আবূ ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ্, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র এই কথায় ঃ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ -

তুমি লোকদের উপর দারোগা নও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ -

তুমি লোকদের উপর জবরদস্তিকারী নও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ -

বল ঈমানদার লোকদের, তারা যেন সে সব লোকদের ক্ষমা করে দেয় যারা 'আল্লাহ্‌র দিন' সমূহের (যখন আল্লাহ আল্লাহদ্রোহী লোকদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন এবং তাদের খারাপ কাজের বদলে আযাব দিবেন; কিংবা তাঁর অনুগত লোকদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন) আশা করে না।

এসব আয়াতের হুকুম মনসূখ করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র এ আয়াতটি ঃ

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা কর।

এই আদেশও ঃ

وَاقَاتِلَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

তোমরা যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

প্রথম কোন্ আয়াতটি যুদ্ধ করার আদেশ নিয়ে নাযিল হয়েছে, সেই বিষয়ে আগের কালের মনীষীগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। রুবাই ইবনে আনাস প্রমুখ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর।

এটিই প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত। অন্য এক দল লোক—আবূ বকর সিদ্দীক (রা), জুহরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র প্রমুখ বলেছেন, যুদ্ধে অনুমতি নিয়ে সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত হচ্ছে ঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا -

যারা যুদ্ধ করছে তাদেরকে তা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা মজলুম।

প্রথম যুদ্ধকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়ার ও যুদ্ধ মুবাহ হওয়ার আয়াত ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর' হতে পারে। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে সাধারণভাবে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে তাদের বিরুদ্ধে। যেসব মুশরিক যুদ্ধ করেনি, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'এবং তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' এ কথার বিভিন্ন অর্থ বলা হয়েছে। রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, মদীনায় যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে এই আয়াতটিই প্রথম নাযিল হয়েছে। এরপর নবী করীম (স) সেসব মুশরিকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন, যারা আগে তাদের উপর যুদ্ধ শুরু করত। যারা তা করত না, তাদের বিরুদ্ধে তিনিও যুদ্ধ করতেন না। শেষ পর্যন্ত সব কাফির মুশরিকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ আসে। ইরশাদ হয় ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً -

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ কর, যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করছে।

বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ -

তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দ ও অসহনীয়।

বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

হারাম মাসসমূহ অতীত হয়ে গেলেই তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে।

অনেকেই বলেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

এবং তোমরা তাদেরকে মসজিদে হারামের নিকট হত্যা করবে না।

এটি মনসূখ হয়ে গেছে এ কথাটির দ্বারা ঃ

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হুকুমটি মনসূখ হয়ে যায়নি, তা বহাল রয়েছে। দুশমনরা মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ না করলে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস সেই কথাটির সমর্থন করে। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

মক্কা হারাম। আল্লাহ্ যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিনই তা হারাম করে দিয়েছেন।

অবশ্য রাসূলে করীম (স) মসজিদে হারামে যে যুদ্ধ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন, তাকে দলীল বানিয়ে যদি কেউ বলেন যে, তা করার রুখসত আছে, তাহলে মনে রাখা উচিত যে, সেটা কেবল তাঁর জন্যে দিনের কিছু সময়ের জন্যে হালাল করা হয়েছিল। পরে সেই হারাম-ই পুনর্বহাল হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের হুকুমটা বহাল রয়েছে, মনসূখ হয়নি। তাই যে সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, তার বিরুদ্ধে আমরা মসজিদে হারামে যুদ্ধ শুরু করতে পারি না।

হারাম মাসসমূহেও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ আয়াতটি তার দলীল—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ - وَصَدٌّ -

লোকেরা তোমার নিকট হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধ করা খুবই বড় অপরাধ। বিরত থাকা কর্তব্য।

পরে এ আয়াত মনসূখ হয়ে যায় এ কথার দ্বারা ঃ

'যখন হারাম মাসসমূহ চলে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের হত্যা করবে যেখানেই পাবে।'

আবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, না এটা দ্বারা সে আয়াত মনসূখ হয়ে যায় নি। নিষেধ এখনও বহাল রয়েছে।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ -

এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পারবে এবং তাদেরকে বহিষ্কৃত করবে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছিল।

এ আয়াতে মুশরিকদের হত্যা করতে বলা হয়েছে যখনই তাদের আয়াত্তে আনা যাবে। যে সব মুশরিকের বিরুদ্ধে মুসলমানরা যুদ্ধ করত তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা সাধারণ নির্দেশ। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যখন উপযুক্ত সময় হবে এবং যাদেরকে হত্যা করা যায় তাদেরকে পাওয়া যাবে, তখন। কেননা বেসামরিক নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদেরকেও হত্যা করা নিষেধ। 'তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' আদেশটিতে যদি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম হয়ে থাকে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, এবং 'সীমালজ্ঘন

করবে না, কেননা আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করবে না' যদি নিষেধ হয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে করা থেকে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, তাহলে তাকে অবশ্যই মনসূখ মনে করতে হবে এবং তা 'তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পার' কথাটির দ্বারা তা মনসূখ হয়েছে বলতে হবে, কেননা প্রথমোক্ত আয়াতে যাদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, এ আয়াতে তো তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করবে না।' এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হয়ে যাবে যদি তাদের রুিদ্ধের যুদ্ধ করা হয় যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না। 'আর তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে।' অর্থাৎ মক্কা থেকে, যখন তোমরা তা করতে সক্ষম হবে। কেননা তারা মক্কায় মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ করে তাদেরকে মক্কা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছিল। ফলে তাঁরা ওদের দ্বারাই বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ –

যখন তোমাকে নিয়ে—হে নবী—কাফিররা ষড়যন্ত্র করছিল, হয় তারা তোমাকে তাদের বাপ দাদার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করবে নতুবা তোমাকে হত্যা করবে, অথবা তারা তোমাকে বহিষ্কৃত করবে .....

এই প্রেক্ষিতেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করার সময় তাদেরকেও বহিস্কৃত করার আদেশ করেছিলেন। তা-ও মুসলমানরা যখন তা করতে সক্ষম হবে। কেননা পূর্বে তারা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পার' সাধারণ হুকুম হয়ে গেল সব মুশরিকের ব্যাপারে। তবে যে সব লোক তখনও মক্কায় ছিল তাদের সম্পর্কেই এই আদেশ। তারাই তো মুসলমানদের সেখান থেকে বহিষ্কার করার আদেশ করেছিল। কিন্তু যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারই আদেশ হয়েছে।

তার দলিল হিসেবে উল্লেখ হচ্ছে সেই আয়াত, যা তিলাওআতের ধারাবাহিকতায় আসে। তা হচ্ছে ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ –

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা তা না করে।

এ থেকে প্রমাণিত হল 'ওদেরকে হত্যা কর যেখানেই ওদেরকে আয়ত্তে পাবে।' আদেশটি মক্কা ছাড়া অন্য স্থানে মুশরিকদের সম্পর্কে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

ফিতনা হত্যার চেয়েও অনেক শক্ত ব্যাপার।

আগেরকালের মনীষীদের এই কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতের 'ফিতনা' অর্থ কুফর। বলা হয়েছে, ওরা মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছিল। তাদেরকে কাফির হয়ে থাকতে বাধ্য করছিল। পরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নবী করীম (স)-এর সাহাবী। আমর ইবনুল হাজরামী হারাম মাসগুলোতে মুশরিক ছিল। তারা বলেছিল মুহাম্মাদ (স) হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করাকে হালাল করে নিয়েছেন। তখন উপরোক্ত আয়াতাংশ নাযিল হয় ঃ ফিতনা হত্যা থেকেও কঠিন ব্যাপার। 'অর্থাৎ তাদের 'কুফর' ও মুসলমানদের উৎপীড়ন ও নির্যাতন দেয়া মসজিদে হারামের শহরে ও হারাম মাসে। এটা হারাম মাসে যুদ্ধ করার তুলনায় অনেক বড় গুনাহ্‌। আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করবে না যতক্ষণে তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছে। এর অর্থ, তোমাদের কোন কোন লোককে হত্যা না করছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা নিজদেরকে দোষী বানিও না।' এর অর্থ, কতক লোক অপর কতক লোককে দোষী বানাবে না। কেননা তাদের সকলকে হত্যা করার পর তাদেরকে ওদেরকে হত্যা করার হুকুম দেয়া অর্থহীন। মক্কায় হত্যা করার নিষেধ এ আয়াতে এসেছে তার জন্যে, যে সেখানে নিহত হয় নি। এ দৃষ্টিতে যুদ্ধমান কোন মুশরিক যদি মসজিদে হারামে আশ্রয় নেয়, সে নিজে যুদ্ধ করেনি, তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ উক্ত দলীলের ভিত্তিতে। আয়াতটি সাধারণ অর্থবোধক হওয়ায় তা তার জন্যেও দলীল, যে হত্যার কাজ করে হারামে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা কে হত্যা করেছে, কে করে নাই এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি তাদের সকলকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে। অতএব আয়াতের মূল বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক হয়েছে যে, হারামে আমরা যাকেই পাব তাকেই হত্যা করতে পারব না, সে নিজে হত্যাকারী হোক, কি না হোক। তবে হারামে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকলে তাকে হত্যা করা যাবে—এক্ষণে ওরা তোমাদেরকে হত্যা করলে তোমরাও হত্যা কর' এই আদেশের বলে।

যদি বলা হয়, ও আয়াতটির মনসূখকারী আয়াত হচ্ছে এইটি ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ اللّٰهِ -

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কর যতক্ষণে ফিতনা শেষ হয়ে না যাবে এবং আনুগত্য, কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত না হবে।

জবাবে বলা যাবে, দুটি আয়াত-ই যদি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলে কোন্‌টা অপর কোন্‌টি দ্বারা মনসূখ হয়েছে বলা যায় না। তাছাড়া মনসূখ হওয়ার ব্যাপারেই লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়' এর প্রয়োগ হবে হারাম ছাড়া অন্যস্থানের ব্যাপারে।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হারামে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া, যদিও সে একজন অপরাধী। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا 'যে-ই হারামে প্রবেশ করল সে-ই নিরাপত্তা পেয়ে গেল। এই নিরাপত্তায় শামিল রয়েছে হত্যার ভয়ে ভীত ব্যক্তিও। অতএব বোঝা গেল, হত্যার যোগ্য হওয়া ব্যক্তিও যদি হারামে প্রবেশ করে, তাহলে সেও হত্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا –

স্মরণ কর, আমরা আল্লাহ্র ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছি, সেই কথা।

এ সবই প্রমাণ করে যে, হত্যারযোগ্য ব্যক্তি হারামে আশ্রয় নিলে সে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা সে এখন হারামে আছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ ফিতনা শেষ না হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্টিত না হয়' তো প্রথম সম্বোধনেই নাযিল হয়েছে। যখন নাযিল হয়েছিল ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না।' অতএব এটি ওটির মনসূখকারী হতে পারে না। কেনন মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন হবে কাজে পরিণত হওয়ার পর, পূর্বে নয়। আর একটি সম্বোধনে বলা কথার এক অংশ মনসূখকারী ও অপর অংশ মনসূখ হতে পারে না। যখন সব কথাই একই সম্বোধনে বলা হয়েছে, তিলাওয়াতের বিন্যাসে তাই রয়েছে, নাযিল হওয়ার সংস্থাও তাই। অতএব দুটি আয়াতের নাযিল হওয়ার একটার তারিখ ঠিক রাখা ও অপরটির নাযিল হওয়ার তারিখ পিছিয়ে দেয়া জায়েয হতে পারে না। তবে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলে ভিন্ন কথা। একটির দাবি সহীহ্ হওয়া সম্ভবও নয়। একথা রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এটি মনসূখ হয়েছে আল্লাহ্র 'ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়' কথার দ্বারা। কাতাদাতা বলেছেন, সেটি মনসূখ হয়েছে আল্লাহ্র 'অতঃপর তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের তোমরা পাবে' কথা দ্বারা, ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা সঙ্গত হতে পারে, রায় দ্বারাও। কেননা ঃ 'অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদের পাবে' আল্লাহ্র এই কথাটি নিঃসন্দেহে সূরা আল-বাকারার পরে নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর তাতে কোনটির মনসূখ হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। কেননা দুটির-ই প্রয়োগ সম্ভব—সম্ভব এভাবে যে, মুশরিকদের তোমরা হত্যা কর' কথাটি ওদের বিরুদ্ধে 'মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না' কথাটির উপর ভিত্তিশীল। এক্ষণে মোট কথাটি এই দাঁড়ায়. তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তবে মসজিদে হারামের নিকট নয়। কিন্তু তারা যদি সেখানেই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। তারা যদি তা করে, তাহলে তোমরাও ওদেরকে হত্যা করবে। একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি ইবনে আব্বাস, আবূ শুরাইহ্ আল-খুজাঈ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। বলেছেন, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিয়ে বললেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَمْ يَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ، وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

হে জনগণ! আল্লাহ্ যেদিন আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারোর জন্যে হারাম হয়নি, আমার পরেও তা কারোর জন্যে হালাল করা হবে না। আমার জন্যে দিনের কিছু সময়ের হালাল করা হয়েছিল মাত্র। পরে তা পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে।

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে হালাল করা হয়েছিল দেখে যদি কেউ রুখসত আছে বলে ধরে নেয়, তাহলে তার মনে রাখা উচিত যে, তাঁর জন্যেও দিনের মাত্র কিছু সময়ের তরে হালাল করা হয়েছিল। এ থেকে হারামে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াই প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, ওরাই যদি তা করে, তাহলে ভিন্ন কথা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদুল মুকবেরী, আবূ শুরাইহ আল খুজাঈ সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, আমাকে মাত্র একদিনের কিছু সময়ের জন্যে সেখানে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অপর একটি বর্ণনাও তার সমর্থন করে। মক্কা বিজয়ের দিন খুজায়া বংশের এক ব্যক্তি যখন হুযায়ল বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসল, তখন নবী করীম (স) ভাষণ দিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহ্র নিকট অধিক গর্হিত অপছন্দনীয় হচ্ছে তিন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি যে তার হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্যকে হত্যা করেছে, যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে হত্যাকাণ্ড করেছে এবং সেই ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করল।

এই হাদীসও হারামে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা হারাম প্রমাণ করে। তার দুটি কারণ। প্রথম, হারামে হত্যাকারীকে সাধারণভাবেই নিন্দা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সেই সাথেই উল্লেখিত হয়েছে, যে হত্যার যোগ্য নয় তাকে হত্যা করা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হত্যা তাকে করা যাবে, যে নিহত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, পরে সে হারামে আশ্রয় নিয়েছে। এটা রাসূলে করীম (স) কর্তৃক দেয়া খবর যে, হারাম তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছে। উপরে উদ্ধৃত সব কয়টি আয়াত থেকে এক সাথে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হারামে আশ্রয়গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে তা নিষিদ্ধ হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাণ হত্যার কমের কোন অপরাধ পর্যায়ে কোন দলীল তাতে নেই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তাদেরকে মসজিদুল হারামের নিকটে হত্যা করো না।' কথাটি হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যেই সীমিত। আর 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করল, সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল' এবং 'জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান' কথা দুটি বাহ্যত হত্যা থেকে নিরাপত্তা লাভ-ই বোঝায়। কোন দলীল পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতে অন্যদেরকেও তাতে গণ্য মনে করা যায়। কেননা 'যে সেখানে প্রবেশ করবে' কথাটিতে মানুষ সম্পর্কেই বলা। 'সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল' কথাটিও মানুষ সম্পর্কেই। আয়াত যার নিরাপত্তার দাবি করছে, সে মানুষই বটে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। তা সত্ত্বেও

শব্দ যদি প্রাণের প্রতি ইঙ্গিত করে ও তার চাইতেও কম জিনিসেও, আর আমরা যদি দলীলের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ করে থাকি তার চাইতে কম জিনিসকে, আর শব্দের হুকুমটা প্রমণের ব্যাপারে অবশিষ্ট থেকেই যায়। কারোর উপর ঋণ থাকা অবস্থায় সে যদি হারামে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সেখান থেকেই তাকে কয়েদ করা হবে। তার হারামে প্রবেশ তাকে এই গ্রেফতারী থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই। প্রাণের দায় ছাড়া আর যত হক্-হুকুকের ব্যাপার রয়েছে, হারাম তাকে তা আদায় করা থেকে রক্ষা করতে পারে না যেমন ঋণের বেলায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

ওরা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।

এটা হচ্ছে একটি বিষয়ে শর্ত আরোপ, এ শর্তটা হলে কি হবে সেই কথাটি এর পরই বলে দেয়া দরকার। তা হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর জন্যেও তওবা করার সুযোগ রয়েছে। কেননা 'কুফর' হত্যার তুলনায় অনেক বড় গুনাহ। আর আল্লাহ তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, কাফির ব্যক্তির তওবা আল্লাহ কবুল করবেন, তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণে না ফিতনা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠি হয়' কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছে, যতক্ষণ না তারা কুফর ত্যাগ করবে। ইবনে আব্বাস, কাতাদাতা, মুজাহিদ, রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, 'ফিতনা' শব্দটি এখানে শির্‌ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, কুফরকে ফিতনা বলা হয়েছে এজন্যে যে, কুফর মানুকে ধ্বংস করে। ফিতনাও তাই করে। অপরদের মত হচ্ছে, ফিতনা অর্থ যাচাই-পরীক্ষা, বিপদে ফেলে মানুষের খাটিত্ব অ-খাটিত্ব পরখ করা। আর 'কুফর' যাচাই-পরীক্ষাকালে বিপর্যয় প্রকাশ করে। তার 'দ্বীন' অর্থ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তার দাসত্ব বন্ধনে বন্দী হওয়া। তার আসল আভিধানিক অর্থ দুটি। একটি الانقياد। বন্ধনে বন্দী হওয়া। আর দ্বিতীয়টি العادة। অভ্যাস। আর শরীয়াতের দিক দিয়ে দ্বীন-এর অর্থ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব বন্ধনে বন্দী হওয়া, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা চিরন্তন ও অভ্যাসগতভাবে। এ আয়াতটি বিশেষভাবে মুশরিকদের সম্পর্কে। আহলি কিতাব এর মধ্যে শামিল নয়। কেননা সম্বোধনের শুরুতে তাদেরই উল্লেখ রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে ঃ তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদেরকে আয়ত্তাধীন পাবে' এবং 'তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বহিষ্কৃত করেছে।' এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে বলা কথা। তারাই নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তাই এই নির্দেশে আহলি কিতাব অন্তর্ভুক্ত নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব মুশরিকদের নিকট থেকে দুটির যে-কোন একটিই গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ হয় তারা ইসলাম কবুল

করবে, নয় তাদের প্রতি তরবারির ব্যবহার হবে। কেননা আল্লাহ্ তো বলে দিয়েছেন ঃ 'আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেন ফিতনা নিঃশেষ ও খমত হয়ে যায়।' আর 'ফিতনা' অর্থ, কুফর। আর 'দ্বীন'—আধিপত্য-কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম কায়েম হবে। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট আল-ইসলামই একমাত্র দ্বীনরূপে গ্রহণীয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

ওরা যদি বিরত থাকে, তাহলে জালিম ছাড়া অন্য কারোর উপর বাড়াবাড়ি করা হবে না। অর্থাৎ জালিম ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হবে না।

শুরুর শব্দ 'হত্যা' 'এবং তাদের বিরুদ্ধে কর' কথার মধ্যে যা রয়েছে, এ তো সেই হত্যা, যা কাফিরদের জন্যে কুফরির কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। আর তা-ই হচ্ছে জুলুমের প্রতিফল। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -

খারাপ কাজের প্রতিফল অনুরূপ খারাপ কাজ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর, যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে।

তবে প্রতিফলস্বরূপ যা করা হবে, তা সীমালঙ্ঘন নয়, খারাপও নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ -

হারাম মাসসমূহ হারাম মাসসমূহের বিকল্প। আর হুরমত হচ্ছে কিসাস।

হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, আরব মুশরিকরা নবী করীম (স)-কে বলেছিল, হারাম মাসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে তুমি বিরত থাকলে ? নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ,। মুশরিকরা হারাম মাসে তাঁকে বদলে দিতে চেয়েছিল। তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার ইচ্ছা করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল করেন। তার অর্থ, হারাম মাসে তারা যদি তোমার প্রতি কোন আচরণ হালাল করে, তাহলে তোমরাও তাদের ব্যাপারে অনুরূপ হালাল করে নিবে।

ইবনে আব্বাস, রুবাই ইবনে আনাস, কাতাদাতা, দহাক বর্ণনা করেছেন, কুরায়শরা রাসূলে করীম (স)-কে যখন মক্কার মাঝ পথ থেকে ফেরত দিয়ে দিল, এটা ছিল যিলকাদ মাস আর তা হল হারাম মাস। তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা রওয়ানা হয়েছিল।

আল্লাহ তাঁকে পরবর্তী যিলকাদ মাসে মক্কায় প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি উমরার কাযা আদায় করেছিলেন। কেননা আগের বছর হুদায়বিয়ার নিকটে তাঁকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল ও ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল উমরা না করেই। উক্ত কথার দুটি অর্থ হতে পারে না। মুশরিকরা হারাম মাসে তাঁকে বাঁধা দিয়েছিল, পরবর্তী বছর সেই হারাম মাসেই আল্লাহ তাঁকে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার সম্ভব করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে এই কথা শামিল রয়েছে যে, হারাম মাসে মুশরিকরা যুদ্ধ করলে মুসলমানদের জন্যেও হারাম মাসে যুদ্ধ করা মুবাহ। কেননা একটি শব্দ একই সাথে খবর ও আদেশ দুটিই হতে পারে না। আর একটি অর্থ গ্রহণ করা হলে তার অপর অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তবে আল্লাহ তাঁর জন্যে বিকল্প বানাবার জন্যে এক হারাম মাসের বদলে আর একটি হারাম মাস নির্দিষ্ট করে দিলেন। যে মাসটি শেষ হয়ে গেছে সে মাসটির হুরমত সেই মাসটির হুরমত-এর মতই ছিল, যে মাসে তাঁকে মক্কায় যেতে দেয়া হয়েছিল। এই কারণে الحرمت قصاص। 'হুরমতসমূহ সমান সমান' বলা হয়েছে। এর পর-পরই বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করলো, তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর যেমন সে তোমাদের উপর করছে।' এ থেকে বোঝা গেল, কাফিররা হারাম মাসে যুদ্ধ করলে মুসলমানদেরও কর্তব্য সেই হারাম মাসে যুদ্ধ করা। তবে মুসলমানদেরই যুদ্ধ শুরু করা জায়েয নয়। সীমালঙ্ঘনের প্রক্রিয়াস্বরূপ যে কাজ করতে বলা হয়েছে, তাকেও সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। কেননা এটাও সেই জাতীয় কাজ। এটা তাদের পাওনা। কেননা তারা যা করেছে, তাতে তার জওয়াবস্বরূপ এই কাজটা করা অপরিহার্য। এই কারণে সেটিকেও সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। এটা প্রত্যক্ষ কথা নয়, পরোক্ষ। কেননা মূলত সীমালঙ্ঘনকারীই জালিম। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার সাথে সীমালঙ্ঘনের কাজ কর, যেমন সে করেছে'—সাধারণ অর্থবোধক। ঠিক যেমন কেউ কারোর মাল ধ্বংস করলে তার মালও অনুরূপ ধ্বংস করাই সাধারণ নিয়ম। এই দৃষ্টান্তমূলক কথাটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি, সেটি সেই সমজাতীয় কাজ। পাত্র দ্বারা বা পাল্লা দ্বারা ও সংখ্যায় গণিত জিনিস পরিমাপের দিক দিয়ে অভিন্ন। আর দ্বিতীয়টি তারই মতো মূল্যে। নবী করীম (স) একটি ক্রীতদাসের ব্যাপারে দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা দিয়েছিলেন। তাদের একজন সেটিকে মুক্ত করে দিয়েছিল। তার উপর তার মূল্যের অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছিলেন। সীমালঙ্ঘনে তারই মতো বাধ্যতামূলক সমান বানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তার মূল্য। ফলে এটি একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমান জিনিস কখনও মূল্যের উপর ধার্য হয়। তখন তা তার নাম হয়ে যায়। বোঝা গেল সমান জিনিস কখনও নামে হয়, যা তার সমজাতীয় নয়, যখন তা ওজনে হয়, কখনও পরিমাপে পরিমাণ ধার্যকরণে। যা কর্মফল হিসেবে পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। যদি কেউ কারোর উপর মিথ্যা যিনার দোষারোপ করে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে যা করার অধিকারী হয়েছে, তাতে অনুরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনার অধিকার হয় না। বরং অনুরূপ শাস্তিস্বরূপ সে আশি দোররা খাওয়ার যোগ্য হয়েছে। তেমনি কেউ যদি কাউকে গালমন্দ বলে, যিনার

অভিযোগের তুলনায় তা কম মাত্রার দোষ। তাই তার উপর তা'জীর (একটি শাস্তি) ধার্য হবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সমান-সমানের নাম কখনও তার সমজাতীয় না-ও হতে পারে।

উক্ত নীতির ভিত্তিতে বলা হয়েছে, কেউ যদি শক্ত কাঠ চুরি করে তার নির্মাণ কাজে ঢুকিয়ে ফেলে, তাহলে তাকে তার মূল্য দিয়ে দিতে হবে। কেননা মূল্যটাই তখন তার সমজাতীয় প্রতিশোধ গণ্য হতে পারে। অপহরণকারী তা নিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে, অতএব সাধারণভাবে হক্ আদায়ের আদেশের দরুন এ ব্যবস্থাই তার জন্যে উপযুক্ত।

যদি বলা হয়, এ সময় তো তার নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সেই কাঠ বের করে নিলেই সেই জিনিসটিই উদ্ধার করা যায়। সেটাই হবে তার সীমালঙ্ঘনমূলক কাজের সমজাতীয় প্রতিবিধান।

জবাবে বলা যাবে, তার আসল মালিকানা সম্পদ নিয়ে নিলেই অপহণকারীর উপর সীমালঙ্ঘন হয় না। যেমন কারোর নিকট কোন আমানত থাকলে সেটাই যদি নিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ হয় না। সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ হবে যদি তার মালিকানাকে ক্ষয় করা যায়, যেমন সে একজনের মালিকানাকে ক্ষয় করেছে। অথবা তার হাত বঞ্চিত হবে অনুরূপ সেই জিনিস থেকে যা তার হাত প্রথম ব্যক্তির (যার কাঠ সে হরণ করেছিল) মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তার আসল মালিকানা গ্রহণে কারোর উপরই কোন সীমালঙ্ঘন থাকে না। তাতে অনুরূপ জিনিস গ্রহণও হয় না।

এই দলীলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, কিসাস ওয়াজিব হবে যাতে সমান সমান ও অনুরূপ জিনিস পূর্ণ মাত্রায় নেয়া সম্ভব। যাতে পূর্ণ মাত্রায় নিয়ে নেয়া হয় বলে জানা যায় না, তা নয়। যেমন অর্ধবাহুর স্থান থেকে হাত কেটে ফেলা, তাতে কিসাস প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণে। কেননা তাতে অনুরূপ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ কঠিন ব্যাপার। যেহেতু আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ করেছেন পূর্ণ মাত্রায় অনুরূপ জিনিস গ্রহণ করতে।

এই আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলেছেন, যে লোক এক ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেছে এবং তাকে হত্যাও করেছে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের অধিকার রয়েছে এই হত্যাকারীর প্রথমে হাত কাটা এবং পরে তাকে হত্যা করার। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর যে লোক সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর যেমন সে করেছে।' অতএব নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের তা-ই করার অধিকার রয়েছে যেমন সে করেছে, এটাই আয়াতের দাবি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ –

এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু কয়টি দিক উন্মোচিত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে হাদীস, মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহম্মাদ ইবনে আমর ইবনে সরহ্‌, ইবনে অহব, হায়াত ইবনে শুরাইহ ও ইবনে লেহয়াতা, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, আসলাম আবূ উমর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমরা কনস্ট্যান্টি নোপলের উপর যুদ্ধাভিযান চালালাম। বাহিনীর প্রধান ছিলেন আবদুর রহমান ইবনুল অলীদ। শহরের পৃষ্ঠদেশে রোমানরা একেবারে লেগেছিল। এই ব্যক্তি শত্রুর উপর আক্রমণ চালালো। লোকেরা বলল, থাম, থাম। লোকটি কলেমা পড়তে পড়তে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করল। তখন আবূ আইয়ূব বললেন, এ আয়াতটি আনসার জনগণের বিষয়ে নাযিল হয়েছিল, যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্যদান করেছিলেন এবং তাঁর দ্বীন-ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা বললাম, আস, আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে থাকব এবং তার সংস্কার করব। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় কর এবং নিজদিগকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' বোঝা গেল নিজেদের হাতে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা বলতে বোঝায়, সম্পদের মধ্যে অবস্থান করা,তার কল্যাণ সাধনে ব্যতিব্যস্ত হওয়া এবং জিহাদ ত্যাগ করা। আবূ ইমরান বলেছেন, অতঃপর আবূ আইয়ূব আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কনস্টান্টিনোপলে সমাহিত হন। আবূ আইয়ুব জানিয়েছেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসে নিক্ষেপ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করা। আয়াতটি এই বিষয়েই নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হুযায়ফা (রা), আল-হাসান, কাতাদাতা, মুজাহিদ ও দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে।

বরা ইবনে আজিব (রা) ও উবায়দাতুস্‌-সালমানী থেকে বর্ণনা এসেছে, নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত পাওয়া থেকে নিরাশ হওয়া গুনাহের কাজ করার পর। কারো কারো মতে অযথা ব্যয় ও অপচয় করা এমনভাবে যে, শেষ পর্যন্ত তার পানাহারের ব্যবস্থাও থাকবে না। ফলে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনিবার্য। অপর লোকদের মতে শত্রুকে উৎক্ষিপ্ত করা ছাড়াই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু আয়াতটির এই সব ব্যাখ্যাকে আবূ আইয়ূব আনসারী অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এগুলো কারণ হতে পারে। কিন্তু এই সবই আয়াতের অর্থ হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এই সব অর্থই এক সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাতে অর্থসমূহের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তবে এক ব্যক্তির পক্ষে শত্রু আক্রমণ—শত্রুদের এক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া—মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তাঁর السير الكبير। গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—এক ব্যক্তি যদি এক হাজার ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে, সে একা, নিঃসঙ্গ, তাতে তার কোন ভয় হয় না, যখন সে মুক্তির জন্যে লালায়িত, কিন্তু শত্রুকে লাঞ্ছিত করা। যদি মুক্তির আশা না তাকে, শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও না হয়, তাহলে আমি তার জন্যে এ কাজ পছন্দ করি না। কেননা সে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাতে মুসলমানদের কোন ফায়দা হয় না। এক ব্যক্তির পক্ষে তা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, যখন সে মুক্তি লাভের কিংবা মুসলমানদের ফায়দার আশা হবে। যদি তা না হয়, বরং তাতে

মুসলমানরা অধিকতর সাহসী হয়ে উঠবে বলে আশা হয়, মুসলমানরাও তারই মত কাজ করবে এবং যুদ্ধ করবে ও শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশা থাকে, তা হলে তাতে দোষ হবে না ইন্‌শা আল্লাহ্‌। কেননা তাতে যদি শত্রুপক্ষের ক্ষতির আশা করা যায়, মুক্তির আশা না-ও হয়, তবু একজন লোক বিরাট শত্রুর উপর আক্রমণ করলে আমি কোন দোষ দেখতে পাই না। অনুরূপভাবে অপরকে যদি জয় করা সম্ভব হয় কোন ব্যক্তির একার আক্রমণে, তাতেও কোন দোষ নেই, বরং তা করে সে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে বলে আমি আশা পোষণ করি। হ্যাঁ, তাতে যদি কারোরই কোন ফায়দা না হয়, কোন রকমেরই কল্যাণ না হয়, তাহলে তা করা উচিত নয়। যদিও মুক্তি ও বিজয়ের আশা না-ও হয়। তবে তাতে শত্রু যদি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তা হলে তাতে দোষ হবে না। কেননা এটা একটা উত্তম পন্থা শত্রুকে গায়েল করার। আর তাতে মুসলমানদের যথেষ্ট ফায়দাও রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ এই যা কিছু বলেছেন, তা সহীহ্‌ কথা, তার বিপরীত কিছু জায়েয নয়। এ সব অর্থের দৃষ্টিতে আবূ আইয়ূব বর্ণিত হাদীসে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এক ব্যক্তি শত্রুর উপর আক্রমণ করলে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে যখন তাতে কোনরূপ ফায়দা হবে না। অবস্থা যদি তা-ই হয়, তা হলে কোনরূপ ফায়দা ছাড়া-ই নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে দ্বীনেরও কোন ফায়দা হবে না, মুসলমানদেরও নয়। তবে নিজেকে ধ্বংস করলে দ্বীনের যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার ব্যাপার, আল্লাহ্‌ এই কারণে নবী সাহাবীগণের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَ لَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ –

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বলে যে, তাদের জন্যে জান্নাত রাখা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, তাতে তারা হত্যা করে, নিহতও হয়।

বলেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ –

লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রয় করে দেয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে।

এর দৃষ্টান্তে আরও বহু আয়াত রয়েছে, তাতে আল্লাহ্‌ প্রশংসা করেছেন সেসব লোকের, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র জন্যে ক্ষয় করেছে।

এই প্রেক্ষিতে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' সংক্রান্ত হুকুমটা বাস্তবায়িত হবে যদি তাতে দ্বীনের কোনরূপ ফায়দার আশা থাকে। তাতে তার জান-প্রাণ ক্ষয় করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিহত হবে। তারা হবে শহীদদের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ - اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ -

এবং ভালো কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব বিপদ তোমার উপর আসবে, তা সহ্য করে নাও। মনে রেখো, এ অত্যন্ত উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার ব্যাপার।

ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার শহীদ হচ্ছে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্যকথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্, আবদুল্লাহ, ইবনে ইয়াযীদ, মূসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ্, তাঁর পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছিলেন, (আমি শুনছিলাম) ঃ

شَرُّمَا فِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে ধৈর্য-সহ্যহীন অতৃপ্ত লোভ ও লালসা এবং কর্মহীন ভীরুতা, সাহসহীনতা।

ভীরুতা, কাপুরুষতার এই নিন্দা বীরত্ব-সাহসিকতা ও অগ্রসরতার প্রশংসার উদ্ভাবক। তবে যদ্দারা দীন-ইসলামের কল্যাণ সাধিত হয়, তা। তাতে ধ্বংস নিশ্চিত হলেও কোন দোষ নেই।

খায়রুন প্রকাশনী